গ্রন্থাবলী সিরিজ   ৯০১   3804

দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী

দেশবন্ধু
চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার—মূল্য ১৲ টাকা।

সূচিপত্র

১। মালঞ্চ ১

২। কাব্যের কথা—

(ক) স্তব ২৮

(খ) কবিতার কথা ৩০

(গ) বাঙ্গালার গীতিকবিতা ৩৭

(ঘ) রূপান্তরের কথা ৮৩

৩। অন্তর্য্যামী ৯৩

৪। ডালিম ১০৩

৫। কিশোর-কিশোরী ১১১

৬। দেশের কথা ১২৩

৭। মালা ১৭৫

৮। সাগর-সঙ্গীত ১৯১

৯। অপ্রকাশিত কবিতা ২০২

১০। বক্তৃতাবলী ২০৭

মালঞ্চ

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

মালঞ্চ

উপহার

আসিয়াছ শুধাইতে, ল'য়ে মধু হাসি,
নব বরষের করি মঙ্গল কামনা ;
নয়নে এসেছ ল'য়ে সুখ রাশি রাশি,
নির্ব্বাপিতে জীবনের জ্বলন্ত যাতনা ।
রাখ মোর হস্ত-পরে ওগো বরাঙ্গনে !
কোমল মঙ্গলভরা প্রিয় হস্তখানি ;
তোমার ও শুভদৃষ্টি থাকুক্ জীবনে,
ভাগ্যহীন জনমের তুমি হও রাণী !
প্রথম প্রভাতে আজি নব বরষের,
উঠুক্ ফুটিয়া তব প্রেম-পুষ্প, হাসি,
সুন্দর মঙ্গলরূপে !—লুব্ধ হৃদয়ের
আশা-দীপ, তাড়াইয়া অন্ধকাররাশি ।
তোমারে কি দিব, শুভে ! কহ আজ, কহ ?
মঙ্গলকামনা শত লহ তুমি লহ !

তোমার প্রেম

তোমার ও প্রেম সখি ! শাণিত কৃপাণ !
দিবা-নিশি করিতেছে হৃদি-রক্ত পান ।
নিত্য নব সুখ-ভরে,
ঝলসিছে রবি-করে
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্ব্বাণ !

তোমার ও প্রেম সখি ! শাণিত কৃপাণ !
তোমার ও প্রেম সখি ! ভুজঙ্গের মত,
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত !
প্রতি নিশ্বাসেই তার,
বরিষে মরণ-ধার ;
আকুল চুম্বন আর, দংশিছে সতত !
তোমার ও প্রেম সখি ! ভুজঙ্গের মত !

তোমার ও প্রেম সখি ! স্বপন সমান—
সুখশ্রান্ত শশী সম মোহ-ম্রিয়মাণ !
নিশীথের অন্ধকারে,
কুসুমের গন্ধ-ভারে,
অজানিত সুখ করে হিয়া কম্পমান !

তোমার ও প্রেম তাই স্বপন সমান !
তোমার ও প্রেম সখি ! নিশি আঁধিয়ার !
তমোময় আবরণ আমার তোমার !
কোন মোহ-আকর্ষণে,
হাতে হাত লয় টেনে—
তার পরে লুপ্ত করে এ বিশ্ব-সংসার !
তোমার ও প্রেম সখি ! নিশি আঁধিয়ার !

তোমার ও প্রেম সখি ! অনলের প্রায় !
হৃদয়ের ফুল-বন দগ্ধ করে যায় !
তীব্র দুঃখ, তীব্র সুখ,
শান্তিহীন শ্রান্ত বুক,
চির দীর্ঘশ্বাস মোর অন্তরে জাগায় !
তোমার ও প্রেম সখি ! অনলের প্রায় ।

তোমার ও প্রেম সখি । মৃদু মধু আলো !
কুসুম-চুম্বনে তার, জীবন জুড়ালো !

কোন্ রজনীর তীরে,
কেমনে আসিল ধীরে,
নব স্ফুট প্রাণ-পরে স্বপন রাজিল !
তোমার ও প্রেম সেই মৃদু মধু আলো !

তোমার ও প্রেম সখি ! প্রবাসীর প্রায়,
অনন্ত অচিন্ত্য ভাবে ভাসে কল্পনায় !
• অর্দ্ধেক পরাণ হ'রে,
আর অর্দ্ধ থাকে ভ'রে,
তৃষাতুর হৃদয়ের অন্ধ বেদনায় !
তোমার ও প্রেম সেই প্রবাসীর প্রায় !

তোমার ও প্রেম সখি ! অদৃষ্ট সমান,
নিষ্ঠুর শকতি-পূর্ণ, অনন্ত মহান্ !
হ'য়ে জীবনের প্রভু,
হাসায় কাঁদায় কভু ;
ও রাজ-চরণে তবু লুটায় পরাণ !
তোমার ও প্রেম মোর অদৃষ্ট সমান !

তোমার ও প্রেম সখি ! ভিখারীর প্রায়,
আমার প্রাণের কাছে কাঁদিয়া বেড়ায় !
যা' ছিল সকলি খুলে,
স'পেছি চরণমূলে ;
তবু সেই আঁখি তুলে, বাসনা জানায় !
তোমার ও প্রেম সখি ! ভিখারীর প্রায় !

তোমার ও প্রেম সখি ! অমর-জীবন—
শান্তিরূপী নন্দনের চির-আরাধন !
অসার স্বপন লয়ে,
থাকিলে নিদ্রিত হয়ে,
ধূলা ভরা ধরণীর ধূলি-নিমগন,
তোমার ও প্রেম আনে জাগ্রত জীবন !

তোমার ও প্রেম সখি ! মরণ সমান—
জীর্ণ শ্রান্ত জীবনের শান্তি-আবরণ !
কোমল তুষার কর,
রাখিয়া ললাট'পর,
জুড়ায় অনন্ত জ্বালা, আনিয়া নির্ব্বাণ !
তোমার ও প্রেম তাই মরণ সমান !

তোমার ও প্রেম সখি ! তোমারি মতন,
অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মগন !
অধর, প্রশান্ত ধীর,
আঁখি, কৃষ্ণ, সুগভীর,
পুষ্পিত হৃদয় তীর, সৌরভ-স্বপন !

এই কাছে এসে চাও,
ওই দূরে চ'লে যাও,
এ সকল ক্ষণিকের অর্দ্ধ-আলিঙ্গন !
সমস্ত হৃদয় তব,
অজ্ঞানিত নিত্য নব,
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন !
তোমার ও প্রেম সেই তোমারি মতন !

রাণী

মধুর অধরে তার প্রভাতের প্রভা,
লাবণ্য-ললিত বাহু নিন্দিছে নবনী ;
নিশ্বাসে নন্দন গন্ধ, ভালে শুভ্র শোভা,
চরণ-পরশে রক্ত অলক্ত অবনী !
অখণ্ড সুন্দর তনু, অনিন্দ্য মুরতি,
গীত-গন্ধ-বর্ণ-ভরা সুধার ভাণ্ডার !
তারি মাঝে উদ্ভাসিত অনিমেষ-জ্যোতি,
অনন্ত সুন্দর প্রাণ, অনন্ত, উদার !

হৃদয়ের আশা তার, ভ্রমরের মত,
সৌন্দর্য্য-সঙ্গীত-পুঞ্জ তুলিছে গুঞ্জরি !
হৃদয়ের প্রেমে তার প্রস্ফুট সতত,
জীবন-নিকুঞ্জবনে যৌবন-মঞ্জরী !

রাণী হয়ে করিয়াছে রাজত্বস্থাপন,—
আমারি হৃদয়ে তার পদ-পদ্মাসন !

জাগরণ

আমার এ প্রেম তুমি রেখো না বাঁধিয়া
হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বন্ধ কুসুমের
সমস্ত-গগন-ভরা পবনে লাগিয়া,
সমস্ত ধরণী পা'ক্ প্রেম মরমের।

সুনীল নয়ন তব নহে গো আকাশ,
প্রাণ-পাখী আর নাহি ধায় নিরুদ্দেশ ;
ও তনু-পরশ নহে বসন্ত-বাতাস,
বাসনার স্বর্গ নহে তব কৃষ্ণ কেশ।

আজি এ হৃদয় মোর ছিঁড়েছে বন্ধন,
পড়েছে বিশ্বের আলো পুষ্প-কারাগারে ;
আবর লাবণ্য তব, নিবার চুম্বন,
ভেসেছে তরণী আজ মুক্ত পারাবারে।

প্রভাতে জাগ্রত হৃদি, শেষ কর গান :
আমার জীবন-ভরা বিশ্বের আহ্বান !

ওফিলিয়া
(OPHELIA.)

বর্ণহীন শুভ্র শোভা ম্লান মরতের
ওফিলিয়া ! তুমি যেন প্রভাত-শিশির।
অনন্ত-সৌন্দর্য্য-ভরা কবিহৃদয়ের
ওফিলিয়া ! তুমি যেন স্বপন নিশির !

ওফিলিয়া ! মৃদু প্রেম তব মরমের—
কুসুমকোরক সম সুন্দর সুধীর—
শত ছিন্ন, পরশিয়া ক্ষিপ্তপ্রেমিকের
দিবসের দুর্ভাবনা, দুঃস্বপ্ন নিশির !

দেবতার বজ্র যেন আসিল নামিয়া
তোমার মস্তক-পরে, সুন্দর তরুণ,
সুবর্ণ শৈশব-স্বপ্ন সকলি ঢাকিয়া,
চির-অস্তাচলে গেল জীবন-অরুণ।

এস এস পুষ্প হাতে, পূর্ণ পাগলিনি !—
সুধায়ো না—চক্ষে লেখা জীবন-কাহিনী !

ঋণ

তুমি চাও স্বপ্ন-ভরা প্রেম নিরমল,
তুমি চাও মর্ম্মপূজা রক্ত হৃদয়ের !
তোমার ঐশ্বর্য্য চাই, জীবন-সম্বল ;
তুমি চাও স্বর্গ যেন, ফুল নন্দনের !
ঋণী আমি সকলের ; জনম ভরিয়া
কত আর কব শুধু আশ্বাসবচন !
বিশ্ব ভরা ক্ষুধা যেন ফেলেছে ঘিরিয়া -
রিক্তহস্ত, নিরুপায়, অস্থির জীবন !
জনমের আছে দাবী, মরণের দেয়,
তোমরা ভুলিয়া কর মিছে অভিমান,
ভগ্ন হৃদি, দগ্ধ তনু, ধূলা মুষ্টিমেয়,
জীবন-চরণে রবে মরণের দান !
আমার যা আছে তাই লয়ে যাও সব
তার বেশী বৃথা আশা, মিছে কলরব !

আমার ঈশ্বর

সম্মুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়া,
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ অন্ধকার।
নিষ্প্রভ নয়ন হ'তে যেতেছে হারায়ে
জীবনের লক্ষ্যগুলি ; তাদিয়া পড়িছে

প্রাণের আবাস! তাই আজ ডাকিতেছি
বারে বারে, কোথা ওহে নিখিলনির্ভর!
আমার এ অর্দ্ধ-অন্ধ জীবনের ভার
লহ তুলে, আশ্বাসিয়া বিপন্ন হৃদয়।
ওহে চিরোজ্জ্বল রবি! কেন অন্ধকার
জীবন ভরিয়া মোর? কেন আশে পাশে
মৃত্যু-ভরা প্রেত-ছায়া, নিষ্ঠুর নর্ত্তনে,
জীবনের প্রতি কক্ষ করে আন্দোলিত?
ওহে দেব! তুমি কর অভয় প্রদান,
আমার হৃদয়-পুষ্প সাদরে চুম্বিয়া
সুরঞ্জিত কর প্রভু! স্বর্ণ-করে তব।
শৈশবে আছিনু শুভ্র শিশিরের মত,
কখন দেখিনি দেব! ঘোর কৃষ্ণ ছায়া
সৌন্দর্য্যে তোমার। আপনারি শুভ্রতারে
করিয়া নয়ন, পূর্ণ শুভ্র হেরিতাম,
রোগে শোকে সুখে দুঃখে আকুল সংসার।
প্রভাতকিরণ-দীপ্ত শিশিরের মত
সোনার শৈশব মোর, আকাশের গায়
কনক-বরণে মাখা জলদের মত,
গিয়াছে ভাসিয়া—আমারে রাখিয়া গেছে,
আশা-ভরা ভয়-ভরা পথিকের প্রায়,
জীবনের অর্দ্ধ-আলো-অর্দ্ধ-অন্ধকারে!
ওই যে আসিছে আরো গাঢ় অন্ধকার!
নিখিল সংসারে দেব তুমি অধিপতি!
তোমার নিশ্বাসে বহে বসন্তমলয়—
তোমারি নিশ্বাসে প্রভু! শীতের সমীর
বহিছে ধরণী-পরে—করিছে কুঞ্চিত
বসন্ত-সঞ্চিত সুখ, জীবন-প্রবাহ,
শুষ্ক করি পুষ্পগুলি ধরণীর বুকে!
এই যে অন্তর মোর মগ্ন অন্ধকারে,
তুমি জান জগদীশ! রহস্য তাহার।
তোমারি আদেশ যদি, বল অন্তর্যামি!
এর পর-পারে, পড়িবে কি আঁখিপরে
সুন্দর—সরস—পুষ্প-পরশের মত,
নন্দনের আলো? সহস্র-সঙ্কল্প-ভরা
তরুণ জীবন, আশা দিয়ে, প্রেম দিয়ে,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, নিত্য রচিতেছে
কত না আগ্রহভরে সুবর্ণস্বপন।
বল দেব! ব'লে দাও, তিমির-তরঙ্গ
করিছে আকুল মোরে গভীর গর্জ্জনে।
বল দেব! পারিব কি লয়ে যেতে শেষে
সাঁতারিয়া, স্বপ্নভরা নবীন হৃদয়
নন্দনের পথে? আমার প্রাণের তরে
নাহি মোর কোন ভিক্ষা; কিন্তু ওহে দেব!
আমার প্রাণের মাঝে রেখেছি রুধিয়া
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর অপূর্ব্ব স্বপন!
আজ তুমি কর মোরে অভয় প্রদান!
আকুল অন্তরে কত সুধায়েছে দাস—
কর নি উত্তর দান! মর্ম্মাহত প্রাণে!
সুপ্তোত্থিত শিশু সম, সেই সে কাহিনী
আবার উঠেছে কাঁদি, কাঁপিয়া কাঁপিয়া!
জীবনের সিন্ধু মম, আজি এ আধারে
কোন্ মোহভরে, কোন্ পাপপুণ্যবলে
কি জানি কিসের লাগি করেছে মন্থন!
ওগো, উঠে নাই তাহে সুধা এক বিন্দু!
দুরন্ত অনল-ভরা বিদ্রোহ অসীম,
স্কন্ধে লয়ে ধরণীর রহস্যের ভার,
কালকূটরূপে আজ উঠেছে ভাসিয়া
আমার হৃদয়-মাঝে। তারি বিষে মোর
জর্জ্জরিত হিয়া! হে প্রভু, দয়ার নিধি,
লুণ্ঠিত-চরণে তব দীনের বেদনা,—
দয়া কর আজ।
বুঝেছি, বুঝেছি তবে
কহিবে না কিছু। তৃষার্ত্ত জিজ্ঞাসা মোর

আনিছে ফিরায়ে তব লৌহ-বক্ষ হ'তে
রুদ্ধ ভাষা অশ্রু-সিক্ত লজ্জা-নত আঁখি!
শক্তিশীল, দৃষ্টিহীন, শ্রবণবিহীন,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর তুমি, পাষাণের মত।
এই যে বেদনা-ভরা কম্পিত ধরণী,
চিরদিন মৃত্যুময় মলিন মেদিনী,
আনিছে চরণে তব, প্রতি প্রভাতের
ভাষাহীন আশা, প্রতি নিশীথের
মর্ম্মভেদী কাতরতা, ডাকিছে তোমায়
কত না ব্যাকুল কণ্ঠে, আকুল পরাণে
কেমনে শুনিবে?—তুমি সুখের সম্রাট!
স্বর্গের রাজন্! তোমার নন্দনমাঝে
সে ক্রন্দন পশিবে কেমনে? বুঝিয়াছি
আজ, তুমি শুধু কনককিরণ-ব্যাপ্ত
চিরসুখ চিরগর্ব্ব আনন্দ-উজ্জ্বল!
ছায়াহীন মায়াহীন রুদ্র রৌদ্র সম
করুণাবিহীন তুমি, অনন্ত নিষ্ঠুর।
তবে সেই ভাল; সংশয়শঙ্কিত প্রাণ,
দুরু দুরু হৃদয়ের কাতর বেদনা,
ছায়া-অন্ধ নিশীথের মর্ম্ম-অশ্রুজল,
রবি-দীপ্ত দিবসের রুদ্ধ মনোব্যথা।
এর চেয়ে, নিশ্চয় নিষ্ঠুর সত্য ভাল
শতগুণে! তবে সেই ভাল; জীবনের
ভেঙ্গেছে আবাস, যদি ভেসেছে বিশ্বাস,—
তুমি থাকিও না আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন!
গেছ যদি, ভাল ক'রে যাও, মুছে দাও
অর্দ্ধ-অন্ধ জীবনের কম্পিত স্বপন।
তুমি যাও, আমি থাকি আপনারে লয়ে
ডুবিয়া হৃদয়তলে, গভীর—গভীর!—
আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব্ব নন্দন।
তার পরে, শেষে আনন্দ উজ্জ্বল করে,
করুণা মলিন করে, সর্ব্ব প্রাণ ভরে,'
যত্ন করে' গড়ে' তুমি আমার ঈশ্বর!
আকুল পরাণ লয়ে, ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণতলে আসিব না আর।

স্বপ্ন

সেই সে তামসী নিশি নির্দ্দয় নির্জ্জন,
ভাষাহীন অনন্তের রহস্যের মত;
ভাঙ্গিল বিভোর নিদ্রা, মেলিনু নয়ন,
অন্তর-বাহির অন্ধ-অন্ধকার-গত।

সহসা স্বপন সম সুন্দর নির্ম্মল,
ভাসিল আঁধার-মাঝে মানস-মূরতি:—
অপূর্ব্ব অধরখানি চন্দ্র করোজ্জ্বল,
আঁখি দুটি সন্ধ্যা-দীপ মঙ্গল-আরতি।

কহিল না কোনো কথা, নীরব নিশ্চল
নির্দ্দয় দেবতা সম ছিল দাঁড়াইয়া,
অশ্রুহীন ভাষাহীন চির-হাস্যোজ্জ্বল:
সকল আকাঙ্ক্ষা মোর উঠিল কাঁপিয়া।

চ'লে গেল ঘনীভূত কেশপুঞ্জ তার
আকাশে আঁকিয়া গেল ঘন অন্ধকার।

ঘুম-ঘোর

আমি তো সঁপিনি হৃদি,
আপনি পড়েছে ঢুলে
নিশীথের ঘুম ঘোরে
তোমারি চরণ-মূলে।
মরণেরে দেব ব'লে
পরাণ খুঁজিনু হায়।

ভুবন ভ্রমিয়া দেখি
সে প্রাণ তোমারি পায়

প্রাণের গান

দুরাশা কম্পিত সুরে কি গান গাহিব আর,
এত গীতি মনে মনে এত ভুল বারবার।
ধ্বনিত বসন্ত-তানে অন্তরের চারি ধার,
আমার দুর্ব্বল ভাষা শক্তিহীন ছিন্ন-তার।
কি যেন শুনা'তে চাই. কি যেন ফুটা'তে চাই,
জন্মভরে যেন সখি! ফুটা'তে পারি না তাই।
শতপুষ্প পড়ে ঝরে', শত গীতি যায় মরে;
হৃদয়ের গান রহে' আমারি হৃদয় ভরে'।
কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
স্তম্ভিত বিজন গীতি, শুনা'তে পারি না তাই।
ধরণীর আলো লে'গে লাজে গীতি ফিরে যায়,
আপনা আবরি রাখে যত ডাকি 'আয় আয়।'
অপূর্ব্ব বাসনা আর গীতভরে পূর্ণ প্রাণ,
শত গীত আলোভরা হৃদয়-মন্দির ম্লান।
কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
অভিশপ্ত হৃদি মোর,—গাহিতে পারি না তাই।

দিবসে

দিন গেল, আন সাকী! প্রমত্ত মদিরা
ভরিয়া সুবর্ণ-পাত্র! করিলে চুম্বন—
ম্লানমুখী দিবসের আলোক সুধীরা
আরক্ত চঞ্চল হ'য়ে ভরিবে জীবন!
আসে পাশে যাবে ভেসে কুসুমসৌরভ,
বসন্তসঙ্গীত যাবে বন উজলিয়া;
অধরে বাড়িবে তব লাবণ্য-গৌরব,
কুন্তল-ভুজঙ্গ রবে হৃদি জড়াইয়া।
দিও না অসহ্য সুখে ফেলিতে নিশ্বাস;
আরক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিয়া মুখ;
কাঁপিয়া উঠিলে মোর জীবন আবাস—
বুঝিতে দিও না কোথা সুখ, কোথা দুখ!
মলিন গম্ভীর দিন, লাগে না গো ভাল,—
অনলে দহিতে চাই, স্বর্ণ-সুরা ঢাল!

অহঙ্কার

তুমি উচ্চ হ'তে উচ্চ ধার্ম্মিক-প্রবর!
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ,—
ওগো! কোন্ শূন্য হ'তে আনিয়া ঈশ্বর,
জীবন তাহারি কর আরতির গান?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়ো না ফিরিয়া,
ধরণীর দুঃখ-দৈন্য আছে যাহা থাক;
উর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্!
রক্তহীন রিক্ত হস্ত কঙ্কাল জীবন,
সব রক্ত করে পান ঈশ্বর তোমার!
রুদ্ধ করি নিরুপায় জীবন মরণ
চরণে দলিয়া করে মহা অত্যাচার!
কোন্ মুখে কার তরে কর অহঙ্কার?
মুছে ফেল আঁখি হ'তে মোহ-অন্ধকার।

আকাঙ্ক্ষা

যদিও তোমারি কথা আমার জীবনে,
বসন্ত রাগিণী সম উঠেছে বাজিয়া—
যদিও তোমারি প্রেম-রবির চুম্বনে
হৃদয়ের রক্ত ফুল উঠেছে ফুটিয়া!—

এ প্রাণের প্রতি ভাব-প্রমত্ত ভ্রমর
যদিও তোমারে ঘিরি' আনন্দে গুঞ্জরে—
বসন্ত-পরশ সম স্বপনে তোমার,
যদিও প্রাণের মৃত মুকুল মুঞ্জরে!—
আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর,
তোমার স্বপন ছাড়ি' তোমারে চাহিছে;
মধু দেহে সুখস্পর্শ রহস্য গভীর
অপূর্ব্ব অধরে তব চুম্বন মাগিছে!
কোথা তুমি? কাছে এসো, করহ সৃজন
ধরণীর ম্লান বক্ষে নন্দন-কানন!

প্রেম-চতুষ্টয়

১

আজি এ তামসী নিশি ধরণী আঁধার!
কম্পিত কামনাভরে প্রমত্ত হৃদয়;
মদিরার মোহ-সম, ও তনু তোমার
অলস আবেশ আনে সারা দেহময়!
চঞ্চল অনিল চুমি অঞ্চল দুলিছে,
তোমার কুন্তলভরা কুসুমের গন্ধ;
বসন্ত পাগল প্রাণ সকলই চাহিছে,
কত কি মাধুরী তব লাজ-বাস বন্ধ!
আঁধারে কাঁদিছে তাই চঞ্চল লালসা,
আজ তুমি খোল তব চির আবরণ;
অন্তর অমৃত পিয়ে মেটেনি পিপাসা,
এ তনুর চিরতৃষ্ণা কর নিবারণ।
শোন না আঁধারে হৃদি করিছে ক্রন্দন?
অন্ধ নিশি বসন্তের মানে না বন্ধন।

২

শুন না কম্পিত বাণী পুষ্পিত ছলনা
কুসুমের গন্ধভরা অন্ধ হৃদয়ের!
এ নহে সুবর্ণ সুখ নন্দন-ললনা,—
এ যে শুধু অন্ধতৃষা পূর্ণ আঁধারের!
জান না কি দেবতার আশীর্ব্বাদ-ছায়ে'
ফুটেছে অপূর্ব্ব এই প্রেম দু'জনার?
পরিম্লান ধরণীর ধূসর ধূলায়
এ প্রেম মরিয়া হবে মৃত্যুর আধার।
এ মোর স্বর্গের আশা সুন্দর দুর্ব্বল!
বাসনা-নিশ্বাস তুমি ফেলিও না তায়;
ভয় হয়,—পাছে মোর জীবন-সম্বল
দেবতার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে যায়!
যা কিছু সুন্দর, এই প্রেম তাই পা'ক,
আঁধিয়া রজনী তবে পোহাইয়া যাক।

৩

বসন্ত-সুন্দরতনু তরুণ দেবতা!
এসেছ জীবনতটে, লও উপহার—
প্রণয় কম্পিত দেহ মধু পুষ্পলতা,
সঘন গম্ভীর নিশি মোহান্ধ-আঁধার!
ওগো আমি আঁখিহান, নিশীথ মন্থরে?
দেখিতে পাই না তব সুখ ভরা মুখ;
তোমার পরশভরে ফুটিছে অন্তরে
রক্তসুখ রাশি রাশি, রাশি রাশি দুখ!
আমার হৃদয় দেহ গীত-ভরা বীণা
তোমার চুম্বন তাহে চম্পক-অঙ্গুলী;
আছি মোহ-অন্ধকারে তোমাতেই লীনা,—
চকিতে চমকি উঠে সঙ্গীত-বিজলী।
মধুর মৃদুল ভাষে কও কথা কও,
চেয়ো' না কাতরকণ্ঠে, লও সব লও!

৪

তুমি ত এসেছ কাছে অনলের মত,
সঙ্গে লয়ে জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত ক্ষমতা!
জ্বলিছে তরুণ দেহ হৃদয় সতত,
তোমার ও প্রেমে প্রভু! নাহি কি মমতা?

আমার এ পিঞ্জরের নাহি করি ভয়,
লোকলজ্জা কলঙ্কের আছে কিবা ডর ?
ভুল ক'রে বুঝিও না রমণী-হৃদয়,
মর্ম্মহীন অপমানে বাঁধিও না ঘর !

এ প্রেম আমার চক্ষে অনন্ত সুন্দর
চির-পুষ্প-তনু হীন অনঙ্গের প্রায়
ও রূপ-আমার বক্ষে মদন-মন্তর
মোহ-ভরে কম্পমান সবি ভেসে যায় !

তবে যে তরাসে কাঁপি এত কাছে কাছে ?
এ রুদ্র রক্তের জ্বালা রহে' যায় পাছে ।

ঈশ্বর

ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি' গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ-শান্তি নিতেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন !

জীবন-যাতনা তরে সজল নয়ন,
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়া ;
আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া,
সত্য বলে' পূজা করি অলীক স্বপন !

হায় ! হায় ! মিথ্যা কথা ; ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
করুণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে ,
ঠেলে' ফেলি' জীবনের বিনীত নির্ভর,
ধরণীর আর্ত্তনাদ শুনি না শ্রবণে !
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকি, ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি মনে মনে ।

স্মৃতি

সে আছিল আমাদের শান্তির স্বপন,
অতি দূর নন্দনের সৌন্দর্য্য-কাহিনী ,
রবিকর-মুখরিত প্রভাত-গগন,
শশিকর-বিভাসিত প্রফুল্ল যামিনী ।

আরো কত ছিল তার সৌন্দর্য্য অপার,
বলিতে অন্তর কাঁপে সুখ-দুঃখ ভারে ;
অমৃত-পরশে তার ভুলি শতবার
বুঝিতে পারি নি কভু চিনি নাই তারে ।

আজ সে চলিয়া গেছে ; ভাসিতেছে তার.
শান্তিভরা সুখভরা সুন্দর নয়ন ।—
নবস্ফুট বসন্তের মাধুরী অপার,
শশিসিক্ত শরতের শুভ্র সে স্বপন ।

আজ সে গিয়াছে চলে' ; স্বপ্ন ছায়ে তার
বিশ্ব-অঙ্গে ফুটিতেছে নব নব শোভা ;
ফুলে ফুলে ফুটিয়াছে মধু স্মৃতি তার
চাঁদে চাঁদে ভাসিতেছে তারি মধুপ্রভা ।

সুখ

সুরাপূর্ণ স্বর্ণ-পাত্রে করেছি চুম্বন,
বুঝিয়াছি সুখ বিনা সকলি তো ফাঁকি !
আজ আমি খুলে দিব জীবন বন্ধন ;
আজ তবে তুমি দাও যাহা আছে বাকি

অমর চুম্বন দাও অধর ভরিয়া,
নয়ন মুদিয়া আমি মধু করি পান :—
তোমার কুন্তল পাশে আমারে বাঁধিয়া,
হৃদয় ভরিয়া কর গুন্ গুন্ গান ।

মধু-হস্তে ধরি' পাত্র মুখে ধর মোর,
সুবর্ণ-মদিরা মোরা আরো করি পান ;

নয়নে আসুক নেমে রজনীর ঘোর,
তোমার কম্পিত লজ্জা হোক অবসান !

অপেক্ষায় সুখ-পুষ্প যেতেছে ঝরিয়া,
দেবতারা হাসে যেন গগন ভরিয়া।

যদি তুমি নাই এস হৃদয়ে হাসিয়া
বরিষ স্বপন-ধারা জীর্ণ-সন্ধ্যায় !
আমার এ প্রেম বুঝি তৃপ্তিহীন তৃষা,
সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা।

ভুল

ভুলায়ে রেখেছে মোরে
তোর নয়নের তারা !
ওই আঁখি-পানে চেয়ে
পরাণ পাগল-পারা !
বিশ্ব যায় ভেসে ওরে !
কত বল্ রাখি ধরে';
কেমনে বা রাখি ধরে'
আমি যে আপনাহারা !
আকাশে যখন চাই
শশী তারা কিছু নাই
শুধু জাগে ওই, ওই,
তোর নয়নের তারা।

তৃষা

তোমার সৌন্দর্য্য আর মোর ভালবাসা,—
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে দুই তুলনা-বিহীন ;
পিপাসিত প্রাণে তুমি আকাঙ্ক্ষিত আশা,
করুণ-ক্রন্দনে হৃদি পূর্ণ চিরদিন !
আমার সকল অঙ্গ তৃষা-জরজর,
তোমার পরশে পাবে বারি বৃষ্টিদান ;
আমার সকল মনে শুষ্ক মর মর,
তোমার এ প্রেম হবে বসন্তের গান।
ওগো তুমি দেখা দাও বারেক আসিয়া,
ক্ষুধিত তৃষিত চিত্ত চির-অপেক্ষায় ;

সান্ধ্য সাগরে

আজ কেন মনে আসে
দুটি আঁখি ভরা বাসে
মধুর মুরতি হৃদে উঠেছে জাগিয়া ?
কে তুমি ডাকিছ মোরে,
সমস্ত হৃদয় ভ'রে ?
শুনিতে পেয়েছি তব আকুল আহ্বান।
কে তুমি এসেছ কাছে,
হৃদয়ের পাছে পাছে,
কে তুমি শুনাও চির-পরিচিত গান ?
আজি কেন, আজি কেন,
আকুল পরাণ হেন ?—
শত ধারা ভাঙ্গি, যেন যাইবে ছুটিয়া !
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে,
ধূসরিত সাগরান্তে,
তোমার চরণ-প্রান্তে পড়িবে লুটিয়া।

চিরদিন

রেখে গেছ জন্ম শোধ বিদায়ের বেলা
প্রেমভরা অশ্রুভরা বিষাদ-চুম্বন ;
সুখ-দুঃখ-বিজড়িত হৃদয়ের মেলা
রেখে গেছে চিরস্মৃতি সজল নয়ন।

সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে ধূসর গগন,
তোমার মলিন মুখ মেঘে আসে নেমে ;
পরিপূর্ণ শুভ্র রাত্রি জোছনা-মগন,
তোমার মলিন ছায়ে হাসি যায় থেমে।
আর তুমি যেথা যাও আমি আছি সাথে
কাছে কাছে, পাছে পাছে, মৃত্যুর মতন
সমস্ত জীবন তব সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভরেছি নিশ্বাসে মোর করিয়া যতন ;
দুটি দুঃখ ফুটিয়াছে জীবনের ফুল—
মিলনের মধু স্মৃতি স্বপনের ভুল।

পূর্ণিমা

সতত সরস হাসি পূর্ণিমা আমার !
জীবন ডুবিয়া গেছে হাসিতে তোমার।
আমি নিশি, তুমি চাঁদ,
ভেঙেছ জীবন-বাঁধ,
ভাসায়ে হৃদয় মোর প্রেয়সী আমার !
সতত সরস হাসি অধরে তোমার !

সতত সরস হাসি বসন্ত আমার !—
পুষ্পিত জীবন মোর হাসিতে তোমার।
আমি গীতি তুমি ছাঁদ—
পেতেছ মোহন ফাঁদ,—
বেঁধেছ কুসুম-ডোরে জীবন আমার !
সতত সরস হাসি নয়নে তোমার।

ও মধু সরস হাসি শারদ প্রভাত !
তুলেছি কুসুমরাশি ভরিয়া দু' হাত !
মধুর সরস গানে
মাধুরী ভাসিছে প্রাণে,
মরম মদিরা পিয়ে ভরি ফুল পাত !
তোমার সরস হাসি শারদ প্রভাত !

হায় প্রিয়ে ! হাস হাস ভরিয়া গগন।
জীবন মরণ তব হাসিতে মগন।
হাস আর হাস হাস,
জোছনা-সাগরে ভাস,
অধর হাসুক তব হাসুক নয়ন !
মদির জোছনা হৃদি করিছে চয়ন।

সে

সে !— এসেছিল, কেঁদেছিল
বসেছিল কাছে :
ভয় ভয় কথা কয়
ব্যথা পাই পাছে।
আঁখি তুলে চেয়েছিল
ভেসে আঁখি-জলে,
মুখ খুলে থেমে গেল
আধখানি বলে'।
এক বিন্দু হাসি তার
ঠোঁটে লেগেছিল,
ভাল করে' দেখি নাই
কোথা মিলাইল !
দুটি হাত ধরে' মোর
কি যে ভেবেছিল,
"বিদায়" বলিয়া শুধু
কেঁদে থেমে গেল।
সেই যে গিয়াছে চলে'
আর আসে নাই—
সেই চেয়েছিল চোখে
আর চাহে নাই।
পথ-পানে চেয়ে আছি
আসিবে কি শেষে ?

উজলিবে হৃদি মোর
মৃদু মধু হেসে ?

জোছনা

এস প্রিয়ে স্বপ্নময়ি !
প্রেমময়ী সুধাময়ি !
কাছে এসে একবার দাঁড়াও হাসিয়া !-
সায়াহ্ন-সঙ্গীত-তালে,
পুষ্পিত প্রদোষকালে,
স্বপ্ন-ভরা রূপ তব, রাখ বিস্তারিয়া ।
স্বপ্নময় চন্দ্রমার
রজত-কিরণধার,
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব প্রেয়সি আমার !
শান্তি-ভরা ঘুম-ঘোর
নয়নে আসিবে মোর
জীবনের যত জ্বালা ভুলিব আবার ।

ক্রন্দন

এ দেহ পুষ্পের মত
ওহে প্রাণপ্রিয় !-
সর্ব্বদা বসন্ত চাহে,
চাহে রবিকর !
তোমার পরশ—স্বপ্ন,
চুম্বন—অমিয়,
এ তনু লাবণ্য পারে
করিতে অমর !
প্রভাত-চুম্বিত ছিনু—
প্রফুল্ল পুষ্পিত,
বিশুষ্ক মলিন আজি—
গত গন্ধ প্রায় !
তোমার চুম্বন শূন্য
অরুণ—অতীত,
ও সুখ-পরশ ভিন্ন
বসন্ত কোথায় ?
আমার লাগিয়া আমি
করি না রোদন,
তোমার প্রেমের লাগি
যত ব্যথা পাই ;
লাবণ্য হারায় যদি
বিপন্ন বদন,
ও প্রেম নন্দন তব
পাই কি না পাই !
প্রিয় ! এ ক্রন্দন তাই

সোঽহং

অসার সকল জ্ঞান ; ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী !—
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার ?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী
আপনার মনে আনে মোহ-অন্ধকার ।

ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহা দেবতার ;
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে ?
বৃথা বহ আপনার পুষ্প-অর্ঘ্যভার !

জান নাকি মন্ত্রময় মুকুরের মত
নিতান্ত নিষ্ফল হেথা মানবের প্রাণ ?
যত কর অন্বেষণ, হের অবিরত
শত আবরণে আপনারে মূর্ত্তিমান !

কাহার চরণে তবে সাজাইছ ডালা ?
কারে ভাবি কার গলে পরাইছ মালা ?

সাগরে

চন্দ্রমা-চুম্বিত শোভা সুনীল আকাশে,
তালে তালে নাচিতেছে সাগরের জল ;
আর্দ্র বায়ু বহে' যায় আর মনে আসে
সেই আঁখি, সেই হাসি, সেই অশ্রুজল।

জীবন বিজন বড় ; বিশ্বব্যাপী ব্যথা —
বুঝাবার জুড়াবার নাহি কোন ঠাঁই ;
অভিশপ্ত প্রাণ ল'য়ে জন্মিয়াছি হেথা,
অনন্ত বাসনা শুধু চাই ! চাই ! চাই !

তাপসী

শুনেছি আহ্বান তব ওহে প্রাণপ্রিয় !
আমার অন্তর আজি উঠেছে কাঁপিয়া ;
ছিন্ন করি' আশা-পুষ্প জীবন অমিয়,
সেজেছি তপস্বী আজ যেতেছি চলিয়া।

বিভূতি মেখেছি হের সর্ব্বাঙ্গে আমার,
সুবর্ণ-স্বপন সবি বিবর্ণ বিরাগ ?
চরণে এনেছি মোর জীবন-আধার
রাগে রাঙ্গা জবাসম রক্ত অনুরাগ।

কবিতা কল্পনা ছিল. পূর্ণ শশী সম
জীবন আঁধারে মোর জোছনা ঢালিয়া ;
মধু-নিশি শেষ হ'ল ! স্বপ্ন মনোরম
জীবন ত্যজিয়া আজি গিয়াছে ভাসিয়া।

এ চির-বিদায় নিতে বেদনা বেজেছে,
তরুণ হৃদয় মোর গিয়াছে ছিঁড়িয়া ;
শুনেছি আহ্বান তব স্বপন ভেঙ্গেছে,
রচেছি পূজার ডালি হৃদি-রক্ত দিয়া।

ডেক না ডেক না আর শুনেছি আহ্বান,
আমার হৃদয়-তল উঠেছে কাঁপিয়া ;
সঁপেছি চরণে যত পুষ্প হাসি গান
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া।

সাগর-তীরে

ফেলিয়া এসেছি দূরে জীবন-জনতা,
শত লক্ষ মানবের, অন্ধ কোলাহল ;
হেথা শুধু আকাশের সুনীল বারতা,
গম্ভীর সাগর-গীতি, স্তব্ধ ধরাতল।

সৌম্য শান্ত সান্ধ্যছায়া পড়েছে সাগরে,
গগনে ভাসেনি শশী স্বপনে সাজিয়া ;
আঁধারের মাঝে আজি কোন্ মোহভরে
স্বপ্নময়ী স্মৃতিগুলি উঠিল ভাসিয়া।

সেই, এমনি সায়াহ্ন আকাশের তলে,
তারকার পানে চেয়ে ছিলে দাঁড়াইয়ে :—
সহসা অধরে তব যেন কোন্ ছলে
বিমল বিহ্বল হাসি উঠিল ভাসিয়া।

কি জানি কেমন করে' সে হাসি তোমার
আঁধার হৃদয় মোর গেছিল প্লাবিয়া,
শত লক্ষ কুসুমের পরশে আমার
বিভোর অলস প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া।

আর সেই ? সেই নিশি, স্বপন-মগন ?
শশিকর পড়েছিল অধরে তোমার :—
দুটি হাতে হাত আর নয়নে নয়ন,
তার পর ছাড়াছাড়ি হ'ল দু'জনার।

আজ তুমি এত দূরে? ভাবিতেছি কত
অপার অনন্ত সিন্ধু মাঝে দু'জনার;
ও পারে দাঁড়ায়ে তুমি দুরাশার মত,—
এ পারে তোমারি তরে জীবন আঁধার।

বিফল ভিক্ষা

এতটুকু চেয়েছিনু, এতটুকু মধু,
এত ধন আছে তব, ওহে প্রাণবঁধু!
কিছু দিতে নাই?
নলিন নয়ন দুটি স্বপনের সিন্ধু,
চেয়েছিনু তাহারই কৃপাদৃষ্টিবিন্দু,
পেয়েছি কি তাই?
তোমার পরশ স্বর্ণ—সুধা-পারাবার
একটি তরঙ্গ সখি! যদি দিতে তার,
ফুরা'ত কি ছাই?
সঞ্চিত অঞ্চলতলে কত শত নিধি,
একটি দিলে না তার? তোমারে কি বিধি
দয়া দেন নাই?
পাশ দিয়ে চলে' গেলে, সুবাস ঢালিলে,
চকিত পরাণখানি চরণে দলিলে,
ভাল ভাল তাই!

লালসা

সুন্দর হৃদয় পূর্ণ শুভ্র দেহ তব,
নয়নে ভাসিছে যেন নন্দনপিপাসা!
তোমার পবিত্র হৃদি,
প্রশান্ত অর্ণব;
আমার এ প্রেম যেন
তরঙ্গিত আশা!

ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যেন ক্ষিপ্ত সিন্ধু প্রায়
এ তপ্ত রক্তের জ্বালা যেতেছে বহিয়া;
তুমি যে সুন্দর, তুমি
তরঙ্গের ঘায়,
ক্ষীণ তৃণ-দল সম
যাইবে ভাসিয়া;

আমার এ যৌবনের প্রমত্ত গরল,
বিশ্ব-অঙ্গে জ্বালিয়াছে প্রলয়-অনল!
আর আসিও না কাছে,
কি জানি গো পাছে
দগ্ধ হ'য়ে যাও, তুমি
শুভ্র শতদল।

গুঞ্জরে লালসা মোর, লুব্ধ অলি যেন!—
তোমার বদনে চক্ষে সুন্দর তরুণা!
বদ্ধ গীতি সান্ধ্য ছায়ে!
কি জানি গো কেন?—
এ মরু মরমে মোর
কাঁদিছে করুণা।

তুমি তো জান না আজ, সরল নয়নে
অনন্ত বিশ্বাসে তব, কি দিতেছ আনি!
তোমার ও দেহ মন—
কুসুম-চয়নে,
কত সুখ কত ভয়
আমি তাহা জানি।

সুন্দর-মরম ভরা শুভ্র তনু লখি',
নয়নে লাবণ্য ভাসে প্রশান্ত বিবশা!
এখনো সময় আছে
ফিরে যাও সখি!
আমার এ প্রেম শুধু
রক্তের লালসা।

মোনা

সে দিন ভাসিয়া গেছে
কি জানি কেমন ?

বসন্ত-মলয়ে মন্দ
আন্দোলিত ফুলগন্ধ
হৃদয় ললিত ছন্দ
ব্যাপ্ত দশ দিশি।
সে দিন চরণে তব
করিল চুম্বন
মোর প্রাণ হ'তে বালা !—
প্রস্ফুটিত পুষ্পমালা
রক্ত সুখ রক্ত জ্বালা
সঙ্গ দিবানিশি !
আর কেন ? গেছে প্রেম।
মিছে আনা-গোনা।
অধরে ভাসিলে হাসি
জেনো প্রতারণা !
"নয়নে অনল শুধু
সত্যের ছলনা"
আজ মোনা !

বিগত বসন্ত ভ'রে
এ প্রেম-অতিথি
আনি পূর্ণ ভালবাসা
জাগাইয়া স্বর্ণ আশা
জীবনে বাঁধিয়া বাসা
করিল বসতি !
স্বপ্ন-রথে লয়ে' গেল
হইয়া সারথি !
বসন্ত কি আছে আর
কোথা অমৃতের ধার
কোথা প্রাণে পুষ্পভার
কোথা স্বপ্নভাতি ?

আমি পূর্ণ ঘুমে, তুমি
নিতান্ত জাগিয়া,
সেই বসন্তের নিশি
ম্লান চন্দ্র দিয়া
আধ অশ্রু আধ হাসি
আধ জানা শোনা
নাই মোনা ?

অনন্ত সুন্দরী ছিলে
বসন্ত নিশায় ;
বাসনাবিহীন হাসি
শুভ্র শেফালিকারাশি
তোমার অধরে ভাসি
শীত-চন্দ্র প্রায় !
চরণে আনিয়া প্রাণ
সকলি করিনু দান
গরল করিনু পান
প্রেমপিপাসায়,
চিরস্মরণীয় সেই
বসন্ত নিশায়।
লভিনু অবজ্ঞাদৃষ্টি
সুখহীন সব সৃষ্টি
জীবনে অনলবৃষ্টি
মৃগতৃষ্ণিকায়।

তুমি আজ আকাঙ্ক্ষিণী
নব প্রেমানুরাগিণী
অশ্রুভরা ভিখারিণী
মলিন-আননা—
আজ তব হাসি ভাসে,
আমি হেরি অনায়াসে

প্রাণে পুরে শুধু আসে
অতীত কল্পনা !

আজ তুমি ঘুমে, আমি
নয়ন মেলিয়া
"প্রেম ত বিদ্রূপ শুধু"
গেছ কি ভুলিয়া ?
বসন্তের শেষে কেন
নব প্রতারণা ?
ছি ছি মোনা !

তোমার আমার মাঝে
রয়েছে পড়িয়া—
নিষ্ফল স্বপন, আর
শত শুষ্ক ফুলভার
কত রক্ত লালসার
শ্বেত ভস্মরাশি ।

কেমনে ফুটিবে আজি
দলিত কুসুমরাজি ;
কেমনে উঠিবে বাজি
সেই সুখ-বাঁশী ?

তোমার আমার মাঝে
যেতেছে বহিয়া
বিস্তৃত বিস্মৃতি বারি ;
এ পারে দাঁড়ায়ে তারি
আমি পরশিতে নারি
গত স্বপ্নরাশি !
সতৃষ্ণ নয়নে চাও
চুম্ব উড়াইয়া—
যদি আজ এসে পড়ে
তৃষাতুর মোহভরে
আমার জীবন'পরে
তব চুম্ব হাসি ?

অধরে কি তপ্ত লাগে
ফোটে প্রেম রক্ত রাগে
আবার জীবনে জাগে
প্রেম পুষ্পরাশি ?

আজ বৃথা অভিসার
মিছে প্রতারণা,
নাহি প্রাণে হাহাকার
অবোধ বাসনা !
মায়া মোহ সবি গেছে ;
এ নব ছলনা
মিছে মোনা !

চাও যদি কর তবে
চুম্বন প্রদান ;
গাও প্রত্যাশিত তানে
কও কথা কানে কানে
আমার শীতল প্রাণে
সকলি সমান !
জীবনে অনল নাই
আছে বাসনার ছাই
প্রাণ শুধু করে তাই
পরিহাস পান ।

দিবাদগ্ধ রাত্রিহীন
জীবনে আবার
প্রেম মায়া উপবন
নহে সৃজিবার ।
কি ভুল আনিবে তবে
কি নব ছলনা ?
আজ মোনা !

কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি

এ নহে রবির লেখা সুন্দরী সনেট্‌,
শরদ প্রভাত সিক্ত শুভ্র শেফালিকা :—
কিম্বা কবি ! বাতায়নে মুগ্ধ জুলিয়েট !
এ মোর হৃদয়জাত মলিন মালিকা—
পড়িয়া চরণে তব তুলে দেখ কবি !
তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি,
সুখভরা শান্তিভরা স্বপ্নভরা সবি,
ব্যঙ্গভরা বাক্য আর রঙ্গ-ভরা হাসি !
আরো ভালবাসি আমি প্রিয়ারে তোমার !
কত না কবিতা তার অধরে লাগিয়া,
অন্নপানে রাঙ্গা মুখ হইতে যাহার
তোমার অধর কবি লইতে রাঙ্গিয়া ।
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট্‌
আমার আগ্রহ-ভরা ভিখারী সনেট্‌ ।

ধার্ম্মিক

সুধাও ধর্ম্মের কথা দিবস-রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কথায় ;
বক্তৃতা শুনিয়ে শুধু স্তম্ভিত অবনী,
আহা ! আহা ! বলি তব চরণে লুটায়
ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি,
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া
নিমেষে নিশ্বাস ফেলি ভগবান্ স্মরি
মানবের শত পাপ দাও দেখাইয়া !
ওহে সাধু ! আমি জানি, অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায় ;
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায় ।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভাণ ।

অভিসার

কেমনে আসিনু ? নিদ্রাহীন নিশি ধ'রে
বিজনে শুনিতেছিনু বিশ্বের বারতা,
আসিল অপূর্ব্ব প্রেম মোহমন্ত্র ভরে,
পরশিয়া পক্ষে তার কহে গেল কথা ।
ভাল ক'রে বুঝি নাই । প্রতি অঙ্গে মোর
পরিপূর্ণ রক্তে হ'ল আনন্দসঞ্চার,
অধর চুম্বন লাগি হইল বিভোর ;
বাহু, বাড়াইয়া চম্পক অঙ্গুলি তার,
খুলিল দুয়ার ! আমার তৃষিত চক্ষে
জাগিয়া তোমারি মূর্ত্তি অনিন্দ্য সুন্দর,
প্রাণ সংজ্ঞাহীন, চরণ ধরণীবক্ষে.
মস্তকে সঙ্গীতপূর্ণ অনন্ত অম্বর !
তার পর ? সবি স্বপ্ন অনল-বরণ ;
আমারে এনেছ বুঝি লোলুপ চরণ ?

সাক্ষী

তোমারেই করিয়াছি সাক্ষী জীবনের,
সমস্ত জনম তব চরণে পড়িয়া ;
কলঙ্ক-কণ্টক-ভরা দুঃখ-শয়নের
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি দেখ পরীক্ষিয়া !—
দেহের পরশ থাকে, দেহের সীমায় ;
অধরের চুম্ব যায় অধরে মরিয়া ;
আমার এ প্রাণ শুধু তোমা-পানে ধায়,
তোমারি সুবর্ণ প্রেম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া !
প্রতি নিমেষের তুমি আনন্দ নির্ম্মল,
অতি নিষেধের তুমি গভীর বিষাদ ;
পরাধীন তনু ব'লে হে প্রাণ-সম্বল ।
চরণে করেছি কি গো চির অপরাধ ?
রুদ্ধ হিয়া বদ্ধ দেহ তৃষিত নয়ন
কত সুখে কত দুঃখে তোমাতে মগন ।

বিদায়

তোমারি পরশ লাগি অন্তর অধীর,
তোমারি দরশ তরে তৃষার্ত্ত নয়ন ;
প্রতি প্রাতে পরিপূর্ণ আনন্দ মদির,
স্বপ্নালসে করি যেন কুসুম চয়ন !
সন্ধ্যাকালে শূন্যমনে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়,
বাস্তবের অন্ধকারে জীবন মলিন !
স্বহস্তে সজ্জিত পুষ্প শুষ্ক হয়ে যায়,
সুন্দর হৃদয়রাজ্য পত্র-পুষ্প-হীন ।
বুঝেছি আমার প্রেমে নাহি লাগে মন,
কষ্ট ক'রে আসিও না দিতেছি বিদায় :
পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে করিও ভ্রমণ
নিত্য নব মাধুরীর পল্লবিত ছায় !
তুমি পেয়ো শত-পুষ্প-বসন্তের বায়,
রেখে যেয়ো সব শূন্য চির হায় হায় !

প্রেম-পরিহাস

সে দিন ধরণী ছিল নন্দনকানন
বসন্ত-পবন অঙ্গে, পুষ্পোজ্জ্বল হিয়া !
তোমার সুন্দর মন, আনন্দ আনন,
স্বপ্নোজ্জ্বল মধু আঁখি—পূর্ণ উজলিয়া !
মন-মধুকর মোর, নয়ন পল্লবে
নিশি নিশি কত মধু করিয়াছে পান !
আজিকার রুদ্রালোকে জীবন-বিপ্লবে,
সে সত্য কাহিনী লাগে স্বপন-সমান ।
আমার কি দোষ বল ? দেবতা নির্দ্দয়
করিল মোদের লয়ে প্রেম-পরিহাস !
দুদিনের ভুল ভাঙ্গি, জাগিল হৃদয়
শত ছিদ্র সর্ব্বাঙ্গের সুখস্বপ্ন-বাস !
সে রত্ন হারায়ে গেছে কি করিব বল ?
তোমার নয়নে অশ্রু নিতান্ত নিষ্ফল !

রক্তগোলাপের প্রতি

কোন্ দেবতার ছিলি আকুল ক্রন্দন,
হৃদয়ের রক্ত পিয়ে রক্তিম বাসনা !
কোন্ মহা প্রণয়ের নিষ্ঠুর বন্ধন,
অলস চুম্বন আর অমৃত-মগনা !
কোন্ পাদপদ্মে ছিলি অলক্তের দাগ—
নন্দনের শুভ চিহ্ন সুরক্ত স্মরণ !
কোন কিন্নরীর ওষ্ঠে তাম্বুলের রাগ—
কোন অপ্সরার বুকে রক্তিম বরণ ?
সহসা আসিলি যেন নন্দন ছাড়িয়া —
সুধাসিক্ত স্বপনের অস্ফুট আভাস !
জগত কমলবনে উঠিল বাজিয়া
প্রভাত রাগিণী সম বিহ্বল বিভাস !
কবিতা সঙ্গীত সবি অসার তুলনা !
এ মনে মদিরা তুই রক্তিমভূষণা ।

বারবিলাসিনী

শুন আমি বারবিলাসিনী !
নিশীথে পিপাসা-হরা,
প্রাণহীন প্রেমভরা ;
পদতলে উন্মাদ ধরণী,—
লালসা-চঞ্চল হিয়া, উন্মাদ ধরণী !
আমি শুধু বারবিলাসিনী !

রঞ্জিয়াছি অধর আমার !
কোমল বিচিত্র রাগে
আমার অধরে জাগে
রক্ত-আভা ; কেশে পুষ্পসার—
চঞ্চল কুন্তলে মিশে—মধু পুষ্পসার !
রমণীর অধর আমার ।

মধু অঙ্গ'পরে নীলবাস,
নীল গগনের মত,
নীল স্বপ্ন বিজড়িত,
উড়াইয়া পুড়াইছে আশ—
চঞ্চল অঞ্চল উড়ি পুরাইছে আশ,
আবরিছে তনু নীলবাস।

শুভ্র রক্ত চরণ দুখানি!
কনক-কিঙ্কিণী হাতে,
কনক কিরীট মাথে,
রজনীর রাজ্যে আমি রাণী—
ওগো অন্ধ রজনীর রাজ্যে আমি রাণী!

পুষ্পসম চরণ দুখানি?
এস পান্থ! ভ্রমিয়া ধরণী!
চরণে লেগেছে পঙ্ক,
প্রাণে কাঁপিছে কলঙ্ক;
এস পান্থ! আঁধিয়া রজনী—
অবগাহ প্রেমে মোর আজি এ রজনী!
এলে পান্থ ভ্রমিয়া ধরণী!

অধর-চুম্বন কর পান!
তরঙ্গিত তনু ভ'রে,
সব মধু লও হ'রে,
আছে যত পুষ্প হাসি গান!
তৃষাহীন নিশা মোর কর অবসান,
অধর-চুম্বন করি পান!

অঙ্গের পরশ লও টানি,
করিয়া বসন তব
পাও সুখ নব নব;
লাজ-হীন প্রেম-ভরা বাণী,
আঁধারে শুনিও মোর প্রেম-ভরা বাণী!-
অঙ্গের পরশ নিও টানি।

যাহা আছে, সব লও তুলে!
রেখে যেয়ো রক্ত জ্বালা,
তুলে নিও পুষ্পমালা;
রজনী-প্রভাতে যেয়ো ভুলে—
অন্ধ নিশি শেষ হ'লে সব যেয়ো ভুলে!
আমার সকলি লও তুলে।

কিবা ভয়? রজনী আঁধার!
কলঙ্ককম্পিত দেহে,
অধীর প্রশান্ত গেহে,
কাটিবে গো রজনী তোমার!—
দুরন্ত আনন্দে যাবে রজনী তোমার;
কোথা ভয়? সকলি আঁধার!

তুমি যেয়ো এলে উষারাণী।
পুণ্য দেহে শুভ্র হাসে
পশি ও পবিত্র বাসে;
রজনীর কলঙ্কের বাণী—
ভুলে যেয়ো রজনীর কলঙ্ককাহিনী!—
শুধু আমি র'ব কলঙ্কিনী।

এ ধরার কলঙ্ক তুলিয়া
পরেছি পুষ্পিত শিরে!
এস পান্থ ধীরে ধীরে,
মর্ম্মহীন আবেগ লইয়া—
তোমার কম্পিত তনু—আবেগ লইয়া!
আমি র'ব কলঙ্ক বহিয়া।

চারি দিকে শত পুষ্পরাশি,
করি গন্ধ বিতরণ,—
মোহিতেছে বিশ্বজন!
আমিও যে, সবারে বিলাসি,
সুমন্দ সুগন্ধ আনি সবারে বিলাসি,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ বিকাশি!

নাহি প্রাণ, মধু দেহে মোর!
নাহি সুখ নাহি লজ্জা,
জীবন বিলাস সজ্জা,
কাজল নয়নে, ঘুম ঘোর—
চাও পান্থ আঁখি পানে, লও ঘুম-ঘোর!
মোহ-ভরা, মধু দেহ মোর।

নাহি স্মৃতি, জীবন ব্যাপিয়া,
নাহি কোন অনুতাপ,
প্রাণময় পরিতাপ
যদি আসে, ফিরাই হাসিয়া
দিবস-রজনী আমি, হাসিয়া হাসিয়া
কোথা স্মৃতি জীবন ব্যাপিয়া।

আছে রূপ, বিশ্ব-বিমোহন!
পূর্ণ রক্ত শতদল
প্রস্ফুটিত ঢল ঢল,
গন্ধ তার কর আহরণ!
মত্ত মধুকর সম, করি আহরণ,
লও রূপ বিশ্ব-বিমোহন!

আমি যেন চিরদিন ঋণী!
অপার ঐশ্বর্য্য লয়ে,
বিলাই ভিখারী হ'য়ে,
বাসনা-বিহীন উদাসিনী!—
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী!
কে করেছে মোরে চিরঋণী!

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী!
এ বিশ্ব লালসা ছাই,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই,
চলিয়াছি কলঙ্ক-বাহিনী!
মর্ম্মহীন কর্ম্মহীন, কলঙ্ক-বাহিনী!
চিরদিন, যৌবনে যোগিনী!

কার অভিশাপে নাহি জানি!
কোন্ মহাপ্রাণ ব্যথা—
দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী!
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী!
তারি শাপে চির-কলঙ্কিনী।

মুক্তি

তব প্রেম অত্যাচার হ'তে হে সুন্দরি
লভিয়াছি মুক্তি আজ! চুম্বনে কাঁপিত
প্রতি দিবা কৌতূহলে; আনন্দে জাগিত
চির নিদ্রাহীন শত সচন্দ্র শর্ব্বরী,
হে সুন্দরি

শ্রান্ত করি দেহ মন ধেয়ান ধারণা
প্রভাতে দিবসে রাত্রে সমস্ত জীবন
কি তিক্ত অমৃতে তুমি করেছ মগন
নিশীথের স্বপ্নভাতি দিবসে ভাবনা
নির্ভাবনা?

দুরন্ত জীবন আজ শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া।
উন্মাদ আনন্দ-সুধা করিয়াছে পান;
তোমার রাজত্ব করি পূর্ণ অবসান
আপন আবেগে আজ যাবে কি জ্বলিয়া
দেহ হিয়া?

অপহৃত প্রাণ হ'তে চিরবন্দনীয়
নির্দ্দয় পরশ তব রক্ত চরণের;
বিদ্যুৎ পরশ তব নক্ত নয়নের
ঢালে না জীবনে আর সে তীব্র অমিয়
চির-প্রিয়!

সুন্দর চরণাঘাতে কম্প্র হৃদিপ'রে
ফুটে না কুসুমদল মদগন্ধভরা
পাগল কুন্তল আর আঁধারে না ধরা
যে স্বর্ণ সৌন্দর্য্যে ছিল প্রাণ পূর্ণ ক'রে,
গেছে ঝ'রে!

করপুটে ভিক্ষা মাগি হে বরসুন্দরি!
জনমের মত তুমি যাও তবে চ'লে;
জীবন ঢালিয়া মোর বিস্মৃতির কোলে
আপনারি কাছে র'ব দিবস শর্ব্বরী,
হে সুন্দরি!

অভিশাপ

কত যুগ যুগান্তর দিবস-রজনী ধ'রে
বিশ্বের প্রার্থনা
চির দীর্ঘশ্বাস-ভরা অশ্রুজল-পরিপূর্ণ
অবোধ বাসনা
ছুটেছে নন্দন পানে, নন্দনের স্বর্ণদ্বারে
হইয়া প্রহত
ফিরেছে ধরণী-বক্ষে ব্যর্থ ব্যাকুলতা-ভরা
মস্তক আনত!
শুনেছে কি বিশ্বরাজ বসি স্বর্ণসিংহাসনে
চিরানন্দমাঝে?
অতি দূর ধরণীর কোন্ চোখে অশ্রুজল
কার ব্যথা বাজে?
শান্তিহীন ধরাবাসী চরণে এনেছে তবু
মর্ম্ম-উপহার;
জানে নাই সব স্বর্গ রুধিয়া আছিল এক
নির্ম্মম দুয়ার!
একদা প্রশান্ত সন্ধ্যা করুণার প্রাণরূপী
আঁধার বরণ—
দেবতার হাস্যমাঝে আসিল, সচন্দ্র রাত্রে
মেঘের মতন,
মুক্ত করি কেশজাল বিদেশের ধূলি-লিপ্ত
ধূসর চরণ
রাখিলা নন্দন'পরে শ্রান্ত ছায়াঞ্চল টানি
আনম্র নয়ন!
শিহরিল সুরলোকে অনন্ত আনন্দ-ভরা
সুরেন্দ্রের মন,
শীতের নিশ্বাস লাগি সহসা শিহরে যথা
পুষ্প-উপবন!
স্বর্গের রাজন্ কহে ডাকি সর্ব্ব সুরলোক
হে নন্দনবাসী!
শান্ত এ হৃদয়ে মোর কেমনে বাজিল আজ
সান্ধ্য রূপরাশি?
নিষ্ফল স্বর্গের শোভা অনন্ত বসন্ত ভাল
নাহি লাগে আর—
নব নব জগতের পরশ লভিব আজি
আকাঙ্ক্ষা আমার।
দেবেন্দ্রের আজ্ঞামত প্রহরী খুলিয়া দিল
স্বর্গের দুয়ার,
বসন্তের বায়ু'পরে পারিজাত বরষিল
পরিমলভার!
নিশীথের সাথে সাথে কনক-প্রদীপ শত
জ্বলিলে নন্দনে,
সকল নন্দন আসি একত্র মিলিল যেন
প্রমোদ বন্ধনে!
বসি স্বর্ণসিংহাসনে সুধা-হস্তে স্বর্গপতি
সৌন্দর্য্যবেষ্টিত—
কিন্নরীর নৃত্যতালে অপ্সরার গীতজালে
নিতান্ত জড়িত!
হেনকালে হু হু ক'রে আসিল ঝটিকা, আর্ত্ত-
ক্রন্দনের মত

বহিয়া জগৎ হ'তে প্রাণপূর্ণ হতাশ্বাস
দুঃখ শত শত !
থেমে গেল নৃত্যগীত ! সুরেন্দ্রের স্বপ্নজাল
স্বরগ-সঞ্চিত,
নিমেষে টুটিয়া গিয়া আপনার মোহ হ'তে
করিল বঞ্চিত।
নিভিল প্রদীপমালা ; চিরোজ্জ্বল সুরসভা
স্তম্ভিত মলিন,
যেন কোন মহাশূন্য অন্ধকার-পরিপূর্ণ
নিত্য সুখহীন।
অনন্ত গগন-ভরা বৃহৎ বিহঙ্গ যেন
পক্ষ প্রকম্পিয়া
শান্ত করিবারে চায় মর্ম্মভরা ব্যাকুলতা
শান্তিহীন হিয়া !
তেমতি কাঁপিল স্বর্গ ! দেবতার দীর্ঘশ্বাস
ভগ্ন হৃদি-ভরা
শ্মশানে ঝটিকা সম রহিল ভীষণ ভাবে
সুখ-শান্তি-হরা !
তারি মাঝে ধরণীর অনন্ত ক্রন্দনস্রোত
আসিল ছুটিয়া,
নন্দনের কূলে কূলে নতশির দেবতার
চরণ বিরিয়া !
পরদিন স্বর্গপুরে সুপ্রসন্ন সূর্য্যকর
সুবর্ণ ঝলকে
চুম্বিল সকল স্বর্গ, চুম্বিল সুরেন্দ্র-হৃদি
চঞ্চল পুলকে !
বিষণ্ণ নন্দনপতি হস্তস্থিত সুধাপাত্র
ফেলি' দিয়া দূরে,
বাজাইলা স্বর্ণ ভেরী আহ্বানিয়া সুরসভা
সুপ্ত সুরপুরে।
বিষাদকম্পিত কণ্ঠে কহিলা স্বর্গের রাজা—
হে নন্দনবাসী !

আজি হ'তে মোর রাজ্যে বন্ধ রবে গীত গান
শত উচ্চ হাসি।
আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই এত দিন
ক্রন্দন ধরার,
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত ধরণীর
চির মর্ম্মভার।
হায় স্বর্গ ! হায় ধরা ! বন্দী আমি আপনার
নিয়মকারায়,
অনন্তে রচিত মোর হস্তস্থিত সৃষ্টিসূত্র
কোথায় হারায় ?—
সৃজিয়াছি শান্ত সুখ, কোথা হ'তে আসে দুঃখ
মলিন-বরণ ?
জীবনের সাথে সাথে কোথা হ'তে এল ভেসে
অবাধ্য মরণ ?
কাঁদ কাঁদ ধরাবাসী ! তব তীব্র আর্ত্তনাদ
বজ্রশেল সম,
সহস্র-সম্ভোগ-ভরা কম্পিত এ স্বর্গধাম,
বাজে মর্ম্মে মম।
সৃষ্টির নিগড় গড়ি চরণে পরিয়া আমি
পূর্ণ পরাধীন ;
অনন্ত ক্ষমতা নাই, অপার অনন্ত দুঃখ
স'ব চিরদিন।
স্বর্গসহচরগণ ! আজি হ'তে আমি হ'ব
ধরণীর প্রাণ,
বাজিবে আমারি মর্ম্মে জগতের দীর্ঘশ্বাস
শত দুঃখ তান !
চির অশ্রুজল চ'খে জাগিয়া রহিব ল'য়ে
পূর্ণ পরিতাপ,
বক্ষেতে বিঁধিয়া রবে শাণিত কৃপাণ সম
এই অভিশাপ।

ঊষা

কখন্ জাগিলে তুমি হে সুন্দর ঊষা !
রজনীর পার্শ্বে ছিলে স্বপন মগন,
কখন্ করিলে তুমি স্বর্ণ-বেশ ভূষা ?
ললিত রাগিণী দিয়ে রঞ্জিলে গগন !

তোমারে আবরি' ছিল যে ঘোর রজনী
তিমির কুন্তল তার বাঁধিলে যতনে ;
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী
সরল নির্ম্মল সুখ কমল-নয়নে !

কোমল চরণে আসি শিয়রে আমার
বুলাইলে আঁখি পরে কুসুমিত কেশ ;
চকিতে চাহিয়া দেখি অধর তোমার
আরক্ত আনন্দ-ভরা,—রজনীর শেষ !

পরশিয়া দেহে তব আলোক অঞ্চল
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক-চঞ্চল !

কল্পনা

তোমারে পাব না জানি ! তবু মনে আসে
অনন্ত বাসনা-পূর্ণ অসংখ্য কল্পনা ;
অন্তরের কানে কানে মোহমন্ত্র ভাষে
দিবসে নিশীথে জাগি সহস্র জল্পনা ।

যদি কোন দিন আমি মুহূর্ত্তের তরে
সব ভুলে যাই তব সৌন্দর্য্যের ছায়,—
যদি কোন দিন সত্য সত্য মোহভরে
আপনা রাখিতে পারি তব পুষ্প-পায় !—

কল্পনার স্বপ্ন-ছল সত্য হয়ে উঠে
আপনার বাসনার নিবিড় তৃষায় ;
আমার অন্তরতলে শত পুষ্প ফোটে,
শরৎ-প্রভাতে আর বসন্ত-নিশায় !

এ তনুর প্রতি অণু তৃষিত লোলুপ,
এ প্রাণের পিপাসায় কোথা তব রূপ ?

নিশীথে

নূপুর খুলিয়া লও !
যদি এই রজনীর অন্ধকারে বাজে—
আমাদের দু'জনের কলঙ্কের কথা ;
যদি এই অর্দ্ধসুপ্ত সংসারের মাঝে
বাতাসে প্রকাশে অন্ধ অন্তরের ব্যথা,—
মর্ম্ম-কাতরতা !

কৌতূহল-পরবশ বিশ্বের নয়নে
এ প্রেম সুন্দর যদি ধরা প'ড়ে যায় ;
যদি নব-প্রস্ফুটিত এ প্রেম পবনে
দু'জনার সর্ব্বসুখ অন্তরের ছায়
শুষ্ক হয়ে যায় ?

দুঃখ

তোমারে চিনেছি দুঃখ ! তুমি রাখ মোরে
আবরিয়া কি অপূর্ব্ব প্রেয়সীর মত
সংসারের সর্ব্বসুখ হ'তে ! সাধ ক'রে
প্রাণ হ'তে ছিঁড়ে লও প্রাণ-পুষ্প শত !
অধরচুম্বনচ্ছলে রক্ত কর পান,—
নিশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার,
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধ মৃত্যুর সমান,
বিমুক্ত কুন্তলে কর অনন্ত আঁধার ।
সমস্ত জীবন ওগো রহস্যমধুরা !
দিবসে নিশীথে কর খেলনা তোমার ;

সর্ব্বদা করিছ পান অগো তৃষাতুরা !—
আশা ভয় প্রেম সুখ সর্ব্বস্ব আমার !
অন্তরে জ্বলিছে চির চুম্বন তোমার,
অনন্তসুন্দরী তুমি প্রেয়সী আমার !

সুখ

তুমি চিরদিন ভ্রম কনক-কাননে
প্রাণপূর্ণ আশা-পুষ্প চোখে হাস্যভাতি
কি স্বর্ণ মোহন মন্ত্র তব শুভ্রাননে
বিকসিত পুণ্যালোকে প্রতি দিন রাতি
দেবতার সুধাভাণ্ডে হে শুভ্র বালক !
ঢালিছ অনিন্দ্য হাসি সে সুধা জিনিয়া
কুসুম দুর্ব্বল দেহ অশান্ত অলক
নন্দনের স্বর্ণকরে নিত্য ঝলসিয়া !
অপ্সরার বক্ষ ভ'রে তুমি খেলা কর,
কৌতুকে চুমিয়া লও কিন্নরীর মুখ ;
নির্ম্মমের মত হেথা ছদ্ম বেশ ধর—
নিতান্ত মানবাতীত, হে সুন্দর সুখ !
ধরণীর মায়ামৃগ সুবর্ণ মণ্ডিত,
থাক তুমি স্বর্গপুরে সুরেন্দ্রবন্দিত !

জীবনের গান

সুপ্রসন্ন সুপ্রভাত আজি !
সুন্দর সূর্য্যের আলো
চরাচর চক্ষে ;
সুমন্দ বসন্ত-বায়ু
অবনীর বক্ষে
প্রস্ফুটিছে শত পুষ্প-রাজি—
পুলকচঞ্চল দল শত পুষ্প-রাজি
সুবসন্তে আজি !

চারিদিকে সুবর্ণ স্বপন !
এমন বিহঙ্গ মোর
কোথা উড়ে যায়,
ধরণী ছাড়িয়া কোন্
গগনের গায় ?
মোহমগ্ন জীবন মরণ—
কি স্বপ্ন চুম্বিয়া আজি সুবর্ণবরণ
জীবন মরণ ।

আসে প্রেম অনন্ত সুন্দর !
তুলে দেয় হস্তে মোর
রক্ত ফুল তার,
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
মধু গন্ধভার ;
স্বপ্ন দেয় ভরিয়া অন্তর—
গোপনে চুম্বিয়া যায় আমার অন্তর
এ প্রেম সুন্দর !

আসে নেমে যশ সুরাঙ্গনা !
গগনে ফুটিছে পুষ্প
চরণ আভাসে,
আমারে বাঁধিছে যেন
শত পুষ্পপাশে
স্মিত-হাস্যে প্রফুল্ল-আননা—
সহস্র সৌন্দর্য্যভরা চিরশুভ্রাননা
যশ সুরাঙ্গনা ।

পরিপূর্ণ সুবর্ণ নেশায়
আসিছে হাসিছে আশা
শত স্বপ্ন রাণী !—
ঢালিছে আমারি কর্ণে
আর স্বর্ণ-বাণী :

হস্তে তার মদপাত্র ভায়,—
সে মদ চুম্বিয়া হৃদি কি যে গীত গায়
স্বর্ণ নেশায় !

প্রাণপূর্ণ অপূর্ব্ব স্বপনে
অস্ফুট সঙ্গীত তালে
ফেলিছি চরণ ;
আনন্দে ফুটিছে পুষ্প
আরক্ত বরণ
ধরণীর বসন্ত-কাননে !—
দেবতার হাস্যভাতি ভাসিছে গগনে
অপূর্ব্ব স্বপনে।

আমি রাজা, সকলি আমার !
আনন্দিত তৃণ'পরে
দাঁড়াইয়া আমি,
চরণে প্রশান্ত ধরা
আমি তার স্বামী ;
দূর হ'তে গগন অপার
শ্রবণে ঢালিছে সুরসঙ্গীতের ধার,
ইঙ্গিতে আমার !

ওগো এস কাছে মোর !
অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে
বিলাইতে চাই,
অনন্ত জীবন আজি
তারি গান গাই ;
তোমাদের আছে মৃত্যু ঘোর,
অনন্ত জীবন হেথা, কোথা মৃত্যু ঘোর ?
এস কাছে মোর !

দরিদ্র

অনেক সৌন্দর্য্য আছে হৃদয় ভরিয়া,
সহস্র মাণিক্য জ্বলে অন্তর-আধারে ;
অনন্ত সঙ্গীতরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দিবস-রজনী করে উন্মাদ আমারে !

গাহে পাখী, বহে বায়ু বসন্তের মত,
নানা বর্ণে শত পুষ্প ফুটে মন-বনে ;
জগতের কাছে তবু দরিদ্র সতত
মরমে মরিয়া থাকি আপনার মনে !

তোমরা ডেকেছ তাই আনিয়াছি আজ
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন-মালঞ্চের ;
তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের।

হৃদয়-সম্পদরাশি ফুটে না ভাষায়,
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য্য হারায় !

শেষ

ওগো আর নাই এই শেষ !
মালঞ্চের পুষ্পরাজি
সকলি দেখেছ আজি
আর কিছু নাই অবশেষ—
রজনী আসিছে নেমে এলাইয়া কেশ-
এই শেষ !

কাব্যের কথা

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

স্তব

নমস্তে নারায়ণ!

তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন। আমাদের এই হাসি-অশ্রুময় জীবন, সুখে দুঃখে পরিপূর্ণ সংসার,—ইহাকে বাঁচাইয়া, জাগাইয়া রাখ একমাত্র তুমি।

তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া-পুত্তলিকা। তুমি যখন আপনাকে লুকাইয়া রাখ, তখনি সংসার মায়ার খেলা হইয়া উঠে। তুমি সৃষ্টিকে সত্য করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ। সকল সংসার তোমার লীলাভূমি।

নায়কনায়িকার মাধুর্য্য, পিতামাতার বাৎসল্য, সখার সখ্য এবং প্রভু ও দাসের একদিকে স্নেহ ও অপরদিকে ভক্তি—এই সব লইয়াই ত সংসার, এই সব লইয়াই ত জীবের জীবন। তুমিই ত এই সকল রসকে সার্থক কর। সকল রসের একমাত্র লক্ষ্য তুমি; আর যাহা কিছু, সব ত উপলক্ষ।

ওই যে মাতা বাৎসল্য-আবেগে আপনার শিশুটিকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন, ঐ বাৎসল্যরস ত তোমারই দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ওই শিশুর মধ্যে যে জননী শিশুরূপী তোমাকে না দেখিতে পান, তাঁহার বাৎসল্যের সার্থকতা কোথায়? তুমি যখনি তাঁহার প্রাণে ওই শিশুরূপে আবির্ভূত হও, তখনি তাঁহার বাৎসল্য ধন্য হয়। বাৎসল্যের অসীম আনন্দ তিনি তখনি উপভোগ করেন। নায়কনায়িকার যে মাধুর্য্যরস, তাহাও তোমারই পানে প্রবাহিত হয়; যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায়, ততক্ষণ তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনি তুমি নায়কনায়িকারূপে আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনই তাহাদের প্রেমালিঙ্গন ধন্য হয়। তাহারা হাসি-অশ্রুজলে, চুম্বনে, পরশে তোমারই মাধুর্য্যরসের অপার আনন্দ সম্ভোগ করে; সকল সখ্যের তুমি আশ্রয়, সকল দাস্যের তুমি যে প্রভু! যতক্ষণ তুমি সখারূপে, প্রভুরূপে না দেখা দাও, ততক্ষণ তাহারা "কই সখা, কই প্রভু" বলিয়া এই সংসার-অরণ্যে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তুমিই তাহাদের সখ্য ও দাস্যকে সার্থক করিয়া তুল।

সকল জীবের তুমি একমাত্র আশ্রয়, সকল নরের তুমি সমষ্টি, সকল নরসমাজের তুমি ব্যষ্টি, সকল জাতির তুমিই জাতীশ্বর। তুমিই বিশ্বমানব;—অতীত মানব তোমারই বুকে লুকাইয়া আছে, বর্ত্তমান মানব তোমারই জীবন আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করিতেছে; আর মানব যাহা হইবে, তাহার সমুদায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এক অপূর্ব্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত তোমারই বক্ষে ফুটিয়া আছে। তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; অনাদি তুমি, আদি তুমি; অনন্ত তুমি, সান্ত তুমি। তুমিই নরনারায়ণ।

তুমি যেমন জীবের অবলম্বন, জীবও যে তেমনি তোমার অবলম্বন। প্রভো! জীব ছাড়াও তোমার চলে না। লীলা-প্রয়োজনহেতুই ত তুমি জীবকে তোমার বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিলে। সে জীব ছাড়া তোমার লীলা সম্ভব হয় না।

তুমি নিত্যই এক, আর নিত্যই দুই হইয়া আপনার মধ্যে লীলা কর। তুমি এক হইয়াও লীলারসে বিভোর হইয়া অনন্ত রূপ ধরিয়া বিশ্বসংসারে বিচরণ কর। তুমি যখনি তোমার বিশ্ববীণায় ঝঙ্কার দেও, তখনি সকল বিশ্বের কবি গান গাহিয়া উঠে কা'র সে সঙ্গীত, প্রভো! তুমি ছাড়া কেই তাহা সম্ভোগ করে। তুমি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া স্নেহদান কর,—আবার তুমিই সন্তান হইয়া সে স্নেহের দাবী কর! তুমি প্রভু হইয়া দাসকে স্নেহে আবদ্ধ কর, আবার তুমিই দাস হইয়া প্রভুকে প্রাণের ভক্তি অর্পণ কর। তুমি সখা হইয়া সখ্যরস ঢালিয়া দাও, আবার তুমিই সে রস সম্ভোগ কর। তুমি ধনী হইয়া দান কর, ভিখারী হইয়া গ্রহণ কর। তুমিই নায়কনায়িকা হইয়া প্রেমলীলায় অভিনয় কর। তুমিই তাহাদের বাহুপাশ হইতে আলিঙ্গন কাড়িয়া লও, তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে প্রেমচুম্বন চুরি করিয়া আস্বাদ কর।

সকল ভোগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমি কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্তরূপী নারায়ণ! তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয়, তখন বুঝিতে পারি, ইতিহাস তোমারই লীলাপরিপূর্ণ পুণ্য কাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রস-স্ফূর্ত্তি। ধন্য জীব, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা!

নমস্তে নারায়ণ!

কবিতার কথা

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে। আমি ভাষার কথা বলিতেছি না, সাহিত্যেরই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষতঃ গীতি-কাব্য লইয়া, নানাপ্রকারের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতার অভাব। আবার কেহ কেহ বলেন, ভাবুকতাই মনুষ্যজীবনের সারাংশ। এই ভাবুকতা ছাড়িয়া দিলে কবিতা ফুটিবে কি করিয়া? প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যে Realism ও Idealism লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিত, ইহা কতকটা সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজী সাহিত্যে ইহার একটা মোটামুটি রকমের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই মীমাংসা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylarkএর শেষ দুইটি ছত্রে আছে—

Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of Heaven and Home!

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য এই দু'য়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই কি আমাদের কবিতার আদর্শ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদের প্রাণের মাঝে দুইটা ভাব সর্ব্বদাই দেখা দেয়। একটা আমাদের মাটী আঁকড়াইয়া থাকিতে বলে, আর একটা আমাদের মাটী ছাড়াইয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরে। এই সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, এই দুই লইয়াই আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি না। ছাড়িয়া দিলে, মনুষ্যজীবন বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার অঙ্গহানি হয়।

মনুষ্যজীবন কি? আমরা প্রতিদিন যেমন করিয়া জীবনযাপন করি, তাহাই কি প্রকৃত জীবন? আমরা সকলেই সকালে উঠিয়া যে যার কর্ম্মে নিযুক্ত হই, সমস্ত দিন কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসি এবং তৎপরে বিশ্রাম করি। যাহার কর্ম্ম করিতে হয় না, সে-ও শয্যা হইতে উঠিয়া কোন রকম গল্প করিয়া, তামাক টানিয়া দিনটা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনের বহিরাবরণ। ইহার আর একটি দিক আছে। তাহাকে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতি বলা যাইতে পারে। যে সমস্ত দিন কর্ম্ম করিয়া কাটায়, সে-ও মাঝে মাঝে, ভাবিতে ভাবিতে, তাহার কর্ম্মের সার্থকতা যেখানে, সেই রাজ্যে গিয়া পৌঁছায়। যে সমস্ত দিন আলস্যে অতিবাহিত করে, সে-ও একেবারে অসার না হইলে মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশীরবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। এই সব মুহূর্ত্তগুলি জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত। এই মুহূর্ত্তেই আমরা প্রকৃত জীবনযাপন করি এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সার্থকতা বুঝিতে পারি। কৃষকের জীবন লইয়া সেই কবিতা লিখিতে পারে, যে কৃষকের জীবনের সার্থকতা বুঝিয়াছে। কেমন করিয়া কৃষক প্রাতে উঠিয়া পান্তা ভাত খাইয়া লাঙ্গল লইয়া

মাঠে যায়. কেমন করিয়া সে চাষ করে, সে চাষ করিতে করিতে কি গান গায়, সে বাড়ী ফিরিয়া কেমন করিয়া বিশ্রাম করে, কি খায়, কি পরে—এই সব খুব জাঁকাল রকমের ভাষায় বর্ণনা করিলেও কবিতা হয় না। কেবল একখানি সুন্দর আলোক-চিত্র হয়।

আজকালকার দিনের অনেক কৃষক-বিষয়ক কবিতা এই প্রকারের এই সব কবিতায় প্রত্যক্ষ বাস্তবতা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বস্তুতন্ত্রতা নাই,—যাহা লইয়া কৃষকের জীবনের সার্থকতা, তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কৃষক বুঝুক, আর না ই বুঝুক, তাহার দৈনন্দিন জীবনের বাহিরে একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই অন্তঃপ্রকৃতির অনুভূতি যার নাই, সে কখনই কৃষকের জীবনকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। সে যাহা বুঝে ও যাহা ধরে, তাহা বাহিরের খোসামাত্র। সেই খোসা লইয়া যাহা লেখা যায়. তাহা কবিতা নয়। যে কবি সেই জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পাইয়া, সেই জীবনের ভিতর ও বাহির দুই দিককেই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারেন, তিনিই যথার্থ কৃষকের কবিতা লিখিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বার্ণ্সের Ploughmanএর কথা বলা যায়। আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় কালিদাস বাবুর "পর্ণপুটে" কৃষকের ব্যথা নামক একটি কবিতা যথার্থ কৃষকের কবিতা—

ক্ষেতের কাজ করতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই
কাজেতে আর নাইক মন, আরামে সুখ নাই।
তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে জ্বলি,
ধানের চারা উপ্‌ড়ে ফেলি আগাছা কাটা বলি'।

* * * *

শান্তিপুরে,' তোমার ডুরে,' এ বুকে চাপি ধরি,
চোখের জলে বক্ষ ভাসে মেজেতে রহি পড়ি।

কৃষকের কবিতায় বিষয় যাহা বলিলাম, সব কবিতায় বিষয়েই তাহা খাটে। শুধু নায়কনায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জ্ঞানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত বলিলাম, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়-মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখন কবিতার সৃষ্টি হয়।

তবে কবিতার রাজ্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা লইয়া তর্ক করার অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ধরণী আকাশের গায় ও আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে। এ মিলন অপূর্ব্ব, গভীর, অনন্ত। দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম, এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলনভূমি অপূর্ব্ব, অনন্ত! বুঝিলাম, যাহা আত্মা, তাহাই দেহ; যাহা অনন্ত, তাহাই সান্ত; যাহা পরমার্থ, তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলনমন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই—যাহা আছে, তাহাই

জীবনের স্বরূপ! এ জীবন লইয়াই কবিতা! যে শুধু ছোবড়া খায়, সে কখনও ফলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবড়া না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সে-ও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের প্রস্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিত লোক সৃজন করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহনির্ম্মাণ করা যায় না, সেইরূপ কল্পিত-লোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই কল্পিত-লোকের কোন সত্তা নাই। এ মিলন-মন্দির সত্য সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।

আমি দু'একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি"—

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সেই মহামিলনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি!"

আজকাল এরূপ কবিতা শুনিতে পাই না! আর কি শুনিতে পাইব না?

"রাধিকার পূর্ব্বরাগের কথা মনে করুন!
সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।"

এও সেই মহামিলনমন্দিরের গীতধ্বনি! যাঁহারা শুধু বাহিরের দিক্‌টা দেখেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, "পূর্ব্বরাগে আবার মিলন আসিল কোথা হইতে?" আমি যে মহামিলনের কথা বলিতেছি, তাহাই যে জীবনের স্বরূপ,—পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বিরহ ইত্যাদি সেই স্বরূপেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং পূর্ব্বরাগের গীতই হউক, কি মিলন অথবা বিরহের গীতই হউক, জীবনের সকল গীতই সেই মহামিলন-মন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। যিনি যথার্থ কবি, তিনি সেই মন্দিরে পৌছিয়া তাহারি গান বুকে করিয়া বহন করিয়া আনেন! তাই আজ এত বৎসর পরেও এই কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

চণ্ডীদাস যে সাধক ছিলেন। তিনি যে নামের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নায়ক-নায়িকার নাম লইয়া লিখিত দুইটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে। একটি এই—

"শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি শুনেছি তাহা,
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা!
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম।
বালার খেলার সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে,
স্বজনেরা তার, নলিনী নলিনী
নলিনী বলে গো তাকে।

নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম !

আর একটি এই—

ভালবেসে সখি ! নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার
মনের মন্দিরে ।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো তোমার
চরণ-মঞ্জীরে !

বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাসের কবিতা যে রাজ্যের, এ দুট কবিতা সে রাজ্যেরই নয়—সে মহামিলনমন্দিরের অনেক দূরে ।

প্রেমে ডগমগ-হৃদি রাধিকা নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না । সে ভাবিতেছে, তাহার কি হইল । সে যেন সংসারে থাকিয়াও সংসারে নাই । সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ প্রেমের যে প্রভাব, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে,—

সই ! পিরীতি আখর তিন ।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাত দিন ॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত ।
রসের স্বরূপ, পিরীতি-মুরতি
কেবা করে পরতীত ।
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল !
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতিকুল ।
সে রূপ-সায়রে, নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধিল হিয়া ।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি না দিয়া ।
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে ।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে ।

রাধিকার হৃদয়দর্শী চণ্ডীদাস, রাধিকার হৃদয়ের কথা সকলই জানেন । সংসারে থাকিয়াও যে সে সংসারের বহুদূরে, তাহা তিনি জানেন । তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আছয়ে ঘরে বটে, কিন্তু ইঙ্গিত পাইলে অনল দিয়ে দুয়ারে ।" আর একটি কবিতাতে কবি বলিতেছেন, "তোমার এ রকম ত হবেই । তুমি যে—

পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি বাস ।"

তার পর মিলনের ও সম্ভোগের কথা । মিলনের মাঝে রাধিকা বলিতেছে—

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা !

এ ত শুধু বাহিরের সঙ্গীত নহে, এ যে অন্তর্দৃষ্টি-পরিপূর্ণ । শ্যামের প্রেমে গদগদ-প্রাণ রাধিকা এ কোন্ শ্যামের অনুসন্ধান করিতেছে ? চণ্ডীদাস জানে ; রাধিকা না জানিলেও তাহার হৃদয় জানে । তাই সে মিলনের মধ্যেও গাহিয়া উঠিল—

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা !

প্রত্যেক মিলনের মধ্যেই একটা বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকে । এ গান তাহারি প্রথম সূত্র । এই বিরহ তার পর সম্ভোগে আরও সুন্দরভাবে, গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি ।
দুহুঁ পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

ইহার পরের অবস্থাই বিদ্যাপতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুর যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝিনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

কেমন করিয়া নয়ন তিরপিত হইবে, নয়ন যে অতৃপ্য! কেমন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে, প্রাণ যে জুড়াইবার নয়! আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়া অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চাই। তাই প্রত্যেক মিলনের মধ্যে মহা-মিলনের অনুসন্ধান করি, তাই সম্ভোগেও এক মহা-বিরহের ছায়া পড়ে, তাই সম্ভোগ-মিলনের মধ্যেও নায়িকা গাহিয়া উঠিল—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি!

এই কবিতাগুলি Realisticও নয়, Idealisticও নয়. আমি যে মহামিলনমন্দিরের কথা বলিয়াছি, তাহারি ধ্বনি। এগুলি জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধ্বনি পাওয়া যায়। তাই আমরা এ কবিতা-গুলিকে কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

ইহাই হিন্দুর আন্তরিক ভাব। ইহাই বাঙ্গালী কবিতার প্রাণ। বঙ্গসাহিত্যে—চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্য্যন্ত—এই কবিতার একটা অক্ষুণ্ণ ধারা দেখিতে পাওয়া যায়!

সে ধারা কোথায় লুকাইয়া গেল? আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না কেন? ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাঙ্গালা কবিতার যে প্রাণ, তাহাই হারাইয়া ফেলিব? আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, কবিতা কি চিরকাল এক রকমই থাকিবে? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের পরিসর বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমন করিয়া চলিবে? কিন্তু আমি ত কোন গণ্ডীর কথা বলি নাই. আমি কবিতার রাজ্যের কথা বলিয়াছি. কাব্য-লোকের কথা বলিয়াছি। এই কাব্য-লোকের কোন সীমা নাই। এ রাজ্য অসীম, অনন্ত। জীবনের পরিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে, কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইবসেন হইতে কাড়া-কাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। নানা ফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মত মেটারলিঙ্কের পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে। আমরা সে বিষয়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কবি যদি সেই কাব্য-লোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা। এক দিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জিনিস নহে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, সেই মহামিলনমন্দিরের সাধক হওয়া চাই। সে অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুবা চাই! নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া, বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া, কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদী রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।

বাঙ্গালা কবিতার সেই সরল সত্য প্রাণ আমরা হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাষা

ধরণ ক্রমশঃ কিম্ভূত কিমাকার হইয়া আসিতেছে। াাজকালকার দিনে!

এই হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল—

াই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার াাবশ্যক হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছানিয়া নিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে হয়। তা' না ইলে না কি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা বাই খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে সি। একটি ভাব কোন রকমে জোগাড় হইলেই াহাতে ভাষার রং মাখাইতে বসি এবং সেই রঙ্গিন জনিসটাকে লইয়া, বল-খেলার মত তাহাকে াাছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির াদয় হইতে কোন ভাবই সহজে, সরলভাবে পাঠকের নে আসে না। কবি যেন তাহাকে তাঁহার মন ইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা রেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দখিয়া লয়, আর কবির ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা রে।

কিন্তু ইহা ত বাঙ্গালা কবিতার ধরণ নয়। যে পরিমাণে প্রাণের অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরণের াাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙ্গালা কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাই আজকাল বাঙ্গালা কবিতাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরণের এত বাড়াবাড়ি।

সেই সোজা সরল ধরণের দুই একটি কবিতা মনে পড়িতেছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা ঐ ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কবিতায় অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকিলেও তাঁহার ভাষা ও ধরণ অনেকটা সেই প্রকার সহজ, সরল, প্রাণময়—

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরুপম
নয়ন ত মম মনোমত নয়।
যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন
হতেছিল সম্মিলন;
নয়ন পলক দিলে, সেই সুখের সময়!

ইহাতে খেলিবার চেষ্টা নাই,—ইহার গতি সরল। আবার দেখুন,—

মন যে আমার পড়েছে সই উভয় সঙ্কটে
এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,
আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হয়ে র'ব।
এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,
আর এক নয়ন বলে, আমি মুদিত হয়ে থাকি।
এক করে সাধ করে, ধরে কৃষ্ণ করে,
আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তারে।
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়
আর এক পদে, পদে পদে বারণ করে তায়।

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অজ্ঞান। সখীরা তাহার কানে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল। অমনি রাধিকার কৃষ্ণস্ফূর্তি!

বহুদিন পরে মোরে মনে ক'রে
এসেছিল ঘরে বঁধু যে আমার।
আমি জানলাম জানলাম—
বঁধুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধে পশি নাসারন্ধ্রে
মৃতদেহে করলে জীবন সঞ্চার।
সখি! আমি ছিলাম অচেতনে,
ভাল, তোরা ত ছিলি চেতনে,
হায় হায়! যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,
কেন অযতনে হারালি আবার।

এইরূপ ভাষা এখন আর শুনিতে পাই না। নিধুবাবুর "তোমারি তুলনা প্রাণ তুমি এ মহীমণ্ডলে", কিম্বা বিহারীলালের—

"নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার!"

এইরূপ অনেক কবিতা বঙ্গভাষায় আদরের সামগ্রী।

আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয়, যেন আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ. সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা অন্য প্রকারের, আমরা প্রত্যেক কথা এত ঘুরাইয়া বলি যে, সাদাসিধে লোকে বুঝিতে পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মত বক্রগতি। তা'র ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগ-রাগিণী-আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে, সে ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই, সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতেই পারে না।

আমাদের কবিতার এই শোচনীয় অবস্থার হয় ত যথাযথ কারণ আছে। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপণ্ডিত, তাঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু যথেষ্ট কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে ত মন মানে না! প্রাণ যে চায় সেই বৈষ্ণব কবিদিগের সব-জুড়ান সুধাস্রোত। মন যে চায় সেই বাঙ্গালীর কবিতা। বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেই হইবে। কবিতা লইয়া আর খেলাধুলা ভাল লাগে না। সংসারের খেলাঘরে খেলিতে খেলিতে যাহারা প্রাণের বস্তুর সাক্ষাৎ পায়, তাহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু যাহারা প্রাণের বস্তু লইয়া খেলা করিতে বসে, তাহাদের মত দুর্ভাগ্য আর কার? বঙ্গসাহিত্যের সেই হারান ধারাকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বতী নদীর মত বালুকারাশির মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে।

আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশব সাহিত্যসেবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বড় বড় লেখকেরা আজকাল কি লেখেন, আমি হয় ত ভাল করিয়া জানি না। হয় ত আমার বুঝিবার ক্ষমতাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা আমি বুঝি ও কতকটা জানি। তাহারি গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই, সত্য; কিন্তু আমি ত সাধক নহি, সাহিত্যমন্দিরপ্রাঙ্গণে সামান্য কিঙ্করমাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী!

আজ পরিণত বয়সে ওপারের কথাই বেশী মনে হয়। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতামন্দিরে আমি যাহাকে বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় সেই মহামিলন-মন্দিরের ধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

আবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সকল সাহিত্য সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

বাঙ্গালার গীতিকবিতা

বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায় সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গালার প্রাণ, বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গালার ঢেউ-খেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু-গন্ধবহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধূনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মতন কুটীরপ্রাঙ্গণ, বাঙ্গালার নদ-নদী, খাল-বিল, বাঙ্গালার মাঠ, বাঙ্গালার ঘাট, তালগাছ-ঘেরা বাঙ্গালার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার বাতাস, বাঙ্গালার তুলসীপত্র, বাঙ্গালার গঙ্গাজল, বাঙ্গালার নবদ্বীপ, বাঙ্গালার সেই সাগর-তরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গালার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গালার কাশী, বাঙ্গালার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গালার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে।

সেই প্রাণ-তরঙ্গে এক দিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত বাঙ্গালার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত এক দিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গালার গীতিকাব্য যে কখন্ কোন্ আদিম উষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি, সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দোঁহায় তাহার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের সেই গীতিকাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতিকাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশা করি, এক দিন আমরা আমাদের গীতিকাব্যের এই হারান ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।

চণ্ডীদাসের লিখিত গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গালার যথার্থ গীতিকাব্য; এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গালা গীতি-কবিতার প্রাণ। বাঙ্গালা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার

বাঙ্গালা জাগিয়া দেখিল, উর্দ্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল অঞ্চল-ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কলহাস্যময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাইয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে; শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগন! বাঙ্গালা দেখিল, তাহার আশেপাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান,—মন প্রাণ-বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান! তখন বাঙ্গালীর কবি গাইয়া উঠিল,—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"

বাঙ্গালা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণে পরতে পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে; বাঙ্গালা প্রাণে প্রাণে বুঝিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিকচক্রবালের পরিধিপারে মিলিয়াছেন, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, ঢলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, "এস এস, আমি ত তোমারই।" দেখিল, সে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মে জন্মে সকলই সার্থক! জন্ম সার্থক! মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক। প্রাণ সার্থক! আত্মা সার্থক! এই মহামিলন সার্থক! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলনমন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা;—আমরা যে তিলে তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গালার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাহিলেন,—

"নব রে নব নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব!"

আদিম যুগ হইতে বাঙ্গালার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন-পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে"

হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা আপনিই ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সে রূপ কেমন? যেন,—

"চরণ-কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক"

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর হৃদয়ের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল,

তখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই মানস-প্রতিমা জীবন-প্রতিমা,—

"চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী * * *
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।"

ইহাই বাঙ্গালা গীতিকাবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে,—ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গালার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন-মন্দিরে পূজা যে চলিতেছে; বাঙ্গালার গান, তাহার আরত্রিক—বাঙ্গালার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গালার কবি চণ্ডীদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।

বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল একপ্রকার মল্লযুদ্ধ বাধিয়াছে। নানা-প্রকার তর্কবিতর্ক, দলাদলি, দ্বেষ, ঈর্ষা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরা গান গাইতেছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে "বিষামৃতে একত্র করিয়া" প্রাণ-রন্ধ্রে সে বংশী আর যেন ফুকারিয়া উঠে না। কাব্য লইয়া, কবিতা লইয়া, সাহিত্য লইয়া, রস-সৃষ্টি লইয়া, নানা বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন, ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়তা, নিকৃতির ওজনে তৌল করিয়া, কষ্টি-পাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই করিতেই দিন গত হয়, কিন্তু—

"দিন গত নহে শ্যাম, তব চরণে এ দিন গত"

সে সুরের, সে সৃষ্টির, সে জাগরণের, সে মিলনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাঁশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিয়াসা"

আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সেই তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই ভাবদ্বৈধের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসা, ভাষ্য ও টীকাটিপ্পনীর সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয় ত না-ও হইতে পারে; তবে বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় আসিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই বলিতে চাই, কোন্ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের দেখা মিলিবে, তাহাই খোঁজ করিব। আপনারাও যদি আমার সঙ্গে একবার এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের ভিতর দিয়া সেই অবিরাম কবি চিন্তা-মণির 'মণি-কোটা'র সন্ধানে আসেন;—ধৈর্য্য ধরুন, সে বাঁশীর রাগিণী আপনাদেরও কান জুড়াইবে, প্রাণ জুড়াইবে। ধৈর্য্য ধরিলে মুরারি মিলিবে। সে নূতনের সাক্ষাৎ মিলিবেই মিলিবে। সে যে "নিতুই নব।" নিজে নূতন হইতেছে, সাথে সাথে এই জাগ্রত বিশ্বও নব নব উন্মেষে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন কথা হইতেছে, কাব্য কি? গীতি-কবিতা কি? সাহিত্য কি? সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা রূপের ডালি হইয়া এক দিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শও এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া সৌরবে সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম্ম;—রূপে রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া

উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুলিয়া আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম্ম ও বিকাশের ধর্ম্মই তাই। অনন্তকাল হইতে তাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডীদাস গাইয়াছেন,—

"মাটীর জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ!
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।"

সিতাসিত, কাল, পক্ষ, দিবস, রজনী, সবই ছিল, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতি-কবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ সোজা কথায় হয় ত বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবদ্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ তাহার এক সামাজিকতত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার এক মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কল্প-কলার স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়মাঝারে যে স্বচ্ছ দর্পণখানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়! প্রথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ঘিরিয়া, কুটীর রচনা করিয়া আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাবজাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরের জলধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোত্থিত গানের মত তাহাদের ভাষা ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম রসানুভূতি, তাহাই সমাজ-বিজ্ঞানবিদের বিশদ কথা।

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতির দ্বারা নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশ জনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্য আকার লইয়া অন্য আবেগের ধারায় নূতন রকমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষে সহজাত সংস্কারবশে যুগল মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান-প্রদান, ভাব-অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না পাওয়ার রস উপজয় হইল। গানের ধারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাসি-কান্নার বিলাস!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার ভাব ও আকার পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়। না-পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। জীবন ও

মৃত্যু, শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার-যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তার পর, দিন গেল, নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে জড়তা কাটিয়া গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা আসিল। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাঁদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব জাগিল, রূপতৃষা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

কিন্তু কলাকলার যে স্রষ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে সেই নিত্য সত্য রংরাজের রংএর খেলা! তাঁহার ত আদি অন্ত নাই। কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন; বিশ্বপ্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে? আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার করিবে কে?

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা ফেলা ও প্রত্যেক পা ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপতৃষাস্বভাব, সৃষ্টি-রক্ষার জন্য মিলিবার পন্থা। কলাকলার স্রষ্টা বলে, এ তৃষা নয়, এ স্ফূর্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য্য। মাটী ফাটিয়া তৃণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলায় রঙের পর রং ঝলকিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয়; সে 'আপনি' সেই লীলামৃতরসাধার, এ সবই তাঁরই প্রেমের বিচিত্র রূপ-রস! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সেও তাঁহারই লীলা। এ বিশ্বসৃষ্টি তাঁহারই, এ জীবসৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই; ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। ইহা পূর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত, অনন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কলাকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস!

কলাকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কলাকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল-অতীত। সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির নীতিও ধর্ম্মের অতীত। কলাকলা, সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কলাকলাবিদ্ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ, পরস্পরকে ধরিয়া আছে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealistও নয়, Realistও নয়, সে Naturalist। শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত্ত ধরিয়া আপনা আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদ্ও তেমনই ভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া সৃষ্টি করেন। জীবন যে সাধনা, সে ত স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট শিল্প, এ মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে, আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য।

মায়া বলিয়া কোন জিনিসই নাই। জগন্মিথ্যা নয়, এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণে যেমন অন্ধকারা যামিনীতে ঝড়াকারা নিশীথিনীর বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও তেমনই হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই—যাহা কালাবিদের সৃষ্টির ভূমি হইতে দেখিবার বস্তু নহে। ইহাই সত্য হিন্দুর প্রাণের কথা; যিনি ভাবুক, যিনি রসিক, এই রসসাধনা যাঁহার অন্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ ত নয়
তর তম করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটিক হয়।"

আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ কবি, সত্যদ্রষ্টা, তিনি সেই মিলনের উদ্দেশ্যেই বিভোর হইয়া আছেন।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কলাকলা-সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাসলীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাম্য, এই যে সমদর্শন, ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবন্মুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য, ত্যাগের বিরাট ভাবও তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাঁহার কেন্দ্র, সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বর্তিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেমরাগিণীতে সকলকে মোহিত করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন, তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—

"রূপ করুণাতে পাইবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা।"

এই বিশ্বসৃষ্টির রস-মাধুর্য্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব-প্রাণের অন্তরভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে মিলনভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহামিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কলকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ্ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, এবং বিশ্লেষণ ভাঙ্গিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্ব্ববন্ধন। সেই প্রেমের দেবতা পরিপূর্ণ, সবল, সহজ, সরল, সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাঁহার! কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ-চিন্তামণির 'মণি-কোঠা'র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সেই প্রাণের সে অতল-স্পর্শ রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, 'ঢেঁকো কথায় ভুল না,' তাহার মানে ত সকলেই বুঝেন! কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির

সাক্ষাৎকার মিলিবে ; এমত ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য্য। পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকে। ভাষাও তেমনি কোন সুন্দরভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল, নিখুঁত, সুন্দর ও সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার জন্য ; অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার রূপের অনন্ত সত্তাকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ মাত্র। পর্ব্বতের গায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে ঝরণা যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতে মহীয়ান্ ; জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম অনন্ত পাবকশিখা। মানব-জীবন সেই শিখার অনন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রঙ ও রঙের মিলন-মাধুর্য্য।

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্তু ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরে যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপচিন্তা-মণির অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্পকলার শেষ রঙ্গের খেলা। এই যে দেহ, মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নামই রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া উঠে। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিসকেই এই অন্তরের দিক্ হইতে দেখিলেই এই রূপান্তরে পৌঁছান সহজ হয়। শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত্ত আসে, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে এই রূপ রাগভরা শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে, যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভ-মুহূর্ত্তের জন্যই সকল কল্পকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্ত্তে সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত, 'মুখরিত', বিকশিত, সৌন্দর্য্য-লীলায় লীলায়িত ; প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশ্ব-আত্মার সমান খেলা। সকল জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্য রূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ,—সেই জগতের ক

তাহার এক নাড়ী,—তাঁহার এক বিরাট্ হৃদয়। সেই বিরাট্ হৃৎপিণ্ড এই বিরাট্ প্রাণসমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে।

বাঙ্গালার গীতি-কবিতায় আমি তাহারি সন্ধান পাইয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতি-কবিতার ধারায় প্রথম যে ভাষায় আমরা আজকাল গান ও কবিতা পাই, তাহাকে না কি সন্ধ্যাভাষা বলে। সুপ্তি ও জাগরণের সন্ধি, নূতন ও পুরাতনের সন্ধি, আলো ও দো-আলোর খেলা। এই সন্ধ্যাভাষায় সহজিয়া ধর্ম্মের সকল গানই রচনা, আর তাহাই নাকি বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রাচীন সম্পদ্। তাহাতে যে সমস্ত পদ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ও রহস্য এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। তবে সহজিয়ার মধ্যে যে স্বাভাবিক জীবনের স্ফূর্ত্তির উপর জীবনকে গাঁথিয়া তুলিয়া আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, এ কথার ভাব তাহার মধ্যে আছে, তা সে যত সন্ধ্যারই আলো-আঁধারি হউক না কেন। তাহার পর গৌড়ীয় যুগ, সেই গৌড়ীয় যুগে চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলী-গান অতুলনীয়। আমার মনে হয়, সে ওই সন্ধ্যা-ভাষার বৌদ্ধ সহজিয়ার পদ হইতে চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদের মধ্যে কালের বিপুল প্রভাব আছে; অনেক ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া না যাইলে ভাষার ছাঁদ ও রীতি যাহা চণ্ডীদাসে ফুটিয়াছে, তাহা হইতেই পারে না। তবে এ সমস্ত মতামত লইয়া আলোচনা করিবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই। আমি শুধু ভাবের দরজার দ্বারী; সেই মন্দিরের পূজার কিঙ্কর, আমি তাহার কথা কহিব এবং চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বাঙ্গালা কবিতার প্রাণের সহজ সরল ভাবগুলি মিনিসূতার মালার মত গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব-কবিতা রসভরা পাকা ফলের মত, তাহার খোসা আছে, শাঁস আছে, রসে অনুপম মিষ্টতা আছে. এমন কবিতা বাঙ্গালা দেশের গৌড়ীয় যুগের চণ্ডীদাস ছাড়া আর কাহার গানে আজও পর্য্যন্ত মিলে না। চণ্ডীদাসের অনুভূতি আর কাহার হয় নাই। এক দিকে বাঙ্গালার পর্ণকুটীরের কবি চণ্ডীদাস, অন্যদিকে মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির শিবসিংহ ছিল, লছিমী ছিল, চণ্ডীদাসের ছিল—

"নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটীর
নিরজন স্থান অতি"

আর ছিল রামী! এক জন রাজ অনুগ্রহে সম্মান সুখভোগের মধ্যে পালিত, আর এক জন দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা-পীড়িত! বিদ্যাপতির লছিমা দূরে আকাশের কোলে উজ্জ্বল তারকার মত, আর চণ্ডীদাসের রামী তাঁহার বুকের ভিতর—প্রাণের ভিতর। দুই জনের অনুভূতি এক হয় নাই। দুই জনেই জীবনের সকল দিকের কথা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, দুই জনে কিন্তু সমান পারেন নাই। দুই জনেই কবিতার মিলন-মন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়াছেন। এক জন মন্দির-দ্বারে আসিয়া থমকিয়া থামিয়া গেলেন, আর এক জন সেই মণিকোটার প্রাণ চিন্তামণিকে বুকের ভিতর ধারণ করিলেন, গাইলেন,—

"বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।"

"রসেতে গাঁথিয়া" এও সেই সহজিয়ারই কথা। এই রসের সাধনাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সাধনা। এই রস যে সেই রসামৃত মায়াধীশের প্রেমের খেলা, যাহার কাছে—

"মায়া আসি প্রেম মাগে"।

কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি, তাঁহারা বোধ হয়, জীবনের সুখ-দুঃখকে ভাল করিয়া বুঝেন নাই। সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্যে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা সুখ নয়, দুঃখ; এবং দুঃখ যখন ভাগবত সত্যে গিয়া পৌছায়, তখন তাহা দুঃখ নয়, সুখ; তাই চণ্ডীদাস গাইয়াছেন—

"......সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঞি।"

শ্যাম-বিরহে রাধিকা বিবশা, পীরিতি যে সুখের সাগর, তাহে দুখের মকর ফিরে নিরন্তর, প্রাণ টলমল করে অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি—এই অবধি যুগল প্রেমের লীলায় যে মিলন-বিরহের রস-মাধুর্য্য, তাহাই ফুটিল, কিন্তু এইটুকু হইল ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রীপুরুষের সহজাত মিলনের রসাভাসের মধ্যে যেটুকু, তাই; কিন্তু তাহার পরই বাহির ভিতর এক হইয়া গেল, মানুষের এই সুখ, এই দুঃখের ভিতর হইতে চণ্ডীদাস সেই ভাগবত সত্যকে রূপান্তরে টানিয়া তুলিলেন। ইহা নীতিবিদের নীতি নয়, ইহা শুধু রসপণ্ডিতের রসশাস্ত্রের আলাপ নয়; এ যে জীবনের এক চরম অনুভূতির কথা। এই চরম অনুভূতি বিদ্যাপতির হয় নাই। অনুভূতি শুধু আনন্দের ভিতর দিয়া ত হয় না—সকল রকম বিচিত্রতা না আসিলে জীবন কে উপলব্ধি করিতে পারে? এই সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াই সেই প্রাণের সাক্ষাৎকার হয়, আর প্রাণের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়-মন যে রসোচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় দাঁড়ায়। এক দিকে জীবনের অনুভূতি, অন্যদিকে রসের ভিতর দিয়া রূপান্তর, চণ্ডীদাসের প্রত্যেক কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু বিদ্যাপতির তাহা নয়, তিনি গানে যে রসের মধ্যে যে অবস্থার কথা কহিয়াছেন, তাহাতে শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগ, রূপ-রস গন্ধের অনুপম সামঞ্জস্য ও মিলন; তিনি সেখানে স্বয়ং সেই রূপ রসের মধ্যে ডুবিয়া আছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস সেই রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে ডুবিবার মত ডুব দিয়া মণি তুলিয়া উঠাইয়াছেন। বিদ্যাপতি গাইলেন, রাধার বিরহের কথা,—

"আপনহি পেম তরু অব বাঢ়ল
কারণ কিছু নাহি ভেলা।
শাখা পলব কুসুমে বে-আপল
সৌরভ দশদিস গেলা।
সখি হে দুরজন দুরনয় পাএ!
মূর ভঞো মুড়হি সঞো ভাগল
অপ দহি গেল সুখাএ
কুলক ধরম পহিলহি অলি অওল
কঞোণে দেব পালটাএ
চোর জননি নিজঞো মনে মনে ঝখঞো
রোএঞো বদন ঝাপাএ॥
অইসন দেহ গেহ ন সোহাবএ
বাহর বম জানি আগি।
বিদ্যাপতি কহ আপনহি আউতি
সিরি সিবসিংহ লাগি॥"

প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কারণ কিছু ছিল না, শাখা-পল্লব কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশদিকে গেল। হে সখি, দুর্জ্জনের দুর্নীতি পাইয়া যেন মূল শীর্ষের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, অস্থানে পড়িয়া শুকাইয়া গেল। ফুলের ধরম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে? চোরের মা'র মত মনে মনে শোক করিতেছি। এরূপ অবস্থায়, দেহ গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে। বিদ্যাপতি কহে, শ্রীশিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। আর চণ্ডীদাস গাইলেন,—

"নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে যাইত সাথে।
গুরু গরবিত বসতি আমার
পরাণ লইয়া হাতে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
আপন অন্তর না কর বেকত
তবে সে কহে যে তোরে॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত
এ দুখ কহি যে কারে।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে॥
পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে!
চণ্ডীদাস বলে বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥"

রসজ্ঞ সুজনমাত্রেই যিনি এই বিচ্ছেদ ও মিলনের রসে রসিক ও দরদী, তিনি উভয়ের এই দুই পদ আলোচনা করিলেই বুঝিবেন, বিদ্যাপতি শুধু মাত্র রসের কথায় মজিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস তাহাতে মজিয়া ডুবিয়া জীবনে এক নূতন অনুভূতির কথা বলিতেছেন। দুইটি গানে একই রকমের ভাবের ও কথার মিল পাওয়া যায়, হয় ত উভয়ে স্বতন্ত্রভাবেই ইহার স্রষ্টা, অথবা এক জন এক জনের আগে কিংবা পরে, কিন্তু তাহা লইয়া এখানে আমরা আলোচনা করিতে চাই না। আমি শুধু এখানে ভাবের দিক্ দিয়াই বিচার করিব। বিদ্যাপতির রাধিকা কহিতেছেন, প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কিন্তু দুর্জ্জনের দুর্নীতিতে তাহা উপযুক্ত স্থানের অভাবে শুকাইয়া গেল। আর সেই স্থলে চণ্ডীদাসের রাধিকা কহিতেছেন,—

'গুরু গরবিত বসতি আমার'

আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতেছি, সই রে, তোকে আর কি বলিব, এ রসে যে মজিল, সেই মনের মরমকথা জানিবে। বিদ্যাপতির রাধিকা বলিতেছেন, 'কুলের ধর্ম্ম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে?' চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছে,—

'কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।'

এই জায়গায় উভয়েই একই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু "মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি"র ব্যঞ্জনা হইতে 'পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে' এই কথা কয়টিতে ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, ইহাতে ঐ ভাবটির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাহার পর বিদ্যাপতির রাধার অবস্থা 'গৃহ ভাল লাগিতেছে না, বাহিরেও অনল ঢালিয়া দিতেছে' ভিতরে বাহিরে জলিয়া মরিতেছেন, এমন অবস্থায় বিদ্যাপতি কহিলেন, শিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। অর্থাৎ তার শিবসিংহের প্রেমে বদ্ধ, শিবসিংহ তাহাকে আনিয়া দিবেন। চণ্ডীদাসের শিবসিংহ ছিল না, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয় নাই, রাজার মন রাখিতে হইত না। তিনি বলিলেন রাধিকার মুখে—

'কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে,'

শুধু এইখানেই তিনি তাঁহার রাধার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—

'পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস বলে, বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥'

এই সমস্তটাকে একটা সার্ব্বভৌমিক সত্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শুধু রাধার অন্তরে প্রবেশ করিয়া রাধার কথার সঙ্গে নিজের প্রাণের ভাব মিলাইয়া জড়াইয়া দিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাস রাধাকে রাধাই রাখিলেন, তাহার মনের, শুধু রাধার মনের নয়, কুলবতীর মনের কথাটি এমন সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না। তার পর নিজে রাধা হইয়া অথচ দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার রাধার সমস্ত ভাবটিকে বিশ্বের সার্ব্বজনীন সত্যের উপর রাখিয়া তাহাকে গাঁথিয়া দিলেন। ভারত-শিল্পের আদর্শে যেমন বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়, ইহাও ঠিক সেই রকম। দেবালয়-প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ধারা ভারত-শিল্পে পাওয়া যায়, সে দেবমন্দিরে প্রত্যেক পাষাণখণ্ডের সার্থকতা থাকে; বিশ্বকে আদর্শ করিয়া যেখানে যেটি যেমন ভাবে থাকিলে সুন্দর হয়, বিচিত্র হয়, সেখানে সেটি ঠিক তেমনি ভাবে গাঁথিয়া তোলা, এমন কি সেই মন্দিরের স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড ও বালুর রাশ জমান থাকে, খণ্ড প্রস্তর যে পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার স্বাধীন পরিণতি যে বিশ্বের স্থানে স্থানে হয় নাই, তাহার নিদর্শন। বিশ্বকে আদর্শ করিয়াই ইহার রচনা। কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী তেমনি যেন প্রকাণ্ড মন্দির। ভারত-শিল্পে স্থাপত্য যেমন অতুলনীয়, চণ্ডীদাসের পদাবলী তেমনি সার্ব্বজনীন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরস্পরের এই সমস্ত পদাবলী পূর্ব্বরাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখাইবার স্থান এখানে নাই, কেন না, তাহা অতি বিস্তৃতভাবে, বিশদভাবে না দেখাইলে তাহার ঠিক চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তবে উভয়ের পদাবলীর রসবিভাগ করিয়া তাহার অনুভূতির কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির প্রেমে বেদনা অপেক্ষা সুখের আতিশয্যই বেশী। তাহাতে দুঃখটুকু যেন সোহাগ করিয়া ঢালিয়া দেওয়া। তাহাতে প্রাণের সে তীব্রতা, আন্তরিকতা নাই। কিন্তু প্রাণের ভিতর যে অতলস্পর্শ সমুদ্র আছে, তাহাতে গাহন করিতে পারেন নাই। সে ত্রিভুবনব্যাপী তন্ময় বিরহ বিদ্যাপতির ভিতর নাই। আছে ছন্দ সুর তাল, অনন্যসাধারণ উপমার ছটা, ভিতরের কথা ভাল করিয়া অনুভূতিতে না আসিলে, উপরের কথাই বেশী হইয়া পড়ে। অলঙ্কারেই সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে। বিদ্যাপতির কাব্যে কতকটা তাহাই ঘটিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালার এই প্রেম-রসের সাধন রাধা-কৃষ্ণ লীলার গানে গৌড়জনের প্রাণমন শীতল করিত। দেশে তখন অবাধ হাওয়া, অজস্র জলধারা, শ্যাম প্রান্তর, অন্তরের ফেনমুখ গৈরিক জলস্রোত! পাখীতে রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিত, মানুষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আদর্শে জীবনের অনুভূতি লাভ করিত। বাঙ্গালা দেশ তখন গানে গানে মুখরিত ছিল। সে কাল এখন নাই। সে পদাবলী সাহিত্যের গানগুলিকে বৈষ্ণব কবিরা, এক এক রসে ভাগ করিয়া সমস্ত গাঁথিয়া দিয়াছেন। সমস্ত পদাবলী গানগুলি তাহাতে যেন ফুললতা-পাতার রঙের বিচিত্র সমাবেশ। প্রত্যেকটি যেন এক একটি খিলান, আর রস যেন সেই খিলানের চাবি, সেই খিলানের পর খিলান গাঁথিয়া এক বিশাল বিরাট মন্দির রচনা করিয়াছেন,—যাহাতে মানবের সকল অবস্থার রসলীলাই তাহার মধ্যে ফুটিয়া আছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যে সকল পদাবলী

ভাব-সম্মিলনে বা রাগাত্মিকায় আছে, তাহারই মধ্য হইতে আমি সেই শ্রেষ্ঠ অনুভূতির ও রূপান্তরের যে যে ভাব, সুর ও ধারা পাইয়াছি, তাহাই বলিব। বিদ্যাপতির একটি সর্ব্বজনবিদিত পদ আছে, তাহাকে লোকে পদাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলে,—

"সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম্ রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহে ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলন এক॥"

আমার মনের ধারণা যে, লোকে এই কবিতাটিকে অতি শ্রেষ্ঠ বলে, তাহার কারণ, তাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী আলোচনায় যে রসজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই বিদ্যাপতির এই পদের উপর আরোপ করিয়া তাহার এত গভীর অর্থ করেন। বিদ্যাপতির শেষ কথা হইল,—

"লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল,"

ইহা সেই চির-নূতন ভাবের রসোল্লাসের কথা। জন্ম হইতেই আমি রূপের মধ্যে নয়ন ডুবাইয়া রাখিয়াছি, তবু সে রূপের সীমা পাইলাম না, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া বঁধুকে বুকে বুকে করিয়া রাখিলাম, তবু এ হৃদয় জুড়াইল না, নয়নের তৃষ্ণা মিটিল না। বিদ্যাপতি এই মিলনের মধ্যে সেই মহামিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহার আভাস জাগিয়াছে। বিশ্বের রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধকে তিনি জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, রূপ রস গন্ধও তাঁহাকে তেমনি আগ্রহে জড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদের ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই; এদের সঙ্গে জন্ম হইতে দেখা-শুনা, তবু তাহাদের পরিচয় ভাল করিয়া হয় নাই, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে বুকে বুকে করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি "প্রেয়"র মধ্যেই ডুবিয়াছিলেন, প্রেয়র মধ্যে শ্রেয়কে দেখিতে পান নাই; আর চণ্ডীদাস গাইলেন,—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক-মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।
* * * *
আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥"

সেই কথা শুধু আঁখির তৃপ্তির কথা নয়, না দেখিলে পরাণ যে বাঁচে না। বিদ্যাপতি সুর বদলাইয়া উপরের পর্দায় উঠেন নাই, চণ্ডীদাস সুরের আসল রূপটি ধরিয়া একেবারে অন্তরের ভিতর চাহিয়া ডুবিয়া গেলেন, গাইলেন—

"বঁধু তুমি সে পরশ মণি হে
তুমি সে পরশ মণি।

(এক) তিলে শত যুগ দরশন মানি
ছেড়ে কি রহিতে পারি হে॥"

এখানে যে সব মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেছে। এখানে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রামের সুর নয়, এ সুর অন্তরের মিলন-মন্দিরের অনাহত-ধ্বনি!

তার পর বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'—

"যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মিলি মিলি পরিজন খায়।
মরনক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গ চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয় পদ নায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হোয়ব কোন উপায়॥"

পাপকর্ম্ম দ্বারা যতেক ধন-সঞ্চয় করিলাম, পরিজন মিলে মিলে খায়, মরণের সময় কেহ জিজ্ঞাসা ত করে না, কর্ম্ম সঙ্গে চলিয়া যায়—

অন্যত্র—

'আধ জনম হম্ নিদে গমাওল
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস-রঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসান।
তোহে জনমি পুণ তোহে সমাওত
সাগর-লহরি সমাণ।"

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে মাধব, আমার পরিণামে আর আশা নাই। কিন্তু প্রেমে যে ডুবিয়া, রসিয়া মরিয়া, বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তার এ মরণ-ভয় কেন? প্রেম যে অজের অমর; সে ত মরণের সময় ভয় পাইবে না, তার ত পরিণাম-পরিণতি নাই। সে যে নিত্য সত্য জীবন্মুক্ত, তাহার এ ত্রাস কেন? তিনি বলিতেছেন,—

"আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অবতারণ ভার তাহারা—"

তোমায় আদি অনাদির নাথ লোকে বলে, এখন তরাইবার ভার তোমার; হে মাধব, আমায় তরাও। কিন্তু চণ্ডীদাস গাহিলেন,—

"মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা
নিতুই নূতন পীরিত রতন
যতনে রাখিল তারা"

যারা প্রেমে এমন করিয়া মরিয়াছে, তাহাদের সবই সে নিতুই নব। তাহাদের ত পরিণাম-ভয় নাই।

"সুজন পীরিতি পরাণ রেখ
পরিণামে কভু না হবে টোট।
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥"

এ যে সুজনের পীরিতি, এ যে পরাণ মন ভরিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে ত কাম-গন্ধ নাই। এ প্রেমে কভু পরিণামে টুটিবার ভয় নাই। সে যে নূতনকে আরো সৌরভে স্নিগ্ধ করিয়া আনিয়া দেয়। চন্দন যেমন ঘষিতে ঘষিতে দ্বিগুণ সৌরভে আমোদিত করে, এ প্রেম তেমনি।

"পুত্র পরিজন, সংসার আপন
সকল তেজিয়া লেখ
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ"

চণ্ডীদাসের পাপের ভার বোধ হয় নাই। যে প্রেমের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া হেম হইয়াছে, তার আবার পাপ কি; তাহার সেই প্রেমের মধ্যে "তাহারে পাইবে," এ বিশ্ব-সংসার তাঁহারি, তাঁহাকে যখন পাইলাম, তখন 'পুত্র পরিজন সংসার আপন' সকলি ত মিলিল, তার পর চণ্ডীদাসের শেষ অনুভূতি।

এখানে চণ্ডীদাস জন্ম-মৃত্যুর অতীত, সুখ-দুঃখের অতীত, ভয়-ভাবনার অতীত ইন্দ্রিয়গ্রাম সব ডুবাইয়া এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের রসসিন্ধুর মাঝে ঢেউয়ের মত দুলিতেছেন।

"মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হ'ল,
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল,
ভগ্নীর জনম না ছিল যখন
ভাগিনা হ'ল বুড়া।
অনিত্য কুলের এ কি বিপরীতে
ন পিতা ন পিতা খুড়া,
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ,
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ,
মাটীর জনম ছিল না যখন
তখন করেছি চাষ,
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস
(এখন) একুল ওকুল দুকুল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ,
কহে চণ্ডীদাস কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝয়ে কেহ॥"

ইহা চণ্ডীদাসের শেষ কথা, অনুভূতির চরমোল্লাস। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের প্রাণের সম্পর্ক, সকলই ছিল—আছে। অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আছে, খেলা চলিয়াছে, এখন এ কুল ও কুল দুকুলেরও ভাবনা নাই, লীলা-সাগরে দেহ পড়িয়া ভাসিতেছে। চিরজন্ম চিরকাল কল্পকাল ধরিয়া তুমি আর আমি এই খেলার রসে মজিয়া আছি। এ কেহ বুঝে না, যে রসিক হইয়াছে, যে ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে, সেই সে জানে ঘরের কথা।

চণ্ডীদাস জীবনে সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সকল রসের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার অনুভূতিতে সিদ্ধ হইয়া তবে এমন কথা বলিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির আর বিশদ সমালোচনা করিবার স্থান এ নয়, সময়ও অল্প. এই কয়টা কথা যাহা বলিলাম, ইহাতেই আমি সে কথা বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি। বিদ্যাপতির দোষের কথা যাহা বলিলাম, সে শুধু চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া; কিন্তু বিদ্যাপতি যে খুব বড় কবি, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, চণ্ডীদাসের জীবনে যে অনুভূতি পাওয়া যায়, বিদ্যাপতিতে তাহা পাওয়া যায় না, সে অনুভূতি আর কোন কবির হয় নাই। তবে এইটুকুমাত্র বুঝা যায় যে, সেই আদর্শেই বাঙ্গালা এখন পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছে। আশা করা যায়, হয় ত আবার সেই বাঁশীর ধ্বনি কর্ণে আসিবে, প্রাণসুন্দরের সে বিমল রূপমাধুরী আবার দেশে ফুটিয়া উঠিবে।

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কায নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রতন তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা।
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা,
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরম-ব্যথা॥"

যে দেশের কথা চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন, সেই দেশের কাহিনী গানে না ফুটাইলে গানের সার্থকতা কই? কল্পনা ও জীবনের আদর্শ তাহা না হইলে বা মিলে কই? তিনি বলিতেছেন, "বাহির দুয়ারে কপাট লাগিয়াছে, এখন ভিতর দুয়ার খোলা। তোরা নিসাড় হইয়া চুপে চুপে আয়, দেখ্‌বি আলোর মাঝে সেই কালো।" এ সবই সেই দেশের সেই ঘরের কথা।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব। চণ্ডীদাসের ভালবাসায় যাহা ভাবের ও রসের অনুভূতি আশ্রয় করিয়াছিল, মহাপ্রভুতে তাহা জীবন্ত জাগ্রত জলন্ত হইয়া উঠিল। দিনমণি-সূর্য্যের সঙ্গে যেমন উষার অরুণালোকের সম্পর্ক, চৈতন্যের সঙ্গে চণ্ডীদাসের ঠিক সেই সম্পর্ক; চণ্ডীদাস অরুণের রথ বাঙ্গালায় জানাইয়া গেলেন, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর পূর্ণ রূপ আসিতেছে—উঠ উঠ জাগ—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দিব্যোন্মাদের পরে বলিলেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ধন চাহি না, জন চাহি না, মনোহর কবিতা চাহি না, এ সকলের কিছুই আমি কামনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মে, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

চণ্ডীদাসের গানে যা অভাব ছিল, মহাপ্রভুর জীবনে তাহার পূরণ হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, "অহৈতুকী ভক্তি দাও, জগদীশ, আর কিছুরই কামনা করি না।"

হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমারই, আর যে কিছুই জানি না; ইচ্ছা হয়, দয়া করিয়া আমায় আলিঙ্গন দাও। অথবা পায়ের তলে দলিত করিয়া সুখী হও, কিংবা অদর্শনে আমার মর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া ফেল। হে লম্পট, তুমি আমার যে বিধান করিলে সুখী হও, তাই কর, তাই আমার ভাল, কারণ, আমি জানি, তুমি যে আমার প্রাণনাথ—অপর কেউ ত নয়।

যখন রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর তত্ত্ব-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল—তাহার কথা বলিব। যদিও তাহাতে গীতি-কবিতার কিছু নাই, তথাপি চণ্ডীদাসের উপলব্ধি জ্ঞানের ও রসের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া মহাপ্রভুতে তাহার শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার কথা বলা চাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রায় কহিতে লাগিলেন,—

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি-সাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর!
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥

প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্য-সার॥"

ইহার পর যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রামানন্দ কহিলেন,—

'রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার'।

তখন রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গাহিলেন, বলিলেন, "প্রভো, শুধু একটি কথা মনে পড়িতেছে, সেই কথাটি বলিলে আমার বলার শেষ হয়, কিন্তু তাহাতে আপনার চিত্ত-বিনোদন হইবে কি না, তাহাতে যে সন্দেহ হইতেছে।" মহাপ্রভু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "রামরায়, বল বল, সেই রাধা-কৃষ্ণের বিলাসবিবর্ত্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" তখন রায় গাহিলেন। সর্প যেমন ফণা তুলিয়া বাঁশীর স্বর শুনে, মহাপ্রভু তেমনি ভাবে দুলিয়া দুলিয়া শুনিতে লাগিলেন।

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥'
না সো রমণ, না হম্ রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি॥'

এখানে শ্রীমতি বলিতেছেন :—

'না সো রমণ না হম্ রমণী
দুঁহু মনোভাব পেশল জানি।'

মন এখানে প্রেমরসে ভরপূর। ভেদ-বুদ্ধির রসের অতলে ডুবিয়া গেছে! ইহাই কলাকলার শ্রেষ্ঠ রূপান্তর।

যুগল প্রেমের এই যে বিলাস বিবর্ত্ত, চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে তাহার অপরূপ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। সে শুধু ভাব-রাজ্যের অনুভূতিতে নয়, দেহ মন কর্ম্মে, ধ্যান-ধারণায়, তাহার সমাধিতে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই মনে হয়, চণ্ডীদাস যেন মহাপ্রভুর সৃষ্টিকে আনিতেছিলেন। শতেক যুগের যে ফুল ফুটিবে, তাহাই বাঙ্গালার মনে লুকাইয়াছিল, যে

'হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
এখন দেখিনু সে',

এমন করিয়া ভাবরাজ্যের কোনার সৃষ্টিতে সহজ সরলরূপে সত্যরূপে রূপান্তর হইয়া উঠিল। কবির ভাব জাগ্রত মূর্ত্তি ধরিল, কবি যে দ্রষ্টা, কবি যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলে। চণ্ডীদাস সেই রূপান্তরের স্রষ্টা। বাঙ্গালার গীতি-কবিতার যদি আদর্শ থাকে, প্রাণ থাকে, তবে ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। চণ্ডীদাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবন ইহাই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গালা গানে ও প্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডীদাসের গৌড়ীয় যুগে যে সকল রসের লীলায় দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর তাহার ব্যাপ্তি ও পরিধি আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আরও সার্ব্বজনীন হইয়া সেই ভাব গানে, জীবন ও কর্ম্মে মধুর হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবতে ভগবানকে শুধু যুগলরস-মূর্ত্তিতে দেখে নাই, তাহার ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রসাবতারণা আছে। লীলা এই বিশ্বের চয়মের মধ্য দিয়া শুধু মধুরেই মিলায় নাই; তাহাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের কথাও আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগে তাহার কিছু কিছু সাধনাও হইয়াছিল। এই ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে রামানুজ ও মাধ্বের ভাব শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া নিজেতে তাহার সমন্বয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মের পর, আমরা যে সমস্ত পদাবলী সাহিত্যের গান পাই, তাহাতে সেই পূর্ব্বকার যুগল সম্বন্ধের কথার ভিতর দিয়াই পৌছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রূপান্তরই তাঁদের আদর্শ ছিল

বটে, কিন্তু মহাপ্রভু যে পাপীর উদ্ধারের নূতন কথাটি আনিলেন, কাব্যে তাহার চরম পরিণতি ও রূপান্তর হয় নাই। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা সেই পথের পথিক হইয়াই চলিয়াছেন, চণ্ডীদাস হইতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এমন কি, সে আদর্শেও পৌঁছিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে, সকলেই সেই আদর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই পদাবলীর ভিতর সেই একই সুর, একই ছন্দ, একই তাল।

কবি জ্ঞানদাসের একটি পদকীর্ত্তন তুলিয়া দেখাইব যে, সেই একই ধারা অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে,—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে
কি আর বলিব সই কি আর বলিব
যে পণ করেছি চিতে সেই সে করিব
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধারে
লহু লহু কহে কথা পীরিতি মিশালে।
ঘরের সকল লোকে করে কানাকানি
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাব আগুনি।'

সেই একই কথা—

রূপ দেখিয়া হৃদয়ের রূপতৃষা ত মিটে না, সে যে কি সুখ, তা কেমন করিয়া বলিয়া উঠিব, তাহাকে দেখিয়া তাহার স্পর্শের জন্য গা যেন কেমন করিয়া উঠিতেছে। এ ত সেই পূর্ব্বরাগ। জ্ঞানদাসের পদের একটু বিশেষত্ব আছে, সে বৈশিষ্ট্য তাঁহার মুরলীশিক্ষা—

'মুরলী করাও উপদেশ
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম
* * *
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহ এ হাসি হাসি
রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী'

জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাধা নামে সাধা বাঁশী রাধার মুখেও 'রাধা' বলিবে, তার উপায় কি? বাঁশীরও সেই ভাব রূপান্তর হইয়া আছে, সেও ত রাধা ছাড়া আর কিছু বোল বলিতে পারে না, তারও জীবন যে রাধা। কিন্তু এই সকল কবিতায়ই চণ্ডীদাসের ছাপ। এ কবিতাগুলির মধ্যে চণ্ডীদাসের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের পর আমরা যে কবির পদাবলী পাই, তাহার ভিতরে সেই আগেকার রাগিণীই ফুকারিয়া উঠিতেছে। তবে বাঙ্গালা দেশের একেবারে ঘরের কোণের কথার ভিতর সেই ভাব সত্যরূপে ফুটিয়াছে, এখানেও কলকলার সেই রূপান্তর। কবি লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তাঁহারই একটি পদে আমরা দেখিতে পাই, তাহা এই—

"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে ব'স
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি
(আমার) অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও হার ক'রে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
(আমায়)
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

(বঁধু) তোমায় যখন পড়ে মনে,
(আমি) চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইয়ে কেশ নাহি বাঁধি!
রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা ক'রে কাঁদি॥
কাজল করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচনদাসের এই সাধ॥"

ইহার ভিতর সেই প্রেম, প্রাণের ভিতর কুরিয়া কুরিয়া বাহির হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্মের পর বাঙ্গালায় আর এত বড় কবি জন্মায় নাই। লোচনদাস গৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হইয়া গাইয়াছিলেন,—

"আর শুনেছ আলো সই গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গৌরী বসিল যতনে।
হলুদ বরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপ মন প্রাণ টানে।
ছলছলানি মনে গো সই ছটকটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব সমবরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার॥"

বাঙ্গালার ঘরকন্নার কথার ভিতর দিয়া এমন করিয়া আর কখন কাব্য-রস ফুটে নাই, এ অপূর্ব্ব, অনুপম। গৌরাঙ্গ জীবন্ত প্রেমের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া দেশকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিয়া গিয়াছিলেন। ভাগবতে যে মধুর ও মঙ্গলের আভাস আছে, চৈতন্যে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল। এক দিকে নিত্যানন্দ আর এক দিকে যবন হরিদাসের মিলন, আর অন্যদিকে জগাই মাধাই উদ্ধার। এই সকল লইয়া অনেক পদকীর্ত্তন আছে, এখনও বাঙ্গালায় তাহা ভিখারী বৈষ্ণবে গাহিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাতে কমকলার সে রূপান্তর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই— শুধু আভাসেই থামিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিরা যেমন রসের অনুভূতির সঙ্গে তাহাকে সেই রূপান্তরে লইয়া গিয়াছেন, ইঁহাদের ভিতর অন্যান্য কবিরা আর তেমনটা পারেন নাই। কেহ বা বলিতেছেন,—

"হরি হরি আর কি এমন দশা হব
ত্যজ্য করি মায়ামোহ ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ
কবে হাম প্রকৃতি হইব॥"

ইহা কবি নরোত্তম দাসের পদে আছে। পুরুষদেহ ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি হইবার সাধ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে. কিন্তু চণ্ডীদাস প্রভৃতির ভিতর বাহির এক হইয়া গেছে। চণ্ডীদাস যা গাইয়াছেন, কবি লোচনদাসও তাহাই গাইয়াছেন,—

"এ দেশেতে কবাট দিলে. সে দেশ তো পাই
'বাহির গাঁয়ে কাম নাই চল ভিতর গাঁয়ে যাই'
সাপের মণি বাহির করিলে হারাই যদি মণি
মণি হারাইলে তবে না বাঁচয়ে ফণি॥
যতন করে রতন রাখা বাহির করা নয়
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকী দিতে হয়॥
লোচন বলে ভাবিস কেনে, চোক আপনার ঘর
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর॥"

ইহা অবস্থার কথা, ভাষার জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝান যায় না। চৈতন্যের যুগে পরবর্ত্তী গীতি-কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাসই চণ্ডীদাসের ভাবের ও রসের অনুভূতির পর্দ্দায় গাইয়াছিলেন, তাহার পর আর সমগ্র গৌর-পদতরঙ্গিণীর ভিতরে এমন কেহ নাই, যাঁহার কবিতায় সে অনুভূতির লেশমাত্র পাওয়া যায়। সুর নামিয়া যাইবার কারণ কি? কারণ যে ঠিক কি,

তাহা বুঝা কঠিন। তবে একটা কারণ বোধ হয় এই, যে ফুল শতযুগ ধরিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল, যাহার জন্য সেই সন্ধ্যা-ভাষায় আধো আলো আধো আঁধারের ভিতর হইতে ভাব ফোট-ফোট হইয়াও ফুটে নাই, তাহার পর দিন গেছে। মানব-মনের ভিতর দিয়া অজ্ঞানে সে ভাবের ধীরে ধীরে স্ফুরণ হইয়াছে, ধীরে ধীরে কত যুগ অন্ধকার ও আলোকের, আশা ও নিরাশার ভিতরে চণ্ডীদাসে দেখা দিয়াছে, বিদ্যাপতির রূপ রসাভাসে ফুটিয়াছে। সেই ফুল যখন চৈতন্যে আসিয়া সাক্ষাৎ ফুটিয়া দশদিশি গন্ধে ভরিয়া গেল, তখনই শত শত যুগের কল্পনা সত্যরূপে প্রতিভাত হইল। তাহার পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতর হইয়া প্রকাশ হইল। ইহার পর ভাগবত ধর্ম্মের সহিত রামানুজের যে লীলা-ভক্তির ভাব দেশে আসিয়াছিল, সে ভাব এখনও পূর্ণভাবে মুঞ্জরিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের প্রেম, বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, লোচনের গৃহধর্ম্মের সরল সহজ প্রাণের কথার সঙ্গে যে দিন সেই সার্ব্বভৌমিক কলকলার সূচনা হইবে, সে দিন জগৎ দেখিবে, এই বাঙ্গালার প্রাণ কোথায়, তাহার মর্ম্ম কোথায়! আবার বাঙ্গালার মাটীতে তেমনি আবেগে, তেমনি সোহাগে, তেমনি মধুর করুণ উজ্জ্বল লীলায় ফুটিয়া উঠিবে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর রূপ হইতে রূপান্তরে ফুটিয়া জাগিয়া উঠিবে।

এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া জগতের অজ্ঞ, বৃদ্ধ, শ্রান্ত, তৃষিত, তাপিতের জন্য যে করুণা, মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্ত্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল কাটিয়া দর-দর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, তখন গাইতেছেন,—

"মেরেছ কলসীর কাণা
তা ব'লে কি প্রেম দেব না॥"

এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন প্রাণ এক অদ্ভুত নব-রসে উছলিয়া উঠে, আঁখি ছল ছল করে, মনে হয়, আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাঙ্গালায় জন্মিয়াছি!

বৈষ্ণব কবিদের এই অফুরন্ত গানের সুধার ধারায় সারা বাঙ্গালা দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সমাজে দেশে তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু কালে সকলি ত বদল হয়। সেই সব-জুড়ান প্রাণ-মাতান সুধা-স্রোতে ধীরে ধীরে চড়া পড়িল, সে ধারা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। সাহিত্যের অন্যান্য ভাগ শাখা-পল্লবে ভরিয়া গেল, কিন্তু যেমনটি ছিল, তেমনটি আর হইল না। যখন মুসলমান বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল, তখন বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি একেবারে হারায় নাই, তখন সমাজে মাঝে মাঝে বিপ্লব বাধিয়াছে; সুর উঠিয়া, সুর নামিয়াছে। তাহার পর সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। বাঙ্গালা আপনাকে ভুলিয়া গেল। মুসলমান-ধর্ম্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালা আপনার চারিধারে আচার-ব্যবহারের একটা গণ্ডী টানিয়া দিল—সেই তাহারি মধ্যে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিল। কিন্তু সাহিত্যে, ভাবে ও ভাষায় মুসলমানের হাত একেবারে এড়াইতে পারিল না। দেশ তখন নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। এক দিকে শাক্তের পঞ্চ-মকার, আর অন্যদিকে বৈষ্ণবের শুক্‌না মালার ঠক্‌ঠকি, আর চারিদিকে যত শৈবের দল ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতেছিল। এক দিকে দেশের পতি মুসলমান, অন্যদিকে সমাজের পতি অসংখ্য ভূত-প্রেত। এত দিন ধরিয়া যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালা নিজেকে আদর্শের সমান করিয়া আনিয়াছিল, সে শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়াই বাঙ্গালা চলিয়া আসিল। তাহার পর কত নিশি পোহাইয়াছে, কত পাখী গাহিয়াছে, অরুণ কিরণে শ্যামল অঞ্চল

উড়িয়াছে, কিন্তু যে মিলনের কথা বলিয়াছি, তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল। মুসলমান বাঙ্গালায় আসিবার পর বাঙ্গালা শ্রীহীন হইয়াছিল, একে দেশ দুর্ব্বল, তাহার উপর মানসিংহ বাঙ্গালার রাজা। প্রাণের কবিতা তখন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ আসিল। রাজার পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্য যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের উপর বৈষ্ণবের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার কবিতা মুসলমানী ফার্সীর আরব ছবিও ছায়ায় পরিপূর্ণ। তাঁহার চরিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট নিপুণতা থাকিলেও এ কথা বলিতেই হইবে যে, চণ্ডীদাস-যুগের বৃন্দা ও বড়ায়ের জায়গায় তিনি আনিলেন, মুসলমানী কেতাবের কুটনী দাসীর কেচ্ছা। সে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা নাই, সে সখীর মত সখী নাই; সে সখীর জন্য অন্ধকারে প্রাণের আবেগে তাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার কেহই রহিল না। ভিতরে বাহিরে প্রাণের রস মরিয়া সে ধারা শুকাইয়া গেল।

তাহার পর অকস্মাৎ কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল। দেশ আবার গানের আস্বাদ পাইল। বৈষ্ণব কবিদের ঘরসংসার ঘেরিয়া যে কার্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরে তিনি নূতন রসের অনুভূতি দেখাইলেন, তিনি গাইলেন,—

"ওরে সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি

এ-ও সেই বৈষ্ণবের অহৈতুকী ভক্তির কামনা। বাঙ্গালা আবার সেই সুর খুঁজিয়া পাইল, সাধকের সাধনা, ভাবের সাধনা ফুটিয়া উঠিল, রামপ্রসাদ গাইলেন,—

"এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।"

এ-ও সেই দেশের কথা, যে দেশের গান চণ্ডীদাস গাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের পর বাঙ্গালা আবার কিছু দিন গানে ভরিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানে বাঙ্গালার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই যুগকে বাঙ্গালার 'গানের যুগ' বলা যাইতে পারে। বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর, বিচিত্র পদাবলী, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। যে বাঁশী এক দিন বাঙ্গালাকে জাগাইয়াছিল, যাহার সুরে বাঙ্গালার সুখ-দুঃখ জড়াইয়া জড়াইয়া দেশের জীবন মরণের প্রাণ হইয়াছিল, সেই সুরে আবার বাঁশী ডাকিল। তাহাতে বিচিত্র সুরের মেলা। মুসলমানী কেচ্ছার আবিল স্রোতে বাঙ্গালা সাহিত্য ঘোলা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার জাত গিয়াছিল, তাহার ধর্ম্ম গিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানে আবার তাহা ফিরিয়া আসিল। রামপ্রসাদের মাতৃভাবে, বাঙ্গালা মায়ের রূপে দেখা দিলেন। কখন মা আমার বাপের ঘর হইতে শ্বশুর-ঘরে যাইতেছেন, কখন কৈশোর ও যৌবনের মধুর অভিনয় করিতেছেন, কখন কোলের ছেলেকে হারাইয়া মা পাগলিনীর মত কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন,—

"আমার উমা এলো ব'লে রাণী এলোকেশে ধায়"

বাঙ্গালার সেই আলিপনা দেওয়া ঘর, সেই তুলসীর বন। সেই গৃহস্থের আঙ্গিনা, সেই মৃদুল মধুর বাতাস বহিয়া যায়।

তার পর নিধুরাম বসু, হারু ঠাকুর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি কবিওয়ালারা আসিলেন। গানে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। সকলেই সেই কল্পকুলার রূপান্তরে পৌঁছিতে যথেষ্ট সাধন করিয়াছেন কিন্তু সে আদর্শে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন আজু গোঁসাই, তিনি কতকটা রামপ্রসাদের ছাঁদ ধরণ লইয়াছিলেন,

কিন্তু তাঁহার মত অবস্থায়, নিজেকে সে রূপান্তরে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। তাহার পর নিধু বাবুর গান। তাঁহার এক নূতন কথা, নূতন ভাব, ভাষার দিক্ দিয়া দেশের জীবনকে আত্মস্থ করিবার প্রথম চেষ্টা তাঁহাতেই প্রকাশ দেখিতে পাই। তিনি গাইলেন ;—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা
কত নদী সরোবর কি বা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥"

তখন হইতে বাঙ্গালা জাগিতে শিখিয়াছে। সে গানে যুগের অবতার, সাধক রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে কিছু দিন যে থামিয়াছিল, তাহার পর অবিরাম জলোচ্ছ্বাসের মত গান আসিতে লাগিল। আবার সেইরূপ প্রেম, সেই ভালবাসার গান ফুটিয়া উঠিল। নিধু গাইলেন,—

"তারে দেখ্‌তে এত সাধ কেন।
তিলেক যদি না হেরি সজল নয়ন ॥
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন ॥
তাহার রূপের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন জানি না কি গুণ ॥"

আবার—

"তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কান্দে কলঙ্কচ্ছলে ॥
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গা-জলে ॥

এই মিঠে ভাষা বাঙ্গালার প্রাণের রাগিণী। শুনা যায়, নিধু শোরির পাঞ্জাবী মুসলমানী টপ্পার অনুকরণ, সেই সকল সুরের ধরণে, এই সব প্রেম ভালবাসার গান বাঁধিয়াছিলেন, এই গানগুলিকেও লোকে নিধুর টপ্পাই বলে। কিন্তু সুরের মুসলমানী ঢঙকে এমন আপনার করিয়া লইতে আর কেহই পারে নাই। আবার দেখুন,—

"না হ'তে পতন তনু দহন হইল আগে
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজায়ে তাহে দুঃখ-তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে ॥"

ইহাতে প্রাণের গভীরতা আছে, সুরের অতি মিঠা রস আছে, বাঙ্গালার ইহা নিজস্ব সম্পত্তি। বিদ্যাসুন্দরি ফার্সী বয়েতের পর এমন মিঠা গান আর হয় নাই। তাহার পর রাম নৃসিংহের গান—,

"সখি এ সকল প্রেম, প্রেম নয়
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয় ॥
সুহৃদ ভঞ্জন, লোক-গঞ্জন,
কলঙ্ক-ভাজন হইতে হয় ॥
এমন পীরিতি করি যাতে তরি দুদিক্
ঐহিক আর পারত্রিক।

"মন মধুব্রত হয়ে যেন রত, সেই নামামৃত-সুধা খায়।"

ইহাতেও সেই প্রেমের আভাস, তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তার পর হরু ঠাকুরের গান—

"নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে
(ওগো ললিতে)
না দেখি এমন রূপ বারি-মাঝেতে ॥

* * * *

আজু সখি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়
নীর-মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী ॥

বিশেষ বুঝিতে নারি নারী বই ত নই
(ওগো প্রাণ-সই)
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই॥
*　*　*　*
কুল শীল ভয় লজ্জা তার যায়
না রাখে জীবন আশ
তার জলে বা স্থলে বা
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার॥"

হারু ঠাকুর গাইলেন, তোমরা কেউ জলে ঢেউ দিও না, আমার প্রাণকিশোর অখণ্ড চাঁদ যে তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে। নির্ম্মল জলে, নির্ম্মল হৃদয়ে অনিমিষে তাকাইয়া থাকি। * * যার এমন প্রেম, কুলের ভয় নাই, লাজের ভয় নাই, তার মরিবার ভয়ও নাই।

তাহার পর রাম বসুর গান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, "যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত। রাম বসুর গানে বাঙ্গালার ঘরের প্রাণের কথা যেমন ফুটিয়াছে, এমন আজ পর্য্যন্ত আর হয় নাই।

"দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না
তোমায় ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই
কিছু কাল থাক, থাক বোলে ধরে রাখ্‌বো না।
শুধু দেখা দি'লে তোমার মান যাবে না
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমার গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবিনে পর
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না॥"

এ সকল গানের তুলনা হয় না। তাহার পর—

"মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না
সরমে মরম কথা কহা গেল না—
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে—
নির্লজ্জা রমণী ব'লে হাসিত লোকে—
সখি ধিক্ থাক্ আমারে ধিক্ সে বিধাতারে
নারী-জনম যেন আর করে না॥"

রাম বসুর গানের অনুকরণে আজ কত গানই না বাঁধা হইল, কিন্তু তেমনটি আর হয় না। তেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে ডুব দিয়া সরমে মরম কথা বলিবার ধরণ আর নাই। আমার মনে হয়, রাম বসুর পর বাঙ্গালায় আর এমন গান-বাঁধিয়ে জন্মায় নাই—

চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত সেই একই ধারা-স্রোতের মত বহিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণকমল গাইলেন,—

সখীরা বলিল,—

"রাই ধীরে ধীরে চল গজগামিনি
অমন ক'রে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি,
*　*　*
না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারাবি গো
কত কণ্টক আছে গো বনে—
—(দেখে চল গো কমলিনি)"

দিব্যোন্মাদে কৃষ্ণকমলের রাধিকা বলিলেন,—
আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি?

"যখন নব অনুরাগে　হৃদয় লাগিল দাগে
বিচারিলাম আগে, পাছে কাজে
(যা যা করতে হবে গো আমরা সখি বঁধুর লাগি)
'জানি'
প্রেম ক'রে রাখালের সনে,　ফির্‌তে হবে বনে বনে
ভুজগ কণ্টক পঙ্ক মাঝে (সখি আমার
—যেতে যে হবে গো, রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী)

অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতাম, (সখি আমার চল্‌তে
—যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইল আঁধার রাতি, পথ-মাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম (সদায় আমায়
—ফিরতে যে হবে গো, কত কণ্টক-কানন-মাঝে)
এনে বিষ-বৈদ্যগণে বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে,
তন্ত্রমন্ত্র শিখেছিলাম কত;
(যতন করে গো—ভুজঙ্গ-দমন লাগি)
বধুর লাগি কর্‌লাম যত, এক মুখে কহিব কত
হত বিধি সব কৈল হত! হায়! সে সব
—বৃথা যে হলো গো—সখি আমার করম-দোষে)"

এমন সরল গতিতে সরল কথায় জীবনের খেলায় কেমন অনুভূতির প্রকাশ পাইয়াছে। এমন ভাষা এমন করিয়া প্রাণ মন ভরিয়া তোলা গান আর এখন শুনিতে পাই না।

কৃষ্ণকমল বৈষ্ণব গীতি পুনরুত্থান-কালের শ্রেষ্ঠ কবি।

এখানে চণ্ডীদাসের রাধিকা, বিদ্যাপতির রাধিকা, আর কৃষ্ণকমলের রাধিকা এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, যদি এই তিনের সাধ্যভাব এক-সঙ্গে সমন্বয় করিতে কেহ পারেন, সে মূর্ত্তি জগতে আজিও সৃষ্টি হয় নাই, কল্প কলার সে রূপান্তরের জন্য বাঙ্গালা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, চণ্ডীদাসের প্রাণের গভীরতা, আর কৃষ্ণ-কমলের "স্বাদিতে নিজ মাধুরীতে" যে বিরহ, এই তিনের অপূর্ব্ব রস-রচনা, কোন দেশের সাহিত্যেই আজও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালার মাটীতেই সেই তিন ফুটিয়াছে, আবার বাঙ্গালার মাটীতে কি একে—সেই তিন ফুটবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যে রাধা-ভাব, সেই জীবন্ত রাধা ভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনীর রাধিকায় ফুটিয়াছে। ভাগবতের উক্তি চৈতন্যের প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিয়া কৃষ্ণকমল রাধিকা গড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অমৃত-রস ছাঁকিয়া কৃষ্ণকমল রাই উন্মাদিনীকে বসাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাধায় যে আত্মবিস্মৃতি, সেই আত্মবিস্মৃতিতে রাধার বিরহ জাগিয়াছে। শ্রীচৈতন্যেও তাই! রাধিকা হইয়া বাহ্যপ্রকৃতির রূপে কৃষ্ণ দেখিতেছেন। পূর্ব্বে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যেন রাধা আত্মবিস্মৃত হইয়া বঁধু পাইবার জন্য তাহার সে তপস্যার কথা কহিতেছেন। কৃষ্ণকমলের রাধিকা এক অভিনব সৃষ্টি।

বাঙ্গালার মধ্যযুগে 'গানের যুগে' এই বিচিত্র ভাব-সম্পদের কথা আমি এইখানেই শেষ করিলাম। তার পর অন্ধঘন মসীময় আকাশ,—আর নাই। বাঙ্গালার প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুকাইয়া গেল, বাঙ্গালার দীপ নিবিয়া আসিল। বাঙ্গালা চিরদিন পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে বিজলী-ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাঁধাঁ লাগিল, বাঙ্গালা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতরে যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহ্য করা যায় না, বাঙ্গালার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ ইউরোপ হইতে যে আলোক সহসা বর্ষিত হইল, তাহা সহ্য হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তার পর ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, সুরেন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অনেকেই গীতি-কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই যুগের এই কবিতার কথা অন্য সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন শুধু একটি কথা বলিয়া রাখিব। আমি যে "রূপান্তরের" কথা বলিয়াছি, আজও পর্য্যন্ত আমাদের এই যুগের

গীতিকাব্য সেই রূপান্তরের অবস্থায় পৌছিতে পারে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় কোনখানেই তাহা মিলে না। মাইকেলের অশেষ ক্ষমতা সত্বেও তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' সেই পদ্দার কাছেও পৌছিতে পারে নাই, ব্রজ কবিতায় শুধু নিতান্ত বাহিরের জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সুরেন্দ্র মজুমদারের "মহিলা," বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী" ও সারদামঙ্গল" আমাদের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই—কিন্তু ইঁহাদের কবিতাতেও সেই সুর সেই ভাবে জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য প্রতীচ্য এই উভয়কে মিলাইয়া মিশাইয়া কাব্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না, সে বিচার করিবার সময় আমার বোধ হয় এখনও আসে নাই।

একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাসকে কবিওয়ালাদের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর শুধু এক জন নীলকণ্ঠ—যাঁর

"সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে।"

সেই পুরাণ সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজও বাঙ্গালায় ভিখারী বৈষ্ণব তাহা গাহিয়া বেড়ায়। কিন্তু কল্পকলার সেই রূপান্তরে কেহ পৌছিতে পারেন নাই। সকলেরই লক্ষ্য তাই, সাধ্য তাই, সাধনা তাই। সে সাধক এখনও আসেন নাই।

তবে বাঙ্গালা জাগিতেছে। দিনের নাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাঙ্গালা কবিতা শুনিব। সে সাধক আসিবেই আসিবে। আমি যে তাহার আগমনীর সুর শুনিতে পাইতেছি।

[বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বাঁকীপুর অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।]

বাঙ্গালার গীতিকবি

-o-

দ্বিতীয় কল্প

আমার বাঙ্গালার এক চিরন্তন আদর্শ আছে। বাঙ্গালার যেমন শ্যামলশ্রী রূপ, যেমন সবুজ তৃণের কোমলতা, নীল আকাশ আর গঙ্গার উচ্ছল বারি, আমার বাঙ্গালার আদর্শও তেমনি সেই শ্যামলশ্রী, সেই—

"নব রে নব, নিতুই নব,
যখন হেরি তখনি নব"

হেরিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়। বাঙ্গালার গানের সঙ্গে বাঙ্গালার প্রাণের যে অবিচ্ছিন্ন অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্পর্ক আছে, সেই মিনিসূতার মালার গাঁথনির কথা আপনাদের শুনাইব বলিয়া, আজ আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছি।

বাঙ্গালার এক অখণ্ড সত্য আছে, সেই সত্য, যুগে যুগে যখনি বাহার মরমের নিভৃত আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে তখনি এই মাটীর প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিবিড় পরিচয় পাইয়া আত্মার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাতেই নিশ্চিন্ত হয় নাই, প্রাণে প্রাণে সেই মিলনবাণী 'লোকহিতায়' 'জগতে ধর্ম্মস্থাপনায়' দেশে দেশে বিলাইয়া দিয়াছে। সেই পরিচয়েই ধর্ম্মের স্থাপন, সেই পরিচয় হইতেই মানুষের সমাজ, শ্রদ্ধা, সংস্কার। সেই মিলনেই এই অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে রসমূর্ত্তি বুকের ভিতর আঁকিয়া লইয়া জাতি আপনাকে বিকাশ করিতে থাকে। বাঙ্গালার এক দিন ছিল, যে দিন বাঙ্গালী আপনাকে সেই পরিচয়ের জোরে জগতের কাছে বাঙ্গালী বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহার বুকের ভিতর হইতে সেই সচ্চিদানন্দ চিন্ময় মূর্ত্তি কোন অবসাদের তমোগূঢ় অন্ধকারে মুছিয়া গিয়াছে। সেই যে বাঙ্গালা তাহার নিজের মাটীর পরিচয় ভুলিয়া গেল, সেই হইতেই এই দিনগুলা আঁধারেই কাটিতেছে; কিন্তু দীপের ধর্ম্মই জলিয়া উঠা। আত্মার অন্তরের পরতে পরতে যে দীপ জলিয়া আলোক বিকিরণ করে, সে আলোকের ধর্ম্মই অন্ধকারকে জ্বালাইয়া দীপ্ত করা। হাজার হাজার বছরের অন্ধকার এই দীপের আলোয় মরিয়া যায়। সকল মানবই সেই পরিচয় লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সকলকেই এক দিন সেই সাযুজ্য-পরিচয়ের জন্য আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি হইতেই হইবে। সেই মধুর পরিচয়টি করাইবার জন্য মাটী অহরহ সজাগ রহিয়াছে। তাহার আর সে চেষ্টার বিরাম নাই, বিরতি নাই, বিশ্রাম নাই, সঙ্কোচ নাই। স্নেহময়ী জননীর মত সে তাহার জন্যই ব্যস্ত। তাই মাটী আমাদের শুধু শরীর দান করে না, আমাদের মনপ্রাণের নূতন জন্ম দিয়া নবজীবন দান করে। শুধু মাটী নহে। মাটীই আমার সঙ্গে অনন্ত রসমূর্ত্তিরূপে আমার প্রাণের সঙ্গে রসলীলাভঙ্গে এক দিন সেই প্রাণমণি দীপখানি জ্বালাইয়া দেয়। সেই দীপ এক দিন বাঙ্গালার কবিচিন্তামণির বুকের ভিতর জলিয়াছিল, সেই দীপ এক দিন মহাপ্রভুর বক্ষের মণিকোঠায় জলিয়াছিল, সেই দীপের আলোক যুগযুগান্ত।

আবহাওয়ার ভিতরেও রামপ্রসাদের প্রাণের ভিতর জলিয়াছিল, সেই দীপ এই ফেরঙ্গ-যুগেও গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীতলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার সাধনার ধারা এমনি করিয়া ধীরে ধীরে রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধের ভিতর দিয়া এমনি করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সাধনার ধারাতেই বাঙ্গালার গানের জন্ম। আজ আপনাদের আমি সেই বাঙ্গালার জীবনের ধারায় যে সাধনার গান, সমস্ত দেশকে ও দেশের প্রাণকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই কথা কহিব।

আমার বাঙ্গালার বড় মধুর রূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর ত কাহাকেও দেন নাই। আমার বাঙ্গালার রূপের কি তুলনা আছে! শ্যাম-চেলাঞ্চলময়ী বনরাজি-বিভূষিতা সরিৎবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী, মা'র বুকে অবিরাম নৃত্য করিতেছে, চরণতলে উদ্দাম উচ্ছল মহোর্শ্মি-বিস্ফূর্জ্জিত সাগরের দিগন্ত-মুখরিত হলহলা, শিরে নগাধিরাজ ধূর্জ্জটি, সূর্য্যকিরণে ধক্-ধক্ জলিতেছে। মা আমার এক হাতে ধান্যশীর্ষ, অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্রদল শ্বেতপদ্ম, আকাশ উজ্জ্বল, তরুণরবি হিরণ-চূর্ণ দিগ্‌দিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশেপাশে ললিতকণ্ঠে পিককুল কলঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে! এ রূপের কি তুলনা আছে! সেই বাঙ্গালা মায়ের বাঙ্গালী ছেলে চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ, সে বাঙ্গালী যে আজিও মরে নাই, তাই সেই আশার আলোয়, সেই আনন্দে, আজ চোখে জল আসে। কি কাঞ্চন-মণি ফেলিয়া, কি কাচ আজ কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়াছি; রাশি রাশি খড়িব চাপ ও ধূলায় সকল কলঙ্ক শুভ্র করিতেছি; প্রাণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি ভয়াবহ পরধর্ম্মের খোলস পরিয়াছি! বাঙ্গালা ভুলিয়া বাঙ্গালার ভাব ভুলিয়া, রূপ ভুলিয়া, প্রাণ ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া সে মায়ের রূপকে দেখিতে পাই না, দেখিলেও আর চিনিতে পারি না। চোখে পর্দ্দা পড়িয়া গেছে, চোখ খারাপ হইয়া গেছে। আজি চোখের সমুখে ইউরোপীয় অবভাসের যবনিকা —চোখ আর সে রূপ চিনিতে পারে না। ইউ-রোপীয় ভাবের ধারায় ছাঁচে, নিজেদের না ঢালিয়া, আমরা যেন আজ কিছুই ভাবিতে পারি না। কল্পনা ফেরঙ্গ, ভাব ফেরঙ্গ, সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গে, জীবন ও ধর্ম্মের অঙ্গে আজ এই ইউরোপীয় ব্যভিচারী ভাব, আমাদের জীবন ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প ও সব কল্পকলাকে মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে। আজ এই দুর্দ্দিনে সূচিভেদ্য তমসাচ্ছন্ন আকাশতলে এই ফেরঙ্গ বাঙ্গালার ফেরঙ্গ সাহিত্যের মাঝে অকস্মাৎ বিজলী-ঝলকের মত কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত মায়ের শ্রীরূপ দেখিলাম; সেই পদ্মালয়া, সেই সরস্বতী, সেই অন্নপূর্ণা, সেই সিংহবাহিনী, সেই ভীমা ভয়ঙ্করী রুধিরার্দ্রবসনা করালী—আর দেখিলাম সেই মদনমোহন,—

'বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা।'

সে যুগল রূপের কি ওর আছে! আধশ্যাম আধরাধা যেন মেঘ-অঙ্গে বিজলী মিলাইতে চায়; মেঘ যেন বিজলীর ঝলক দিয়া হাসিয়া উঠে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নব নব রূপ ফুটিয়া উঠিতে চায়, সকল রূপ প্রতিনিমিষেই সেই যুগলরূপে মিলাইয়া যায়।

"মিলল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ
চকোর পাওল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি-ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥"

আর বাঙ্গালীর কবি চণ্ডীদাস সেই রূপের পাশে রহিয়া, ভাবে গদগদ হইয়া,

"চামর ঢুলায়ত।"

এই ছবি বাঙ্গালার নিজস্ব। যে মরম জানে, সে রসিক এই রসের কথাও জানে। সেই প্রাণের ধারার সঙ্গে আপনাদের ধারার পরিচয় রামপ্রসাদের ছিল। রামপ্রসাদ তাই গাইয়াছিলেন,

"গিরিবর আর পারি না হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে,—
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধ'রে দে উহারে।
আমি পারি নে হে প্রবোধ দিতে উমারে।"

এ সব গান বাঙ্গালার প্রাণের পঞ্জর হইতে বাহির হইয়াছে, জীবনের সঙ্গে এ রসের অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আজ বাঙ্গালী সেই প্রাণের প্রাণকে তাহার সাহিত্যের—তাহার জীবনের সেই রূপ, যে রূপের চরণে,—

"মদন মুরছা পায়,"

সেই রূপ ভুলিয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। নিজেদের বাঁচার মত বাঁচিতে হইবে। শুধু একটা কাব্যের খাঁচা দেখাইয়া, রসবোধের রসিক হইয়াছি বলিলে, প্রাণ বুঝে না। আত্মার আত্মায় রমণে সে রস উপভোগ হয় না। মনুষ্যজীবনের যে চরম পরিচয়, তাহার পথে শুধু অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা আসিয়া ব্যবধান করিয়া দাঁড়ায়। তাই এই মিথ্যাময় ফেরঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার জীবনকে মুক্ত করিতে হইবে। আজি তাহারি বার্ত্তা আমি বহন করিয়া আনিয়াছি। আমি প্রাণে প্রাণে যে অনুভূতি দ্বারা—সাধনের দ্বারা জীবনের সে রূপের যে পরিচয় পাইয়াছি, আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালাকে তাহা শুনাইবার জন্য আমি সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া প্রস্তুত হইয়াছি। আজ এই তমসাচ্ছন্ন পুঞ্জীভূত অন্ধকারের তামসিকতার দিনে সকল রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া আমাদের জীবনের ধারাকে বাঁচাইতে হইবে। এই ভাবের অপচারের দিনে, ফেরঙ্গ-সাহিত্য ও জীবনের দিনে সমগ্র শক্তিকে একবার অন্তর্মুখী করিয়া বাঙ্গালার সেই প্রাণের প্রাণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হে বাঙ্গালী, বাঙ্গালার সেই প্রাণের গানের সন্ধান কর! দেবতা চায় অমৃত, অসুরে চায় অনৃত। মানুষের এই দেহ-মন-প্রাণ প্রভৃতিত্রয়ের ভিতর অহোরাত্র যে যুদ্ধ চলিয়াছে, সে যুদ্ধে জয়ী হইবার, মহতো ভীতি হইতে নিজেদের বাঁচিবার জন্য বাঙ্গালার সবুজ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া দিনের আলোকে নিজেদের সন্ধান ক'রতে হইবে, তবে সেই অমৃতে আমাদেরই অধিকার। বাঙ্গালার সশক্তিক কবি চণ্ডীদাস রামপ্রসাদের, বাঙ্গালার স্বধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর অমৃতোপম রসানুভূতিতে যেই রস-সৃষ্টি হইয়াছে, প্রাণের জিনিসকে তাঁহারা যেমন বুকের ভিতরে প্রাণ ভরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, সেই সাধনের পথে, সেই অনুপম কাব্য-সৃষ্টির পথে নিজেদেরও দেশের গতিকে লইয়া যাও, নিজের জীবনে ও কর্ম্মে মিলাও, তোমার নিজেরও পরিচয় পাইবে, দেশেরও পরিচয় পাইবে। ফেরঙ্গ-জীবন ও সাহিত্যের এই মহতো ভীতি হইতে তবেই রক্ষা পাইবে। স্বধর্ম্মের বাঙ্গালার প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্মের এই পরিচয় পাইলে;

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ,'

নচেৎ সারা বিশ্ব উজাড় করিয়া বিশ্বের কাব্যভার মাথায় করিয়া আনিয়া, নিজের ও জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া, তাহার স্বাভাবিক সহজ প্রকৃতিগত চিন্তা-শক্তি রোধ করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, মনকে চোখ ঠারিয়া যাহা কিছু রচনা কর না কেন, বেলাভূমে বালুর প্রাসাদের মত এক বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া যাইবে, তাহার রেখাও থাকিবে না, কোন চিহ্নও পাইবে না। তাই আজ দিন থাকিতে থাকিতে ফিরিতে বলিতেছি। এ ব্যাধির যে ঔষধ, তাহা ওষধি-লতার মত বাঙ্গালারই বনে জন্মিতেছে।

আজিকার দিনে এই জীবন ও সাহিত্য-সৃষ্টির যে ধারা চলিয়াছে, এই ব্যর্থকাম বৈদেশিক খোলসপরা

জীবন-কল্পরাজ্যে যে শ্রীরামপুরী খৃশ্চান পাদরীর নৈতিক সভ্যতা ও পাপবোধের অপচার মিলাইয়া, আজ শত-বৎসর ধরিয়া জীবন ও সাহিত্যের নামে, জীবনের বিচিত্রতার নামে, ধর্ম্মের নামে যে পুঞ্জীভূত অধর্ম্ম, ক্রীতদাসের পরানুকরণ,—জীবনে ও সাহিত্যের, কর্ম্মের ও ধর্ম্মের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে ছাপ পড়িয়াছে; গানে, সুরে, চিত্রে, স্থাপত্যে যে ক্লেদ, যে পঙ্ক, যে ধূলী, যে খড়ি-মাটীর রং পড়িয়াছে, তাহাকে মুছিতে হইবে; ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মনুষ্যত্বে ভাবের দাসত্ব, ভাষার দাসত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। হে বাঙ্গালী, জানিও, তাহা ছাড়া আর কোন পথ নাই,—নাই। তাই সেই জীবন ও ধর্ম্মের, প্রাণ ও সাহিত্যের মাঝে বাঙ্গালার সেই চিরন্তন বাণীকে তোমাদের কাছে, সাহিত্যের মধুর বিচিত্ররূপের ভিতর দিয়া আনিয়া দিতেছি; গ্রহণ কর!—গ্রহণ কর! ইহাকে বৈষ্ণব-তত্ত্ব বা রসের কথা বলিয়া, তত্ত্বের কথা না জানিয়া, রসের কথা না বুঝিয়া ফেলিয়া দিও না। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, ইহা বাঙ্গালার মাটীর ও প্রাণের মিলন-ভূমি; এই কাব্যলোকেই বাঙ্গালার মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ! মনে করিও না, তোমরা আজ যাহাকে বিচিত্র হওয়া বলিতেছ—তাহা সত্যসত্যই বাঙ্গালার স্বাভাবিক বিচিত্রতা। ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের কথা মুখস্থ করিয়া, সেই কথাগুলিই রসান দিয়া, বাঙ্গালায় বলিলেই বাঙ্গালীর জীবন হঠাৎ বিচিত্র হইয়া উঠে না। এই মিথ্যা বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংঘাতজনিত শতখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতা মাত্র। আমি যে প্রাণ ও সাধনার দিকে ফিরিতে বলিতেছি, আমি যে বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে বলিতেছি, বাঙ্গালা তাহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিয়া, নিজে যে বিচিত্ররূপে জগতের কাছে নিজকে ধরিয়াছিল ও আপনি যে শত শত অপূর্ব্ব ভাবে বিচিত্র হইয়া বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই বিচিত্র প্রাণ-ধারারই কথা। পাশ্চাত্যের এই ভাব-মোহ এবং "বিশ্ব"-মোহ যাহা আমাদের সমস্ত স্নায়ুকে, নাড়ীচক্রকে ব্যাধিপীড়িত মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের উদ্ধার হইতেই হইবে। বাঙ্গালার নিজের প্রাণকে জানাই তাহার একমাত্র উপায়। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, সাহিত্য ও জীবনকে আমি চণ্ডীদাসের যুগে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাই, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। তাহা নয়; নদীস্রোত উল্টা ফিরিয়া যায় না, সে আপনার পথ আপনি কাটিয়া লয়! সৃষ্টির বীজ অন্তরেই নিহিত থাকে, আঁখির আগে আগেই রূপে ধরা দেয়, পিছনে নয়। বর্ত্তমান জীবনের ধারাকে স্বাভাবিক করিতে হইবে—চণ্ডীদাসের গানের মত স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের গানের মত আমাদের সেই স্বাভাবিকতায় ফিরাইয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালার স্বাভাবিকতা ফরাসী রুশের Naturilism নহে। এ স্বাভাবিকতায় প্রকৃতি ও আত্মা আত্মস্থ, প্রকৃতির দাস নহে। তাই সেই যুগের প্রাণময় প্রাণের সুরে ঢালাই করা গানের ধারা ও উৎসের খোঁজ করিতে চাই। আশা করা যায় যে, বাঙ্গালার সেই কাব্যসাধনার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার, তাহার জীবনকে সত্য করিবার পথ আবার আমরা সাধন করিব এবং সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবই করিব ও তাহার সেই উৎসের মূল রসের পথ ধরিয়া সেই নিখিল রসের সকল আনন্দের মাঝে আমাদের বাঙ্গালীজাতির জীবনের সার্থকতা অনুভব করিব।

কেহ কেহ বলেন, বহুশতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশ পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন। এই পরাধীনতায় তাহার অনেক মানুষী বৃত্তিও অনুশীলন অভাবে নষ্ট হইয়া গেছে। স্বাধীনতার সে আনন্দ, জাতীয়তার যে সংবিৎ, যে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, তাহাই নাকি

কমকলার প্রাণ। এই স্বাধীনতাই তাহার বিরাট্ উপায় ও ফল। ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, বাঙ্গালা তাহার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা হইতে চ্যুত হইয়া, তাহার জীবনের সরল গতি হারাইয়া, সত্য সুন্দর শিবের ধ্যান ভুলিয়া গেছে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই বাঙ্গালার সাংখ্যকার কপিলের জন্ম, এই বাঙ্গালাই শ্রীচৈতন্যকে দিয়াছে, এই বাঙ্গালাই আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়াছে। এই বাঙ্গালাই এক দিন সমস্ত প্রাচ্যকে ভাবে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে অজেয় নেতার মত চালাইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালার স্বাধীনতা—তাহার আত্মার আত্মস্থ-সংবিতের অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠায়। এই অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মার জীবন্ত রসানুভূতির জন্য বাঙ্গালা যে তপস্যা করিয়াছিল, সেই তপস্যাই কত বিচিত্ররূপে বাঙ্গালার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার সাধনা, বাঙ্গালার স্বাধীনতার আদর্শ সেইখানে, বাঙ্গালার কমকলার ভিত্তিও সেইখানেই। সেইখানেই আমাদের গীতি-কবিতার ও গানের প্রাণ।

মনুষ্যজীবনের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা কখন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় হয় নাই হইবেও না। শুধু পরের দাসত্বের বোঝা ও শিকল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেই তাহাতে জীবনের স্বাধীনতা-রক্ষা হয় না। মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল প্রবৃত্তির, সকল রসের অনুভূতির, সকল যাতনার উপরে, সকল ভোগের উপরে নিজেকে—নিজের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, স্বাধীনতা অর্থহীন দেহভোগীর প্রাণহীন বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের মনুষ্যত্ব তাহার আত্মার সংবিতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে যুগে চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন, সে যুগও বাঙ্গালার স্বাধীনতার যুগ নয়; কিন্তু দারিদ্র্যের—পরাধীনতার—সমাজের সঙ্কীর্ণতার সমস্ত সঙ্কোচ ও ব্যবধানের মধ্যেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছাকে দারিদ্র্য, পরাধীনতা, সমাজের পেষণ কিছুতেই পাড়িতে পারে নাই। এই সব মহাপুরুষদের প্রাণ-বেদীমূলে মাটী যে সম্ভার আহরণ করিয়া দিয়াছিল, তাঁহারা একনিষ্ঠ সাধকের ধারায় নিজেদের মাটীর সম্পর্কে এক করিয়া সে প্রেমাগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। কোন সমাজ সংহিতা, কোনওরূপ দণ্ড তাঁহাদের এই জলন্ত জীবন্ত অগ্নিশিখা নিবাইতে পারে নাই। আত্মার সেই প্রেমরসের অনন্ত বিভূতি, এই পরাধীনতার ভিতর হইতেই তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রেমের সোরাজ্যে তাঁহারা চিরনূতন সম্রাট্; কেমন করিয়া অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের জীবন্ত প্রেমভরা মণিকোঠায় পৌঁছিয়া, সেই রসচিন্তামণি আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই সাযুজ্য-পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই আমাদের জানিবার—উপলব্ধি করিবার বিষয়।

কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য "রূপক।" মানুষের নিজের অর্থাৎ বৈষ্ণবকবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে না কি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে। রূপ-অরূপের প্রভেদ, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ, বস্তু ও অবস্তুর প্রভেদ শুধু বিচার-দ্বারা কত দূর বুঝা যায়, বলিতে পারি না। শুধু বিচারবুদ্ধির উপরে আমার সেরূপ আস্থা নাই। খুব সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে কল্পিত সত্য-মিথ্যা সৃষ্টি করিয়া, সেই সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে দাঁড়াইলে গঙ্গাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সাগরও দেখিতে পাওয়া যায় না। মায়া বলিয়া এই জাগ্রত বিশ্বের বিচিত্রতার মধ্যে মায়াধীশকে খাড়া করিয়া, সকল বিশ্বকে বুদ্ধির প্রাখর্য্যের দ্বারা ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশ্ব উড়িয়া যায় না, মায়াও আপনার প্রকৃতরূপে দেখা দেয় না। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই

কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া, সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব-কবিতা বুঝিতে গেলে, বোধ হয়, রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের সে সাধনা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর সাধনা। বৈষ্ণবকবিদিগের প্রত্যেক অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই; সেই প্রাণকে যে জানে না, জানিবার চেষ্টাও করে না, সে কেমন করিয়া বুঝিবে? বৈষ্ণব-কবিদের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা, তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্ম্মে শতদলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগলরূপই বাঙ্গালার সভ্যতা, সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত করিয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালার প্রাণ, যাঁহারা বাঙ্গালার প্রাণকেন্দ্র হইতে ইউরোপীয় বিশ্বসাহিত্যের ঝড়ে শতধা দীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাঁহারাই এই বিশাল বিশ্ব-লীলার জীবন্ত মূর্ত্তি-স্রোতের মাঝে বৈষ্ণব কবিতাকে প্রাণহীন রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কৃষ্ণ যদি বাস্তবিকই কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দেন, তবে ত এ জীবনকে ধন্য মনে করি। কৃষ্ণ বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কবিতা এত সরল, এত সুন্দর, এত রূপ-বৈচিত্র্যে ভরা-ভরা। এই সব কবিতা বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যের মোহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গালার যে প্রাণ, তাহার খোঁজ করিতে হইবে, মুখস্থ করা জ্ঞানের যে অহঙ্কার, তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

বাঙ্গালাদেশকে নূতন করিয়া বৈষ্ণব হইতে হইবে না। বাঙ্গালা যে প্রাণে বৈষ্ণব। বাঙ্গালার স্বাভাবিক শক্তি, তাহারই তপস্যা করিতে হইবে। তোমাদের ইহাই বলিতে চাই, শ্রীকৃষ্ণ রূপক নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, ভারত-সভ্যতার ইতিহাসে, হিন্দুর জাতীয় গরিমার ইতিহাসে, তাঁহার স্থান অতি-অতি-উর্দ্ধে, সেই আদর্শ মহাপুরুষকে শ্রীভগবান্ বলিয়া ভারত-আপামরসাধারণ মানিয়া আসিতেছে, তাঁহার লীলার মধ্য দিয়া ভারত সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা অঙ্গাঙ্গি-যোগে যুক্ত—তাঁহারই লীলার মহাভাবে পুষ্ট ভারতের কাছে ইহা রূপক নয়, বাঙ্গালার কাছে ইহা রূপক নয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। শুধু ঐতিহাসিক নয়, যুগে যুগে মহাপ্রাণের ভিতর সেই লীলা-আভাস-চঞ্চল মূর্ত্তিতে বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষ মুখরিত ও বিকসিত। যাহা জাতীয় প্রাণের ভিতর দিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, ইহলোক-পরলোককে ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া লইয়া আসিতেছে, তাহাকে রূপক বলিয়া, রকম করিয়া, পাশ্চাত্যের রূপক লইয়া এত মাতামাতি করিলে চলিবে কেন? চটুলতায় কোন অধ্যাত্মসাধন হয় না। যাহারা দেশের দশকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, দেশের অন্তরঙ্গ-সাধনা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের প্রতি কথায়, প্রতি ভাবে, প্রতি কার্য্যে পশ্চিমী সেপাইয়ের খাড়া নজীর দেখাইতে হয়, যাহারা সংসারে জন্ম লইয়া নিজেদের প্রাণকে প্রতিনিয়তই নিজেরা ছলনা করে, যে আলোক তপস্যার দ্বারা প্রাণের পরতে পরতে ঝলসিয়া উঠে, আত্মার সে স্বানুভূতি যাহাদের নাই, যাহাদের জীবনটা নিজেদের কাছেই রূপক, তাহাদিগকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই; শুধু এইটুকুমাত্র যে, আপনার আত্মার পথ ধরিয়া বাঙ্গালার নবজীবন-উষার প্রাক্কালে, নবোদিত সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেশের সাধনার ধারার মধ্য দিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া, আপনার কল্যাণের পানে মুখ তুলিয়া, মন মুখ এক কর; তবে বাঙ্গালার আত্মসাধনার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে। চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের মধ্যে, তাঁহাদের নিজেদের জীবনের সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভালবাসা, মিলন,

বিরহ, সমাজের সহিত বিরোধ, প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে প্রচলিত আচার, অনাচার, তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে বিরোধ ও মিলন, স্বাভাবিক হইবার, সহজ হইবার যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারি কথা—এই বাঙ্গালা কবিতার ভিতর হইতে আমি দেখাইতে চাই। যে সকল কলকলার ধারায় এই বাঙ্গালা শ্রেষ্ঠ, এই চণ্ডীদাসের ও রামপ্রসাদের গান বাঙ্গালার সেই কলকলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়াছে। আজ এই ইউরোপীয় অবভাসের দিনে আমি জোর গলায় বলিতে পারি যে, বাঙ্গালার ঘরে সে দীপ আবার জ্বলিয়াছে। জানিও, ইহাই বাঙ্গালার অভয় বাণী। এই বাণীকে সার্থক করিতে হইবে।

আর একটা কথাও মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে, বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ বড় বেশী। আধুনিক কবিতার আর এখন instinctএর (স্ব-স্বভাবের) পর্য্যায়ে নাই; তাহা এখন উদ্ধগ, অতীন্দ্রিয়ের সুবাসে মত্ত। ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ভাব, কোন সত্তা, আজিও মানুষের ভিতরে অনুভব হয়, এমন বিশ্বাস আমার নাই। ইন্দ্রিয় যাহার সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয়ও তাঁহারই সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত গাথা যায় কি? কেহ আজিও পারিয়াছেন কি? রক্ত-মাংসকে, মাটীকে অস্বীকার করিয়া, মানুষের সাধ-সোহাগ অস্বীকার করিয়া, কাব্যলোকে কোন শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আধুনিক নকল ইংরাজীনবীশদের বুদ্ধির বয়নাকায় পড়িয়া, বহুকাল হ-য-র-ব-ল হইয়াছে। তাই এখন শুনিতে হইতেছে যে, বৈষ্ণব কবিতা erotic। বাঙ্গালার সাধনা চিরকালই ইন্দ্রিয়কে সত্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের সকল রস আহরণ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের মুখে লাগাম দিয়া চালাইয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার সকল বৈচিত্র্যের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দিয়া তাহাদের সকল বিভিন্নতাকে সে এক করিয়াছে। বহুর মধ্যে, বহু বিচিত্র রসের মধ্যে বাঙ্গালা সমরসের আস্বাদন করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সত্য খেলাকে বাঙ্গালা কখনও অস্বীকার করে নাই। বৈষ্ণব জানে যে, তাহার মনে, প্রাণে, দেহে এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত লীলা করিতেছে, সে যন্ত্র, যন্ত্রী তাহার প্রাণের প্রাণারাম হইয়া আনন্দ-রস লীলাচ্ছলে ভোগ করিতেছেন। এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শুদ্ধি, ভোগ ও ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত। এ ইন্দ্রিয় ভাগবতভোগের ইন্দ্রিয়। বাঙ্গালার কবি সাধক, সেই ভোগে আত্মস্থ শুদ্ধির মধ্যে ভুক্তিকে সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করে, মর্ম্মে মর্ম্মে আত্মায় আত্মায় রমণ করে,—এ ভোগ ভাগবত-ভোগ। বাঙ্গালার গীতিকবিতার মর্ম্মে মর্ম্মে এই ভোগের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টান পাদরীর কাছে বাঙ্গালার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের কথা ও পাপবোধের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা আমাদের আদর্শ ভুলিয়া, প্রতীচ্যের রঙিন খোলসে পড়িয়া, নিজের আত্মাকে অস্বীকার করিয়া সাহিত্য ও ধর্ম্মে আত্মহত্যার গৌরব অর্জ্জন করিব?

আজিকালিকার দিনের এ সব অলীক খৃষ্টানী নীতিকথার ন্যাকামীতে যাহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগকে অশুদ্ধ করিয়া ভুলিতে চায়, তাহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। বাঙ্গালার বুকের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গেছে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যাচার—সমাজ-রক্ষার নামে হিংসার অত্যাচার—মানুষের উপর মানুষ যত প্রকার অত্যাচার করিতে পারে, সব হইয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার রূপ, কত রঙের বিচিত্রতার বদল হইয়া গিয়াছে। কত কবি জন্মিয়াছে, কত অকবি জন্মিয়াছে, গত কয় শতাব্দীর উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা, কত বাত্যা, কত বিরোধ ও বিদ্রোহের অগ্নিতে সমাজ, মানুষ ও ধর্ম্মের আবর্ত্তন,

বিবর্ত্তন ও আলোড়ন হইয়াছে ; কিন্তু তাহারই মধ্যে বাঙ্গালার যে শক্তি, পর্ণকুটীরে বসিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে করতলস্থ আমলকবৎ ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি —সে সামর্থ্য হারাইল কেন ? সে আদর্শ কেমন করিয়া এই ফেরঙ্গ-যুগ নষ্ট করিল, তাহাই ভাবিবার কথা। চণ্ডীদাস যে ব্রজপ্রদীপের প্রদীপ জালিয়াছেন, সেই প্রদীপ আবার জ্বালাইতে হইবে। কত বিপদ্‌, কত সংঘাত ও বিপ্লবের মধ্যেও চণ্ডীদাস ও শ্রীচৈতন্ত কেমন করিয়া বাঙ্গালার পরিপূর্ণ রস-মূর্ত্তিটিকে নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা স্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই কথ'টি—সেই পথটি আমাদের বিশেষরূপে ভাবিবার ও দেখিবার বিষয় ; সে বিষয়ে অন্তমত থাকিতেই পারে না। সেই পথ না জানিলে দেশের সাহিত্যের ধারাকে আমরা কখনও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব না। সেই ধারা সরস্বতীর ধারার মত বালুর নিয়ে কোথায় লুকাইয়াছে। তাই আজ সাহিত্যের কাননে মুঞ্জরিত তরু নাই! তাল-তমাল-রসাল-পিয়ালের সে বনশোভা নাই, অশ্বথ-বটবৃক্ষ নাই, সপ্তপর্ণ নাই। তাই এখন পোড়া বাঙ্গালা শূন্য বনভূমিতে পুঞ্জীকৃত "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" বালুর নিম্ন হইতে আমরা সরস্বতীকে আবার বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা করিব।

আজ কেন তাহা নিবিল ? এর কারণ খুঁজিয়া দেখিবে, অবশ্য একেবারে তার কোন নির্দেশই পাওয়া যায় না, এমন কথা নয়। সংসারের প্রত্যেক কারণ ও কার্য্য জড়াইয়া এত বিচিত্রতায় পরিণত হয় যে, অনেক সময় সেই আসল কারণটার কোন নিরাকরণই হয় না। আমাদের এ ক্ষেত্রেও তাহা যে হয় নাই, এমন কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে বোধ হয় সঙ্কোচ বোধ করিবেন, তবে সকলের চেয়ে বড় কারণ এই যে, আমরা আমাদের প্রকৃতিকে হারাইয়াছি। কেমন করিয়া যে হারাইলাম, তাহা লইয়া অনেক তর্ক উঠিবে। সে কারণ অনুসন্ধান করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা আমাদের ভুলিয়াছি। সিংহ যদি একেবারে নিজের মুখখানা তার প্রাণের আয়নায়, মর্ম্মের আলেকারশিতে দেখিতে পায়, তবেই সকল সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য তাহাই। নিজেকে সিংহরূপে 'চেন' চাই—সাহিত্যের ও কাব্যের চরম কথাও তাই—আপনাকে চেনা চাই।

সেই চেনার ভিতর—সেই প্রাণের মরম-পরিচয়ের ভিতর—যত কথা সব লুকাইয়া থাকে, সেইখানেই যত খেলা। এই প্রাণ-মন-দেহ, এই প্রতিষ্ঠাত্রয় দিয়া নিজেকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলে, এই যে আমার মৃন্ময় ভাণ্ডটি মুহূর্ত্তেই চিন্ময় হইয়া উঠে। মানুষ আত্মস্থ হয়, এই আত্মস্থ অবস্থাই চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদের হইয়াছিল। এই জাগ্রত জীবনের খেলাই তিনি কৃষ্ণলীলার ভিতর দিয়া নিজের প্রাণের মহামিলন-পরিচয়ের মুহূর্ত্তগুলি গানে সুর সৃষ্টি করিয়া গেছেন। আধুনিক কবিদের মত নিজের প্রাণের সঙ্গে কোন পরিচয় না রাখিয়া, শক্তিহীন সমালোচনা তরঙ্গ ভঙ্গের ভাবুকতায় হাবুডুবু খাইয়া, শুধু কেবল বালুতটে ফেনা ছড়াইয়া, কাঁদির ফেনা রঙ্গিন করিয়া যান নাই। আধুনিক কবিরা আত্মাকে চোখের সম্মুখে রাখিয়া, প্রেমের মধুর প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। সকল রসের—সকল রূপের সঙ্গে প্রাণমনে সবিকল্প পরিচয় করিয়া আত্মায় আত্মায় রমণে যে আনন্দ, তাহা আস্বাদ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সমুদ্রপারের তীর হইতে শুকনা সমুদ্র-ফেনা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া বোঝা ভার করিয়াছেন।

তাই আজ ডাক দিয়া বলিতেছি, হে আমার বাঙ্গালা, আপনাকে চিনিবার সুযোগ আপনিই ত হইয়াছে। আত্মা অশ্বে বল্গা দিয়া, এ জীবন-রথকে চালাও, জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ তোমার ইহাই পথ, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই!—নাই।

আজিকার এই সাহিত্যের দরবারে আমি পুরান কথাটিই আবার বলিতে আসিয়াছি। গীতি-কবিতা কি? গীতি-কবিতার প্রাণই বা কি? গানের প্রাণই বা কি? কেন না, বাঙ্গালা দেশে যাহাকে পদাবলী-সাহিত্য বলা হয়, বা তাহার পরে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারায় যে সকল পদ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলগুলিই সুরে গান হয়। আমাদের গান ও বিলাতী গীতি-কবিতায় কিছু পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য না বুঝিলে দেশের প্রাণের সঙ্গে ঠিক পরিচয়লাভ হইবে না।

বিলাতী গীতি-কবিতায় কবি বিশ্বের সকল পদার্থকে তাঁহার বুকের ভিতর টানিয়া লন। তাহাই প্রাণের ভাব রসে সিঞ্চিত করিয়া প্রকাশ করেন। সে প্রকাশে তাঁহাদের নিজত্বের ছাপ দিয়া দেন। তাহাতে হয় এই যে, প্রত্যেক রূপই কবির নিজের ভাবের ছাঁচে গড়া হয়। যে কবির আত্মায় সমস্ত বিশ্বের এই রূপ প্রতিভাত হয়, আর তাহা কবির মনের রূপের ছাঁচে গড়িয়া উঠে, সেই কবির কার্য্যই এই গীতি-কবিতা; কিন্তু এই যে গীতি-কবিতা, ইহা আমাদের দেশীয় নয়।

আমাদের দেশে চণ্ডীদাস হইতে রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালারা কেহই এই গীতি-কবিতা লেখেন নাই। তাঁহারা রচিয়া গেছেন গান, সেখানে আমরা কবিকে দেখি দ্রষ্টা। দুজনের প্রাণের খেলায় দর্শক হইয়া আনন্দরস ভোগ করিতেছেন। সেই আনন্দের সুরের রসে সব কথাগুলি ভিজান। মানুষের যে প্রাণের প্রকৃতি, সে যেন পাঁজর ভেদ করিয়া স্বাভাবিকভাবে পাখীর গান গাওয়ার মত গলা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাই হইল—বাঙ্গালার গীতি কবিতার বা গানের প্রাণ। সেই জন্য আমি বলিতে চাই, বাঙ্গালার প্রাণের ভিতর হইতে গানই বাহির হইয়াছিল, ইংরাজী-প্রমুখ যে বিদেশী সাহিত্য আমাদের দেশে আমদানী হইয়াছে, তাহারই ফল এই বিলাতী গীতি-কবিতা। এ ধারা বাঙ্গালার নিজস্ব নয়। মনকে, চক্ষুকে, প্রাণকে ঠিক ঐ বৈদেশিক শিক্ষার ছাঁচের ভিতর দিয়া না লইয়া গেলে, ও গীতি-কবিতার ধারা সম্যক্ উপলব্ধি হওয়া দুষ্কর। গীতি-কবিতায় থাকা চাই,—তাহার ভাবের একান্ত-রস আর সেই রসের একটি পরিপূর্ণস্বরূপ ফুটাইয়া তুলাই তাহার কাজ। যেখানে সেই রসে খুব গাঢ় ও খুব অল্প কথা বা ভাবের দ্রুতকম্পনের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইবে, সেইখানে গীতি কবিতার সার্থকতা। সেই ভাবের ও রস সৃষ্টির মুহূর্ত্তে যখন কবি তাঁহার নিজের আত্মায় প্রতিফলিত আসল রূপের স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখনি তাহা রূপান্তরে পরিণত হয়। আমরা আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই জিনিসটি পাই না; এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। কিন্তু গান যখন আসে, তখন সুর ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কথা, সুধু সেই রূপকের—সুরের সেই রূপকে ফুটাইতে সহায়তা করে। সেইখানে সুরের সঙ্গে রসিক কবির আত্মার স্বানুভূতি জাগে, পরস্পর নিজের মাধুরী আস্বাদন করে, তাহাতেই সুর ও কথা আপনিই আসে। যে গান রসের সৃষ্ট মূর্ত্তিকে সুরের রূপে ঢালাই করিয়া দেয়, সেই গানই বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি। ইংরাজী গীতি-কবিতায় ভাবের যে দোলন বা গতি প্রকাশ অধিকাংশই কবির মনের গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাঙ্গালা গান তাহা নয়, তাহার গতি আত্মার আপনার নিজস্ব। তাহার সুরের ও তানের মাদকত্ত্ব জাগে, সেই উন্মত্ততায় সে গানের ধারা সৃষ্টি করে। ইহাই সেই 'সাধিতে নিজ মাধুরী।' আমাদের দেশের মেয়েলী-ছড়া, গাথাকে গীতি-কবিতার স্তরে ফেলা যাইতে পারে বটে, তবে তাহার ছাঁচও বস্তুর নিজের সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবির প্রাণের ছাপ নাই, বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় সরস থাকে। এই বিলাতী গীতি কবিতার আমদানীতে

আমরা ঠিক নিজেদের রাখিতে পারি নাই। আমাদের আত্মস্থ হইবার পথে, এই পথ—এই ছাঁচ প্রকাণ্ড অন্তরায়। কেন না, বস্তুর সহিত ইহা আমাদের সম্যক্ পরিচয় করাইয়া দেয় না। একটা কুহেলিকাময় আবরণের ভিতর আমাদের যে নিশ্বাস, তাহা রুদ্ধ হইয়া আসে। এই যে ভাব, ইহা সত্যও নয়, অসত্যও নয়, জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, এই এক অদ্ভুত অবস্থায় আধুনিক গীতি-কবিতা দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মাটীর রসের সঙ্গে সেই দেশের মানুষের দেহের ও মনের রসের একটা অন্তরের মিল আছে। সেই রসের টানে, সেই রসের আবেশে যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার দেশের প্রাণের পরিষ্কার নিখুঁত পরিচয় করাইয়া দেয়। বিলাতী Lyricএর আর একটা দিক্ আছে, তাহাতে অনন্তের দিক দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু অনন্ত দুইটা হয় না; আপনাকেও দেখাইব, অনন্তকেও দেখাইব, তাহা হয় না। কল্পনা যেখানে মূক, মানুষ সহজেই সেখানে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। একটা কোন স্বচ্ছন্দ পরিষ্কার প্রাণের অনুভূতির কোন রেখাও পড়ে না; কোন রূপের দ্বারাও প্রকাশ করিতে পারে না। বাঙ্গালার কবিতায় চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদের যুগে, কি কবিওয়ালাদের সময়েও এ ভাব তাঁহারা তাঁহাদের গানে কখনও আনেন নাই। তাঁহারা প্রাণের সঙ্গে প্রাণারামের সাক্ষাৎকার না করিয়া কোন কথা কখনও কহেন নাই।

তাই সেই বাঙ্গালার গান মানুষের জীবনের ধারায় সাধনের পথে আত্মার প্রতিধ্বনি; সে যেন রাগে সুরে মাখামাখি করিয়া তন্ময় হইয়া চলিয়া উঠিতেছে। আবার সেই আত্মার গভীর নিগম দেশে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রাণের ভাবগুলাকে গলাইয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও যেন গলিয়া রস-নির্ঝর ধারায় ঝরিয়া পড়ে। তাহাই আবার সুরের রঙে, ভাবের রঙে রঙিন হইয়া, এক নূতন জ্যোতির্ম্ময় ধ্যানলোক সৃষ্টি করে, সেই ধ্যান লোকেই কাব্য লোকের রূপান্তরের অনুভূতি হয়।

প্রথম কথা, আদর্শ কি? কাহাকে বলে? আদর্শ সেই পরিপূর্ণ রসের আকর লীলামৃত সুন্দর অনন্তশক্তির আধার শ্রীভগবান্। তিনি নিজেতে অধিষ্ঠিত—স্বাধীন, সেই জন্য অনন্ত। লীলার মধ্যে যিনি বিশৃঙ্খলাকেও সুশৃঙ্খলায় লইয়া আসেন, সেই চিদ্ঘন-আনন্দ-সুন্দর পুরুষ জড় ও জীবের যিনি আশ্রয়, লতা-গুল্ম, পশুজীবন, মানবজীবন, গ্রহ নক্ষত্র, সূর্য্যালোক, মহাব্যোমে অনন্ত-কোটি নক্ষত্ররাজী যাঁহার খেলার বুদ্বুদ, যিনি প্রতিরূপেই স্বপ্রকাশ, তিনিই এই বিশ্বের আদর্শ। তিনিই সুন্দর, তিনিই কল্যাণ, তাঁহার সৃষ্টি, অনন্ত রূপই সুন্দর এবং সব সৃষ্টিই সেই জন্য সুন্দর। যেখানেই তাঁহার সুন্দর রূপের প্রকাশ হয়, সেইখানেই উজ্জ্বল বিভার আলোকচ্ছটায় সৌন্দর্য্য শতগুণেই ফুটিয়া উঠে। স্বপ্রকাশ স্বাধীন আত্মার যে অনুভূতি ও সৃষ্টি, তাহাই কারুকলার রূপসৃষ্টি। আর যে রূপের অনুভূতির আদর্শ ও রূপের অপরিমিত ভাবে পূর্ণ সরস হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। সেই মুহূর্ত্তেই আমরা চিদানন্দ-ঘন-রসের শক্তি যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অনুভব করিতে পারি। সৌন্দর্য্য সেই জন্য সকল রকমের স্বাধীনতার উপরই ফুটে। জীবনের সাধনার ধারায় যখন মন-প্রাণ-দেহের সর্ব্ববাধা-বন্ধনবিহীন ভাবে আবেগে অনন্তের দিকে মুখ তুলিয়া চায়।

প্রাণের ভিতরে সেই অনুভূতি যখন দেহ-মন-প্রাণে একাঙ্গীভূত হয়, তখনই জীবনের রূপান্তর। এ রূপান্তর বুদ্ধের জীবনে হইয়াছিল, যখন বুদ্ধ মহাতপস্যার পর গেহকারককে নিজের ভিতরেই চিনিতে পারিলেন। এই রূপান্তর চণ্ডীদাসের জীবনে হইয়াছিল, যখন তিনি তিমির অন্ধকার পার হইয়া সহজকে

জানিলেন, যখন প্রাণের অনুভূতির কষ্টি পাথরে 'বিষামৃতের' একত্রে মিলন-রেখা, মরমের দাগে সোনার নিকষের মত দাগ দিল। রূপান্তর মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল, যখন সব ঠাঁইয়ে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফুরণ হইতে লাগিল। এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল, যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন, অবোধ বালকের মত মায়ের নিকট আবদার করিতেন, কখনও বা তাঁহাকে গালি দিতেন। এই রূপান্তর শ্রীরামকৃষ্ণেও ফুটিয়াছিল। রামপ্রসাদের সাধনা রামকৃষ্ণের ভিতর যেন জীবন্ত রসমূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই যে মানুষের জীবনের ধারায় সাধনাঙ্গের একটা সহজ দিক্ আছে, সেই রূপের পর রূপের অবিরাম রূপস্রোতে অনুভূতি ও সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ নিজেকে চিনিয়া ফেলে; অমনি রূপের আসল রূপ ধরা যায়।

বাঙ্গালাদেশের এই যে গানের ধারা—এই যে কল্পকলার ধারা, যাহাকে জীবনের সাধনাঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হয়, কেন না, বাঙ্গালা দেশ সাধন-ধর্ম্মের উপরই সকল কর্ম্মের—সকল সৃষ্টির—সকল কল্পকলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের যে সহজ সরল আদর্শ আমাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠে, সেই আদর্শ ঐ রূপের মধ্যেই চিত্রে, সুরে, কথায় নানারূপের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ হয়, যেমনই প্রাণে অনুভূতি হয়, অমনি রূপ-সৃষ্টি। এমন করিয়া রূপের পর রূপ, মূর্ত্তি, স্রোতের মত লীলাচাঞ্চল্য বারিধি-বুকে লহরে লহরে দুলিয়া উঠে। সেই লীলা-তরঙ্গের যে দোলন-রেখা, সেই রেখার লীলার মধ্যে আমিও একটা রেখা, আমার সেই তরঙ্গ, আমার সেই দোলন, আমিও সেই অনন্ত লীলামৃতের মধ্যে রস-রেখায় রসিয়া আছি। আমি কখন এক, কখন বহু; আবার এই এক ও এই বহুর মাঝে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি। দোল চলিয়াছে, খেলা চলিয়াছে, আমি 'জন্মনি-জন্মনি' আমার দেহ-মন-প্রাণ দিয়া এই রস-সাধন করিতেছি। সেই রস-সাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের অনুভূতির সঙ্গেই আমার যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বানুভূতি, তাহা হইতেই আমার কল্পনার সৃষ্টি। তখনই প্রাণের ভিতর আদর্শের পরিপূর্ণ রসানুভূতি হয়।

বাঙ্গালা দেশের গান ও চিত্রে সেই অধ্যাত্মসাধনের রূপ ও রূপান্তরই ফুটিয়াছে, তাই আমি সেই গান ও সেই গানের চরিত্রের ধারায় বাঙ্গালা দেশের স্বরূপকে দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে ও নিত্যানন্দের জীবনে যে প্রেমময় রসমূর্ত্তি ফুটিয়াছিল, নবদ্বীপ সে রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। ঘরে ঘরে সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা, প্রতি গৃহেই ভক্তের ভগবান্ অধিষ্ঠান করিলেন। প্রতি গৃহেই গোবিন্দের মন্দির উঠিল। সে অমিয়ভরা হরিধ্বনি মুসলমান-সভ্যতার ছাঁচকে বদল করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করুন, দেখিবেন—আজ ইংরাজী পড়িয়া যে Realism Idealism লইয়া এত মাতামাতি করিতেছেন, তাহার পরিপূর্ণ অনুভূতি ও কল্পকলার প্রতিষ্ঠা তাহাতে হইয়াছে কি না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই উদ্ধার বর্ণন পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতেই বৈষ্ণব পদাবলীর যে রসচিত্রের ও সুরের খেলা নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা Ideal কি Real, তাহার বিচার করিতে পারেন কি?

"একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া॥
'কে রে' 'কে রে' বলি ডাকে জগাই মাধাই;
নিত্যানন্দ বোলেন, 'প্রভুর বাড়ী যাই॥'
মদের বিক্ষেপে বোলে কিবা নাম তোর?
নিত্যানন্দ বোলেন অবধূত নাম মোর॥

বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মন্ত্রপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুই জন হেন আছে মনে।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে॥
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিলা প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সোঙরে॥
দয়া হইল জগাইয়ের রক্ত দেখি মাথে।
আর বার মারিতে ধরিল দুই হাতে॥
কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দৃঢ়।
দেশান্তরি মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥
এড় বড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥
আথে ব্যাথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গ সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইয়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মনে।
চক্র! চক্র! চক্র! প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যাথে চক্র আসি উপসন্ন হইল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে না দেখিল॥
প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আথে ব্যাথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥"

এই যে বৈষ্ণবের শক্তি ও প্রেমের চিত্র ও চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই প্রেম-ধর্ম্মের স্রোতে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও সাহিত্যকল্পকলা গঠিত হইয়াছিল; তাহার পরিচয় আমরা পাই। এই যে চরিত্রচিত্র, ইহাকে আপনারা কি বলিবেন? Realism না Idealismএর কল্পকলা? আমি বলিব এই যে, অভিনবরূপ চরিত্র-সৃষ্টি, ইহা বাঙ্গালায়ই সম্ভব, কেন না, ইহা বাঙ্গালায় ঘটিয়াছিল, এবং ইহা বাস্তব সত্য। সেই সত্যের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস অতি নিখুঁত তূলিকায় সংযমের সহিত তাহার সমস্ত ভাবটি ও চিত্রটি একাত্ম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। যখন দরদরধারে রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে, তখনও সেই দুই জনের মাঝে দাঁড়াইয়া 'মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এই দুই শরীর' ইহাতে কি প্রেমের জাগ্রত রূপান্তর হয় নাই? ভগবান্ আমাদের এই দুই হাত দিয়া আয় আয় বলিয়া ডাকিতেছেন, আমরা কত রকমের খেলাই তাঁহার সঙ্গে খেলিতেছি। কত দুঃখই তাঁহাকে দিতেছি, তবুও প্রেমময় আয়—আবার সেই আয় বলিয়াই ডাকিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দের এ প্রেমলীলা কি ঠিক সেই শ্রীভগবানের আদর্শের অনুভূতির রসে সিক্ত নয়? কোল দিয়া—মার খাইয়া, তেমনি হাসিয়া হাসিয়া খেলা করিতেছেন। নিত্যানন্দের জীবনে সাধনের ধারায় যাহা রূপান্তর হইয়াছে, চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাসের কল্পকলায় রস-সৃষ্টিতে সেই রূপান্তরই ফুটিয়াছে। এই রস-সাধনায় ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভিতরে যথেষ্ট ফুটিয়াছে। সেই জীবনকে আদর্শ করিয়া মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথে সাধন করিয়া, আত্মার ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে ও কেহ কেহ সেই রূপান্তরের পরিচয় ও জীবনের সাধনের ও কল্পকলায় ধারায় গীতিকবিতা ও গানের সৃষ্টিতে বেশ ফুটিয়াছিল, সৃষ্টিতে বেশ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই সেই পরিপূর্ণ আদর্শ সৃষ্টিতে পঁহুছিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের যে মধুর রসের সাধন, তাহার সঙ্গে নিত্যানন্দের এই অপূর্ব্ব সখ্য দাস্য-বাৎসল্যমিশ্রিত যে অকিঞ্চন সমন্বয়, তাহা আর কোন

সাহিত্যে নাই। এই রসসৃষ্টি পরবর্ত্তী নরহরি, নরোত্তম, লোচন, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিরা সেই আদর্শেই নিজেরা সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোকাতীত রূপলাবণ্য, তাঁহার সেই মেঘগম্ভীর স্বর, তাঁহার সেই অসাধারণ অমানুষিক প্রতিভার সংযম ও হৃদয়ে সমাহৃত অনুপম প্রেম, যে বন্যা বাঙ্গালায় আনিয়াছিল, সে ভাবের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেই ভাবের ধারায় বাঙ্গালার সঙ্গে এক অতি নিগূঢ় যোগ আছে। চণ্ডীদাস ও বৌদ্ধ-সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার ভিতর দিয়া বাঙ্গালা তাহার এই রস-সাধনা, এই সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বলোককে প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালা তখন মৃদঙ্গের মেঘগুরুনিস্বনে ও হরিধ্বনিতে মুখরিত ছিল। পবনে গগনে সে দিগদিগন্তে প্রেমের বাণীকে বহন করিয়া লইয়া দিত। সেই মহাপ্রেমিক যখন মহাসমুদ্রের বুকে রূপের নৃত্য দেখিয়া, আপনাকে সেই সৌন্দর্য্য-রসসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল উদ্বেলিত মহাসাগরের মহাপ্রাণের সঙ্গে যখন একাত্ম হইয়া রূপের সহিত মর্ম্মে মর্ম্মে মিলাইয়া নির্ব্বিকল্প-মহামিলন লাভ করিয়াছিলেন,—সেই এক চন্দ্রমা-শোভিতা নিশা! শ্রীভগবানের রূপের তৃষ্ণা কেমন রূপের ধারায় ভিতর দিয়া রূপে রূপে মিলিত হইয়াছিল! সে লীলা, সে খেলা, সে প্রেমের অজের তুলনা কোন দেশের সাহিত্যে মিলিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।

এইটুকু প্রাণে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে হইবে যে, এই রূপ, এই সুন্দরের হাসি, তাঁরই রূপ, তাঁরই হাসি, তাঁহারই এই উন্মাদনা, তাঁরই এই উন্মত্ততা, তাঁহারই এই আবেগ, তাঁরই এই আকুলতা! চন্দ্রমাও তাঁহার, আমিও তাঁহার, তিনিও তাঁহার। এ যে রূপে-রূপে মিলন—প্রাণে-প্রাণে মিলন। শ্রীনিত্যানন্দের এই যে উত্তম অধম বিচার না করিয়া, আচণ্ডালে প্রেম বিলাইবার কাহিনী বাঙ্গালার গানের একটা দিক্, বাঙ্গালার ধর্ম্মসাধনের একটা অঙ্গ, তাঁহার এই লীলায় লীলায়িত।

"ভকতি রতনখান, উড়াইয়া প্রেমমণি,
নিকষণ সোনায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তারি ঠাঁঞি,
দান করে জগত বেড়িয়া॥"

লোচনদাস গাহিয়াছেন—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়,
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা,
হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া॥"

এই যে অভিমানশূন্য বৈষ্ণবের প্রাণ, এই যে অযাচিত প্রেমদান, এ আদর্শ বাঙ্গালারই নিজের। নিত্যানন্দ অবধূত তাহারি জীবন্ত—জাগ্রত—রূপান্তরে মূর্ত্তপ্রকাশ ছিলেন।

অবশ্য, এ কথা সত্য যে, এই বৈষ্ণব সাধনা বাঙ্গালা নিজের আত্মার অধ্যাত্মসাধন হইলেও, তাহার একটা গতি আমরা ধরিতে পারি। সকল শক্তির ধারাই এক। একবার করিয়া কুটস্থ, একবার করিয়া কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচ, আর একবার করিয়া সম্প্রসারণ। চণ্ডীদাসের জনমের পর যে ভাব, যে প্রেমের সাধন তাহার সঙ্কোচ হইয়াছিল, আবার সম্প্রসারিত হইয়া শ্রীচৈতন্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল। সেই ভাব বাঙ্গালাকে কাব্যে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে সকল রূপের সৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, আবার সঙ্কুচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়েই, বাঙ্গালার সকল সমৃদ্ধি ছিল, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

তাহার পর একটা যুগ আলো ও অন্ধকারে কাটিল। শক্তি আবার কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচে পরিণত হইল। শাক্ত ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ, জাতির নানারূপ

হীনতার মধ্যে মুসলমানের অত্যাচার, সব মিলিয়া দেশ আবার অন্ধকারে ডুবিয়াছিল; নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার!

সেই অন্ধকারের মাঝেই রামপ্রসাদ আসিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে আবার মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, রামেশ্বর বাঙ্গালার কাব্যের ধারাকে অন্যদিকে পুষ্ট করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রাণের গানের সুর তখন মিলাইয়া আসিয়াছিল। রামেশ্বরের শিবায়ন অনেকটা বাঙ্গালার যাত্রার পূর্ব্বাভাস বলিলেও বলা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন ও রামপ্রসাদের যে গান, তাহার তুলনা হয় না। বাঙ্গালা আবার সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মুসলমান-প্রভাবের মধ্যেই ভারতচন্দ্রের জন্ম।

এই যে কাল ও কালধর্ম্ম, তাহার মধ্যে আমরা একটা সত্য ধরিতে পারিতেছি। বাঙ্গালার যে খাঁটি প্রাণ, বাঙ্গালার বাঙ্গালী জাতির যে বৈশিষ্ট্যের ধারা, তাহার প্রাণধারাকে লইয়া চলিয়াছে, তাহারও একটা স্রোত চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় মুসলমানী রাজার যে বিজাতীয় সভ্যতা, তাহার দ্বারা অভিষিক্ত যে ধারা, তাহাও চলিয়াছে। বাঙ্গালীজাতির খাঁটি কবি রামপ্রসাদ, আর বাঙ্গালী জাতির অখাঁটি কবি বা মুসলমানী সভ্যতার ধারার কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের ক্ষমতা অসাধারণ হইলেও তাঁহার কাব্য সুন্দর হইলেও,—তাহার মধ্যে বিজাতীয় ভাব, হাবভাব, ধারা-ধরণ ছিল ও আছে। রামপ্রসাদের ভিতর হিন্দুর পৌরাণিক সত্য সংস্কারজনিত প্রাণের পরিচয় আছে। এক দিকে মুসলমান বাঙ্গালী কবি আলোয়ালের পদ্মাবতী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মাঝে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন সেই যুগের দুই ধারাকে স্রোতের মত লইয়া গেছে; কিন্তু দুই স্রোত গঙ্গা-যমুনার মত মিলিতে পারে নাই, পারিবেও না। বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়, বৈশিষ্ট্যই ভগবানের অভিপ্রেত! বিশেষেই রূপ সৃষ্ট হয়।

রামপ্রসাদ কালী-কীর্ত্তনের প্রথমেই গাইলেন,—

"গিরিবর! আর পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধ'রে দে উহারে!
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথা রে॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে ব'সে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে ক'রে॥
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য-পুঞ্জচয়
জগতজননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥"

এই বাৎসল্য-রসের চিত্র ও গানটিকে এই ফেরঙ্গযুগে গোঁরো কবিতা বলিয়া ব্যঙ্গ করা সহজ, কিন্তু যাঁহারা সত্য মাতৃত্ব পিতৃত্ব ও বাৎসল্য-রস জীবনে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া প্রাণের ভিতর অনুভূতিতে সে রস আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহার তুলনা কেহ দিতে পারে না। প্রথম ইহা সত্যই

বাঙ্গালার নিতান্ত ঘরের ছবি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহা পর ছাড়িয়া আসল ঘরেরও ছবি। আমরা প্রথম হইতেই এই গানটিকে সকল দিক দিয়া দেখিতে চাই।

গিরিরাণী মেনকা গিরিবরকে ডাকিয়া কহিতেছেন, "ওগো, আমি যে আর উমাকে প্রবোধ দিতে পারি না", শুধু এই প্রথম ছত্রটি পড়িলেই বুঝা যায়, ইহাতে রাণী মেনকার স্নেহ, বাৎসল্য, মধুর রসের যে বেদনা, তাহার সুরেতে যে প্রতি অক্ষরেই মাখামাখি। তাহার পরের চিত্র সন্তানের অভীষ্ট বস্তু না পাওয়ার জন্য মেয়ের সেই অভিমান, ঠোঁট ফুলাইয়া কান্না, স্তন হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া, এ সকল দিক্ কেমন অঙ্কিত জীবন্ত চিত্রের মত ফুটিয়াছে, সন্তান যেমন হাত বাড়াইয়া চাঁদের পানে চায় আর কাঁদে। এই কয়টি ছত্রের পর পুনর্ব্বার—

'আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে'

এইটা ফিরিয়া আর একবার বলায়, মা'র বেদনার গভীরতা কেমন ব্যক্ত হইয়াছে। তার পর,—'আয় আয়, মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথা রে।"

এইখানে আমরা আর একটি নূতন রহস্য পাই, মেয়ে মা মা বলিয়া অঙ্গুলী ধরিয়া যখন চাঁদের দিকে দেখায়, সেই হাত বাড়াইয়া দেখার ভিতর সেই ছোট মেয়েটির প্রাণের ভিতর যে রূপের ডাক, তার তৃষ্ণা, সেই পথে মিলিবার অজানিত আশা ও শব্দহীন ভাষা, তাহার ভিতর মেনকা রাণী তাঁহার বুদ্ধির দ্বারা 'কোথা যেতে চায়', ইহা ভাবিয়া পাইলেন না। কোন্ অজানিত মহাশূন্যের পানে এই ছোট মেয়ের প্রাণ ধায় কেন, তাহা মেনকা নিজের মনে মনে ঠিক ধরিতে পারেন নাই। তাই তিনি 'চাঁদ কিরে ধরা যায়' বলিলে, সে দুরন্ত মেয়ের মত বসনভূষণ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মা মেনকা তখন যেন আর সামলাইতে পারিলেন না! পিতা গিরিবর উঠিয়া কন্যাকে ভুলাইলেন। মুকুরে মুখ দেখিয়া মা উমা তখন শান্ত হইল। তখন দ্রষ্টা শ্রীরামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

'জগজ্জননী যার ঘরে।'

মেয়ের মুখ দেখিয়া সেই বিশ্বমাতার রূপের কল্পনা ও ধ্যান মনে পড়িল। শুধু মনে পড়িল নয়, জাতির জীবনের ধারায় যে পৌরাণিকী কল্পনা, আজও পর্য্যন্ত যাহার মেরুদণ্ড হইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া সেই জগন্মাতার ভাবটিকেও মিলাইয়াছেন। তাহার পর মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িল। এই যে বাৎসল্য রসের ছবি, ইহা বাঙ্গালার ষোলো রস হইলেও ইহার 'বিশ্বমোহ নাই। বাঙ্গালার জাত মারা যায় নাই। বাঙ্গালার সকল রং গঠন হাবভাব সকলই আছে, অথচ কাব্যের গানের যে প্রাণ, যেরূপ রূপান্তর, তাহাও হইয়াছে। যখন পেটের মেয়ের মুখে বিশ্বমায়ের রূপ এমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই রূপান্তর হয়।

আমি তুলনায় সমালোচনা করিতে চাই না। আমি আধুনিক বাৎসল্য-রসের একটি বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ এমনি করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে চাই।

খোকা মায়ে শুধায় ডেকে,
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?
মা শুনে কন হেসে কেঁদে,
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।
ছিলি আমার পুতুল খেলায়,
ভোরে শিব-পূজার বেলায়,
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে,
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।

যৌবনেতে যখন হিয়া—
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে!
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে,
জড়িয়েছিলি সঙ্গে সঙ্গে,
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে—
সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সম বয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে,
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে,
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।

এ সকল ছত্রের ভিতর এবার আমরা দেখিব যে, বাৎসল্য-রস কেমন ফুটিয়াছে। অবশ্য, ইহাতে ঘোরো বাৎসল্য-রস নাই,—কিন্তু ঘোরাল রকমের রস আছে বটে। এখন দেখিতে চাই, এর কি রকম বাৎসল্য-রস। মাতা তাহার সন্তানকে বলিতেছে,—

'ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে।'

কোন খোকা আজও পর্য্যন্ত

'এলেম আমি কোথায় থেকে
কোন খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'

বলিতে পারে কি না জানি না। ইহাতে কবি বোধ হয়, বুড়ো খোকার মত আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর তাহার জবাবগুলিও মায়ের মুখে তাঁহার নিজের বুলি বসাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহাকে ইংরাজী গীতি-কবিতার কথা বলিয়াছি, ইহা সেই বিলাতী ছাঁচে তৈরী। ঋগ্বেদের ১২৯ সূক্তের ৪এর শ্লোকে আছে,—"কমাস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" সর্ব্বপ্রথমে ইচ্ছার আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে মনের প্রথম উৎপত্তি-কারণ নির্গত হইল।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইহার বাঙ্গালা তর্জ্জমা করিয়া গেছেন। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্ক চালনার দ্বারা এই ইচ্ছার স্থানে মায়ের মুখে প্রজাপতি ঋষির বাক্যটি বসাইয়া দেওয়া খুব সম্ভবও নয়। কেন না, বেদ তাহার পরে বলিতেছেন যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন—আশ্চর্য্য নয়!

বিশ্বমায়ের অন্তরের ভিতর মা হইবার ইচ্ছা অথবা মায়ের অন্তরের মা হইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে এবং নারী তাহার নারী-জন্মে। সংস্কারগত বুদ্ধিতে এ কথা মনে করিতে যে পারে, তাহা বলিতে পারেন। তবে তাহাকে এই ইচ্ছার সঙ্গে এক'ত্ম করিবার বুদ্ধি মায়ের মধ্যে থাকে কি?

তাহার পর কবি যতগুলি শ্লোক রচিয়াছেন, সবগুলির ভিতর কোন একটিতেও মা'র কথা নাই। মায়ের মুখের দার্শনিক কবির বুদ্ধির ভাষা ছন্দে গাঁথা। ইহাতে বাৎসল্য-রসের গভীরতা দূরে থাকুক, রসিকজন ইহাতে বুদ্ধির খেলাই দেখিতে পান, রসের কোন আভাসই পান না। যৌবনে মাতার অঙ্গে অঙ্গে সৌরভের মত মিলিয়া থাকা, নিত্য-কালের পুরাতন হওয়া, জগতে স্বপ্ন হইতে এই আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আবার তাহার মায়ের রূপে ফুটিয়া উহা একটা বুদ্ধির কারচুপি হইতে পারে, ইংরাজী সাহিত্যের ধারার বুদ্ধি-রস হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে বাৎসল্য রস বলে না। যে বাঙ্গালী সত্য পিতা হইয়াছে, যে বাঙ্গালী সত্য মাতা হইয়াছে, সে এমন করিয়া ভাবেও না, মনেও করে না। তার পর কবি ঐ কবিতার শেষে বলিতেছেন,—

জানিনে কোন মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দু'টির আড়ালে!

এই শেষ কয় ছত্রে একটা সত্য সত্যই মায়ের প্রাণের ভাবের কথা বটে, তাহা অস্বীকার করি

না, বিশ্বের ধন বলিয়া সন্তানকে মনে করা খুব অসম্ভবও নয়, তবে কোন স্বাভাবিক মাতাই নিজের ছেলেকে 'বিশ্বের ধন' মনে করেন না! জগতের সেরা মাণিক মনে করিতে পারে, কিম্বা সন্তানের মুখে ভগবানের সৃষ্টিসম্পর্কের গূঢ় বাৎসল্য-রস প্রাণে জানিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকাশ এরূপ নহে। ইহার আগাগোড়াই কবিতা নয়, রস নয়, বুদ্ধির দ্বারা, ছন্দের দ্বারা জোর করিয়া কবিতার প্রাণ সৃষ্টি করিয়া তোলা। ইহা বাঙ্গালার গান, রাগিণী, কবিতা নয়; তাই আবার বলিতে হয় যে, বুদ্ধিমান্ অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন।

এই ধরায় যে স্বর্গের কল্পনা ও আভাস পাই, পরিপূর্ণ আনন্দের উচ্ছল ধারায় নিজেরা আর্দ্র হইয়া যাই, এমন করিয়া সেই গলাইয়া মজাইতে পারে শুধু প্রেম। প্রেমই সেই সুরের ধ্যানে আমাদের এই সুখ-দুঃখ-সিক্তি জীবনকে সত্য জীবন করিয়া তুলে। পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে সত্য বস্তু দেখি প্রেম, এই মানুষের যে প্রেম, এই মানুষের যে বাৎসল্য, এই মানুষের যে মাতৃত্ব, তাহার সঙ্গে জগন্মাতার যে ভাব, সে সত্য অনুভূতি, রূপে, ভাষায়, সুরে রাম-প্রসাদের গানে ফুটিয়াছে, তাহা এই আধুনিক শিশু কবিতার জন্মকথায় নাই, থাকিতেই পারে না। কেন না, মাতার প্রাণের পরিচয় ইহাতে নাই, আছে শুধু জ্ঞানের বোঝা, তাহার দার্শনিক তত্ত্ব, মাতার যৌবনের সৌরভের স্মৃতি আর যে রহস্যের নিগূঢ় পরিচয় দিয়াছেন, সেই রহস্যের কথা।

'সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?'

এই যে রহস্যের ভিতর এক প্রশ্ন তুলিয়া খাড়া করা, এ রহস্য জগতের সকল রহস্যে মিলাইয়া দেখার মত ভাব, কবির নিজস্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুসন্ধানের পরিচয় হইতে পারে, ইহাকে রহস্য-রস বলা যাইতে পারে। এত বিচার বিপত্তি মা'র হয় না। মাতা সন্তানের মুখে বিশ্বের সকল পরিচয়ই পাইতে পারেন ও বিশ্বের মধ্যে সন্তানের সকল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কগুলাও দেখিতে পারেন, কিন্তু তাহা এমন বিচার করা পর্দা-ঠিক-করা শুষ্ক জ্ঞানের মধ্য দিয়া নয়, সে মাধুর্য্য আর এক রসের ধারা। সেই রসেই বাঙ্গালার জাত বজায় থাকে ও আছে; এই আধুনিক কবিতায় বাঙ্গালার জাত মারা গিয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিতায় এমন করিয়া আমাদের জাত হারাইতে আমরা প্রস্তুত নহি। আর একটা কথা, রামপ্রসাদের ঐ গানে শুধু বাৎসল্য রস নহে, মধুর-রসের ভিতর, যুগল সম্বন্ধের ভিতর, বাৎসল্য কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে ফুটিয়াছে, তাহা একটু মনে ঠিক করিয়া দেখিলে বুঝিবার অসুবিধা হইবেও না। দেশভেদে যেমন চেহারার পার্থক্য আছে, বিশিষ্ট জাতি আছে, তেমনি কবিতারও জাতি আছে।

ইহা ত গেল বাঙ্গালার খাটী কবি রামপ্রসাদ; ইঁহাকে অবশ্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেহ ফেলিবেন না; কিন্তু বাঙ্গালার কবিচিন্তামণি চণ্ডীদাসের যশোদার বাৎসল্য সম্বন্ধে একটি গান আছে। সেটি এই:—

"তুমি মোর প্রাণ-পুতলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় ভিতরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন
পাইয়া আনন্দ বড়ি।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ-হিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।

আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা ॥
মরুক এমন যত ধেনু গাই
তোমার বালাই লয়ে।
কালি হ'তে বাপু ধেনু গোঠ মাঠ
না পাঠাব বন দিয়ে ॥
কি বলিব মন্দ তোমার যুকতি
কানু পাঠাইয়া বনে।
না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে ॥
বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দূল ভুজঙ্গ রহে।
জানি বা কখন করয়ে দংশন
এ বড়ি বিষম মোহে ॥
আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি ॥
চণ্ডীদাস বলে অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায়।
এ না কভু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায় ॥"

ইহাতেও সেই ঘোরো বাৎসল্য-রস, তাহা ঠিক, কিন্তু এ ছাড়িয়া যে কখন বাৎসল্য হয় না, তাহাও ঠিক।

"আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হ'লে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি ॥"

মাতৃ-হৃদয়ের ভিতরের যে কথা, তাহা কি ব্যক্ত হয় নাই? খাঁটী বাঙ্গালী মায়ের ছেলের "ভাল মন্দ কিছু হওয়া" মা ছেলের সম্পর্কে সে কি প্রাণের অন্তরতম রসের কথা ফুটিয়া উঠে; তাহা যে মা'কে জানে, সেই সে বুঝে। যে জানে না, তাহার বুঝিবার উপায় মা'র আশীর্ব্বাদ। আধুনিক কবিতায় যে ছত্র দুইটিতে—

"হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই
কেঁদে মরি একটু স'রে দাঁড়ালে!"

আর চণ্ডীদাসের—

আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা।
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।"

এই দুই শ্লোকের সঙ্গে যে ভাবের মিলন আছে, তাহাতে কি প্রমাণ হয় না, বৈষ্ণবের বাৎসল্য সজীব —সত্যি নাড়ী-কাটার ব্যথার সাড়া? ইহাতে মাতার যৌবন-স্মৃতি-সুরভি মা'র মনের মধ্যেই আছে, ছেলেকে সে কথা জানাইবার অবসর হয় নাই। সন্তানকে পাইয়া মা'র মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইয়া মাতৃত্বের সার্থকতা হইয়াছে, মা দার্শনিকতা করিয়া কবির মুখে আর জন্মকথা কহিবার অবসর পান নাই।

চণ্ডীদাসের যশোদা ও রামপ্রসাদের গিরিরাণী এই দুই চরিত-চিত্রের যে রঙ, তাহা খাঁটী বাঙ্গালী মায়ের রঙে অঙ্কিত। মায়ের মুখের অঙ্কন, তাঁহার মুখের কথা ক'টি শুনিলেই তাহা বেশ কেমন আমাদের বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করে, মায়ের মতই মনে হয়। 'কোথা হইতে?' বা 'কোথায়?' এ সব প্রশ্ন তাহার মধ্যে পরিস্ফুট ব্যঞ্জনা না থাকিতে পারে। এখানে ভবিষ্যৎ ও অতীত বর্ত্তমানের মাতৃত্বেই পূর্ণতমরূপে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাতেই ডুবিয়া গেছে। এখানে জীবন মাতৃত্বে ও বাৎসল্যের মধুর রস-মুহূর্ত্তে কেন্দ্রগত স্থির ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল। এই প্রেমের চেয়ে সুন্দর কি আছে, এই মাতৃত্বের মত

পূর্ণতা আর কি আছে ? 'কোথা হইতে' ও 'কোথায়' ছেলের মুখের রূপ দেখিয়া মায়ের মনে ঠিক ঐ ভাবের রস ফুটে, এমন ত কখন মনে হয় না।

তাহার পর রামপ্রসাদের গান আমরা কয় ভাগে ভাগ করিতে পারি। কালীকীর্ত্তন, শিবসঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত ও তত্ত্বসঙ্গীত। রামপ্রসাদ তাহা ছাড়া বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার গীতি-কবিতার এই দ্বিতীয় পল্লবে আমরা রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। আজু গোঁসাই, রামদুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই যে ফেরঙ্গ কবিতা বাঙ্গালার এবং মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে ? তাহার গুরু রামমোহন রায়। "জবরদস্ত মৌলবী" রামমোহন বাল্যকাল হইতে আরবী ফারসী পড়িয়া যে ছাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ছাপে বাঙ্গালার ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া সমাজ-সংস্কারক রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্ম-সমাজ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা একসঙ্গে যেমন নমাজ পড়ে, সেই অনুকরণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিকতার উপর এত বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অযথা অন্যায় বিচার করিলেন। অবশ্য, এ কথা মানি যে, বৈষ্ণব তখন শুক্‌না মালার ঠকঠকিতে পরিণত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা দেশের তান্ত্রিক সাধনার ধারাও তখন কিছু বিশুদ্ধ ছিল না. অথচ রামমোহনের গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ও সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনায় প্রতি অযথা আসক্তি,—এ সকলের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এমন কি, এই দুই সাধন-পদ্ধতির সমালোচনায় তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জাত তুলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই। যদি বাঙ্গালা সাহিত্যে দেবদেবী চরিত্রের দুর্গতিই রামমোহনের আবির্ভাবের কারণ হয়,—যেমন আধুনিক কালের কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অতি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন,—তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, রামমোহনের দ্বারা সে নষ্ট-ধর্ম্ম ও লুপ্ত দেব-দেবী-চরিত্রের উদ্ধারসাধন বা সময়োপযোগী কোন সমন্বয়ই সাধিত হয় নাই। যাহা রামমোহনের প্রায় শতাব্দীকাল পরে পূতপ্রবাহিণী গঙ্গার তীরে তীরে কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে তাহার আভাস, উন্মেষ, তাহার বিকাশ, তাহার প্রতিষ্ঠা, তাঁহাদের জীবনে সেই মহাপ্রাণের প্রতিষ্ঠা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু রামমোহনে তাহা ছিল না,—হয় নাই।

তাই আমার মনে হয় যে, রামমোহন প্রতিভা-শালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গালার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কেন না, বাঙ্গালার নিজস্ব যে বৈষ্ণব ভাব যাহা বাঙ্গালার প্রাণকে, ধর্ম্মকে, জাতিকে, সমাজকে সকল রকমে বাঙ্গালার সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন—মায়াবাদী বেদান্ত ও কোরাণের সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রকে বেশ করিয়া গুলাইয়া দিলেন। অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী রামমোহন তাঁহার বুদ্ধির অসামান্য প্রতিভার ঘোরতর মল্লযুদ্ধ দেখাইয়া গেছেন, এ কথা অস্বীকার করিতে পারিব না। তবে এই কথা আমি বলিতে বাধ্য হইব যে, খৃষ্টান পাদরী-দের বিরুদ্ধে হিন্দুর হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না,—কখনই আসিত না, বাঙ্গালার ভাষাকে ইংরাজী করিতে পারিত না,—যদি তিনি আমাদের দেশের সাধনকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজী সভ্যতা সাধনা এমন করিয়া দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন।

রামমোহন আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার সাহিত্য,

ধর্ম্ম ও গান রামপ্রসাদের সুরে—তাঁহার আদর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ঠিক যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন—রামপ্রসাদ যে সুর গাইয়া গেলেন, রামমোহন ঠিক তার উল্টা সুর ধরিলেন। রামমোহন গান করিলেন,—

"অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যতে নির্ভর কর॥"

আর রামপ্রসাদের গানের সুর এই একটি গানে বেশ বুঝা যাইবে।

"আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয়-পদ সার করেছি,
ভবে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান,
মনের আগুন তুলবো না গো। ১
ধনলোভে মত্ত হোয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো,
আশা-রাহুগ্রস্ত হোয়ে,
মনের কথা খুল্‌বো না গো॥ ২
মায়াপাশে বদ্ধ হোয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো,
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো॥"

ইহার সঙ্গে চণ্ডীদাসের,—

"সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঁই।"

তুলনা কতক হইতে পারে, ভাবের ধারা দুই জনের একই পথে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের গান, গান নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ঔষধ গেলান।

রামপ্রসাদের পর বাঙ্গালায় আর খাঁটী বাঙ্গালী কবি জন্মে নাই। রামপ্রসাদ এই জগৎকে যেমন সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বের প্রাণকে যেমন মাতৃরূপে, জননীর মাতৃত্বের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন, নিজের প্রাণকে যেমন মাতৃত্বের রূপান্তরে লইয়া গিয়া, আপনি আত্মস্থ হইয়া তাহাতে নিজেকে ও নিজের প্রাণকে বিশ্বমাতাকে এক করিতে পারিয়াছিলেন,তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁহার রচিত আগমনী ও বিজয়া। বাঙ্গালাদেশে, বাঙ্গালাভাষায় তাহার আগে বা পরে, এমন আগমনী কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। আজিও বাঙ্গালার পল্লী গৃহে সহরের কোলাহলের মাঝে শরতে মহামায়ার সে আগমনী, পরিপূর্ণ সুরে দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ গাইয়া বেড়াইতেছে।

রামপ্রসাদের গানের ভিতর প্রেমের, মানুষের যে রূপান্তর হইয়াছিল, তাহার কাছে বিশ্বের দর্শনাদি-প্রতিপাদ্য গ্রন্থের বোঝা ও জ্ঞান গোষ্পদের তুল্য। মানুষ যখন প্রেমের ভিতর দিয়া স্বাধীন হয়, মিলিত হয়, তখন সে নির্ব্বাণ-মুক্তি চায় না, সে তখন তাহার প্রিয়তমের সহিত প্রাণের লীলাভঙ্গে আনন্দ-রস ভোগ করে—কে তখন তোমার মায়াবাদের সূত্র প্রতিপাদ্যের ধার ধাবে। তাই রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—

"চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি।"

ইহার সঙ্গে মহাপ্রভুর,—

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"

মিলাইয়া একই সুরের, একই ভাবের, একই স্রোতের টানে চলিয়াছে—

বাঙ্গালার শাক্ত রামপ্রসাদের প্রেম-ভক্তি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভক্তির ধারা, বাঙ্গালার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। বাঙ্গালার প্রাণ ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল।

রামমোহনের বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কথা তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে অনেক পাওয়া যায়, সেই সকল

প্রমাণ তুলিয়া দেখান বাহুল্য ভয়ে আমরা দেখাইলাম না। দু'একটা স্থান দেখাইলেই সুধীজন তাহা সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"* * * যে বালিসে পৃষ্ঠ প্রদান ও তাম্রকূট পানপূর্ব্বক আপন আপন ইষ্টদেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করাইয়া আমোদ করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎ-প্রমাণ হয়? এবং দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রায় নাপিতানীর বেশ ইষ্টদেবতার করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? ও বেসো, কেসো, বড়াই বুড়ী ইত্যাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার উপহাস করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়?"

রামমোহন রায় আজ নাই। রামমোহনের তর্ক-বিচার-ক্ষমতার কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না ও আমরাও করি না; কিন্তু প্রাণের অনুভূতির কাছে এই তর্ক-বিচার ও শাস্ত্র-মীমাংসা গোষ্পদের সঙ্গে তুলনীয়। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে মায়া নয়, আর ইষ্টদেবতা, ভগবান্ যে এই আমাদেরই মত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া লীলার মধ্যে আনন্দঘন চিন্ময়-রস আস্বাদন করিতেছেন, শঙ্করশিষ্য রামমোহন তাহা বুঝেন নাই। শাস্ত্রদর্শী রামমোহন তখনও রামানুজ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাহা হইলে তাঁহার এই মায়াবাদেও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে বাঙ্গালার শিরোমণি, তাঁহার পাণ্ডিত্যও কম ছিল না, শাস্ত্র ঘাঁটিতে তিনিও বিশেষ মজবুত ছিলেন, সকলের অপেক্ষা বড় কথা, আসল কথা, খাঁটি কথা এই যে, এই সব শাস্ত্রের অনুশীলনের উপরে যে প্রেমের সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাহা রামমোহনের ছিল না। আর সেই কারণেই দেশকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

আশা করি, রামমোহনের এই বেদান্তী মায়াবাদী ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির প্রাসাদের সমস্ত খিলান আলোচনা করিয়া সুধীজন দেখিবেন। আরব, পারস্য ও তুরস্কের মুসলমানী, দাক্ষিণাত্যি সভ্যতা ও বেদান্ত-মিশ্রিত খিচুড়ির উপর ফেরঙ্গ ভাষা ও ফেরঙ্গ যুগ আনয়নকারী রামমোহনকে বুঝিলে দেশের অনেকটা মঙ্গল হইবে এবং তবেই আমরা এই ফেরঙ্গ-যুগকে সমূলে পরিবর্ত্তন করিতে পারিব। কবি গাহিয়াছেন—

"বহুতক সাহস করো জিয় আপনা।
তেহি সহবাসে ভেট না সপনা॥"

জীবনের বহুতর সাহস কর, সেই প্রাণপতির সহবাসের খেলাই চলিতেছে। এ জীবন স্বপ্ন নয়,—সত্য। মায়া নহে, মিথ্যা নহে। অণু-পরমাণু হইতে বিরাট্ বিশ্ব সব সত্য, সবই তাঁর রূপ। ইহাই সত্য। এই সত্য হারাইয়াছি। মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি. পুরুষত্ব হারাইয়া এই স্ত্রী-জন-সুলভ আধুনিক দুর্ব্বল প্রেমের সাহিত্যে মসগুল হইতেছি। আমাদের নিজেদের উপর, আমাদের নিজেদের জীবনের উপর সে বিশ্বাস, সে আত্মনির্ভর হারাইয়াছি। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঐ যে চাষা মাটীর সঙ্গে কেমন করিয়া প্রাণ দিয়া পরিচয় লাভ করিতেছে, তাহা বুঝিবার কোনও সাধনা নাই। দেখিতেছি ধানের ক্ষেতের দোলা, আর ঐ আকাশের মেঘের রঙ। কিন্তু তাহার জীবনের পৃষ্ঠা আমাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের,—এই খোস-পোষাকী কর্পূর-সাহিত্যের,—এই শূন্য বিশ্বের দিকে উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত যে, বিশ্ব-সাহিত্য—তাহার পৃষ্ঠে কিছু ফুটাইতে পারিয়াছ কি? তাহাদের প্রাণের ভাবাভাব, সুখ-দুঃখ, তাহাদের যে বিচিত্র রূপের লীলা, তাহা কি কখন এক দিনের, এক মুহূর্ত্তের অনুভূতিতে আনিতে পারিয়াছ? বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা ত দূরের কথা—সে সাধনা, সে সাধনের পথে যাহারা যায় নাই, তাহারা তো তাহা কোনরূপেই প্রাণের অনুভূতিতে আনিতে পারিবে

না। যদি পারিতে, তাহা হইলে মা'র, এ সাহিত্য-মায়ের অঞ্চলে অমনি সোনা ফলাইতে পারিতে, তোমাদের মানব-জন্ম এমন পতিত জমীর কাঁটা ও ঘাসে ভরিয়া যাইত না; আবাদ করিলে সোনা ফলিত। শুধু তাহার আকাশ ও বাতাস তোমার প্রাণে বাঁশী বাজাইত না। তাহার প্রাণের রাগিণী তোমার বাঁশরীতে প্রাণময় সুরের রূপ ধরিয়া দেখা দিত। সুরের আবীর হাওয়ায় হানিতে হইত না। তাহার তীব্র বেদনা আকাশ ফাটাইয়া ফুকারিয়া উঠিত। নকল করিয়া এমন নাকাল হইতে হইত না। জীবন আপনি তোমাদের কাছে ধরা দিত। সাহিত্য ও জীবনে কখন ছলনা চলে না। জীবন লইয়া আজ সাহিত্যের বাজারে যে খেলা চলিতেছে, এ খেলা নয়; নবযৌবনের দলের লীলা নয়; ইহা বিলাতী Coquetry জীবনের সঙ্গে প্রাণের ছলা।

বাঙ্গালার অঙ্গনে এই একটা সুন্দর অদ্ভুত ধারা দেখিলাম। সে মুসলমানী ধারার পাশে যেমন রামপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাঙ্গালার প্রাণের স্রোতকে অনাবিল ভাবে বহাইয়া লইয়া গেছেন, ঠিক তেমনি রামমোহনের সময়ে কবিওয়ালার দল, রাম বসু, হারু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী প্রভৃতি বাঙ্গালার খাঁটি কবির দল সেই সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। এই কবিওয়ালা-দের গানের যুগের কথা আমি আর একবার বলিতে চেষ্টা করিব। কবিওয়ালাদের শেষভাগে ঈশ্বর গুপ্তের যে হাস্যরস, তাহার কথাও কহিব।

এই ফেরঙ্গ যুগের সঙ্গে বাঙ্গালার প্রাণের এক বিরোধ পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে সে একবার করিয়া সচকিত হইয়া নিজের মূর্ত্তিকে জাগাইয়া তোলে, মুসলমান যুগেও তাহাই করিয়াছিল, আজ ফেরঙ্গ যুগেও তাহাই করিতেছে। এক দিকে মুসলমান-ফেরঙ্গ-ধারা আর অন্য দিকে বাঙ্গালার নিজের ধারা। কবে মাটী আবার সেই ধারার মূর্ত্ত পুরুষকে জনম দিবে, তাহারই আশায় বসিয়া আছি।

অন্ধকার আকাশ, আকাশে তারা নাই, দেশ-বাসী অসহরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে তমসাচ্ছন্ন অবসাদ। এক দিকে এই অরূপের বিশ্ব মোহ, তাহার সে জ্ঞান নাই, তাহার ভবিষ্যৎ নাই, অতীত নাই- সব গিয়াছে। সংসার জ্বালাময়! সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, কোথায় বাঙ্গালার আত্মা! জাগরিত হও, বল— সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল, এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল, আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব। আমার জীবন আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচনা করিব। গ্রহ-নক্ষত্র জ্যোতিষ্কের দূরাগত পদধ্বনি কানে আসিতেছে, বাঙ্গালা এ মিথ্যা রূপক ত্যাগ করিবেই করিবে। হে বাঙ্গালার সন্তান! মুখ তোল, সত্যকে—জীবনকে মুখোমুখি দেখ, ভাল করিয়া পরিচয় করিয়া লও, দেখ, ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, বিশ্বাস ও প্রেম বুকের ভিতর, ভবিষ্যৎ আমাদেরই।

রূপান্তরের কথা

রস বিচারের বিষয় নহে, অনুভূতির বস্তু। কল্পনায় যাহার উন্মেষ, সত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা, জীবনে তাহার চরম অনুভূতিই জীবনের ধর্ম্ম, কল্পকলা সেই রসের অনুভূতিকে রূপের আশ্রয়ে প্রকাশ করে। বিচিত্র রূপে, বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, সুরে, মহাভাবের আবেগে কি আভা যে, মানুষের জীবন-কুঞ্জে তাহার স্ফূর্ত্তি হয়। এই জীবনের রূপ ও রঙের খেলার মাঝে প্রাণ-নিকুঞ্জে যে দিন বাঁশী বাজিয়া উঠে, সে দিন সে মুহূর্ত্তেই সুন্দর মধুর রূপে বিশ্ব ভরিয়া যায়, আর অনেক দিনের অন্ধকারের অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়ে। জীবনের এই যে অনেক দিনের জড়তা, তাহা নির্ব্বিষ খোলসের মত পড়িয়া থাকে; বিশ্ব-প্রকৃতি মধুররূপে হাসিয়া চায়। এক আত্মা মহা-ইন্দ্র-সম সহস্র কটাক্ষে দেখে, জগতে সুন্দর-কল্যাণ, মধুর-মঙ্গল গ্রহ-নক্ষত্র, ঋতু-কাল-মাস-বর্ষ, তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ-লতা, নদ-নদী, শ্যামায়মান প্রান্তর, অভ্রভেদী হিমালয়, তরঙ্গ-চঞ্চল বিশাল সাগর সেই একই রূপের রূপবৈচিত্র্যে আপনার আত্মবিকাশ করিতেছে।

বাঙ্গালার গীতি-কবিতায় আমি সেই আত্মবিকাশের কথাই বলিয়াছিলাম। সেই রূপান্তরের কথা, সেই রূপ হইতে রূপে বিলাস-বিবর্ত্তের কাহিনী, সেই মহাভাবের সাধনা, সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার প্রতিষ্ঠার কথাই কহিয়াছিলাম।

যে আলো লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে আলোক যে আমার প্রাণে জাগিয়াছে। মরমের 'মণিকোটায়' নিজের যে লুকান আলোক জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে ত' চাপিয়া রাখা যায় না। আত্মা যে আপনার বিকাশ আপনি আপনিই করে। তাই সেই প্রদীপ হাতে করিয়া ঘরে ঘরে প্রাণের দুয়ারে দুয়ারে সেই নির্ব্বাণ দীপগুলি জ্বালাইয়া দিতে চাই। আমি কানে যে সুর শুনিতেছি, সে সুর আমার দেশবাসীকে আমি শুনাইতে চাই। যে প্রদীপে আমার প্রাণ জ্বলিয়াছে, সে প্রদীপ আমার বাঙ্গালার ঘরে ঘরে জ্বালাইতে চাই। বাঙ্গালা আপনার আত্মবিকাশ আপনি করিবে, আপনার গান আপনি গাইবে, আপন সাধন দ্বারা সেই সিদ্ধি লাভ করিবে ও আপন গৌরবে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে। আমিই দেখিব, আমাদের ঘরে ঘরে সেই প্রদীপ জ্বলিতেছে; আমরাই শুনিব, সেই বাঁশরী কত বিচিত্র রাগিণীতে বাজিতেছে। তোমার প্রাণের উজ্জ্বল ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া চল, দেখিবে, তোমারই আকর্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে; দেখিবে, তোমারই-আলোকে চন্দ্র-সূর্য্য আলোকিত হইয়াছে। চাই শুধু—প্রাণের আন্তরিকতা, চাই শুধু—জীবনকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা, চাই শুধু—আত্মার দীপ হাতে করিয়া প্রতি পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে পথ চলা।

আমি শুনিয়াছি, আমার কথাগুলি নাকি অনেকে বুঝিতেই পারেন না। আজ আমি সেই কথাগুলি আরও ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমার বাঙ্গালা কেমন করিয়া সুখে দুঃখে সোহাগ-আবেগে নিত্য নূতন হইয়াছে, বিচিত্র হইয়াছে, রসের সঙ্গে রসের মিলন ও বিরোধে কেমন করিয়া মরা বাঙ্গালী

গান গাইয়াছে, তান তুলিয়াছে, সেই গানের কতটা খাঁটি, কতটা মেকি, তাহারই কথা বলিয়াছিলাম। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার গীতিকবিতার ধারা কেমন করিয়া বহিয়াছিল, মহাপ্রভুর জীবনের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার অপূর্ব্ব বেগ ও স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, কেমন করিয়া আবার সেই ধারা, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় কি আকার ধারণ করিয়াছিল, আবার সেই ধারাই কবিওয়ালাদের গানের মধ্যে কেমন করিয়া মধুর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর মত বহিয়া গিয়াছিল—সেই গীতিকবিতার ছবি আঁকিতে আঁকিতে ও সেই ধারাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য 'রূপান্তরের' কথা বলিয়াছিলাম। আজ আমি সেই রূপান্তরের প্রাণধর্ম্মের কথা শুনাইতে চাই।

কিন্তু সাধারণ জ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের তর্কবিতর্কের ঘোর মোহজাল রচনা করিলে নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইতে হয়। যাহা চাই, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লওয়া সহজ,—শুধু তর্কে তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। জীবনের রসানুভূতির ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে হয়। আপনার প্রাণের মধ্যে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের সঙ্গে স্নেহ চাই, ভক্তি চাই, প্রেম চাই। তাহা না হইলে, যাহাই বলি না কেন, যত তর্কই করি না কেন, যাহা চাই, তাহা কিছুতেই মিলে না। এই তর্ক-যুক্তি কথা-কাটাকাটিতে যাহা পাওয়া যায়—ইহা বাহ্য! তাই মীরাবাই গাইয়াছেন—

"বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা"

আমি দার্শনিক নহি, বিজ্ঞানবিদ্ নহি,—আমি প্রাণধর্ম্মের ধর্ম্মী। আমি সেই প্রাণ-চিন্তামণির আলো লইয়া ঘুরিতেছি—সেই কাব্যলোকের কথাই বলিতে চাই। রূপান্তরের কথা সেই কাব্যলোকের কথা। সে কাব্য-লোক প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে। সে লোক যে মধুর উজ্জ্বল। জীবনের ধারায় প্রাণকে খুঁজিতে খুঁজিতে, যে দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই রূপান্তর হয়। আমার এই প্রাণ যখন জাগরিত হইয়া মহাপ্রাণের আলোকে নিজেকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া তুলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার নিজের সত্য পরিচয় লাভ হয়। সেই কথাই রূপান্তরের কথা,—ইহাই প্রকৃত কবিতার কথা।

কথাটি আরও বুঝাইয়া বলিতে হয়। একটি ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, মনের সাধারণ অবস্থায় শুধু চক্ষু দিয়া দেখিলে একটি রূপ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সেই রূপ কি ফুলের প্রকৃত রূপ, সমগ্র রূপ? ফুল কি শুধু এক দিনে এক মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে? তাহার মধ্যে কি জন্মজন্মান্তরের কাহিনী লুক্কায়িত নাই? কত কাল ধরিয়া সে যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছিল—কতবার ঝরিয়া ঝরিয়া আবার ফুটিয়া উঠিল! কে তাহা গণনা করিবে! তাহার রঙের প্রতিরেখায় যে অনন্তকালের ছাপ, তাহার প্রত্যেক পাপড়ীর মধ্যে যে অনন্তকালের সুখ-দুঃখ জড়াইয়া আছে, তাহার প্রত্যেক কাঁটার মধ্যে যে অনন্তকালের বিরহবেদনা জাগিয়া আছে। ফুল ত' শুধু ফুল নয়, সে যে সকল বিশ্বের মহাপ্রাণ, তাহারি প্রাণকণিকা সে যে অনন্ত লীলাময়ের লীলা-সহচর! তাহার মধ্যেও যে বিশ্বরূপ জাগিয়া আছে। সকল বিশ্ব যে প্রাণময়, সকল রূপ যে চিন্ময়! সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে একমেবাদ্বিতীয়ম্! সকল জীবজন্তু, তরু, লতা, সকল পদার্থ যাহাকে তুমি অচেতন ভাবিয়া হেয় জ্ঞান কর, সবই যে সেই এক মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত, সবই যে একই চিন্ময়, অনন্তরূপে উদ্ভাসিত! ফুলও অনন্ত! তুমিও অনন্ত! তুমি যদি তোমার মনগড়া সাধারণ জ্ঞান কি বিজ্ঞানের ঠুলি চোখে পরিয়া ফুলের এই অনন্ত রূপ না দেখিতে পাও, তাহাতে কি ফুলের স্বভাব, কি ধর্ম্ম বদলাইয়া যাইবে?

শুধু চক্ষে যাহা দেখি, তাহা ফুলের সাধারণ রূপ। আবার সেই ফুল, যখন আমি তাহাতে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া প্রাণ দিয়া দেখি, যখন সেই ফুলটি আমার ধ্যানধারণার বিষয় হইয়া উঠে, আমার রস-সাধনার মূর্ত্তি হইয়া জাগে, তখনই ত' আমার প্রাণের সাক্ষাৎ লাভ করি। তখন দেখিতে পাই, আমার প্রাণ যে অতল অনন্ত, আর আমার ফুল যে আপন গৌরবে তাহার বিশ্বরূপে, চিন্ময়রূপে, অনন্ত হইয়া আমারি প্রাণের মধ্যে ফুটিয়া আছে! তাহার সঙ্গে রসের লীলা চলিতেছে—তখনই রূপান্তর।

আমাদের সকলের জীবনেই এইরূপ রূপান্তর ঘটে বা ঘটিতে পারে। একটি নারী-মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রথম প্রেমের উন্মেষ হয়। প্রেম জাগিবার আগে সেই নারীর যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাই কি তার যথার্থ রূপ? অনুরাগের অবস্থায় যখন তাহাকে দেখি, তখন যে প্রাণ দিয়া দেখি! তখন যে আমার প্রাণকে দেখিতে পাই এবং সেই প্রাণের যে চক্ষু, সেই চক্ষু দিয়া তাহাকে দেখি! তখন যে—

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ-মূরতি
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে!

যতই আমরা প্রাণের সাক্ষাৎ পাই, ততই যে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠে! অনুরাগ গাঢ় হইলে—

আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ!

তার পরে সেই মূর্ত্তি যে আমার ধ্যান-ধারণার বিষয় হইয়া পড়ে!

সেই—সেই তরঙ্গিত পরাণ-মূরতি
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি।
সকল লাবণ্যে গড়া রূপে ঢল ঢল
পরাণ-তরঙ্গে সেই স্থির শতদল!
সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত!
সকল রকম মাঝে সব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায়!—
সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়,
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায়!

তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেই শুভক্ষণে তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সে যে আমার মাহেন্দ্রক্ষণ—সেই মুহূর্ত্তই যে আমার জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত! আমি আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহারও সাক্ষাৎ পাইয়াছি!

সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার
নহ মিথ্যা! সত্য তুমি! সত্যরূপাধার!
অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর
রূপ-রস-গন্ধ-ভরা আত্মার মন্দির!
পদতলে কলকলে কাল উর্ম্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা!

তখনই মনে হয় যে এই প্রেম যে অনন্তের পথে যাত্রা করাইয়া দিয়াছে। একটা অপূর্ব্ব শুদ্ধ পবিত্র-ভাবে প্রাণমন ভরিয়া যায়। মনে হয়, কোথায় কাহার সন্ধানে চলিয়াছি। যাহাকে দেখিয়া প্রেমের উন্মেষ হয়, সে যে কোন্ মহাদেবতার জাগ্রত জীবন্ত বিগ্রহ। কাহার উদ্দেশে অভিসার করিয়াছি, কোন্ মহাসাগরের দিকে আমার জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে! তখনই বাঞ্ছিতকে বলি,—

রাখ বুকে বুক কর গো হৃদয়ঙ্গম
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর-সঙ্গম
পানে বহে চলিয়াছে, কার পিছে পিছে
শুনি কার শঙ্খধ্বনি—

তার পর এই প্রেম যখন আরও গাঢ় হয়, তখন প্রাণের দুইটি তীর ভাসাইয়া দেয় এবং সেই স্রোতের মধ্যে কত কি জাগিয়া উঠে! তখনই গাহিয়া উঠি,—

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা
যে দীপ জ্বালেনি ওরে! সেই দীপ জ্বালা
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল বুলায়ে রঙ্গে?—
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা!
এই যে হৃদয়-মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে!—
যে দীপ জ্বলেনি আগে
ওরে! তারি আলো জ্বালা!

তার পরেই মনে হয়, এই যে প্রেমের খেলা, এ যেন তিন জনের খেলা—এক জনের লীলা। সেই এক জনের চরণ-নূপুরের রুণুরুণু প্রাণের মধ্যে শুনিতে পাই। সে যে হাসিয়া হাসিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া আমার প্রাণের মধ্যে নাচে। এই প্রেমের যত না মাধুর্য্য সবই যেন নিজে আস্বাদ করে। আমরা যেন তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার আনন্দ-মন্দিরে তাঁহারি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিই। তখন আমাদেরও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। তখনই প্রেমিক গাহিয়া উঠে,—

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে,
হৃদয়-কমল-মাঝে কি ধুম লেগেছে

*　　*　　*　　*

কে নেয় রে মধু মিটি
হেসে হেসে কুটি কুটি?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি?
ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধুম লেগেছে
পরাণ-কমল-মাঝে কি জানি জেগেছে!

যখন দেখিলাম, হৃদয়ের মাঝে "কি জানি জেগেছে," পরেই দেখিলাম, "কে জানি জেগেছে।" তখনই উপলব্ধি করিলাম যে, এ প্রেম ধন্য, তখনই আমার যে প্রেমের সহচর, তাহার দিকে চাহিয়া গাহিয়া উঠিলাম,—

ওগো ফুল! ওগো মিষ্টি!
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি!
ধন্য আমি, ধন্য তুমি,
পুণ্য সে মিলন-ভূমি!

তখন যে আমার হৃদয়বিহারী করতালি দিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন, আমি আবার গাহিলাম,—

কে বলে রে ধন্য ধন্য?
কে দেয় রে করতালি?
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে?
কে বলে রে ধন্য ধন্য
এ কার নূপুর বাজে?
কার পদরজঃ
পরাণ-পঙ্কজ
শোভা করে?—

তখনই কি প্রেমিক তাহাকে দেখিতে পায়? তখনও নহে। এই প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন না করিলে তাঁহাকে দেখা যায় না। এই প্রেম ব্রত উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। সকল জীব যে

"ঠেকে গেছে প্রেমের দায়"

এক জন্ম হউক, অসংখ্য জন্ম হউক, এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইবেই হইবে। যখন সেই শুভক্ষণে প্রেমিক দেখিবে, তাহার চোখের কাছে প্রাণের মধ্যে, তাহার অন্তরে বাহিরে দুই বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হৃদয়ের হৃদয়বিহারী চিন্ময় চিদানন্দকে পূর্ণ আনন্দরূপ ঘন রসামৃত-স্বরূপ তাহারই প্রেমের প্রেমিক ভগবান্!

এই যে প্রেমের কতকগুলি অবস্থা নির্দ্দেশ করিলাম, ইহার প্রত্যেক অবস্থাই রূপান্তরের অবস্থা, শেষ অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাই রূপান্তরের চরম। এই প্রত্যেক অবস্থাই সত্য, এই সমস্ত অবস্থা লইয়াই প্রেমের রাজ্য।

সেই প্রথম যখন রূপ আসিয়া চোখের সাম্নে দাঁড়াইল, সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই শেষে যখন সকল রূপের যিনি স্বরূপ, তিনি আসিয়া প্রাণের সম্মুখে প্রাণের মধ্যে দাঁড়াইলেন—এই সব লইয়াই যে প্রেম, এই সব লইয়াই একটি অখণ্ড সত্যরাজ্য। ভগবান্ যে বাঁশী বাজাইয়া তাঁহার নিকট ডাকেন। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইন্দ্রিয়ের ডাকও সেই ভগবানের ডাক। ইন্দ্রিয়-জগতে যে প্রেমের আরম্ভ, অতীন্দ্রিয়-জগতে তাহার পরিণতি। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মই এই যে, সে আঙ্গুল দিয়া অতীন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই যে অখণ্ড সত্যরাজ্য, ইহার কোন অংশই বর্জ্জন করা যায় না,— করিলে সত্যের অঙ্গহানি হয়। এই সমগ্র সত্যটি যখন আমাদের প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তখনই আমাদের সাধারণ জ্ঞানের যে প্রেম, তাহার রূপান্তর ঘটে। প্রেমের যে স্বভাব, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না, শুধু আমাদের চোখ খুলিয়া যায়, প্রেম আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে কবির প্রাণে এই সমগ্র অখণ্ড সত্যের প্রদীপ জ্বলিয়া না উঠে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন যে, কলাকলার সাধনা এ জীবনে শুধু বিলাসের জিনিস, ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম অর্থে ইংরাজেরা যাহাকে religion বলে, শুধু তাহাই বুঝেন। আমরা জীবনটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করিতে শিখি নাই, আমাদের ধর্ম্ম জীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আমরা জানি ও বুঝি যে, সকল কলাকলার ভিত্তি রস-সাধন, সকল কলাকলার উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। সুতরাং সকল রসের আকর যে রসময়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কোন রস-সাধনই সার্থক হইতে পারে না। রস সাধন না হইলে রস-সৃষ্টিও বিড়ম্বনা। বিলাসের ধর্ম্মই এই যে, সে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সে যে আপন বিলাসের বিষয় লইয়া তন্ময় হইয়া পড়ে ও আপনার আবেগে ইন্দ্রিয়রাজ্য অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয়রাজ্যে পৌঁছায় এবং সেইখানে তাহার রূপে রূপে রসে রসে বিলাসবিবর্ত্ত! মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে এই বিলাসবিবর্ত্তের কথাই শুনিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহারা শুধু ইন্দ্রিয়রাজ্যের যে বিলাস, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের খোঁজ পায় না, সেই রূপে রূপে রসে রসে বিলাস-বিবর্ত্তের সন্ধান রাখে না, শুধু ইন্দ্রিয়রাজ্যের মধ্যে বিলাসকে আবদ্ধ করিয়া সেই বিলাস লইয়া একটা মন-গড়া অসার কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে কলাকলার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহাদের আমি তর্ক করিয়া কিছুই বুঝাইতে পারিব না— শুধু বলিব, এই যে বিলাস, যাহার এক দিক্ দেখিতেছ, অপর দিক্ দেখিতে পাইতেছ না— ইহা বাহ্য!

আবার কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রামের কথা তুচ্ছ নিম্নস্তরের কথা; কলাকলায় তাহার স্থান নাই। ইন্দ্রিয়ের বিষয় কলাকলার রাজ্যে প্রবেশ করিলে কলাকলা অপবিত্র হইয়া যাইবে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। নীতির কথা বল, তত্ত্বের কথা বল, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে যাহা আছে, সব কাটিয়া ছাঁটিয়া দাও, ইন্দ্রিয়ভোগের যে স্পৃহা, তাহার নাম মুখে আনিও না, মানুষকে দেবতা করিয়া তুল, কলাকলার দোহাই দিয়া জীবনকে অপবিত্র করিও না। জীবনকে অপবিত্র করে কাহার সাধ্য? জীবনের জীবন যে ভগবানের লীলা, সেই লীলাময়ের লীলার উপরে

হস্তক্ষেপ করে, এমন অহঙ্কার—এমন দাম্ভিকতা কার? মানুষ কি এই পর্দ্দাঘেরা নীতি-কথা বুকে বাঁধিয়া মিথ্যার উপর দাঁড়াইয়া মিছামিছি বিনাকারণে দেবতা হইয়া উঠিবে? মানুষের প্রবৃত্তি কি সত্য নহে? মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে কি ভগবানের সাড়া পাওয়া যায় না? আজও কি চৈতন্যের দেশে এ কথা শুনিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের খেলা সয়তানের খেলা? আমরা কি ইংরাজী আমলের প্রথম অবস্থায় যাহা মুখস্থ করিয়াছি, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না? ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান মিলে না? ইন্দ্রিয় যে অতীন্দ্রিয়ের ভিত্তি, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়া একটা মন-গড়া শুদ্ধ পবিত্র লোকের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া যেমন, শূন্য আকাশে গৃহ-নির্ম্মাণের চেষ্টাও ঠিক সেইরূপ! মিথ্যা কল্পরাজ্যে তাহা স্থান পাইতে পারে, সত্য-রাজ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে যে, তাহার ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের যে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই? কাহারও প্রাণে সেই বংশীধ্বনি খুব স্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠে, কাহারও প্রাণে খুব ক্ষীণ ও অস্ফুটভাবে ধ্বনিত হয়; কিন্তু একেবারে শুনিতে পায় না, এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে? যদি থাকে, তবে আমাকে বলিতেই হইবে যে, তাহার জীবনের কোন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। সে কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করিয়া বসিয়া আছে, জীবনের কোন সন্ধান পায় নাই। সে যে দিন সেই নিয়মগুলি ভুলিতে পারিবে, সে দিনই প্রথম সত্যরাজ্যে পদক্ষেপ করিবে। সে পর্য্যন্ত তাহার জন্য কোন কল্পকলার রূপসৃষ্টির প্রয়োজন নাই। তাহাকেও আমি কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে পারিব না। যে দিন লীলাময় আপনি বুঝাইবেন, সে দিন বুঝিবে। এখন শুধু মহাপ্রভুর তাবায় এইটুকু বলিয়া রাখি,—ইহ বাহ্য!

কেহ কেহ বলেন, মানুষকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাকে কাজের লোক করিয়া তুলিতে হইবে, সাধারণে যাহাতে তত্ত্বকথা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে, জনসাধারণে যাহাতে তাহার প্রচার হয়, কল্পকলার বিষয়কে এমন করিয়া গড়িতে হইবে। তাহাদেরও উত্তর—ইহ বাহ্য!

আবার কেহ কেহ বলেন, সমাজের সংঘাতে যখন ব্যক্তির জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, পরাধীন যখন তাহার শৃঙ্খলের ভারে নড়িতে পারে না, তখন কাব্যরস মানুষের প্রাণকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করে; তাহাকে একটা স্বপ্নের ঘোরে লইয়া যায়। এই স্বপ্নের জন্য, জীবনকে এই স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারী করিবার জন্য কল্পকলার সৃষ্টি। তাহারও উত্তর—ইহ বাহ্য!

কেহ কেহ বলেন, যাহা শুধু হিতকর, যাহা কোন অশুভ, ক্ষতি, কোন অমঙ্গল আনে না, তাহাই সুন্দর ও যথার্থ কল্পকলা। তাহাদেরও আমি বলিব—ইহ বাহ্য!

কল্পকলা যদি শুধু আমাদের আনন্দ ও আমোদের জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন ধর্ম্ম থাকে না, তাহার আত্মবিকাশ হয় না, আমাদের কতকগুলা ভাবের খেয়ালের ছাঁচে পড়িয়া তাহার জীবনের আসল প্রাণটুকু মরিয়া যায়! তাহার কোন সার্থকতা হয় না। সত্য তখনই সুন্দর হয়, যখন তাহার এই বহিরাবরণের ভিতর ছাপাইয়া সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত ভাবকে বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়। মানব-প্রকৃতির গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশের যে প্রাণের খেলা, তাহাই যখন সে প্রকাশ করে, যখন আত্মার নিগূঢ় কথাটি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তখনই কল্পকলার রূপসৃষ্টি হয়। বিশ্বের অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার যাহা সাধারণ জ্ঞানে সাদা চোখে বন্ধ থাকে, মানবের সেই 'ভিতর-গাঁয়ের' কথা,—কাম-কামনার অতীত যে

মাধুর্য্য, সেই আত্মার রসভোগের যে ব্যঞ্জনা, বিশ্বশক্তির যে মূর্ত্ত স্ফুরণ, মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মায় আত্মায় যে রমণ, কলকলা তাহারই চাবি,—সেই চাবি ঘুরাইয়া আত্মা নিজের রূপের আদর্শটিকে সেই অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির করিয়া আনে।

বিশ্বের যে দিকে নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখি,—দেখি, প্রতি পত্রে, প্রতি রঙে, প্রতি রূপে সেই আত্মার প্রতিরূপ। ঋতু আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে মানবের কার্য্যকারণের সম্বন্ধে, প্রকৃতির বিপ্লব-বহ্নিদাহে, মানুষের নিজকৃত স্বকপোলকল্পিত নানা শক্তির বিকাশে, এক মহা সুশৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলায় যেন এই বিশ্ব অহরহঃ আন্দোলিত হইতেছে আঁখির সম্মুখে বাস্তব সত্য-জগৎ প্রতিভাত, কিন্তু তাহাতে সেই অন্তরতমের যে রূপ, তাহা আমাদের চোখে পড়ে না। কলকলা সেই অন্তরের রূপটিকে বিশ্বের বুকের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করে, যাহা মায়া বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার সত্যরূপকে জাগাইয়া দেয়। যাহা এমনি আমাদের চোখে পড়ে, যাহার ভিতর সেই অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ হয় না, কলকলার সেই সত্যকে মনের কাছে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া ধরিয়া দেয়। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণের কাছে সেই সত্যকে আনিয়া দেয়। রূপে রূপে রসে রসে যে লীলা, তাহার ধ্যানগত অনুভূতিই কলকলার বিভূতি। কলকলাবিদ্ সেই বিভূতি দর্শন করেন। যাঁহারা সত্যের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে পরানুরক্তির আসক্তি জাগিয়াছে, যাহাদের চিত্ত সর্ব্বভাবে সেই পরানুরক্তিতে ভিজিয়া গিয়াছে, যাঁহাদের ভাব সেই রসের মধ্যে গাঢ়তা লাভ করিয়াছে, সেই প্রাণ-মন-দেহ দিয়া অনুধ্যান, সেই অহৈতুকী সান্নিধ্যলাভের জন্য যাঁহাদের প্রাণ প্রেমরসে বিভোর হইয়াছে, তাঁহারাই কলকলার স্রষ্টা।

মনের যে আকাঙ্ক্ষা, সে সত্য বস্তুকে সুন্দর করিতে চায়। শুধু তাহার একটা ভাবের আভাষে প্রাণ ভরিয়া উঠে না, তাহাতে সে তৃপ্ত হয় না। সেই রূপরসের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিকে ধরিতে চায়, তাহাতে দোষ হয় এই যে, বস্তু তাহার নিজের স্বাধীন ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। সে তখন আমার আকাঙ্ক্ষার, কামনার ভোগ্য দাস হইয়া দাঁড়ায়। তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে বাধা পায়। তাই তখন আর সুন্দর থাকে না। বস্তুর যে নিজের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও গতি আছে, তাহাই তাহার বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য, আর সেই জন্যই তাহা সুন্দর। সে যে রস জাগাইয়া দেয়, তাহাই সুন্দর। তোমার আমার মনে যে রসের অনুভূতি হয়, তাহার সঙ্গে সেই বস্তুর রসাঙ্গসমূহ মিলিত হইয়া আমার প্রাণের কাছে এমন একটি রূপের দ্বারা রসের আভাষ জাগায়—যাহা সুন্দর—অতি সুন্দর!

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত' জড় নয়, জড়তা আমার মনের মধ্যে, তাই এই চিন্ময় ধামের রূপ-মাধুর্য্যের ভিতর সুন্দরকে ব্যভিচারী দোষে দুষ্ট করিয়া জড় বলি। অঙ্গসমূহের যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে বাহার যথাযোগ্য সন্নিবেশে রূপসৃষ্টি হয়, আর, সেই রূপের ভিতর তাহার আত্মার মধুর রসটি জাগিয়া উঠে, তখনই তাহা সুন্দর। তাই সুন্দরের জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হয়। কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের প্রাণের রসেই তেমনই স্বাভাবিক ভাবের মিলন হওয়া চাই। যখন মনকে রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তখনই সুন্দর, সুন্দর হয়। এই সুন্দরকে প্রকাশ করিবার জন্যই কলকলার সৃষ্টি। মানব-অন্তঃকরণের ভিতর যে ভাবরাশি ঘুমাইয়া থাকে, মানুষের মন যে গভীর জটিল রহস্যগুলি লুকাইয়া লুকাইয়া আপনি খেলা

করে, তাহার প্রাণের ভিতরে যত সঙ্কল্প-বিকল্প, যত তৃষ্ণা, যত দ্বৈতের জঞ্জাল, দৈন্য-বিরোধ, যত মিলন-সোহাগের মাধুর্য্য, তাহার বেদনা, তাহার যাতনা, তাহার রাগ-অনুরাগ, তাহার ভাব-অভাব, মহাভাব এই সব দিয়া আমাদের সমগ্র জীবনের যে অনুভূতি, জীবনচক্রের এই মহা-পরিধির ভিতরে মানুষ যেমন করিয়া বাঁচে, যেমন করিয়া মরে,—এই জাগ্রত ভাবের রূপ ধরিয়া সৃষ্টি করাই কারুকলার উদ্দেশ্য। আর সেই রূপের ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দ-ঘন-চিন্ময় কেমন প্রতিরূপ হইয়া ভাঙ্গা-গড়ার লীলা লীলায়িতভাবে আমাদের প্রাণ-মন-দেহ দিয়া সাধন করিতেছেন, তাহারই প্রকাশ করা, সুন্দর করিয়া মধুর করিয়া তোলাই কলাবিদের প্রাণের সৃষ্টি-কাহিনী।

কেহ কেহ বলেন, কারুকলার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টি অপেক্ষা হীন। কারণ, প্রকৃতিতে জীবন উদ্বুদ্ধ, মানবের সৃষ্টিতে তাহা মৃত, প্রকৃতিতে তাহা সজীব জীবন্ত! কারুকলার উপাদান হয় কাঠ, নয় পাথর, নয় মাটী, নয় মোম, নয় কথা, নয় সুর। এ সব পদার্থও যে সত্য, মৃত নয়, ইহাদের মধ্যেও মহাপ্রাণ জাগিয়া আছে! কিন্তু শুধু এই সব উপাদান দিয়াই ত কারুকলার সৃষ্টি হয় না। আত্মার অনুভূতি দিয়া সেই সৃষ্টির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই অনুভূতিতে যে মহাজীবনের আভাস, তাই এই সব কাঠ-পাথর অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। জীবনের মধ্যে যে সত্য আমরা চোখের কাছে ধরিতে যাই, প্রকৃতির বুকে যে সব সৃষ্টি আমরা জীবন্ত বলিয়া দেখি, কারুকলা তাহাই ধরিয়া নব নব রূপে জীবিত অনন্ত সত্তার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের স্বরূপটি ধরিয়া দেয়। সেই জন্য কারুকলার সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু—ইহ বাহ্য! এ সকল কথা সার্ব্বভৌমিক কারুকলার কথা নয়। প্রকৃতি যে আদর্শে আপনার বুক হইতে রূপের সৃষ্টি করে, মানুষও সেই একই আদর্শে তাহার প্রাণ হইতে রূপ সৃষ্টি করে। এই উভয় সৃষ্টিই যে সেই লীলামৃত-রসাধার সেই আনন্দ-ঘন মহান্ রসরাজের লীলাভঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। কেহ হীন নয়, কিছুই হীন নয়।

কবীর গাহিয়াছেন—

"আপুহি সবমে রমা হৈ,
আপ সবনকে পার।
রূপ রংগ সব আপুহী,
আপুহী সিরজন হার॥"
আগে বহুত বিচার ভো,
রূপ অরূপ ন তাহি।
বহুত ধ্যান করি দেখিয়া,
নহি তহি সংখ্যা আহি।'

আপনি সৃজন করিয়া আপনিই হরণ করিতেছেন। সকলের ভিতরেই তিনি আছেন, সকল রূপের মধ্যেও তিনি। রূপ ও রঙের যে রঙ্গ, যে লীলা, এর ত' সংখ্যা-সীমা নাই। জীবনে যাহাদের রূপের পরিচয় ভাল করিয়া হইয়াছে, তাহারাই এই রূপ-রঙের লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারে।

অনন্ত রূপের মাঝে এ মন শুধু দু একটা রূপকেই চিনিতে পারে, ধরিতে পারে, অসংখ্য সুরের হিন্দোল-মাঝে একটি সুর হয় ত' আমরা চিনিতে পারি, অসীম জ্যোতিরাশির মাঝে আমরা যেন পতঙ্গবৎ উড়িয়া বেড়াইতেছি। কারুকলার রূপের ধ্যানে যখন সমাধি হয়, তখন সেই আসল রূপটি ফুটিয়া উঠে। এই সাধনার সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

ষড় দর্শনে দর্শন পেলেম না আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি-রসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥

কারুকলার স্রষ্টা সত্য সত্যই এই রূপের ভিতর দিয়া দর্শন করে, স্পর্শ করে। সে মহাভাবের গান তাহার কানে অহরহঃ ধ্বনিত হয়। কলাবিদের প্রাণ সেই মহাপ্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনি বাজিয়া উঠে। এই বিশ্ব তাহার কাছে এক বিরাট্ আয়নার মত ঝক্ ঝক্

করিতেছে, কলাবিদ্ সেই আশাতে নিজের রূপের প্রতিরূপ দেখিয়া নিজ মাধুরী আস্বাদন করেন। প্রতিরূপের ভিতরেই তাঁহার বিলাস-বিবর্ত্ত ফুটিয়া উঠে, তাঁহার আত্মার রূপ বিশ্বের প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে, বিশ্বের প্রাণের রূপ তাঁহার প্রাণে প্রতিভাত হয়। এই যে অন্তরে অন্তরে রূপের পরিচয় লাভ করা যায়, তাহাই প্রাণের রূপান্তর।

আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালার আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই প্রাণে প্রাণে অনুভূতি, সেই "স্বাদিতে নিজ মাধুরী" প্রাণের সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার রূপান্তর হয় নাই। চণ্ডীদাসের গানে, রামপ্রসাদের গানে যে রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক কবিদিগের কবিতার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আছে। গীতিকবিতার প্রাণ কবির আত্মানুভূতিতে ও আত্মস্থ অনুরাগের আনন্দে। কবির প্রাণে জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গে যে রূপের পরিচয় কবি লাভ করেন, তাহার আত্মার নিগূঢ় কথাটি, মর্ম্মটি প্রকাশ করিয়া তোলাই গীতি-কবিতার ধর্ম্ম। কথাটি অপ্রিয় হইলেও আমাকে বলিতে হইবে, বাঙ্গালার আধুনিক গীতিকবিতায় সে জিনিসটি পাওয়া যায় না। এই যে শত বর্ষব্যাপী আমাদের আধুনিক সাহিত্য গীতিকবিতার বিরাট্ আয়োজন, ইহা আমাদের জীবনের কোন কর্ম্মই, কোন সাধনাকেই সার্থক করে নাই, কোন সত্যকেই সুন্দর করিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে নাই। এ সেই—

"পিতলকি কাটারি কামে নাই অওল
উপর কি ঝক্‌মকি সার"

এই সমগ্র সাহিত্যই অনুভূতির নয়—মাথার বোঝা। ধার করা—পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহরণ করা। ইংরাজী সাহিত্যে ও ফরাসী কবিতার তর্জ্জমা হয় ত বা নরওয়ে সুইডেনেরও ছাদে গড়া। তাহাতে বাঙ্গালীর প্রাণ নাই, ধর্ম্ম নাই—আছে শুধু অনুকরণ। অনুকরণে কখন জীবন আসে না, ধার করিয়া কখনও সম্পদ অর্জ্জন করা যায় নাই। এই সাহিত্যও সেই কারণে বস্তুহীন, প্রাণহীন, একটা অসার কাল্পনিক ভাবুকতায় ভরা। বাঙ্গালার প্রাণের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই।

রূপে ধরা দিবার জন্যই ভাব প্রাণের অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া উঠে। ভাব যতই রূপের ভিতর দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে। ভাব যখন সত্য সত্যই রূপের কাছে ধরা দেয়, তখনই তাহা মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন মানব-মনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব কাল্পনিক নহে, সত্যের অবভাস নয়, তাহা সত্যরূপ, তাহাই সত্য মূর্ত্তিমন্ত জলন্ত। সত্যের রাজ্যে নিত্য যে লীলা চলিতেছে, তাহাতে ভাব ও আকারের পার্থক্য নাই। সে লীলা কাব্য-লোকের নিভৃত মিলন-কেন্দ্র। আমাদের বিচারবুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু মিলনমন্দিরে যখন বুদ্ধি সেই রূপের টানে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তাহার সেই পাটোয়ারী বুদ্ধি রূপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া মরিয়া বাঁচে, আর প্রাণ তখনই সত্যকে অনুভব করিয়া একেবারে গ্রহণ করে। যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর। যাহা সুন্দর, তাহাই যে অনন্ত, স্বাধীন। যাহা স্বাধীন, তাহাকে তোমার মাপের রশি দিয়া বাঁধিতে পারিবে না; যাহা অনন্ত, তাহাকে তোমার মাপকাঠি দিয়া পরিমাণ করিতে পারিবে না।

তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায় প্রেম—অখণ্ড অনন্ত প্রেম। ভাব যেমন আপনার ভাবে গলিয়া আকারের ছাঁচে আপনাকে ঢালিয়া দেয়, তেমনি জীবনকে সেই প্রেমে ঢালিয়া দিলে তবেই জীবনের সত্য রূপটি ধরা দেয়। এই প্রেমের সোহাগ-বাঁধন

যদি না থাকিত, তবে কি এই যে মহাভাবের অপার আনন্দ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি অনন্ত অভাব, অসীম দুঃখ—এই দুইকে মিলাইতে পারিতাম? যত দুঃখ, যত অভাব, যত যাতনা, যত ঘৃণা, যত হিংসা, সেই প্রেমেরই অন্যরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সবের মধ্যেই যে সোহাগের বাঁধন! এই সবই যে অনন্ত প্রেমের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে! যখন সত্য হারাইয়া মেকি লইয়া প্রাণ কাঁদে, তখন সেই অনন্তের পানে মুখ তুলিয়া প্রাণ বাঁচে! জীবনের যদি কোন সংজ্ঞা থাকে, তবে তাহা প্রেম, প্রেমে এই মূর্ত্তি-স্রোতের জন্ম, প্রেমেই এই প্রাণ-স্রোতের চঞ্চলতা। সারা বিশ্ব সেই প্রাণস্রোতে মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি, রূপের পর রূপ, এই লীলা-চঞ্চল বারিধি-বুকে অবিরাম প্রাণ-স্রোতে টলমল করিতেছে। সেই লীলা-চঞ্চল মুরত্তি-স্রোতের সঙ্গে প্রাণের নিঃসঙ্গ পরিচয়-লাভই প্রেমের এক দিক। রূপের ভিতর দিয়া প্রাণের এই লীলামূর্ত্তির পরিচয় যখন ধ্যানগত হয়, তখন সেই মূর্ত্তির সহিত অহৈতুকী পরিচয় হয়, তখন সেই নিজের মাধুরী সেই মূর্ত্তি-স্রোতের ভিতর আস্বাদন হয়। তখনই সত্য রূপান্তর। প্রেমের প্রথম জাগরণে রতির রাগানুরাগ জাগে, সেই জাগরণের সঙ্গে নিজের মাধুরী আস্বাদের কামনা, বাসনা, মমত্ব, মদনত্ব জাগে। যখন তাহা প্রেমের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়?—সেই প্রেমের ভূমিতে একবার পা রাখিতে পারিলে অখিল-রসামৃত মূর্ত্তির আভাষ প্রাণে—স্ফটিকের সূর্য্যকিরণ-প্রতিবিম্বের মত স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। প্রাণ যখন দর্পণের মত স্বচ্ছ হয়, তখনই আত্মার যে প্রাণময় সৌন্দর্য্য, তাহার স্বরূপকে পাই তখন বুঝিতে পারি! সেই প্রাণের সত্য অন্তু-

নিখিল রস, রসশেখরের রস-চঞ্চল যে সত্য-মূর্ত্তি, তাহাই প্রাণে ফুটিয়া উঠে। সেই ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের রূপকে সত্যদর্শন হয়, তাহাকে স্পর্শ করা যায়, তখন তাহার গায়ের গন্ধ নাসিকায় ভাসিয়া আসে—প্রাণ-স্রোতের লীলায় তখন সেই ধ্যানগত পদ্ম ফুটিয়া উঠে। কলাবিদের জীবনে, কবির জীবনে, এমনি করিয়া সেই সত্য পরিচয় হয়! কলাবিদ্ ও কবির রূপান্তর—তাহার সৃষ্টি তাহার প্রকাশ!—সাধক তাহার সাধনায় সমাধিতে—তাই মিলাইয়া আনন্দ-ঘন-রসে মজিয়া যায়! এই যে রূপান্তর, ইহা সেই অনন্তের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়-লাভ—প্রাণে প্রাণে বুকে বুকে স্পর্শমণি ছুঁইয়া সোনা হওয়া!

আমি বলিতে চাই যে, একমাত্র চণ্ডীদাসের গান ছাড়া বাঙ্গালা গীতি-কবিতার শেষ যুগে রামপ্রসাদের গানে সেই রূপান্তর হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রাণের যে সৌন্দর্য্য, তাঁহার কল্পকলার যে সৃষ্টি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জীবনের মত এত বড় কাব্য আর কখনও রচিত হয় নাই। সাধক রামপ্রসাদ যে রসের আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহার জীবনে যে ফুটিয়াছে, এ কথা এখন না-ই বলিলাম। চণ্ডীদাসের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল,—তাঁহার সৃষ্টি তার প্রমাণ। রামপ্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহার সৃষ্টিও তাহারই প্রমাণ।

অন্তর্যামী

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

অন্তর্যামী

কেমনে লাগিয়া গেছ, মন-তটে !
কেমনে ছড়ায়ে গেছ, আঁখি-পটে !
সকল দরশ-মাঝে
তুমি উঠ ভেসে !
সকল গগন-মাঝে
তুমি উঠ হেসে !
সকল গণনা-মাঝে
তোমারেই গুণি !
সকল গানের মাঝে
তব গান শুনি !
ওগো তুমি মালাকর
মন-মালিকার !
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি
সব সাধনার !
কেমনে জ্বালিলে দীপ, আঁখি-আগে !
নিরখি নিরখি মোর, প্রাণে জাগে !

২

যখনি দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে !
কোথা হ'তে জ্বলে দীপ, সম্মুখে তাহার ?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার !
যখনি হৃদয়-যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধার,
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
মহান্ সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর !

ঘুরিতে ঘুরিতে আজ জীবনের অন্ধকারে
সম্মুখে সকলি বন্ধ, দুই পথ দুই ধারে !
কোন্ পথে যাব আজ ভেবে ভেবে নাহি পাই ।
কে দেখাবে আলো মোরে ? কেহ নাই । কেহ নাই !
কিছু নাই কিছু নাই পরাণের চারি পাশে !
আঁধার নয়নে আরো আঁধার ঘনায়ে আসে ।

হে মোর বিজন বঁধু, হে আমার অন্তর্যামী !
কত দিন কতবার আভাস পেয়েছি আমি !
আজ কি বঞ্চিত হব, ফেলে যাবে একেবারে ?
এ মহা বিজন রাত্রে এই ঘোর অন্ধকারে ?
হা হা ! হা হা ! করি উঠে পরিচিত হাস্যরব !
কোথা তুমি কোথা তুমি এ যে অন্ধকার সব !
যেখানেই থাক নাথ ! আছ তুমি আছ তুমি !
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ চুমি
ভাবনা ছাড়িনু তবে ; এই দাঁড়াইনু আমি !—
যে পথে লইতে চাও ল'য়ে যাও অন্তর্যামী !

৪

যে পথেই ল'য়ে যাও যে পথেই যাই ;
মনে রেখ আমি শুধু, তোমারেই চাই !
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে,
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
সে দিন হইতে বঁধু !—আলোকে আঁধারে
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে !
তোমারে পেয়েছি কি গো ? তা ত মনে নাই !
সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই !

শৈশবে পথের ধারে করিয়াছি খেলা ;
সে কি শুধু অকারণ আপনার খেলা ?
সে দিন তোমারে বঁধু! পারিনি ধরিতে !—
আমার খেলার মাঝে মোরে খেলাইতে !

প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে,
যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই !
পুষ্পিত ঝঙ্কৃত সেই আলোক আগারে
কেমনে রাখিলে বঁধু! আপনা লুকাই !
সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই !
তুমি জান দুঃখ-মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে তোমারে শুধু ; পাই বা না পাই,
বঁধু হে ! তোমারি লাগি আকুল পরাণ !
বঁধু হে ! বঁধু হে ! আমি তোমারেই চাই !—
যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই !

৫

এ পথেই যাব বঁধু? যাই তবে যাই !
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই !
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল ।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব !
গুন্ গুন্ গাহি গান পথ চলি যাব—
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব !
দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক !
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডেক !

৬

ভরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
তোমারি দেখান এই বন-পথ দিয়া !
কত না সোহাগভরে তুলিতেছি ফুল
কত না গরবে মোর হৃদয় আকুল !
কত না বিচিত্র রাগে পরাণ কাঁপিছে !
কত না আশার আশে হৃদয় নাচিছে !
কে যেন কহিছে কথা হৃদয়-মাঝারে ।
কে যেন আঁকিছে আলো নিশীথ আঁধারে ।
কে যেন কি জানি মোরে করায়েছে পান,—
বাতাসে পত্রের মত মর্ম্মরে পরাণ ।
যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরিছি জীবন ।
তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু! বুঝিতে পারিনি ।

৭

কেমন ক'রে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর !
বুকের মাঝে কেমন করে ! চোখে বহে লোর !
দিবস নিশি কতই তব কথা শুনি কানে !
প্রাণের মাঝে তোলাপাড়া মানে অভিমানে !
পরশ তব স্বপন সম প্রাণে আনে ঘোর
নিশাস তব মুখে লাগে কাঁপে প্রাণ মোর !
তোমার প্রেমে এত জ্বালা, আগে নাহি জানি !
চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি !
ছেড়ে দাও ত চ'লে যাই তুমি থাক পিছে
দরশ যদি নাহি দিলে সোহাগ করা মিছে !

৮

কম অভিমান বঁধু কম অভিমান
আঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান !
বাহু বাড়াইয়া দিলে কিছু নাহি পাই,
শূন্য মনে ভূমি-তলে কাঁদিয়া লুটাই !
বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা :—
তবে ছেড়ে দিনু আমি ! কর গো রচনা
আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও !—
পরাণের তারে তারে আপনি বাজাও !
আমি কাঁদিব না আর, কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে প'ড়ে রব ।

কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে,
পরাণে কেমন করে, পরাণি তা জানে!
রাগ করিও না বঁধু! আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে!
এত ক'রে চাপি বুক তবু হাহাকার
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বার বার!—
সে শুধু তোমারি তরে, তোমা পানে ধায়,—
তোমারে না পেয়ে, মোর বুকে গরজায়।
এই অশ্রু এই ব্যথা এই হাহাকার
(তুমি না লইবে যদি, কারে দিব আর ?)

১০

মরম আঁধারে বঁধু! প্রদীপ জ্বালাও!
আমার সকল তারে, বাজাও বাজাও ;
আপনি বাজাও! আমি কথা নাহি কব!
নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব!

১১

কোন্ ছায়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে,
এমন সোহাগভরে প্রদীপ জ্বালালে!
ওগো ছায়ারূপী! কোন্ ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি, হৃদি-তন্ত্রী চুমি
মোহন পরশে ? আমি কথা নাহি কই।
বঁধু হে! নয়ন মুদে শুধু চেয়ে রই!

১২

কোথা ওই ছায়ালোক কোথা প্রাণখানি!
এই প্রাণ-প্রান্ত হ'তে কত দূর জানি!
কত দূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই!—
আঁধারের মাঝে শুধু আঁখি মুদে চাই!
এ কি মোর মরমের অজানিত দেশ ?
এই প্রাণ-প্রান্ত কি গো পরাণের শেষ ?
এ কি গো তোমার বঁধু! গোপন আবাস ?
হোথা হ'তে মাঝে মাঝে দিতেছ আভাস ?
আমি ত' জানি না কিছু, তুমি সব জান!—
কোথা হ'তে এত ক'রে মোরে তুমি টান ?

১৩

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!
অপূর্ব্ব আলোক-ভরা অন্ধকারে ঢাকা!
শত লক্ষ চূড়া তার আনন্দ গম্ভীর,
উঠেছে কোথায় যেন স্বপ্নপটে আঁকা!
নাহি বৃক্ষ তবু আছে বৃক্ষেরি মতন
শত শত পল্লবের আড়াল করিয়া!—
শত লক্ষ পুষ্প-লতা অপূর্ব্ব বরণ
পাকে পাকে উঠিতেছে ঘিরিয়া ঘিরিয়া!
উজ্জ্বল স্বপন-ভরা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে অপূর্ব্ব মন্দির!

১৪

নাহি মেঘ, তবু যেন ছুটাছুটি করে
অপূর্ব্ব আলোক ছায়া মেঘেরি মতন!
নাহি চন্দ্র! নাহি সূর্য্য! কি যে স্বপ্নভরে
উজলি রেখেছে তারে, সে কোন্ গগন!
নাহি শব্দ, তবু যেন মধুর গম্ভীর
ঝরিতেছে নিরন্তর কার গীত-ধার!—
প্রশান্ত আনন্দ-ভরা, ধীর অতি ধীর!—
কে যেন বন্দনা করে কোন্ দেবতার!
বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!

১৫

ওই ছায়া-মন্দিরের কোথা রে দুয়ার!
কোন্ পথে যেতে হবে ?
কে বল আমারে কবে ?
যেন হেরি মনে মনে বন্ধ চারিধার।
ওই ছায়া-মন্দিরের কোথা রে দুয়ার!

কঠিন পাষাণে যেন বন্ধ চারিধার
প্রবেশের পথ নাই,
যতই যাইতে চাই !
তবু আশা নাহি ছাড়ে অন্তর আমার !
ওই ছায়া মন্দিরের কোথা রে দুয়ার !

১৬

যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
আমার অন্তর-আত্মা, বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে !
প্রাণ মোর ভরপুর কি কাতর গানে !
কেন হাসিতেছ তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর ?
অজানিত পথ কি গো এতই বন্ধুর ?
যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
যেমন করেই হউক যেতে হবে মোর !
পথখানি যেথা থাক পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব !

১৭

পথখানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায় ! —
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায় !
কোথা পথ কোথা পথ কোথা পথখানি
সে পথ বিহনে যে গো সব মিছা মানি !
এ দিকে ও দিকে চাই চকিত পরাণে,
পাগলের মত ধাই পথের সন্ধানে !
এই পথ দেখি ভাবি পেয়েছি পেয়েছি !
এ পথ সে পথ নয় !—এ পথে এসেছি !
নিশ্বাস ফেলিয়া বলি, কত দূর জানি,
এই প্রাণ প্রান্ত হ'তে সেই পথখানি !

১৮

তুমি হাসিতেছ বঁধু ! তাই মনে হয়
সেই পথখানি মোর কাছে অতিশয় !
এ দিকে ও দিকে চাই পাগলের মত
কোথা পথ ? কোথা পথ ? খুঁজিছি সতত।
তবু পথ নাহি মিলে ! দিশা হারা মন,
রূপ রস গন্ধ নাহি—আঁধার বিজন !
সব গীতি থেমে গেছে ! ছিন্ন ফুল-হার,
সম্মুখে আলোক নাহি, পশ্চাতে আঁধার !
তবু সে পথ লাগি ঘুরিছি সতত
এই ঘোর মন-বনে পাগলের মত !

১৯

পথের লাগিয়া মন মন-পথ-বাসী !
আমি ত আমাতে নাই, শুধু কাঁদি হাসি।
গৃহ-হীন সঙ্গি-হীন ! স্বপ্নে হেসে উঠি,
না পেয়ে সে পথ পুন স্বপ্ন যায় টুটি !
কে যেন আমার মাঝে পথ খুঁজে মরে,
আকুল নয়নে কার অশ্রুজল ঝরে !
সে যে আমি, সে যে আমি, আমি সে পাগল !
সব ভুলে অন্ধকারে কাঁদিছি কেবল !
মন-মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই !—
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই !

২০

সব তার ছিঁড়ে গেছে ! একখানি তার
প্রাণ-মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার !
সব আশা ঘুচে গেছে ! একটি আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণ-লতা আকাশে দোলায় !
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ-মাঝে কাঁদে বার বার !
সব কর্ম্ম শেষে আজ, মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশা-হারা !
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী !

২১

সে পথের হইতাম ধূলি কণা যদি !
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি !
বুকে বুকে থাকিতাম,
কভু নাহি ছাড়িতাম,

আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি !
সে পথের পথিকের পদতলে বাজি,
মিশে মিশে হইতাম পদ-রজ-রাজি !
আঁকড়িয়া থাকিতাম,
মিশে মিশে হইতাম,
ধূলায় ধূসর তার পদ-রজ-রাজি !

২২

ধূলায় ধূসর তার চরণ-তলায়
ধূলা হয়ে থাকিতাম দিবস-নিশায় !
কিছুতে না ছাড়িতাম,
জেগে লেগে রহিতাম,
সেই পথ পথিকের চরণ-তলায় !
এক দিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তারি পায় উঠিতাম মন্দির-সোপানে !
কি গান যে গাহিতাম,
হাসিতাম, কাঁদিতাম,
চরণের ধূলা হয়ে মন্দির-সোপানে !

২৩

কি আর কহিব বঁধু ! আমি যে পাগল !
কি যে কহি কি যে গাহি আবল তাবল !
আমি মত্ত দিশাহারা,
দীন কাঙ্গালের পারা !
একটি আশার আশে পথের পাগল !
নয়ন দরশ-হীন হৃদয় বিকল
সব অঙ্গ জরজর শিথিল বিকল !
ফিরে ফিরে গৃহে আসি
শুধু অশ্রুজলে ভাসি !
বুকে টেনে লও ওগো ! পরাণ পাগল !
পাগলেরে আর তুমি, ক'র না পাগল !

২৪

এ কি ? এ কি ? ওই বুঝি, সেই পথ-ভূমি ?
মন-মাঝে ঢেকে ঢেকে রেখেছিলে তুমি !
তুমিই দেখালে পুনঃ ! ওগো গুণ-মণি !
কত গুণের বঁধু তুমি কেমনে তা ভণি !
কণ্ঠ-রোধ হয়ে আসে কথা নাহি মিলে !
কেমনে বুঝাব বঁধু ! তুমি না বুঝিলে !
সব সুখ একেবারে ফুটিবারে চায় !
সব দুঃখ গীত হয়ে পরাণে মিলায় !
সব আশা সব ভাষা এক হয়ে যায় !
একটি ফুলের মত চরণে লুটায় !

২৫

লও সে অঞ্জলি লও পরাণ বঁধু-হে !
প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণ-বল্লভ হে !
দরশ তুমি নাহি দিলে,
পরশ তুমি দিও হে—
চোখে চোখে রেখ সদা পরাণ-বঁধু-হে !

২৬

শুভ লগ্নে আজ তবে, যাত্রা করিলাম !
মন-পথের পথিক হয়ে, পথে ভাসিলাম !
আঁধার পথ আলো ক'রে
দিও তুমি সোহাগভরে
পরাণ ভ'রে পরশ দিও, পরাণ বঁধু হে ! —
প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণ-বল্লভ হে !

২৭

বাজা রে বাজা রে তবে ! বাজা জয়-ডঙ্কা !
নাহি লাজ নাহি ভয়, নাহি কোন শঙ্কা !
পরাণখানি কাঁপ্‌ছে কত জয়মাল্য গলে,
ফুলের মত কি জানি গো ফুটছে হৃদিতলে !
সুখের মত দুঃখ আজ, দুঃখের মত সুখ !
কোন্ গানের গরবে ওগো ভরিয়াছে বুক ?
প্রাণের মাঝে এ কি শুনি ? কি নীরব ভাষা !
বুকের মাঝে কোন্ পাখী গো বাঁধিয়াছে বাসা !
পায়ের তলে বাজে পথ ! প্রাণ আজিকে রাজা !
বাজা রে বাজা রে তবে, জয় ডঙ্কা বাজা !

২৮

কি আনন্দে ভরপুর হৃদয় আমার !
বঁধু হে ! আজিকে মোর পথ চলা ভার !
পরাণবঁধু ! বঁধু হে !
কি আর তোমায় কব হে !
আঁখি-জলে ভ'রে হ'ল পথ চলা ভার !

আমার গলায় দোলা সেই মালাখানি,
এত যে ভারের বোঝা আগে নাহি জানি !
আমার বঁধু বঁধু হে !
কি আর তোমায় কব হে !
ফুলের ভারে ভেঙ্গে পড়ি, পথ চলা ভার !

২৯

ওই যে কার গীতধ্বনি জয়ধ্বনির মত,
হৃদয়খানি ছাপাইয়ে উঠ্ছে অবিরত !
পরাণ বাঁধা কিসের জালে,
নাচ্ছি যেন কিসের তালে
ভরা পা'লে তরীর মত ভাস্ছি অবিরত !
অনেক দিনের অশ্রু সাধা,
এমন পথে এমন বাধা
পরাণ আমার কিসের তরে
কি জানি গো কেমন করে !—
হাল-হারান তরীর মতন ভাস্ছি অবিরত !
আমি আর কি কর্তে পারি !
আমি যে গো চলিতে নারি !
সুর-হারান গানের মত ভাসছি অবিরত !

৩০

তোমার আছে অনেক সুর, একটি সুর দাও !
যে সুরটি হারিয়ে গেছে, তাহারে ফিরাও !
সেই সুরের তালে মানে,
বাঁধ্ব আমায় প্রাণে প্রাণে !
অনেক দিনের সাধা সুর, সেই সুরটি দাও !

তোমার আছে অনেক গান, একটি গান গাও !
যে গান আমি ভুলে গেছি, সে গান শুনাও !
দাঁড়িয়ে আছি পথের মাঝে
সে গান জানি কোথায় বাজে !
অনেক গানের অনেক সুরে কেন গো জড়াও ?
আমি চাই একটি গান, সে গানটি গাও !

৩১

তুমি গাও একবার ! আমি গাই পুনঃ !
তোমার গান আমার মুখে কেমন শুনায় শুন !
তোমার গান তোমার রবে, আমি শুধু গাব !
তোমার কথায় তোমার সুরে, পরাণ জুড়াব !
আমার গান হয়ে গেছে, গাও আরেকবার !
তেম্নি তেম্নি তেম্নি ক'রে, গাও হে আবার !
তুমি যবে গাইবে বঁধু ! আমি দিব তাল !
আমি যে ভাসাব তরী তুমি ধ'র হাল !
দুজনায় এম্নি ক'রে পথ চলি যাব !
(এম্নি এম্নি এম্নি ক'রে, সে মন্দির পাব)

৩২

তুমি হেসে হেসে বঁধু ! কর গোলমাল !
বোধ হয় সবি যেন স্বপনের জাল !
তবে কি বৃথায় আমি, এই পথ বাহি ?
এ পথের শেষে কি গো সে মন্দির নাহি ?
তবে কি বৃথাই মোর চিত্ত ছুটে যায়
ওপারের ছায়াময় মন্দিরের গায় ?
এত অশ্রু এত ব্যথা নাহি ব্যর্থ হবে !—
সত্য পথ বাহিতেছি তব বংশী-রবে
তুমি জান তুমি জান, ওগো মন-বাসী !
তুমি ত ভাসালে মোরে তাই আমি ভাসি ।

৩৩

এবার তবে চলিলাম সুরটি ক'রে বুকে
সকল জ্বালায় বাজিয়ে দেব সকল সুখে দুখে

এই ত আমার পোষা পাখী, রবে বুকে জড়িয়ে!
ঘুমিয়ে যদি পড়ে সে গো! চুমি দিব জাগিয়ে!
আঁধার যদি আসে আরো, নেব তারে টানিয়ে
প্রাণের মাঝে রাখ্‌ব তারে,
প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়ে!
তোমার গান আমার গান এক হ'য়ে যাবে!
পথের মাঝে তরুলতা, সেই গানটি গাবে!
তবে তুমি থাক্‌বে বঁধু! থাক্‌বে কাছে কাছে!
থাক্‌বে তুমি, বুকের মাঝে,
থাক্‌বে পাছে পাছে!

৩৪

পথের মাঝে এত কাঁটা! আগে নাহি জানি!
কাঁটা-বনের ভিতর দিয়া গেছে পথখানি!
কাঁটায় কাঁটায় কালা কালা,
কাঁটার ডাল কাঁটার পালা,
কাঁটার জ্বালা বুকে ক'রে, গেছে পথখানি!

কাঁটার ঘায় জ্ব'লে জ্ব'লে চল্‌ছি পথ বাহি!
বেড়া আগুনের মত
জ্বল্‌ছে প্রাণে অবিরত!—
সে জ্বালায় জ্বলে জ্বলে এই পথ বাহি!
তোমার গাওয়া প্রাণের গান,—সেই গান গাহি!

৩৫

তোমার পথে এত কাঁটা! আগে নাহি জানি!
আপন হাতে যাহা দাও, তায় মানি!
একটুখানি সোহাগ দিও, দিও লালাতন!
একটুখানি পরশ দিও, হোক না কাঁটাবন!
একটুখানি আলোক দিও আঁধার বন মাঝে!
একটুখানি বুকে টে'ন যখন ব্যথা বাজে!
একটুখানি ধরিয়ে দিও, তোমার গানের সুর!
সব-জুড়ান সুধা-স্রোতে, ভর্‌ব প্রাণ-পুর!
কাঁটার জ্বালা ভুলে যাব, চল্‌ব গান গাহি!—
পথের শেষে দিও বঁধু! যাহা প্রাণে চাহি!

৩৬

কাঁটার জ্বালায় জ্ব'লে মরি, বঁধু হে আবার!—
জ্বালার উপর জ্বালা! আজি প্রাণ অন্ধকার!
জীবনের যত সুখ শেষ হয়ে গেছে,
যত ফুল ফুটে ফুটে ঝ'রে শুকায়েছে,
যত দীন-দুঃখে আমি ভরেছিনু প্রাণ,
যত স্বাস্থ্য আনন্দের গেয়েছিনু গান;
ছোট-খাট সুখে যত উৎসবের রাতি
ফুলে ফলে সাজাতাম জ্বালিতাম বাতি,
লুকায়ে আছিল সব কি জানি কোথায়!
প্রেতের মতন আজি ঘিরেছে আমায়!

৩৭

সে দিনের গানগুলি মনে করেছিনু
গাওয়া হ'লে সব বুঝি শেষ হয়ে যাবে।
হৃদয় উজাড় করি সকলি ঢালিনু!
কে জানিত তারা পুনঃ হৃদয়ে লুকাবে!
ওই ওই ওই সেই ব্যর্থ ভালবাসা!—
দীর্ণ হৃদয়ের সেই, প্রমত্ত পিপাসা!
ওই ওই ওই আসে মোর পানে চেয়ে
ভীষণ ভৈরব-দল ওই আসে ধেয়ে!
কোথা যাব, কোথা যাব, কোথায় লুকাব?
ভয়ে ভেঙ্গে পড়ে প্রাণ, কেমনে বাঁচাব?

৩৮

ক্ষণে ক্ষণে বাঁচে প্রাণ! ক্ষণে ক্ষণে মরে!
বুকের মাঝে ভূতে প্রেতে, কত নৃত্য করে!
পরাণের আশে-পাশে, বিভীষিকা যত
আঁখি খুলে আঁখি মুদে হেরি অবিরত!
প্রাণখানি মোর যেন গ্রাস করিবারে,
আসে সব আসে ধেয়ে ঘোর অন্ধকারে!
চারিদিকে শুনি শুধু, বিকট চীৎকার!
পরশে অন্তরে শুধু মৃত্যুর আঁধার!

ভয়ে ত্রাসে সব অঙ্গ কাঁপে থরথর !
কাঁপিতেছে সর্ব্ব-প্রাণ মৃত্যু-জর-জর !

৩৯

এস আমার আঁধার ঘেরা ! এস ভয়হারী !
এস এস হৃদ্‌মাঝারে, হৃদয়-বিহারী !
এস আমার আঁধার বুকে, এস আলো ক'রে !
এস আমার দুখের মাঝে সকল দুখ হ'রে !
এস আমার সকল প্রাণে ওগো প্রাণ-হরা !
এস আমার সকল অঙ্গে ওগো সোহাগভরা !
এস আমার প্রাণের মালা ! এস মালাকর !
এস এই ঝড়ের মাঝে ! এস বুকের পর !
এস আমার মরণকালে এস হাসি হাসি !
আন তোমার মরণ-হরা সব-ভুলান বাঁশী !

৪০

এস আমার মন-বাসে টিপি টিপি পাও !
চরণ-তলে প্রাণে প্রাণে কুসুম ফুটাও !
তেম্‌নি ক'রে আবেগভরে পিছনে দাঁড়াও !
তেম্‌নি ক'রে হাত দুখানি নয়নে বুলাও !
তেম্‌নি ক'রে মুখে চোখে পড়ুক নিশ্বাস !
তেম্‌নি ক'রে দিয়ে যাও চুম্বন আভাস !
তেম্‌নি ক'রে গোপন কথা কও কানে কানে !
তেম্‌নি ক'রে গানের মত বাজ প্রাণে প্রাণে !
তেম্‌নি ক'রে কাঁদি আর তেম্‌নি ক'রে হাসি !
তেম্‌নি ক'রে ডুবি আর তেম্‌নি ক'রে ভাসি !

৪১

এস মন-বন-বাসে ! এস বনমালী !
চরণ-তলে ফোটা ফুল, তারি বরণ-ডালি
সাজায়ে রেখেছি আজ নয়ন-জলে ধুয়ে !
পরাণ ভ'রে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে !

তোমার পায়ে ফোটা ফুল কাঁটা নাহি তায় !
কত না আনন্দে মোর হৃদয়ে লুটায় !
এস মন-ব্রজ-বাসে ! এস বনমালী
তোমার ফুলে সাজায়েছি, তোমার বরণ ডালি !

৪২

এস আমার প্রাণের বঁধু ! এস করুণ আঁখি !
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা,
তোমায় কোথা রাখি !
প্রাণের এত কাছা-কাছি আছ তুমি চেয়ে !
তোমার ওই চোখের ছায়া আছে প্রাণ ছেয়ে !
একটুখানি দাঁড়াও তবে, কাঁটা তুলি দিব !
তোমার তরে কোমল ক'রে প্রাণ বিছাইব !
এস আমার কোমল প্রাণ ! এস করুণ আঁখি !
কাঁটা-তোলা প্রাণের মাঝে
আজ তোমারে রাখি !

এস আমার মৃত্যুঞ্জয় ! এস অবিনাশি !
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশী !
ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে, চিরদিনের তরে !
নাইক' আর আঁধার কোন,
আমার আঁখির পরে !
প্রাণের মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে বিভীষিকা যত
পালিয়ে গেছে তারা সব চিরদিনের মত !
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ !
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন !

ডালিম

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

ডালিম

তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ-প্রমোদ ছাড়ি নাই। ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোন কালেই মানুষ বড় ভাল ছিলাম না। সংসারের আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল; আমার মনে হইত, কখনও সেই যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা এক-রজনীর উৎসবের মত কাটাইয়া দিয়াছি। কখন্ আরম্ভ হইল, কখন্ শেষ হইল, বুঝিতেও পারিলাম না। কোনও সুখ হইতে আপনাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, আর তার জন্য কোনও আপশোষও হয় নাই। প্রাণের মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা গভীর পাতাল আছে, তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সর্ব্বদাই এক বিশাল সমতল ভূমির মত মনে হইত, জীবনের রাজপথে ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে আর হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায় কাঁটার আঁচড় লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সমস্ত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বিনা চেষ্টায় সহজেই প্রাণটাকে আস্ত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ প্রায় বুড়া হইতে চলিলাম, আজ তার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন অন্ধকার হইয়াছে। সে কতদিনকার কথা। তার পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। কত খুঁজিয়াছি—কোথাও পাইলাম না। সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ধরা দেয় না। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকের ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুঝি খুঁজিতে খুঁজিতেই কাটিয়া যাইবে। তাহাকে পাইব না? আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে "ডালিম" বলিয়া ডাকিত। সে দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিত, আমি এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তার মুখখানি এখন পর্য্যন্ত আমার প্রাণে প্রদীপের মত জ্বলিতেছে! মাথায় অন্ধকারের মত এক রাশ চুল, মুখে একটা গভীর পাগল-করা ভাব, আর তার চোখ দুটি?—চাহিবামাত্র আমার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু এমন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, চোখে এমন গদ্‌গদ করুণভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয়, আর কখনও দেখিবও না।

সে দিন সন্ধ্যাকালে কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ-প্রমোদ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ণ বাবুর বাগান চাহিলেই পাওয়া যাইত, আমরা চাহিয়া লইয়াছিলাম। বাগানটি খুব বড়, ফটক হইতে সরু একটা রাস্তা ধরিয়া অনেক দূর গেলে বাড়ীটা পাওয়া যায়। বাড়ীর সাম্‌নেই একটা ঘাট-বাঁধান পুকুর। ঘাটের ঠিক উপরেই শান-বাঁধান লতামণ্ডপ। সেই সরু রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ীর ভিতরে যাইতে হয়। সে দিন বন্দোবস্তের কোন অভাব ছিল না। নানা রকমের প্রচুর সুরা, নানা রকমের খাবার, আলোয় আলোয় প্রমোদ-মন্দির দিনের মত জ্বলিতেছিল।

আমার পৌঁছিতে একটু দেরী হইয়াছিল। ফটকে নামিয়াই সেই সরু রাস্তা। চাঁদের আলো খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মত সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই ম্লানছায়ালোকে, লতাপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে সেই সরু রাস্তাটিকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কি হইতেছিল, আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ-রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদাই হাল্‌কা মনে স্ফূর্ত্তি করিতে গিয়াছি। সে দিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা

ভার চাপিয়াছিল। সে যে কেমন ভার, আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়ীতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে, গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিত গায়িকা গাইতেছে—"চমকি চমকি যাও।" ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সে দিন কি জানি কিসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে—"চমকি চমকি যাও!" আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চেঁচাইয়া উঠিল—"কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, দাদা আ—গিয়া।" এক জন বলিল, "দাদা, এই লাও এক পাত্র চড়াও, আনন্দ কর।" আর এক জন গান ধরিল, "এত গুণের বঁধু হে।" আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—"কাঁটা বনে তুল্‌তে গিয়ে কলঙ্কেরি ফুল! ওগো সই কলঙ্কেরি ফুল!" আর এক জন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল, "দেখ্‌লে তারে আপন-হারা হই।" আমার আর এক জন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন,"দাদা, হেসে নাও, দু'দিন বই ত নয়, কি জানি কখন্ সন্ধ্যা হয়!" সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধুঁয়া, গানের ধ্বনি, শারঙ্গের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, তব্‌লার চাটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোক আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেকবার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সে দিন কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল, এ সবই আমার নূতন, অপরিচিত। আমাকে জোর করিয়া এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল—বিডন ষ্ট্রীটের সুশীলা, হাতিবাগানের সুরী, পুঁতুল কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক;—কিন্তু সে দিন যেন হঠাৎ মনে হইতে লাগিল, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে, এক কোণে বসিয়াছিল "ডালিম।" এক জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও মেয়েটিকে আগে কখনও দেখি নাই।" সে বলিল, "বাস্, ওকে জান না? ও যে ডালিম, সহর মাত করেছে, অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে।" আমি বলিলাম, "কাপ্তেন ভাসানর মত চেহারা ত ওর নয়। ও যে এক কোণে স'রে ব'সে আছে।" বন্ধু বলিল, "ওই ত ওর ঢং, ও অমনি ক'রে লোক ধরে।" আমার মন তাহা মানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সে-ও আমায় দেখিতেছিল। বহুবার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি কি দেখিলাম—তাহার চাহনীতে কি ছিল—আমি কেমন করিয়া বলিব—আমি যে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইল, সেই আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দু'টি যেন আর কিসের খোঁজ করিতেছে। আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহা ত বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর থেকে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, উহাকে বুকে ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল, "ডালিম, একটা গাও।" আর এক জন বলিল, "ডালিম ভাল গাইতে পারে না।" আমি তাহার দিকে চাহিলাম। সে বুঝিল, বলিল,—"আমি ভাল গাইতে পারি না।" আমি বলিলাম, "গাও না?" সে একটু সরিয়া আমার সাম্‌নে আসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সে গানে সুরের কেরামতি ছিল না, তালের বাহাদুরী ছিল না; কিন্তু সে গানে যাহা ছিল, তাহা

আর কখনও কোন গানে পাই নাই। মনে হইল, ওই গানের জন্য আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়া ছিল। চোখের জলে ভেজা ভেজা সেই সুর, সুরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নপল্লবে অশ্রুবিন্দুর মত জলিতেছিল। সেই সুরের প্রত্যেক স্বর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপল্লবে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মতই জলিতেছে। ডালিম গাহিতেছিল :—

"কেমন ক'রে মনের কথা কইব কানে কানে।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।
আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়,
গন্ধটুকু রেখো বঁধু হিয়ায় হিয়ায়!
প্রাণের পাতে ফুলের মত
রাখব তোমায় অবিরত
তফাত্ থেকে দেখ্ব শুধু, রাখ্ব প্রাণে প্রাণে;
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে, কাহার কঠিন টানে॥"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কখনও গান শিখেছিলে?" সে বলিল, "না, ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই।" আমি বলিলাম—"আমি এমন গান কখনও শুনি নাই। তুমি কোথায় থাক?" সে কোন কথা বলিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম —"এই গানটি আমাকে একলা এক দিন শুনাইবে?" সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম—"এ সব তোমার ভাল লাগে?" তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, কোন কথা বলিল না।

আমার বন্ধুদের তখন প্রায় সকলেরই মত্ত অবস্থা। এক জন উঠিয়া টলিতে টলিতে ইলেক্ট্রিক্ বাতিগুলি সব নিবাইয়া দিল।

আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম। সে কিছু বলিল না। তার পর,—তার হাত ধরিয়া উঠাইলাম। আমিও দাঁড়াইলাম। তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম—"আমার সঙ্গে চল।" সে আমার হাত ধরিল, আমার সঙ্গে চলিল।

কোথায় যাইব, মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিলাম। তার পর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতামণ্ডপে গেলাম। তখন চাঁদের আলো আরও ম্লান মনে হইতেছিল। পুকুরের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। বাতাস বন্ধ। ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল, আকাশে যেন একটু মেঘ উঠিয়াছে। সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চির উপর তাহাকে বসাইলাম। আমার সর্ব্বশরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর ধপ্ ধপ্ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম—"ডালিম, আমার তোমাকে বড় ভাল লাগে। আমার ত এমন কখনও হয় নাই।" সে বলিল—"ও কথা ত সবাই বলে, মনে করিয়াছিলাম, তুমি ও কথা বলিবে না।" আমি বলিলাম—"তুমি ত আমাকে চেন না।" তাহার একখানি হাত আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল, —"তোমার কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম— "জানি না। ইচ্ছা হয়, তোমাকে লইয়া কোথাও পলাইয়া যাই। এত দিনের জীবনযাপন সবই মিথ্যা মনে হইতেছে।" সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও চোখে জল আসিয়াছিল, কোন কথা বলিতে পারি নাই! সে যতই কাঁদিতে লাগিল, ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম। মনে হইল, ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শান্ত করি। এক নিমেষে আমার সংসারের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশীথের স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়, আমার জীবনের সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল যাতনা এক মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল! এ কি সেই আমি? আমার মনে হইতে

লাগিল, আমি যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি, এই-মাত্র এক নূতন জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে অবস্থা সুখের কি দুঃখের, আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে লাগিলাম। কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগিলাম—'হে আমার ব্যথিত, পীড়িত! এস, তোমার চোখের জল মুছাইয়া দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে থাকিও না—আমার বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠ। আমিও তোমাকে বুকে করিয়া জীবন সার্থক করি।' কতক্ষণ পরে সে একটু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বলিল, যাও, তাই আমি আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর হইতে বলাইতেছে। শুনিবে?" আমি বলিলাম, —"শুনিব; শুনিবার জন্যই তোমাকে এখানে আড়াল করিয়া আনিয়াছি।" সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার প্রাণে জাগিয়া আছে। তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে ব্যথার মত বাজিতে লাগিল,—আজও বাজিতেছে।

সে বলিল:—"আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত। মামা নেশা করিতেন। দিবানিশি সুরামত্ত, তাহার কাছে থেকে কখন ভাল ব্যবহার পাই নাই। মামী আমাকে একটা বোঝা মনে করিত, তার মুখে কটূক্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই। আমার মামার মামাত ভাই আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যখন বারো বৎসর বয়স, তখন তিনি মারা যান। তার পর চারি বৎসর পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা তোমার না শুনাই ভাল। আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তার পর চা'র বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে ছিলাম। এই চা'র বৎসরের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে বোধ হয়, ছয় সাত দিনের বেশী দেখা হয় নাই। তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। কখন কখন দু'এক দিনের জন্য বাড়ী আসিতেন। বাড়ীতে আসিলেও বাহির-বাড়ীতেই থাকিতেন। আমার সঙ্গে দুই এক-বার দেখা হইয়াছিল, কখনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। তাঁহার আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, চা'র পাঁচটি ছেলে-মেয়ে ছিল। আমার শাশুড়ী তাঁহার বিমাতা। আমার কথা কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শাশুড়ীর কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও খাইয়াছি। বাড়ীতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া—রাঁধাবাড়া, ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি—বাড়ীর কাছে নদী, সেই নদীতে—মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে, এই চা'র বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গালা বই ছিল, মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই ঘুমাইলে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম। আমার শাশুড়ীর তাহা সহিল না। এক দিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেই দিন মনে স্থির করিলাম, এ বাড়ীতে আর থাকিব না। পাড়ার

একটি ছেলে—আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সে দিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম, চাঁদের আলো ছিল, বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম, সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বাসনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম—'আমাকে মামার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পার?' সে বলিল—'কত দূর?' আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল—'নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে।' আমি বলিলাম—'যতক্ষণই লাগে, আমাকে লইয়া যাও।' এই বলিয়া তাহার পায় আছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল—'আচ্ছা, তুমি এইখানে ব'স, আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি।' সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। ভাবিলাম, এইবার যমের বাড়ী ছাড়িয়া মামার বাড়ী যাইতেছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার দিকে চাহিয়া ছিল, কোন কথা বলে নাই; শুধু চাহিয়া ছিল, আমার মনে হইতেছিল, তাহার চোখ দুটি যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া ছিলাম।

যখন মামার বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম, 'আমি পলাইয়া আসিয়াছি, আমি সেখানে আর যাব না। আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর, তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও।' মামী কর্কশস্বরে বলিলেন 'পালিয়ে এসেছিস্—কার সঙ্গে?' আমি সে কথার অর্থ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এর সঙ্গে।' মামী বলিলেন—'এ কে?' আমি বলিলাম-'জানি না।' মামী বলিলেন, 'আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ'বে না।' 'আমি কোথায় যাব!' মামী বলিলেন—'গোল্লায়', বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পাগলের মত সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল, সরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব? কোথা যাব? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নে কোন উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মত সে যে দিকে লইয়া গেল, সে দিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোথা যাইবে?' সে বলিল—'কল্‌কাতায়।' তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মত আমার মনে চম্‌কাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাঁদিয়া বলিলাম—'আমাকে রক্ষা কর; আবার আমাকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া চল।' সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর বলিল, 'আচ্ছা।' কিন্তু ফের সেই চাহনি, আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম।

ভোর হইতে না হইতে নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শ্বশুরবাড়ীর দিকে চলিলাম। সে বাধা দিল না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল, আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ী উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি চীৎকার করিয়া 'মা, মা' বলিয়া ডাকিলাম, আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামীর কথা মনে পড়িল—'গোল্লায় যাও।' আমি ফিরিলাম, দেখিলাম, সে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঠিক তেম্‌নি করিয়া চাহিয়া আছে। আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম —'আমি গোল্লায় যাব, যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাও।'

তখন নিশ্চয়ই সূর্য্য উঠিয়াছে, কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার—মনে হইল, যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোন অদৃশ্য বলিদান-মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তার পর?

তার পর কলিকাতায় আসিলাম। শুনিলাম, সে কোন জমীদারের ছেলে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া দু'জনে থাকিলাম। সাত দিন সে আমার গায় গায় লাগিয়া ছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম। আট দিনের দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তার পর?

এখন আমি কল্‌কাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। সহরের বড় বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। আমার বাড়ীতে সাজসজ্জার অভাব নাই, সোনার খাট, হীরার গহনা। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি, ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা, দাসদাসীর অন্ত নাই, আলমারিভরা কাপড়, বাক্সভরা টাকা।

আমি কল্‌কাতার ডালিম, কিন্তু"—কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দু'হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল। তখন জ্যোৎস্নার লেশমাত্র নাই। সেই লতা-মণ্ডপ গাঢ় অন্ধকারে ভরা। তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। আমি সেই অন্ধকারে তার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। আর আমার অন্তরে এক অসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—"কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি, বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয় কাঁদিতেছিল। তার পর বলিল, "তোমায় আমাকে ভাল লাগিয়াছে? তোমার মত আর কারও সঙ্গে আমার এ জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না? আমি যখন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে? এখন—এখন তোমারে ত কিছু দিবার নাই।"

এই বলিয়া সে আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল, শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম—"আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমাকেই চাই।" এই বলিয়া দুইজনেই কাঁদিতে লাগিলাম। সেই অন্ধকারে তাহাকে বুকে আকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলের মত জ্ঞানহারা হইয়া কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম, জানি না। আমি কি জাগিয়াছিলাম? মনে হইতেছিল, আমি ডালিমকে লইয়া এই সংসারের বাহিরে এক অপূর্ব্ব নন্দন-কাননে বাস করিতেছি। আমি আর ডালিম,—সে জগতে আর কেহ নাই! চিরদিন তাহাকেই বুকে করিয়া রাখিয়াছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি। প্রাণের যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আর একটা অতি গভীর পাতাল আছে, সে দিন প্রথম অনুভব করিলাম। আমার হৃদয়ের সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ করিয়াছিল ডালিম—ডালিম!

এমন সময় উপরে কোলাহল শুনিলাম, চমকিয়া

দেখিলাম, ডালিম আমার কাছে নাই! আমি অস্থির হইয়া গেলাম. পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপরে গেলাম, দেখিলাম, সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া এক জন বলিল, "কি বাবা, একেবারে উধাও।" আমি তাহাকে গালি দিলাম। আবার ছুটিয়া নীচে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। ফটকে গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোই বিবি চলা গিয়া?" এক জন গাড়োওয়ান বলিল, "হাঁ বাবু, এক বিবি আভি চলা গিয়া।" আবার দৌড়িয়া উপরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডালিম কোথায় থাকে?" এবার আর কেহ রসিকতা করিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবার ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মোটর-কার করিয়া তাহার বাড়ী গেলাম। শুনিলাম, ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম, জানি না, ডালিমের দেখা পাইলাম না। আবার বাগানে গেলাম, আবার খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাইলাম না।

সে রাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলের মত ছুটাছুটি করিলাম। পরদিন প্রভাতে আবার ডালিমের বাড়ী গেলাম। ঝি বলিল, সে শেষরাত্রে এসেছিল, আবার ভোর না হ'তেই চ'লে গেছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে, তাহাকে ব'লে গেছে—সকালে এক জন বাবু খোঁজ করতে আসবে, তাঁকে এই চিঠিখানা দিস্।

আমি সেই চিঠিখানি লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল. চিঠিখানি পড়িলাম:—

"তুমি আমাকে খুঁজিতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না! মনে করিও, আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই—মরিতে পারিব না! তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে যাকে সুখ বলে, তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কা'ল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, তাহা কখনও পাই নাই। তাহারি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি, তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণসর্ব্বস্ব! আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই!

ডালিম।"

কিশোর-কিশোরী

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

কিশোর-কিশোরী

তিনের কথা।

কাছে কাছে নাই বা এলে—তফাৎ থেকে বাসব ভাল;
ছুটি প্রাণের আঁধার-মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম্ জ্বাল।
এ পার থেকে গাইব গান, ও পার থেকে শুন্‌বে ব'লে;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে।

আশার মত চুমোর রাশ পরাণ হ'তে উড়াইব;
গানের সাথে তোমার ওই মুখে চোখে বুলাইব।
পাগল যত পরশ-তৃষা কোমল হয়ে ভাস্‌বে গানে;
ফুলের মত ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেব তোমার পানে।

লাগবে যখন কোমল ক'রে তরুণ তব প্রাণের পারে;
—আশার মত—ফুলের মত—পরাণ-ঘেরা অন্ধকারে,
ভয় পেয়ো না চম্‌কে উঠে, প্রাণের মাঝে চেয়ে থেক;—
ভেসে আসা প্রাণের নিধি প্রাণের-প্রাণে বেঁধে রেখ।

আভাস।

(১)

সে দিন নাহি গো আর যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে!
ভালবাসি, ভালবাসি মনে মনে কহিতাম!
কারে ভালবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম
হাসিতাম, কাঁদিতাম, শুধু ভালবাসিতাম
আপনারই হৃদয়ের ভালবাসারে!
কল্পনা-গগনালোকে উড়ে উড়ে ভাসিতাম!
সত্য ব'লে ধরিতাম সেই কল্পনারে—
মেঘের আড়ালে মোর মায়ানীড় বাঁধিতাম,
স্বপন মন্থন করি৷ ফুলে ফুলে সাজাতাম,
কত দীপ জ্বালিতাম, কত গীত গাহিতাম,—
মেঘের আড়ালে মোর সেই মায়া-আগারে!

কেহ ভালবাসে নাই! তবু ভালবাসিতাম,
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে!
ভালবাসা, ভালবাসা, ব'লে শুধু কাঁদিতাম,
কারে কহে ভালবাসা তাও নাহি জানিতাম,
মধুর প্রেমের মূর্ত্তি মনে মনে গড়িতাম—
পূজিতাম দেহহীন সেই দেবতারে!

সেই প্রেম নিরাকার কত দিন থাকে আর?
সব শূন্য হয়ে গেল জীবন-ভাণ্ডারে!—
নিবিল সে দীপাবলী, ছিঁড়িল সে ফুলহার,
নির্জ্জন পরাণ ভ'রে উঠিল রে হাহাকার!
সে দিন বহিয়া গেল, যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে!

(২)

সেই সে প্রথম দেখা, সাঁঝের আঁধারে!
ধূসর গগন-তলে
নব-শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
ক্লান্তদেহে ছুটে গে'নু তোমা দেখিবারে!
সেই সে প্রথম বার দেখিনু তোমারে!

অধরে অমল হাস,
আঁখি কোণে লাজ-ভাস,
কে ডাকিল ? ছুটে গে'নু সাঁঝের আঁধারে !

সে কোন্ কুসুম সম,
ফুটিলে মরমে মম,
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে !
বর্ণে বর্ণে উজলিলে,
গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে,
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয়-ভাণ্ডারে !
ওগো ফুল ! ওগো মিষ্ট !
আমি ক্লান্ত, আমি ক্লিষ্ট !
কা'র ডাকে ছুটে এ'নু ?—দেখিনু তোমারে
সেই সে প্রথম বার সাঁঝের আঁধারে !

কে দেখিল সেই দিন সন্ধ্যাকাশতলে,
সে কোন্ দেবতা ?
কে শুনিল কা'ন পাতি শ্যাম-দূর্ব্বাদলে
কাহার বারতা ?—
তুমি দেখেছিলে কিছু ?—আমি দেখি নাই
তুমি শুনেছিলে কিছু ?—আমি শুনি নাই !

কে দেখিল বল বল, কারে দেখাইলে,
কে চাহিল, কা'র লাগি বহিয়া আনিলে,
সেই শ্যাম-দূর্ব্বাদলে নীরব-গৌরবে,
আনন্দ-মুরতি ?
ধ্বনিয়া উঠিল কি গো মেঘমন্দ্র রবে,
সন্ধ্যার আরতি ?

আমি জানি নাই কিছু,—তুমি জান নাই,
বুঝিতে পারিনি আমি, তুমি বুঝ নাই,—
তবে কা'র ডাকে তুমি চ'লে এসেছিলে ?
না জেনে না শুনে কেন আমারে ডাকিলে

কোন্ মহা-পরাণের নীরব-নির্জ্জনে,
বল কোন্ কাজে ?
জীবনের কোন্ কুঞ্জে বিরলে বিজনে,
কা'র বাঁশী বাজে ?—
নির্ব্বাক্ নয়নে সেই অন্ধকারতলে,
কোন্ মহিমায়,
শব্দহীন সন্ধ্যা,—সেই শ্যাম-দূর্ব্বাদলে—
কোন্ গীতি গায় ?

তুমি কি অবাক্ হয়ে শুনেছিলে তাই ?
আমি ত' শুনিনি কিছু—কিছু বুঝি নাই !
তুমি কি আভাস পেলে পূজার গানের ?
গন্ধ পেয়েছিলে বুঝি পূজার ধূমের ?
তাই ছুটাছুটি ক'রে, চ'লে এসেছিলে
আকুল সন্ধ্যায়,
সেই সে প্রথম দিন !—আমারে দেখিলে,
দেখালে আমায়,—
আনন্দ-মুরতি তব ! কাহার লাগিয়া,
বল তব হৃদি-পদ্ম আছিল জাগিয়া ?
কে চাহে পূজার ডালি, সাজাইছে কেবা,—
কাহার পূজার লাগি,—কে করিছে সেবা !

৪

আমি কেন ছুটে এ'নু ? জানি না আপনি,
যখনি দেখিনু তোমা, আসিনু তখনি !
কোন ডাক শুনি নাই, তবু কে ডাকিল,
কে যেন ঘুমা'তেছিল—সে যেন জাগিল !
আমি ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই,
কোন ডাক শুনি নাই কেমনে বুঝাই,—
কেন যে আসিনু ছুটে ?—তুমি কি বোঝ না,
এ নহে কথার কথা,—এ নহে ছলনা ?

তুমি কি ভেবেছ মনে ঠিক করেছিনু,
আগে হ'তে ?—আমি জেনে শুনে এসেছিনু,

মোহিনী মুরতি তব দেখিবার তরে
কৌতূহল-পরবশ বাসনার ভরে ?
সামান্য তস্কর সম চুরি করি নিতে ?
সৌন্দর্য্য-সম্পদে তব মোর দৃষ্টি দিতে ?
চাও মোর আঁখি পানে, ও কথা ভেব না,
এ নহে কল্পনা,—ওগো, এ নহে ছলনা।

কিসের কল্পনা বল, কিসের ছলনা ?
কেমনে জাগিবে আজি বিহ্বল বাসনা
বিগত যৌবনে ? মোর মাঝে নিরন্তর,
হাসিত কাঁদিত সেই যে চির-সুন্দর :—
বাসনায় পূর্ণ প্রাণ, বুকে রক্তরাশি,
আপনি উত্তাল হ'য়ে বাজাইত বাঁশী।
মাথায় ফুলের মালা, ফুলধনু হাতে,
ফুলের তরঙ্গ তুলি, বসন্তের বাতে,

আপনি কাঁপিত আর মোরে কাঁপাইত !
আপনি ভাসিত, আর মোরে ভাসাইত !
সে ফুল তরঙ্গে ;—কোন অপারের পারে,
লয়ে যেত ভাসাইয়া মোরে বারে বারে ?—
আঘাতি' হৃদয় মোর আছাড়িত তীরে !
আবার ভাসায়ে দিত, আসিতাম ফিরে !
জীবন ভরিয়াছিল তারি মহিমায়,
গরবে গৌরবে তারি, সুখে, বেদনায় !

চাহিলে ফুলের পানে, ভাবিতাম ফুল,
এখনি ফুটিবে প্রাণে,—করিবে আকুল,
পরাণ মুকুল-রাশি ! ছুটিতাম তাই,—
হৃদয়-মাঝারে মোর, যদি তারে পাই।
যদি কভু শুনিতাম, কোন সুন্দরীর
সৌন্দর্য্যের স্তুতিবাদ,—অমনি অধীর
বাসনার স্রোতে মোরে ভাসাইয়া নিত !—
তাহারি কম্পিত বুকে মোরে পরশিত।

আমি সেই কল্পলোকে মুদিয়া নয়ন,
তাহারই লাবণ্যের কুসুম চয়ন
করিতাম মনে মনে ; মুরতি গড়িয়া,
প্রাণে প্রাণে সাজাতাম পরাণ ভরিয়া।
কত না সোহাগভরে মালা গাঁথিতাম,
সেই মালা তারি অঙ্গে জড়ায়ে দিতাম
মনে মনে ! ছুটিতাম তারি অভিসারে,
ভাবিতাম, আসিবে সে, ধরিব তাহারে :—

সে চির-সুন্দর মোর, নাই আর নাই !
বিগত যৌবনে তারে খুঁজিয়া না পাই !
শিথিল হৃদয় আজি, নিষ্প্রভ নয়ন,
বক্ষোমাঝে রক্তধারা ছুটে না তেমন,—
উত্তাল উন্মাদ হয়ে ! কাঁপে না অন্তরে,
নির্ব্বোধ বাসনাপুঞ্জ, পাতার মর্ম্মরে,
পুষ্পের পরশে ! সৌন্দর্য্যের কথা শুনে,
উন্মত্ত হয় না হৃদি স্বপ্ন-জাল বুনে।

তবু, কেহ আনে নাই তোমার বারতা,
আমার কানের কাছে ; ওগো কোন কথা,
শুনি নাই অপরূপ, তোমার রূপের !
বাজে নাই কোন তন্ত্রী—মোর মরমের,
তোমা দেখিবার আগে ! তোমার লাগিয়া
ছিল না পরাণ মোর কাঁপিয়া, চাহিয়া !
সেই যে আসিলে সেই যে প্রথমবার,
ধূসর গগনতলে,—সাঁঝের মাঝার !—

তার আগে কেহ মোরে কহে নাই নাম,
কোন্ ঘর আলো কর,—কোথা তব ধাম !
ওই যে অধর তব সরলতা-মাখা,
সকল মাধুরী তার হাসি দিয়ে ঢাকা,
সুধাংশু-কর-স্নাত কুসুম সমান ;
করুণায় ভরাভরা ওই যে নয়ান !

তার কথা শুনি নাই ;—ওগো মর্ম্ম-লতা
আপনি আনিলে তুমি আপন বারতা !

তবে কেন ছুটে গে'নু দেখিতে তোমারে ?
আপনি বুঝিতে নারি, নারি বুঝাবারে ।
শুধু মোর মনে হয়, কে যেন ডাকিল,
তোমার সমুখে আনি জাগাইয়া দিল !
জ্বলন্ত প্রদীপ হ'তে যেমন জ্বালায়,
আর একটি প্রদীপ আনি তাহারি শিখায়,
তেমনি আমারে লয়ে ধরিল যখনি,
তব রূপ-শিখাপরে জ্বলিনু তখনি !

কণ্ঠে মোর জড়াইনু গৌরবের মালা,
কাঁপিতে কাঁপিতে ; এই যে প্রদীপ জ্বালা,
সর্ব্ব-প্রাণে, সর্ব্ব-মনে, ওগো সব অঙ্গে,
ভাসিছি ডুবিছি তারি আলোক-তরঙ্গে !
এ আলো কাহার তরে ?—কেবা জ্বালাইল ?
কা'র পূজা লাগি বল প্রদীপ জ্বলিল ?
কোন্ দেবতার কোন্ মন্দিরের গায়,
ঝুলে ঝুলে জ্বলিতে ছ দিবস নিশায় ?

৫

কেন হাস ? মিথ্যা এ কি ? অলীক ঘটনা ?
আমি কি করেছি শুধু স্বপন রচনা ?
তবে কেন চিত্ত মাঝে আজো কেঁপে উঠে ?
পরাণের কুঞ্জে কুঞ্জে কেন পুষ্প ফুটে ?
এই যে দিবস নিশি মোর চারি পাশে
হৃদয়ের অন্তস্তলে, আকাশে বাতাসে,
সকল বিশ্বের মাঝে ফুলের সৌরভ !
মিথ্যা এ আনন্দ ভাস ? মিথ্যা এ গৌরব ?

সকল পরাণে মোর সারা দেহময়
এই যে দিবস নিশি কি যে কথা কয়,
কত না জীবন্ত ভাবে কত শত সুরে,
বাজিছে গানের মত এই প্রাণ পুরে !—

কভু বা গভীর কভু মধুর সরল,
কভু বা কঠিন কভু করুণা-তরল !
নিমেষে নিমেষে মোরে হাসায় কাঁদায়
নিমেষে নিমেষে মোরে মরায় বাঁচায় !

এও মিথ্যা ! আমি আছি, তাও মিথ্যা তবে ?
আমি নাই ! তুমি নাই, কিছু নাই ভবে !
মিথ্যা তবে সে দিনের ধূসর গগন !
তুমি মায়া, আমি মায়া ! মোদের মিলন

মিথ্যা সে মায়ার খেলা ! সেই মধু হাসি ?
সেই যে অধরে তব উঠেছিল ভাসি ?
তাও ভুল ? তাও স্বপ্ন ? তাও মিথ্যা তবে ?
চোখের চাহনি সেই ? তাও মিথ্যা হবে !

সেই যে কি জানি কেন বক্ষের দোলনি !
অবাক্ বিভোর সেই চক্ষের চাহনি !
যেন কোন দূরাগত সঙ্গীতের বাণী
সচকিত করেছিল সব দেহখানি !

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরল মূরতি !
সকল চাঞ্চল্যভরা, অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে,—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে !

এও তবে মিথ্যা কথা ! শুধু স্বপ্ন বুঝি ?
আমি তো হেরিছি সদা দুটি চক্ষু বুজি !
হারাইয়া যায় ব'লে বক্ষ চেপে রাখি !
আমি যে হেরেছি সদা—তাও মিথ্যা নাকি ?

তবে মিথ্যা, মিথ্যা সেই আনন্দের ভাস,
আমি মিথ্যা, মিথ্যা সেই মায়া সন্ধ্যাকাশ !
মিথ্যা সেই মধুভরা শ্যাম-দূর্ব্বাদল
মিথ্যা সেই প্রাণভরা আঁখি ছলছল !

মিথ্যা সেই সত্য রূপী মুরতি তোমার,
আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, সবি মিথ্যাকার !

জগৎসংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা !
বল কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা ?

মিথ্যা সেই কোমলতা করুণা-রূপিণী !
বুঝি বা চোখের দোষে দেখিতে পারিনি
ভাল ক'রে স্বপ্নালোকে, সেই সে তোমারে,
মায়া-মন্ত্রালোক-ঘেরা, সন্ধ্যার আঁধারে !

কে দিল নয়নে মায়া-অঞ্জন বুলায়ে ?
সকল অন্তর মোর কে দিল ভুলায়ে ?
ওগো আমি কারে বলি কারে হেরিলাম,
নয়ন-পুত্তলি মম—আঁখি-অভিরাম !

তবে কি হেরেছি যাহা তুমি তাহা নহ ?
ওগো মায়া ! ওগো মিথ্যা ! সত্য ক'রে কহ !
কোন্ দানবের সৃষ্ট দেবীর আকারে
দেখা দিলে সেই দিন মোরে ছলিবারে ?

তবে কোন্ ছদ্মবেশী রূপসী রাক্ষসী
আমার এ অন্তরের অন্তঃপুরে বসি'
যত না মাধুরী ছিল, ছিল যত প্রাণ,
একই নিশ্বাসে সব করেছিল পান,

চিরস্মরণীয় সেই সন্ধ্যাকাশতলে ?
আনন্দ-আবেগ-ভরে নয়নের জলে
আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ ;—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ !

আজো হেরিতেছি তাই সেই সে তোমারে
দিবালোক-মহিমায় নিদীপ আঁধারে !
সকল জীবন ভরি' প্রত্যেক নিমেষে,
সকল কর্ম্মের মাঝে সব কর্ম্মশেষে !

সেই সেই তরঙ্গিত পরাণ মুরতি
সকল চাঞ্চল্যভরা অচঞ্চল গতি !—
সকল লাবণ্য-গড়া রূপে টল টল,
পরাণ-তরঙ্গে সেই স্থির শতদল !

যখন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জলে অবিরত !
সকল কর্ম্ম-মাঝে সব কামনায়,
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায় —

সকল দুখের মাঝে সব চেতনায়,
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন-মাঝে সব সাধনায়,—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায় !

মিলনের মন্ত্রপড়া সেই সন্ধ্যাতলে
সেই মধু জল-জল শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
অবাক্ নয়নে তুমি দাঁড়ালে যখন
অন্তহীন মহিমায় ! সেই সে তখন —

অনিত্য কালের মাঝে একটি নিমেষ,
চমকি' থমকি' যেন আনন্দে অশেষ
ফুটিল গৌরবভরে চির-নিত্য হয়ে ;
থিরি তারে কালস্রোত গেছেছিল বয়ে !

অফুরন্ত চির সত্য অনন্ত অশেষ
অনিত্য কালের মাঝে সেই সে নিমেষ !
চিরদিন জাগিবে সে আপন গৌরবে !
তুমি আমি যত দিন তত দিন রবে !

সেই সে নিমেষ-মাঝে তুমি দেখা দিলে
তুমি কি গো চিরকাল তারি মাঝে ছিলে ?
কোন্ মহা-পরাণের বাঁশরী শুনিলে
আপনার আবরণ খুলে ফেলে দিলে !

সেই সে মুহূর্ত্ত মোর তুমি মূর্ত্তি তার !
নহ মিথ্যা ! সত্য তুমি ! সত্য রূপাধার !
সত্যই সেদিন আমি নয়নে হেরেছি,—
সত্যই পরাণ ভ'রে পরাণে ভুলেছি !

অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপ-রস গন্ধ-ভরা আত্মার মন্দির !

পদতলে কলকলে কাল উর্ম্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা।

এই যে প্রত্যক্ষ মোর প্রাণ-মাঝে জাগে
তোমারে বুঝাতে নারি তাই ব্যথা লাগে
কেমনে বুঝাব তোমা ; ওগো বক্ষোবাসি,
আমি সে মূরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।

মনে হয় চিরকাল ভেসে ভেসে যাই
কত জনমের সাধ বুকে লয়ে তাই
সেই সে মুরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।
এখনো সন্দেহ তব ? ফের ওই হাসি ?

আরে আরে অবিশ্বাসি ! আরে রে নির্দ্দয় !
ওই তব বক্ষতলে নাহি কি হৃদয় ?
সে দিন কি প্রাণে তোর ডাকে নাই বান ?
কূলে কূলে উঠে নাই সকল পরাণ ?

ভেসে বহে যায় নাই সকল মরম,
ডুবাইয়া সব কর্ম্ম, সকল ধরম,
ওই কোথাকার সুধা সাগরের পানে;—
পেতে পেতে নাহি পাওয়া কাহার সন্ধানে ?

আমার পরাণ ভ'রে কি গীত গুঞ্জরে !
মরমের প্রতি পত্রে কি ফুল মুঞ্জরে !
বুঝাতে পারি না তোরে তাই কাঁদে প্রাণ,
পরাণ ছাপায়ে তাই ভাসে দু'নয়ান !

ওগো মর্ম্মলতা ! মরমে জড়ায়ে থাক !
আমার বক্ষের মাঝে রাখ মুখ রাখ !
তবে যদি নীরবে গো পারি বুঝাইতে
আজো যাহা পাই নাই হেরিতে শুনিতে !

রাখ বুকে বুক ! কর গো হৃদয়ঙ্গম !—
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন সাগরসঙ্গম
পানে বহি চলিয়াছে, দিবসরজনী,
কার পিছে পিছে, শুনি কার শঙ্খধ্বনি !

বুঝিতে পার না কিছু ? থাক তবু থাক
আমার বক্ষের মাঝে লতাইয়া থাক !
তোমারে হৃদয়ে রাখি মোর মনে হয়
কে যেন আমার মাঝে সদা কথা কয় !

কে যেন ডাকিছে কত মধুর মন্তরে
আমাদের দুজনের অন্তরে অন্তরে !
কে যেন গো এসে এসে ফিরে চ'লে যায়,
হেসে হেসে জীবনের বিজন তলায় !

ওগো মর্ম্মলতা ! থাক তবু থাক
আমার মর্ম্মের মাঝে জড়াইয়া থাক !
তুমিও শুনিবে প্রাণ ! আমি যদি শুনি !
সেই তার নূপুরের মধু রুণুঝুণী !

তুমিও হেরিবে প্রাণ ! আমি হেরি যদি !
চিত্ত-মাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি !
দেখিব দেখাবো তোরে মরমে মরমে
জীবন-মরণ ভ'রে জনমে জনমে !

৬

কেমনে উঠিবে ফুটি শুধু এক দিনে ?
আরে ! আরে ! ফুল যবে হেসে ফুটে উঠে
শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ স্পর্শ করে,
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সে কি শুধু সেই মুহূর্ত্তের
লীলা ? তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন-লীলা যুগ যুগান্তের,
জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে ? অনন্ত কালের
শুভ সঙ্গীতের মাঝে উঠে সে ফুটিয়া !—
ফুটে না ফুটে না ফুল শুধু এক দিনে !

সেই যে মিলিনু দোঁহে সন্ধ্যাকাশতলে
সে কি শুধু মুহূর্ত্তের মিলন-উৎসব ?
অকস্মাৎ অকারণ সামান্য ঘটনা ?
মুহূর্ত্তে আরম্ভ তার মুহূর্ত্তেই শেষ ?

সেই যে পরশ তব, আঁখি অনিমেষ,
সে যে মোর শুভ-দৃষ্টি জনমে জনমে
চির-পরিচিত! সে যে অনন্ত কালের!—
যোগভ্রষ্ট যোগযুক্ত যুগ যুগান্তের!
তোমারে দেখেছি শুভে! কত শত বার
আবার দেখিনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে!

যোগভ্রষ্ট আমি! কেমনে বর্ণিব বল
অনন্ত কালের সেই মাধুর্য্য-কাহিনী?
যুগে যুগে কেমনে যে পরশ লভেছি!
জনমে জনমে কেন হারায়ে ফেলেছি!
কেন বা পাইনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে!
ফুটিয়া উঠিলে মরি! মধু-জল-জল
উজল রসের মূর্ত্তি! কত না কল্পনা
করিছে, জীবন যেন স্বপন-বাহিনী
যেন ধরা দেয়, শত শত জনমের
কত না হাসির ধ্বনি কত অশ্রুজল!

জীবন-লীলার সেই প্রথম প্রত্যুষে
মনে হয়, ছিনু মোরা শিলাখণ্ড দুটি!—
অগাধ আঁধারে যেন ভেসে ভেসে উঠি
দুইটি উপলখণ্ড সৃষ্টি-পারাবারে!
বুকে বুক লাগা, সেই যে প্রথম জাগা
প্রাণদীপ্ত মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বাক্ অবাক্
দুইটি পরাণ! কে দিল তরঙ্গ তুলি?
আবার ডুবিনু কেন আঁধার নির্জ্জনে?—
তরঙ্গ-সঙ্কুল সেই গভীর অর্ণবে
জীবন-লীলার কোন প্রথম প্রত্যুষে?

তার পরে কত কাল কত যুগ ধ'রে
কালের তিমির-স্রোত ব'হে চলে যায়
কোন্ চিহ্নহীন পথে? আলোকবিহীন
কোন্ ঘন-তমসায়? কোন্ স্মৃতিহীন,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার অরণ্যের মাঝে
হয়ে যায় লীন! সেই মহাশূন্যে যেন
অট্ট হাসে পূর্ণ করি দিগ্ দিগন্তর
নৃত্য করে উন্মত্ত সে কোন্ দিগম্বর?
তারি মধ্যে তুমি আমি ছিনু কি নিদ্রায়
কত দিন কত কাল কত যুগ ধ'রে?

তার পর হেসে উঠে নব বসুন্ধরা
ফলে পুষ্পে ভরা ভরা! কৌতুকে অপার
চাহিল নয়ন মেলি নব সূর্য্যপানে!
মোরাও জাগিনু দোঁহে! মধুবন-মাঝে
আমি বনস্পতি ওগো! তুমি বনলতা।
কি আনন্দে কি গৌরবে মেলিলাম আঁখি!
আঁকড়িয়া ধরিলাম কঠিন হৃদয়ে,
মধুর কোমল কান্তি সেই লতিকারে!
গলাগলি জড়াজড়ি মিলন-রভসে!
হেসে হেসে উঠিল সে নব-বসুন্ধরা?

সেই বার সেই মোর ভ্রমর-জনম!
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি বনে বনে!
বুকে লয়ে জন্মান্তের বিরহ-বেদন
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি আনমনে!
অকস্মাৎ এক দিন কানন-প্রান্তরে
অপূর্ব্ব কুসুম-রূপে উঠিলে ফুটিয়া!
আনন্দেতে আগুসারি মিলন-তৃষায়
যেমনি আসিনু কাছে, কোন্ ঝটিকায়
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে তুমি কোথায় লুকালে!—
খুঁজিতে খুঁজিতে গেল ভ্রমর-জনম।

তার পর মনে আছে? ভেলায় ভাসিনু
তুমি আমি নরনারী জীবন-সাগরে!
আশ্চর্য্য অবাক্ হয়ে আমি চেয়ে ছিনু,
কি জানি কেমন ক'রে তুমি চেয়ে ছিলে!

কুসুমিত মুখকান্তি ; মধু দেহলতা ;
দোল দোল জল জল রূপের গৌরবে ?
সে কি প্রেম ? ভালবাসা ? আকাঙ্ক্ষা ? বাসনা ?
কোন্ টানে চেয়ে থাকা এমন নীরবে ?
চাহিতে চাহিতে কেন উঠিল তুফান ?
তুমি আমি ডুবিলাম সে কোন্ সাগরে ?

তার পর ? পশুপক্ষী করিনু শীকার ;
ভীষণ অরণ্যমাঝে ব্যাধের জনম ।
এক দিন বনপ্রান্তে ত্রস্তা সে হরিণী
যেমনি ফেলিনু তারে বাণবিদ্ধ ক'রে,
সজল সরোষ আঁখি ভরা বেদনায়
কোথা হ'তে বাহিরিলে বন আলো ক'রে !
নতজানু হয়ে কত ক্ষমা চাহিলাম,
কহিলে না কোন কথা, ছুটে চ'লে গেলে !
ওগো বনলতা ! ওগো করুণা-রূপিণী !
সে জনমে আর কভু করিনি শীকার ।

বন-শকুন্তলা তুমি বনের মাঝারে
লতা-পাতা-ঘেরা ক্ষুদ্র মোদের কুটীর ।
এ জনমে কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতাম
ফল মূল জল তুমি বহিয়া আনিতে ।
এক দিন আক্রমিল কৃতান্তের মত
নিষ্ঠুর দস্যুর দল ঘোর অন্ধকারে !
শাণিত-ছুরিকা লয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে
তোমার আমার বক্ষে বসায়ে দিলাম ।
সে দিন একত্রে মোরা যাত্রা করিলাম
কোন্ টানে কি আশায় নিশার মাঝারে !

পরজন্মে জনমিলে মধু পদ্ম-আঁখি
রাজার নন্দিনী হয়ে ! তব মালঞ্চের
আমি ছিনু মালাকর ! প্রভাতে সন্ধ্যায়
গাঁথিতাম মালা, তুলি ফুল কাননের !

কি জানি কি বহে যেত শিরায় শিরায়
কত হাসিতাম, কাঁদিতাম থাকি থাকি !
এক দিন মালা দিতে কি দিনু কি জানি !
ধরা প'ড়ে গেনু ! পরদিন বধ্য-ভূমে
যবে নিবু নিবু প্রাণ, ঊর্দ্ধে চেয়ে হেরি
জ্বলিছে গবাক্ষে দুটি অশ্রুভরা আঁখি !

সৈনিকের বধূ তুমি সে কোন্ জনম ?
ছিলে মোর বক্ষ ভ'রে ! দেহ মন গড়া
অনলে বিদ্যুতে ফুলে ! চোখে হোমশিখা !
চপলা চমকে বুকে ! অঙ্গের লাবণি
কুসুম-স্তবক সম মধুর কোমল !
অকস্মাৎ রণভেরী উঠিল বাজিয়া !
শত্রুর কৃপাণ যবে লাগিল হৃদয়ে,
একবার ভয় হ'ল পাছে যত্নে রাখা,
চিত্ত-মাঝে তব মূর্ত্তি ছিন্ন হয়ে যায় !
পরক্ষণে হাসিলাম ; কৃতার্থ জনম !

আমি কবি, রাজগৃহে গাহিতাম গান
প্রহরে প্রহরে ! কত শত জনমের
মিলন-বিরহ-ব্যথা সুখ দুঃখ আশা
ফুটিয়া উঠিত যেন সেই জনমের
প্রত্যেক গানের মাঝে ! কারে খুঁজিতাম ?
এক দিন হেরিলাম লতার আড়ালে
কাল' কাল' দুটি চোখ, ঢাক ঢাক যেন
এলোথেলো চুলে ! সেই দৃষ্টি, সেই হাসি !
সেই কত জনমের চেনা চেনা ভাব !
চমকিয়া উঠিলাম ! বন্ধ হ'ল গান ।

তার পর ? পরজন্মে আমি চিত্রকর,
রূপসী রমণী তুমি ধনীর সংসারে !—
বহুজনসমাকীর্ণ বিপুল সে পুরী !
এক দিন তোমারই আলেখ্য আঁকিতে

আমারে লইয়া গেল নয়ন বাঁধিয়া
কত রাস্তা গলি ঘুঁচি কত সিঁড়ি দিয়া
একটি কক্ষের মাঝে! সম্মুখে দর্পণ,
তারি মাঝে ভাসিতেছে প্রতিবিম্ব তব!
হৃদয়ের রক্ত দিয়া আঁকিনু সে ছবি!
হেরি কহে সবে, অপূর্ব্ব এ চিত্রকর!

মনে কি পড়ে না সেই শিবের মন্দির?
আমি যে পূজারী ছিনু সেই দেবতার।
তুমি সেবাদাসী! কোথা হ'তে এসেছিলে
নাহি জানি! দিবারাত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে
ফুল্ল কুসুমের মত রহিতে পড়িয়া!—
সেই ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি!
এক দিন পূজা-শেষে, আকুল অধীর
মত্তপ্রাণে যেই তোমা বক্ষে বাঁধিলাম,
চূর্ণ হয়ে পড়ে গেল মস্তকে আমার—
সেই জনমের সেই শিবের মন্দির!

এ কি সত্য? এ কি মিথ্যা? জানি না জানি না
জানি শুধু এই লীলা অনন্ত কালের!
জানি আমি জন্মে জন্মে তোমারে পেয়েছি,
লভেছি পরশ কত ভাবে কত বার!
তারি চিত্রগুলি যেন ভেসে ভেসে আসে
আলোক ছায়ার মত মোর চিত্ত-বাসে।
তোমারেই পাই ওগো, বারে বারে বারে
তরঙ্গের মত মোর মরম-বেলায়।
মিলনে বিরহে কত! আর তারি সনে
যেন বেজে উঠে অনাদি কালের বীণা।

অনন্ত কালের লীলা নহে এক দিনে!
সৃষ্টির প্রথম হ'তে চির-প্রসারিত
মোর বাহু দুটি, জন্ম জন্ম করি ভেদ
বিদ্ধ করি ব্যাপ্ত করি যুগ-যুগান্তর!

তারি আলিঙ্গন-মাঝে, ধরা পড়ে গেলে
সেই দিন! যেন কোন্ মহাদেবতার
মহা-মিলনের তরে মিলেছি আমরা!
যুগে যুগে জনমে জনমে বার বার!
তাই সন্ধ্যাকাশতলে উঠিলে ফুটিয়া;
ফোটনি ফোটনি প্রাণ, শুধু এক-দিনে।

৭

জীবন-সাধন ধন তুমি হে আমার।
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার।
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে!
কোন দিন হেরি নাই
পাই নাই কোন দিন;
এস নাই কোন কালে
ফোট নাই কোন দিন,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে!
সব শূন্য পূর্ণ ক'রে
এমন মরম ভ'রে!
তুমি যে মধুর!
তুমি যে বঁধুর
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার!
এমন হারান ধন পেয়েছি আবার!

বারে বারে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে ফুটেছিল কত ঝরিয়াছে!
কত ফুল কত হাসি,
কত ভাল-বাসা-বাসি,
কত দুখ্ কত সুখ,
কত ভুল কত চুক,
কত-না অজানা ত্রাস,
কত বাঁধনের পাশ,

কত সোহাগের কথা,
কত বুক-ভাঙ্গা ব্যথা,
কত আশা কত গান,
কত নিরাশার তান,
মিলনের ভাতি
বিরহের রাতি :—
যুগে যুগে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে গড়েছিল কত ভাঙ্গিয়াছে !

জনমে জনমে পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
যত কিছু ঝরেছিল সবই ফুটিয়াছে—
মরণের পারে পারে
একসঙ্গে একেবারে,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে !
যত ভাঙ্গা গড়েছিল,
যত গড়া ভেঙ্গেছিল,
সবই যে গো প্রাণপুটে
রাঙ্গা হয়ে ফুটে উঠে,
অকস্মাৎ একেবারে
সেই আলো অন্ধকারে !
প্রাণ টল টল !
আঁখি-ভরা জল !
শত জনমের পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
যত-না হারাণ ধন, সবই মিলিয়াছে !

যাহা কভু পাই নাই, যার তরে আশা
না জেনে না শুনে প্রাণে বেঁধেছিল বাসা !
জনম জনম ধ'রে
সকল মরম ভ'রে
গুন্ গুন্ গাহি গান
অনুক্ষণ চুনচান

খুঁজিত খুঁজিত যারে !
ওগো পাইলাম তারে !

সেই সন্ধ্যাকাশতলে
নব-শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
একেবারে অকস্মাৎ
ভরিল রে প্রাণপাত !
ওগো তুমি সেই !
তুমি সেই, সেই !
যারে পাই নাই কভু ! যার তরে আশা,
জীবন-কমল-বনে বেঁধেছিল বাসা !

জন্মে জন্মে ঘুরে ঘুরে এই যে মিলন !
এর তরে ছিল নাকি প্রাণে আকিঞ্চন—
শতেক জনম ধ'রে
সকল পরাণ ভ'রে ?
সকল জনমে আঁখি
চাহেনি কি থাকি থাকি
কোন্ সুদূরের পানে
ভরা বর্ণে ফুলে গানে !

তারি চিত্র স্বপ্ন যেয়ে
ছিল নাকি মর্ম্ম ছেয়ে ?
তারি গন্ধ চিত্ত-হারা
করেনি কি আত্মহারা ?
গীত কাতরতা,
মিলন-বারতা
আনে নাই থাকি থাকি ? হে প্রাণ-রতন !
শত জনমের চাওয়া এ মধু-মিলন !

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা !
যে দীপ জ্বালিনি ওরে ! সেই দীপ জ্বালা !
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল দুলায়ে রঙ্গে !—

যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা!
এই যে হৃদয়মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে'—
যে দীপ জলেনি আগে
ওরে! তারি আলো জ্বালা!
যত সাধ সাধনার
যত গীত অজানার,
ফোটে কি মরমে?
শতেক জনমে?
আঁখি মুদে চেয়ে দেখ, কি শোভন মালা!
প্রাণে প্রাণে চাও প্রাণ! কি আলোক জ্বালা

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে!
হৃদয়-কমল-মাঝে কি ধুম লেগেছে!
ডাঁটায় ফোটে যে ফুল
মোর ফুলে যে ফুটেছে!
ফুলে ফুলে ফুলাকুল
ফুলে ফুলে ফুটেছে!
লালে লালে রাঙ্গা হয়ে
ফুটে ফুটে উঠেছে!

কে নেয় রে মধু লুটি
হেসে হেসে কুটি কুটি?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি?
মধুর তরঙ্গে
কে নাচে রে রঙ্গে?
ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধুম লেগেছে!
পরাণ-কমল-মাঝে কে জানি জেগেছে!

যুগে যুগে পাওয়া পাওয়া না-পাওয়া মিলন
যেন রে সার্থক হ'ল! পূরিল জীবন!
ওগো ফুল ওগো মিষ্টি!
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি!
ধন্য আমি ধন্য তুমি
পুণ্য সে মিলন-ভূমি!
কে বলে রে ধন্য ধন্য?
কে দেয় রে করতালি?
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে?
কে বলে রে ধন্য ধন্য,
এ কা'র নূপুর বাজে?
কার পদরজঃ
পরাণ-পঙ্কজ

শোভা করে? হে মিলিত! হে মধু-মিলন!
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি! ধন্য এ জীবন!

দেশের কথা

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

দেশের কথা

স্বাগতম্ *

হে আমার মা আনন্দময়ী বাঙ্গালার সন্তানগণ, আজ গঙ্গা-পদ্মা-করতোয়া-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-নদ-বারি-বিধৌত সেই প্রাচীন গৌড়-বঙ্গের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় পুরীতে মা আমাদের ডাকিয়াছেন, তাই আজ আমরা মা'র কথা কহিবার জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি। 'বন্দে মাতরম্,'—সুজলা সুফলা নদীবহুলা এই আমার মাতৃভূমিকে বার বার বন্দনা করি! জননী আমাদের যে বাণী দিয়াছেন, মাতৃকণ্ঠের সেই গীর্ব্বাণী—সেই মা মা ধ্বনি, পবনে গগনে ধ্বনিত হইয়া পদ্মার পারে পারে যেন সেই বাণী তুলিতে থাকে, মা-ও যেন প্রাণমন ভরিয়া সন্তানের এ বাণী শুনিয়া আকুল হন।

আজ সংক্রান্তির ক্রান্তিপাত পড়িয়াছে, বর্ষ চুই চলিয়া যায়, 'নূতন' তাহার রাগোজ্জ্বল বিভায় মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমাদের ঘরে অতিথি হইতে আসিয়াছে; সেই কবেকার পুরাতন নূতন হইয়া আসিয়াছে, আর সেই কবেকার গৌড়ের আঙ্গিনায় সেই পুরাতন আবার নূতন হইয়া আসিয়াছে। তাই আজ বলিতেছি, হে আমার পুরাতন, হে আমার নূতন, স্বগৃহে স্বাগতম্! এই গৃহের রজে পিতৃপিতামহের পদারবিন্দের রেণুকণা আছে, এই ধূলি মস্তকে গ্রহণ কর, এই আয়ুষ্মান্ বায়ুতে তাঁহাদের নিশ্বাসের গন্ধ আছে, প্রাণ ভরিয়া মাখিয়া লও, এই পদ্মা-গঙ্গার জলধারায় তাঁহাদের তর্পণ হইয়াছে, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, আজি আমরা তাঁহাদের সেই স্মৃতির স্মরণে ধন্য হইব।

কত দিনের এ দেশ! কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গেছে, কত দান-সাগর এই পদ্মা-সাগরের তীরে তীরে ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ছড়াইয়া গেছে, কে আজি তাহার সে স্মৃতির ধ্যান করে। কিন্তু স্মৃতি আত্মস্থ হইতে শিখায়, প্রতি ব্যষ্টিতে চৈতন্যের আভাস জাগাইয়া দেয়, তাই স্মৃতির স্মরণ পুণ্যকথা। সেই পুণ্যকথার শ্রবণে মনুষ্য জন্ম ধন্য হয়, তাই আজ মাতৃ-মন্দিরে সেই পুণ্যকাহিনী শুনিতে আমরা মিলিত হইয়াছি। মাতৃরূপা এই শ্যামলা জননীকে আমরা বার বার নমস্কার করি!

আপনারা আজ যে গৃহের আঙ্গিনায় সবে সমবেত হইয়াছেন, কত ইতিহাস তাহার আছে। কত আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, কত ঘোরা অমানিশার কাহিনী, তাহার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে। দুর্দ্দাম দুর্ব্বার পদ্মার ভাঙ্গন, কত রাজ্য গড়িয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে। পদ্মার ভাঙ্গন ও গড়ন আজও থামে নাই; কিন্তু যে ইতিহাস সে একবার গড়িয়াছে, সেই পৃষ্ঠা সে নিজেই আবার ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। আপনারা আজ যেখানে আসিয়াছেন, অশ্রান্ত-বারি-বিস্তার পদ্মা আপনাদের বুক করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু পদ্মার সে গৌরবের দিন নাই, হে অতিথি! হে নারায়ণ! সে

> * * * * জলপাত্র, দিব্যাসন,
> সুবর্ণ কম্বল, বহুপ্রকার বসন,
> উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে—

তাহা আর নাই।

---

* ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

কাল আমাদের ভাগ্যহীন করিয়াছে। চিরদিনই কিন্তু আমরা এমন ছিলাম না। ইতিহাস আলোচনার অবসর এখন নয়। আর আমি ইতিহাস-ব্যবসায়ীও নহি। আমি সেই পরশমণির খোঁজেই ছুটিয়াছি। বাঙ্গালীর প্রাণধর্ম্মের আমি কাঙ্গাল। ইতিহাস সেই প্রাণধর্ম্মেই ভিত্তি করে, সেই প্রাণধর্ম্মের ইতিহাসেই জাতির প্রাণের সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। দেশ-মাতৃকার ক্রোড়ে সন্তান চিরদিনই সেই প্রাণের স্নেহরসে জীবিত থাকে। সেই প্রাণধর্ম্মের পরিচয় মা'র আশীর্ব্বাদে প্রাণের অনুভূতিতেই জাগে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে সে সুর ধ্বনিয়া উঠে, সন্তান মা'র স্নেহের সত্য পরিচয় লাভ করে। সেই প্রাণধর্ম্মের দিক হইতেই এই ডাক আমার আসিয়াছে; মা আমাকেও ডাকিয়াছেন, আপনাদের সেবার জন্য; মা আপনাদেরও ডাকিয়াছেন, মিলিবার জন্য। প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে, ভাবে ভাবে। এ এক বিশাল প্রাণযজ্ঞ, যে যজ্ঞের হবিঃ প্রাণ, যে যজ্ঞের চরু জীবন, যে যজ্ঞের কামনায় মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, যে যজ্ঞের হোমধূমের মাঝে সাহিত্যের মিলন-বাণী ও মন্ত্র ধ্বনিত হয়, জাতি আপনাতে আত্মস্থ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ দেখিতে পায়, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে হে আমার পুরাতন! হে আমার নূতন অতিথি! ব্রীহি, যব, ধান্য সকলি প্রস্তুত, আপনারা যজ্ঞে ব্রত হউন। আজ পূর্ব্ববঙ্গ দরিদ্র হইলেও,

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

দারিদ্র্যের জন্য অন্নদানে অক্ষম হইলেও, অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, চরণ-প্রক্ষালনের জন্য জল, আর চতুর্থতঃ প্রিয়বচন—স্বধর্ম্মপরায়ণের গৃহে এ সকলের উচ্ছেদ বা অভাব কদাচ সম্ভব নয়।

অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি॥

এ অকিঞ্চন যেন চিত্ত-সুখে সেই অকৈতব ভক্তি নারায়ণের জন্য সাজাইয়া রাখিতে পারে। তাই আজ পূর্ব্ববঙ্গ—

শিরে ধরি বন্দে নিত্য করো তব আশ।

আমাদের প্রয়োজন অতি স্বল্প। সে দিন আর আমাদের নাই। কিন্তু আপনারা যে ভূমিতে আজ চরণ-চিহ্ন আঁকিতে আসিয়াছেন, সে ভূমি বহু পুরাতন; হে নূতন! সে পুরাতনের স্বপ্নঘেরা মোহ তমাচ্ছন্ন দিনের পরপারে সে যবনিকা একবার সরাইয়া দেখিবে না কি—কাল যে অবগুণ্ঠনে তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এ সেই 'ঢাকা' নগরী। শুনা যায়, এই নগরীর নাম 'ঢাকা' হওয়ার দু'একটা প্রবাদ-কথা আছে। 'ঢাক' বলিয়া এক রকম গাছ এ দেশে প্রচুর ছিল, তাই সেই গাছের নাম হইতে এই নগরীর নামকরণ হইয়াছে। যদিও সে 'ঢাক' গাছ এখন আর মিলে না। কেহ বলে, সম্রাটশেখর বল্লাল, বুড়ীগঙ্গার উত্তরে যে অরণ্যানী ছিল, সেই অরণ্যে দশভুজার এক ধাতুমূর্ত্তি পান। অরণ্যের অন্ধকারে সে সিংহবাহিনী ঢাকা ছিল। বল্লাল পিতৃসিংহাসন পাইবার পর, সম্রাট বল্লাল ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এই ধাতুমূর্ত্তিকে—দুর্গামূর্ত্তিকে নগরের অধীশ্বরীরূপে স্থাপিত করেন, তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী। তাই এই নগরের নাম ঢাকা। আবার কেহ বলেন, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে বুড়ীগঙ্গায় আসিয়া, এই নদীবহুলা ভূমিকে মনোরম দেখিয়া, এইখানে রাজধানী করিবার সঙ্কল্পে স্থিরনিশ্চয় হন। আজ যেখানে ঢাকা অধিষ্ঠিত, সেই স্থান হইতে ঢাক বাজাইলে যতদূর অবধি শুনা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত সহরের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ইহার নাম ঢাকা রাখেন। কীর্ত্তিনাশার বক্ষের উপর

দিয়া আজ আপনারা সেই ঢাকা নগরীতে আসিয়াছেন।

শতাব্দীর সেই যবনিকা যদি সবাই দেখেন, তবে দেখিবেন যে, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এই বিশাল জনপদই বঙ্গদেশ—এখন সচরাচর যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের সময় হইতে গৌড়ের সেনরাজগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত তাহাকেই বঙ্গ বলিত। পদ্মা-মেঘনা এই চিরশ্যামা এক দিন কি মহিমায় কোটি সূর্য্যকিরণভাতিতে দীপ্তিময়ী ছিল! ঢাকা, বিক্রমপুর বলিতে সেই পুরাতন গৌড়বঙ্গের কেন্দ্র বলিয়া মনে পড়ে। গৌড়-বঙ্গ ও মগধের কত না কাহিনী, কত সভ্যতার সংঘর্ষণের ইতিহাস ওত-প্রোতভাবে চলিয়াছে। মগধের কণ্ঠলগ্ন হইবার পূর্ব্বে গাঙ্গেয়গণের বিপুল বলশালী রণ-কুঞ্জর-সজ্জিত অসংখ্য বাহিনী-শোভিত এই দেশের প্রাসাদশিখরে গগনস্পর্শী স্বাধীনতা-ধ্বজা সূর্য্যকিরণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত। সপ্তম শতাব্দীতে সে গৌড়-বঙ্গ কালের ঝঞ্ঝার আঁধারে ডুবিয়া গেল। তার পর এক দিন উত্তরাপথের আলোড়নে যুগবিপর্য্যয় হইল। অবিরাম রাজ্যবিপ্লবে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। এই যুগব্যাপী ঘোর অরাজকতার ভিতরে বাঙ্গালার প্রাণ লুকাইয়াছিল, সে তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। সুপ্ত প্রজাশক্তি সহসা স্বপ্নোত্থিতের মত আঁখি কচলাইয়া ভোরের আলোকে সব দেখিয়া লইল। সিংহপ্রতিম প্রজাশক্তি সমবেত হইয়া সেই "মাৎস্যন্যায়" সেই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও অরাজকতার চরম দুর্দ্দশাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। এই যুগেই গৌড়-বঙ্গের শিল্প-প্রতিভায় বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্মের বিকাশ অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুরণ হইয়াছিল; জগতের ইতিহাসে সে কাহিনী সোনার নিকষে রেখা টানিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে। তার পর, কুক্ষণে বঙ্গ গৌড়বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিচ্ছিন্ন বঙ্গ ও গৌড় এই বিচ্ছেদে হীনবল হইয়া পড়িল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে ভেদবুদ্ধি আসিয়া উভয়কেই নষ্ট করিল। সে দিন বঙ্গ যে মহামণি প্রাণের মণিকোঠায় রাখিয়াছিল, তাহা টুক্‌রা টুকরা হইয়া গেল। বাঙ্গালার মহানাগ অনন্তের মাথার মণি সেই দিন হারাইয়া গেল। তাহা আর মিলিল না। হায়! গৌড়, কেন এমন মণি হারাইয়া ফেলিলে! তাই সেই বিচ্ছেদের দিনে—সেই বিরহের দিনে—বাঙ্গালীর রাজার মাথার শ্বেতচ্ছত্র কে কাড়িয়া লইল? সে উত্তর ইতিহাস আর দিবে কি?

এইরূপে সেই যে দিন গৌড়ের স্বাধীনতা গঙ্গার জলে ভাসিয়া গেল, সে দিনেও এই পদ্মামেঘনা শ্রীবিক্রমপুরের প্রাসাদশীর্ষে স্বাধীনতা-সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখাটুকু বঙ্গের ভাগ্যাকাশ হইতে একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। আজ সে শ্রীবিক্রমপুরের সে শ্রী নাই, বুকের উপর দিয়া পদ্মা চলিয়া গেছে, সে ভূভাগকেও টুক্‌রা করিয়া দিয়াছে। সেই স্বপনের দেশ, কোথায় গেল? সুখের সে স্মৃতি আছে, আর কিছু নাই।

আজ পূর্ব্ববঙ্গ শ্মশান গাঢ়তর অন্ধকার, দিবসে নিশীথ! প্রেতের মত আমরা কয়টি আছি। তবু এই আমাদের ভিটা। তৈল বিনা সন্ধ্যা দীপ জ্বালিতে পারি না, ঘরের চালে খড় দিতে পারি না, দেউলে দেবসেবা হয় না! কীর্ত্তিনাশা ভাঙ্গে গড়ে, দুর্দ্দমা মাতঙ্গিনী একবার করিয়া কাঁদে, আরবার গরজি আস্ফালন করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। পেটে অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই, জলাশয়েও জল নাই। যে মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়-বঙ্গ এক দিন প্রয়াগ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিত, যে কেন্দ্র হইতে এক দিন জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে এক দিন বঙ্গ জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে চলিয়াছিল, এই সেই

ভূমি। এই ভূমিতেই সেই সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের আশিষমন্ত্র ও শান্তিবারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষ নব মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হইয়াছিল, এ সেই দেশ। সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে যে বাণিজ্য-লক্ষ্মী অর্ণবপোত বোঝাই করিয়া ধন আনিত, সে ধনেশ্বরী আজ নাই। শতাব্দীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘান্ধকারে সে সব কোথায় মিলাইয়া গেল। তাই আজ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিজ গৃহে পরান্নভোজী, নিজ গ্রামে চিরপরবাসী, জীবন-মরণের সন্ধির মধ্যে না-বাঁচা না-মরা হইয়াছি। কি দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিব। কবির সে কণ্ঠ আমার নাই, তাহা হইলে আজ শুনাইতাম—এই অরণ্যানীমুখরিত বনভূম শ্যাম-তমাল-দ্রুম-সুশোভিত দেশের রূপের কথা; শুনাইতাম—এই অতল তলে কি সৌভাগ্য ও বৈভব নিমজ্জিত; শুনাইতাম—যদি আমার এই প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দদাসের মত আমার কণ্ঠ থাকিত, তবে "আদিশূরের যজ্ঞভূমি'—বল্লালের অস্থিভস্মে পরিণত যে দেশের 'পথের ধূলি'—সে দেশের বিগত সমৃদ্ধির কথা ও কাহিনী আপনাদের শুনাইতাম; আর শুনাইতাম—অরণ্যের তমাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে, অতল নদীতলে ও ভূগর্ভে মহাসমাধিতে লীন কি কীর্ত্তি, কি বিজয়কাহিনী! কি দারুণ অদৃষ্টের পরিহাস, কি করুণ কাহিনী এই কীর্ত্তিনাশার! আর শুনাইতাম—সেই দানসাগরের কথা, কামরূপ-কলিঙ্গ-কাশী-বিজয়ীর পলায়ন-কলঙ্ক অপনয়ন করিতাম। গাইতাম,—হরিশ্চন্দ্রের কথা, অদুনা-পদুনার সেই প্রাণমনবিমোহনকারী মধুর কাহিনী; চাঁদ রায়, কেদার রায়ের বীর্য্যগাথা। এ সেই সোনার দেশ, এই দেশে আজ আপনারা আসিয়াছেন। হে বাঙ্গালার সন্তান, আজ সে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সে সাম্রাজ্য নাই, সে গৌরবের স্মৃতি আছে; সেই স্মৃতিই আজ আমাদের পুণ্যকথা, তাঁহাদের সেই পুণ্য-কাহিনী আজ যদি আমাদের আমন্ত্র করিয়া দেয়, যদি এই অসীম জলরাশির বুকে তেমনি করিয়া, আবার পাল তুলিয়া, জীবন-যাত্রায় যাত্রা-গান গাহিতে পারি।

সেই স্বপ্নের দেশে, আজ দেখুন, আমরা কি হইয়াছি। দিন গিয়াছে, এই দেশ এক দিন জ্ঞান ও ধর্ম্মে কত উন্নত ছিল, সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শীলভদ্র জন্মিয়াছিলেন, তিনিই চৈনিক পরিব্রাজক হুয়ান চোয়াংএর গুরু। ভারতেতর দেশের পরিব্রাজকেরা জ্ঞানলাভের জন্য এই দেশে আসিতেন। সেই জগদ্বিখ্যাত—সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই দেশেই জন্মিয়াছিলেন। আজিও লোকে নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী দেখাইয়া দেন। এই গৌড়-বঙ্গ বীরদেরই এক দিন জগদ্বিখ্যাত নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য্য ও সংঘস্থবির ছিলেন। আপনারা আজ সেই দেশে আসিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বাঙ্গালার প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। সে যুগের পরিচয়, কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই বিশিষ্টভাবে যুক্ত; তবুও সেই শতবৎসরের মাঝে ব্রাহ্মসংস্কার ও স্বদেশীর মহা-আন্দোলনের দিনে এই আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী কতভাবে কত দিক দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্রশক্তিতে যাহা পারিয়াছি, তাহাই করিয়াছি। কবে আমাদের সব আয়োজন সার্থক হইবে, কবে আমাদের সব চেষ্টা যথার্থ মাতৃপূজায় পরিণত হইবে। কবে সেই মহাযজ্ঞের ধূম নদীপ্রান্তে, অরণ্যানীর্ষে, বনানীর অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিবে। বড় দুঃসময়ে আপনাদের ডাকিয়াছি—আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে, দেখিয়া যান,—এই সেই পূর্ব্ববঙ্গ।

এই বঙ্গে শুধু আজ আমরা একলা নই, আমাদের আর এক ভাইয়া এখানে আছেন। তাঁহাদের গৌরবের কথা আছে, তাঁহাদেরও দুঃখের কাহিনী আছে। আজ এই আমাদের মুসলমান ভাইয়া। অতিথি-পরায়ণ বঙ্গ কখন অতিথিকে ফিরায় নাই। বুকে

সে স্থান দিয়াছে, মুসলমান ধর্ম্মকেও স্থান দিয়াছে। সে দিন যে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা হাতে করিয়া, গৌড়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাঁহারা আমাদের প্রতিবেশী। আমাদেরই মত সমদুঃখী। একই মাতৃস্তন্যপানে আমরা বাঁচিয়া আছি, বাঙ্গালা তাহাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে। ভাই ভাইয়ে কলহ কোন্ দেশে না হয়, তাহা হইলেও তাহারা আমাদের ভাই। সেই ইস্‌লাম পতাকাবাহীর বংশে মহাপ্রাণ সোলেমান কিরাণী জন্মিয়াছেন; সেই যবন হরিদাস এক দিন হরিধ্বনিতে বঙ্গ মাতাইয়াছে; সেই মুসলমান আলোয়াল এক দিন পদ্মাবতী রচনা করিয়াছেন; সেই মুসলমান কত কবির কত গান, কত ফকির, কত সাধু এই বঙ্গদেশের জন্ম ভাগবানের কাছে দোয়া করিয়াছে; সেই মুসলমান কবি চাঁদ কাজির গানে আছে—

ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
আর অভাগীয়া নারী হাম সে সাঁতার নাহি জানি॥

মুসলমান কবি এ গান বাঁধিবার সময় বাঙ্গালার প্রাণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই এ গান বাঁধিতে পারিয়াছেন। এই ঢাকা নগরীতে সেই ইস্‌লামের বিজয়-তোরণ আজি দাঁড়াইয়াছে। একই জমীর পাশে পাশে লাঙ্গলের ফলকে হিন্দু-মুসলমান, আপনাদের ক্ষুধার অন্ন যোগাইতেছে। তাহাদের মর্য্যাদা আমরা যেন কখন লঙ্ঘন না করি। সে দিনেও টাকায় আট মণ চাউল মিলিত, এ দারিদ্র্য সে দিনেও আসে নাই।

হে অতিথি! ওই সেই রামপাল, ওই সেই প্রাচীন যজ্ঞবেদী আপনাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, সে ত মূক নয়, যজ্ঞের মন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও তাহার প্রাণের তারে ঝন্‌ন্ রন্ করিয়া বাজিতেছে। ওই সেই ভস্মগুপ্ত অগ্নি, বুঝি বা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আছে অতিথি, আছে! যে বেদধ্বনি এই যজ্ঞভূমে উঠিয়াছিল, যে ধ্বনি অরণ্যানী শুনিয়াছে, যে ধ্বনি পদ্মায় এক দিন ঘোর করিয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও আছে; আকাশে বাতাসে এখনও তাহার সুর বাজিতেছে। এই সেই প্রাচীন যজ্ঞভস্ম মাটী বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই ভস্ম আজি আপনাদের ললাটদেশ শোভিত করুক্। এ ভূমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছে। হে ঋত্বিক্! আবার তারস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করুন, অগ্নি জ্বলিয়া উঠুক, দেখিবেন,—এই এত কালের সহিষ্ণু মাটী শতধা দীর্ণ হইয়া, সেই জ্বলিতজ্বলন মহান্ ধূর্জ্জটীকে জলজ্জাল ললাট দীপিয়া তুলিয়াছে। যিনি সহস্র বৎসরের বাঙ্গলার মৃতসতীকে স্কন্ধে করিয়া প্রলয়কালের তাণ্ডব-নর্ত্তনে সব বিষ, ঈর্ষা, অক্ষমতা, পরানুকরণের মতিচ্ছন্ন অহঙ্কার জ্বালাইয়া, সেই সৃষ্টিপারাবারের একাকার আনিয়া দিবেন—সংহারের পর আবার নীহারিকায় নূতন বাঙ্গলার সৃষ্টি হইবে। বাহান্ন পীঠের মত সারা ভারতে আবার পীঠস্থানে মন্দির উঠিবে। হে তপোনিষ্ঠ সত্যসন্ধ সাহিত্যের রথিগণ, জীবনে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে একাত্ম হইয়া সেই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি আসুন; স্বাহা স্বধা দ্বিবিধ অগ্নিই জ্বালিয়াছে! পূর্ব্ববঙ্গের শ্মশানে বল্লালের ভিটায় সেই শব সাধনায় অগ্রসর হউন তাই বাঙ্গালীরা আপনাদের ডাকিয়াছে। এই শ্মশানে মড়ার হাড়ে ফুলের মালা পরিয়া, কি ভুলে ভুলিয়া আছি, সেই ভুল একবার ভাঙ্গিয়া দিউন।

আমি দেখিতেছি ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, সেই বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্ম ধীরে ধীরে কেমন লীলা-চঞ্চল স্রোতের মত চলিয়াছে। 'মাৎস্যন্যায়ের' অরাজকতার যুগে বাঙ্গলা যে গর্জ্জন করিয়াছিল, সে সুর বাঙ্গলা ভুলিয়া যায় নাই। আজ ফেরঙ্গ যুগেও বাঙ্গালা সেই ধর্ম্মের আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে বাঙ্গালার স্বভাবধর্ম্ম যে প্রাণমূর্ত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নগরপ্রান্তে সেই অদ্বৈত-বংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্ম্মের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পদ্মা-গঙ্গার লীলার স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এক দিন এই পদ্মাবতী-তীরে তাঁর সেই অরুণ-রাঙ্গা চরণ দুখানি রাখিয়াছিলেন, তাই—

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥

আর—

ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে॥

আর

বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥

আর এই ঢাকা নগরীতে বাঙ্গালার শেষ বৈষ্ণব-কবি কৃষ্ণকমল, সেই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও তাঁহার রাধাভাবের রসে সিঞ্চিত 'রাই উন্মাদিনীর' প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। আমরাও আজ কৃষ্ণকমলের রাধিকার মত—

তব পথ নিরখিয়ে ব'সে আছি সই।
তুমি চন্দ্রে! একা এলে প্রাণনাথ কই?

চন্দ্রা রাইকে বলিয়াছিলেন,—

অঘটন ঘটাতে পারি কৃপা হ'লে তোর—

চন্দ্রা অঘটন ঘটাইয়াছিলেন, আপনারাও 'কৃপা হ'লে' অঘটন ঘটাইতে পারিবেন না কি?

তার পর, এই ঢাকায় প্রথম 'নীলদর্পণ' হইয়াছিল, সে কথা বোধ হয় আপনাদের কাহারও অজ্ঞাত নাই।

এই প্রদেশের কাছে ভাওয়াল, সাভার, ধামরাই প্রভৃতি যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড ভূভাগে স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাদের কত না কাহিনী, কত না দুঃখ সুখ এই মাটীর ধূলিতে মিশাইয়া আছে। হায়! তাহার কাহিনী কে আজ গাহিবে। যদি সেই সুপ্ত ইতিহাসের বাণী কোন দিন কেহ সজাগ করিয়া তুলেন, তবে দেখিবেন,—কি শক্তিমান্ এক মহাপ্রাণ জাতি কি গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছে।

সুখ-দুঃখের অনেক কথা আপনাদের শুনাইতে চাই, সব শুনাইতে পারি কই, কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—বুক ফাটিয়া যায়! বুঝি আজিকার দিনের মত বাঙ্গালার ঘরে এমন দুর্দ্দিন কখনও আসে নাই। এত কালের দীর্ঘ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও এত অন্ধকার, দীর্ঘ নিশ্বাস ও হা-হুতাশের নিষ্ফল বাণী ফোটে নাই! এমন বিপন্ন আমরা আর কখনও হই নাই। এক রামচন্দ্রের বনবাসে সারা অযোধ্যা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ভাগ্যহীন, কত শত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বনবাসে দিয়া এক হাতে চক্ষু মুছিতেছে, আর অন্য হাতে আপনাদের জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্য আনিয়াছে। দয়া করিয়া আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। সুদিন গেছে, কুদিন আসিয়াছে! আপনারা দুর্দ্দিনের অতিথি, দুঃখী বিদুরের ক্ষুদ আছে, আর কিছুই নাই। পূর্ব্ববঙ্গ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই আপনাদের নিবেদন করে—শ্রদ্ধার হবিঃ গ্রহণ করুন, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হউক, কৃতকৃত্য হউক।

দরিদ্র সেবক মোরা অতি ক্ষুদ্র জন।

হে সাধক! আসুন, তবে সমস্বরে মা'কে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মা'র ভাষা দিয়াই মা'কে ডাকি, আসুন! মা ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগ্যবতী পদ্মাবতী তীরে মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সংগ্রামশালিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্তচরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব। আর গঙ্গাতীর-কল্যাণে যদি, [illegible]

সত্যাগ্রহ

আজ মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধীর দিন। আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিবার দিন। আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই; কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিতে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে পাই!

আপনাকে না পাইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। কেন না, ভগবান্ মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হন।

সমস্ত সংসার ভগবানের লীলাক্ষেত্র। যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনি বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হন, প্রত্যেক জাতির মধ্যেও তাঁহার তেমনি বিচিত্র প্রকাশ। এই যে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাও তাঁহারই লীলা। এই নব জাগ্রত জাতির মধ্যেও তাঁহারই বিশিষ্ট প্রকাশ।

আজি এই জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে আত্মা, তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিব।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

কিন্তু এই বল কিসের বল? পাশব বলে আত্মাকে পাইব না। এই বল প্রেমের বল। যদি কেহ স্বদেশকে ভালবাস, স্বজাতিকে ভালবাস, তবেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

ইহাই মহাত্মা গান্ধীর বাণী, আর ইহাই ভারতবর্ষেরও বাণী।

এই বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সকল স্বার্থপরতাকে, সকল হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করি? আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, রাউলাট আইন চলিলে আমাদের এই নবজাগ্রত জাতিটাকে তাহার নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া তুলিতে বাধা প্রাপ্ত হইব। সেই বাধা অতিক্রম করিতে হইলে, সকল হিংসা দ্বেষ বর্জ্জন করিয়া দেশপ্রেমকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তাই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, শত্রুকে ঘৃণা করিবে না, হিংসা করিবে না; কারণ, প্রেমের জয় অনিবার্য্য।

আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, এই যে আন্দোলন, ইংরাজীতে যাহাকে রাজনীতি বলে, ইহা তাহার আন্দোলন নহে। ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্ম্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন, এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্ম-নিবেদন। সকল শাস্তি, সকল-আপদ-বিপদকে তুচ্ছ করিয়া, প্রাণের অনুরাগে আত্মনিবেদন!

আজি আমরা মন্দিরের সোপানে দাঁড়াইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার চাই। ঐকান্তিক আত্মনিবেদন করিতে না পারিলে সে অধিকার ত জন্মে না। তোমরা কি পারিবে? আমি কি পারিব? ভগবানের কৃপা ছাড়া কেহই পারিবে না।

আজ তাই এই দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগে আমাদের নিজ নিজ অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে ও অবনত মস্তকে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। আজ তাই আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি, তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ। আমরা সকলেই পরস্পরকে আহ্বান করিতেছি। আজ সারাদিনের উপবাসে, শুদ্ধ মনে, সংযত চিত্তে বিধাতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রাণের প্রাণ সেই আত্মাকে ডাকিবার জন্য আসিয়াছি। এস আমরা সেই প্রেমের বলে বলী হই। কারণ—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

এস, আমরা আজ প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লক্ষ কণ্ঠে বলি—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত,—"

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

আবার বলি, উঠ, ডাক, জাগ,—আপনাকে জাগাও। সম্মুখে প্রেমের পথ সুবিস্তৃত, সেই পথের পথিক হইয়া জাতির কল্যাণকে জাগাও। তবেই "নরনারায়ণের" প্রকাশ হইবে। মনে করিও না, শুধু তোমার মধ্যে ও আমার মধ্যে নারায়ণের বিকাশ। সে অহঙ্কার একেবারে ছাড়িয়া দাও। যাহারা দেশের সারবস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, মাটী কর্ষণ করিয়া, আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে,—যাহারা ঘোর দারিদ্রের মধ্যেও মরিতে মরিতে দেশের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে,—যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও দেশের ধর্ম্মকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে,—যাহারা আজিও শুদ্ধ চিত্তে, সরল প্রাণে, মন্দিরে মন্দিরে দেশের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে,—যাহারা জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া, জাগাইয়া রাখিয়াছে,—যাহারা বাস্তবিকই এ দেশের একাধারে রক্ত-মাংস ও প্রাণ,—

"উঠ, ডাক, জাগ"—তাহাদেরই মধ্যে "নরনারায়ণ" জাগ্রত হউক। এস নারায়ণ, এস নরনারায়ণ,—আমাদের হৃদয় প্রস্তুত কর।

বাঙ্গালার কথা

আজ বাঙ্গালীর মহাসভায় আমি বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য। আজ এই মিলনমন্দিরে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকারে বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাঙ্গালাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনী মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম অনন্ত প্রদীপের মত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে; আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

সেই ভরসায় আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি। যে কথাগুলি অনেক দিন ধরিয়া আমার প্রাণে জাগিয়াছে, যে সব কথা আমার জীবনের সকল রকমের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া জীবনের ধ্যান-ধারণার বিষয় করিয়াছি, সে সব কথাগুলি আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোন ভয় হয় না। লজ্জা হয় না। হয় তো আমাদের শাসনকর্ত্তাদের কাছে আমার অনেক কথা অপ্রিয় লাগিবে, হয় তো আমার অনেক কথার সঙ্গে আপনাদের অনেকের মনের মিল হইবে না; কিন্তু "সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম" এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি এবং যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিব না। সে তো কাপুরুষের কথা, দেশ-ভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি,

তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্য কোনও অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক, কি অপ্রিয়ই হউক, অম্লান বদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

প্রথমেই হয় তো অনেকেরই মনে হইবে যে, এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাঙ্গালার কথার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাবধর্ম্ম। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি এবং ধার করা জিনিস ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা সর্ব্বাঙ্গীন সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্ম্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, এই সব মনগড়া জীবন-খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীরবেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন-খণ্ড, ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আবদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক্ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায়। রাজনীতি কাহাকে বলে? এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? আমাদের সাধনায় ইহার কোন বিশিষ্ট নাম নাই, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার নামকরণ করিবার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। ইউরোপীয় সাধনায় যাহাকে রাষ্ট্রজ্ঞান বলে, তাহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজায় প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা এবং সে সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিত্য সার্ব্বভৌমিক সত্য নিহিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করা। এ মতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনার বিষয় কোন জাতির বা দেশের পক্ষে রাজা প্রজায় কি রকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজা প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যের সংরক্ষণ ও সংস্থাপন চালনা করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কতটা রাজার হাতে থাকিবে, কতটা প্রজার হাতে থাকিবে, তাহাই বিচার ও নির্ণয় করা।

কিন্তু এ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙ্গালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি, বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে! বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গালাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, বাঙ্গালীর কতকগুলা দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক এবং সেই ভাবে ধরিয়া

লওয়া যা'ক যে, বাঙ্গালী মানুষ। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই আমাদের দেশে রাজা-প্রজায় যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রাজা-প্রজায় কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করিতে গেলে, আমাদের যে এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে, আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে, কেন আমাদের পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক সহরে আসিয়া বাস করে, কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোন কারণে? সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষ-যোগ্য জমী আছে, সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ সচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কিরূপ ছিল, আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতাম, এ সব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া শিক্ষা বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইতাম এবং এখন বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিত, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথারই বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য্য, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ কথারও উচ্চৈশ্য করা যায় না। কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কি সম্বন্ধ থাকা উচিত, কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে, কতটা আমাদের হাতে থাকা উচিত, এই প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করিয়া হইবে?

শুধু ইহাই নহে, আমাদের কৃষিকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্যন্ত আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিব। সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা

Politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। এ দেশের মাটীতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা ত একবারও ভাবি না। Burke-এর বুলি যাহা স্কুলে কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstoneএর কথামৃত পান করি আর মনে করি, ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। "Seely'র "Expansion of England" নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwickএর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসী স্কুল, জার্ম্মাণ স্কুল এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে, কোরাণে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্ত্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারকরা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল, তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক, তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গালার কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাযেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয় ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে? আমরা চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না? আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীর সেরূপ আস্থা নাই? কেন নাই? আমরা যে ভিতরে ভিতরে ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা যে ইংরাজী পড়ি ও ইংরাজীতে ভাবি এবং ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া বাঙ্গালা বলি ও লিখি, তাহারা যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই ভাল। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাযে তাহাদের ডাকি? Governmentএর কাছে কোনও আবেদন করিতে হইলে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? আমাদের কোন্ কমিটীতে, কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্য-শ্রেণীভুক্ত? কোন্ কাজ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের মত লইয়া করি? যদি না করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদের ত্রুটী স্বীকার করিব না? কেন সত্য কথা বলিব না? মিথ্যার উপর কোনও সত্য বা বস্তু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাঙ্গালার সব দিক্ দিয়াই দেখিতে

হইবে। বাঙ্গালার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আজ এই মহাসভায় আমি বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি।

কিন্তু আমি যে বিপদের কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। আমাদের এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহার যথাযথ কারণ আছে। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের এদেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এক দিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে যে অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মবলে মহাপ্রভু সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক কাটা ও মালা ঠকঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতে-ছিল। বাঙ্গালার হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেম-শূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞান-গৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী। বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি জ্ঞানে বাঙ্গালার হিন্দু তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁর পর হইতেই বাঙ্গালার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিকবেশে আগমন করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্ব্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহ বশতঃ আপনার পদ-প্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া' নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে "বিজ্ঞানের তূর্য্যধ্বনি" করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততঃপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে ত আমাদের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই। তার পর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল। তার পর বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালার মূর্ত্তি গড়িলেন—প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন। সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্"

তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।" কিন্তু আমরা ত তখন সে মূর্ত্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।" তার পর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের অশেষ উপকার-সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা লইয়া আলোচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অন্ধ ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতির, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস—একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তার পর আরও দিন গেল। ১৯০৩খৃঃ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙ্গালী আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

"বাংলার মাটী বাংলার জল
সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্"

বাঙ্গালার জল বাঙ্গালার মাটী আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী গুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশী আন্দোলন ইহা একটা বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্থ করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; কিন্তু অহঙ্কার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যাঁরা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিস সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিস লইয়া আঁক কষিতে বসেন। কিন্তু প্রাণের যে বন্যা, সে ত অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্ক-শাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাটি ভাসাইয়া লইয়া যায়! স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে, তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে ত হিসাব করিয়া জন্মায় না না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ এক দিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া, বাঁচিয়াছি। বাঙ্গালার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গালার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গালার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—

সেই মাকে দেখিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়। বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্ত্তি; আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর, -আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।

স্বদেশী আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল, হিসাব না করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু এখন আমাদের হিসাব করিবার সময় আসিয়াছে, মা দেখা দিয়াছেন—এখন যে পূজার আয়োজন করিতে হইবে। হিসাব করিয়া কর্ম্ম তৈয়ারী করিতে হইবে, হিসাব করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে মহা বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, এখন যে সব পতিত জমী আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে। বিশ্বাস রাখিও, সোনা ফলিবেই।

এখন আমাদের বিচার্য্য যে, কেমন করিয়া এই নব-জাগ্রত বাঙ্গালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিকসিত করিয়া তুলিতে পারি! সেই কারণে সেই দিক্ দিয়াই দেখিতে হইবে, আমাদের বিকাশের জন্য কি কি আবশ্যক এবং তাহা কি করিয়া পাইতে পারি।

এই বিচার লইয়াই সম্প্রতি একটা গোল বাধিয়াছে। ইউরোপে নাকি কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব—ইংরাজীতে যাহাকে "Nation Idea" বলে, ইহা নাকি একেবারেই কাল্পনিক, কোন বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোন বিশিষ্ট জাতির নাকি কোন একটা স্বতন্ত্র মূল নাই। প্রত্যেক জাতির রক্তের মধ্যে অন্যান্য জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে। আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায়-দীক্ষায় ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছে এবং এই আদান-প্রদানের মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোন বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে। এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাযেই আমাদের দেশেও দুই এক জন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নব জাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্ক্ষাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি, এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালীর তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে, তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী

আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গালার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ—এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ —এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়? যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ না হইলে একটি পরিবারের উন্নতি হয় না, যেমন পরিবারসমূহের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, যেমন সমাজের উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ঠিক তেমনি সেই একই কারণে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট জাতির উন্নতি না হইলে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হয় না। বাঙ্গালীর শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, সে রক্ত আর্য্যই হউক, কি অনার্য্যই হউক, কি আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রিত রক্তই হউক, যাহা সত্য, তাহা সত্যকামের মত স্বীকার করিতে বাঙ্গালী কখনও কুণ্ঠিত হইবে না— বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, বাঙ্গালী যে বাঙ্গালী, সে কথা আর ত সে ভুলিতে পারে না, সে যে বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গলার জলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গালার জলের সঙ্গে নিত্যই যে তাহার আদান-প্রদান চলিতেছে। আর সেই আদান-প্রদানের মধ্যে যে একটা নিত্য সত্য জাগ্রত সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্বন্ধের উপর বাঙ্গালার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষাদীক্ষার যে আদান-প্রদান, তাহাও এই জাতিত্বের লক্ষণ। জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সমর্থ হয়, গ্রহণ করিতেও সমর্থ হয়। ইহা সেই জাতির অবস্থার বিষয়, স্বভাবের বিষয়। তার পর বিরোধের কথা, জাতিত্বের প্রভাবে যে কতকটা বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সেও যে জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তা বলিয়াই জাতিগুলোকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিবারমধ্যে প্রত্যেক সমাজে বিরোধ-বিসংবাদ ত লাগিয়াই আছে, তা বলিয়াই কি সেই ব্যক্তিগুলার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, না উড়াইয়া দিতে হইবে? শত প্রকারের বিরোধ-বাদ-বিসংবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়। এই যে সব বিশিষ্ট জাতিসমূহ, ইহাদের পক্ষে ঐ কথাই খাটে। এই বিরোধ-বিসংবাদ সংঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এই সব বিশিষ্ট জাতি সমস্ত মানবজাতির যে মিলন-মন্দির, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

সংসারে প্রত্যেক জিনিসের প্রত্যেক ভাবের দুইটা মুখ আছে, এই যে বাদবিসংবাদ, ইহারও দুইটা মুখ। আমরা এক মুখ দেখি, আর এক মুখ দেখি না। বিরোধ আছে চক্ষে দেখিতেছি, মনে জানিতেছি, ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই বিরোধেরই অপর মুখে যে মিলন, তাহা দেখিতে পাই না বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকি। ইউরোপে আজ যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত, এই অনলে ইউরোপের সকল ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, দৈন্য, অপার শক্তির অভিমানজনিত যে হীনতা, অসীম স্বার্থপরতার যে মলিনতা,

সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি, চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি, এই পবিত্র ভস্ম-সমাধির উপরে ইউরোপ তাহার মিলন-মন্দির রচনা করিতেছে। সকল প্রকার হীনতা ও স্বার্থপরতার ধর্ম্মই এই যে, সে নিজের আবেগে নিজের বিনাশ-সাধন করে এবং সেই বিনাশের মুখে পরানুরক্তি জাগাইয়া দেয়। সেই পরমানুরক্তি না জাগিলে যথার্থ মিলন অসম্ভব। অনেকে হয় ত মনে করেন, এই যে কলিযুগের কুরুক্ষেত্র, ইহাতে ইউরোপের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমি বলি, কখনও না। সকল যুদ্ধক্ষেত্র যে ধর্ম্মক্ষেত্র, সকল ইতিহাস যে ভগবৎলীলার পূত পুণ্যকাহিনী, ভারতের কুরুক্ষেত্রের ফলে কি তখনকার ভারত মিলনপথে অগ্রসর হয় নাই? নবজীবন লাভ করে নাই? আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে কি একটা স্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হয় নাই? আমরা অমঙ্গলের দিক্‌টাই দেখি, কিন্তু তাহার সঙ্গে জড়িত যে মঙ্গল, সেই দিক্ দেখিতে ভুলিয়া যাই।

ইউরোপ আজ অসীম দুঃখ-কষ্ট, যাতনা-বেদনা, অর্দ্ধ-অনশনের মধ্যেই মিলনপথে পা বাড়াইয়াছে। অহঙ্কারের অবসান না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না। এই যে দুঃখ-কষ্ট আজ ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা সেই প্রেম-মিলনের আগমন প্রতীক্ষার প্রসববেদনা। এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে দেখিতে পাইবে, ইউরোপ আপনার স্বার্থপরতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বাস করিও, এক দিন দেখিবে, যে প্রবল অপ্রতিহত বেগে ইউরোপ আজ তাহার স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং সমস্ত প্রাণ দিয়া সেই স্বার্থপরতাকেই পোষণ করিতেছে, সেই ইউরোপ তেমনি অপ্রতিহত বেগে ঠিক সেই রকম সমস্ত প্রাণ-পণ দিয়া সে নিজের ও জগতের যথার্থ মঙ্গল-সাধন করিতেছে। এই সমর, এই বিরোধ যে জাতিত্বের ফল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এই সমরক্ষেত্রের অপরপারে যে মিলনমন্দির রচিত হইতেছে, তাহাও এই জাতিত্বেরই ফল, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? যদি কোন দিন সুদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মানবজাতি লইয়া একটা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, তখন সমস্ত বিশিষ্ট জাতিগুলি নিজ নিজ স্বভাব-ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্বরূপে বিকশিত হইয়াছে এবং সেই যুক্তরাজ্যে সকল জাতিরই সমান অধিকার। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিশিষ্ট জাতিসমূহ সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্ম কোন রাজত্বেরই আবশ্যক হইবে না।

এই যে বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বের দাবী, ইহার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথার আলোচনা আবশ্যক। আমি এমন কথা শুনিয়াছি আমার কাছেই অনেকে বলিয়াছেন যে—আমাদের পক্ষে জাতিত্বের গৌরব করা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, এই যে জাতিত্বের ভাব, ইহার সমস্তই আগাগোড়া বিলাতের আমদানী—একটা ধারকরা সামগ্রী মাত্র। এটা যে তাঁহাদের ভুল, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমি আগেই বলিয়াছি, কোন একটা বিশিষ্ট দেশের সঙ্গে সেই দেশবাসীদের যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহারই উপরে জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। হইতে পারে, এ সম্বন্ধ যাহা নিত্য আবহমানকাল হইতে আছে ও চিরদিনই থাকিবে, তাহার প্রতি এতকাল এমনভাবে আমাদের চোখ পড়ে নাই; হইতে পারে, আমাদের সভ্যতায় ও সাধনায় এই সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট নাম রাখা হয় নাই; ইহাও হইতে পারে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস লইয়া এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে, হয় ত এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্ম হইত না—তাহা বলিয়া কি যাহা আমাদের, আমাদেরই দেশের, যাহা বাঙ্গালার জলের সঙ্গে

অণুতে অণুতে প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া আছে, তাহাকে বিলাতের আমদানী বলিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে অপমান করিব? যাহা চিরকাল আছে, তাহাকে দেখিতে পাই নাই, বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না? বিজ্ঞান-জগতে যে বড় বড় সত্য আবিষ্কার হইয়াছে, সে সব সত্যই যে সনাতন—তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব ত কোন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবিদের উপরে নির্ভর করে না? মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মাইবার আগেও ছিল, আমাদের জাতির জাতিত্ব তেমনি ইংরাজ আসিবার আগেও ছিল। আমরা দেখিতে পাই নাই বলিয়া যে ছিল না, তাহা নহে। ইউরোপ হইতে একটা বিপরীত সভ্যতা আসিয়া আমাদের জীবনে আঘাত করিল, সেই আঘাতে আমাদের চৈতন্য হইল, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের জাতির যে জাতিত্ব, তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। এমন করিয়াই মনুষ্যজীবনে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, বাহিরের রূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই ফলে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহা দেখি, তাহা ত বাহিরের নয়, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু। আমাদের নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব, তাহা আমাদেরই প্রাণবস্তু, বিদেশের নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভগবৎ-কৃপায় আমাদেরই প্রাণের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি তাহাকে ধার করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া আসি নাই।

এই কথার সঙ্গে আর একটা কথার বিচার ও আলোচনার আবশ্যক। আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, আমাদের দেশে ইংরাজের আগমন বিধির বিধান। আমার শ্রদ্ধেয় স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৫ খৃঃ অব্দের কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে এই কথাই বলিয়াছেন—এই কথার গূঢ় মর্ম্ম কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি। এই দুইটি কথাই মূলে এক কথা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভবপর কি না, এই বিষয়ে যে অনেক মতভেদ আছে। সেই সব ভিন্ন ভিন্ন মতের মর্ম্ম কথাটি কি, তাহা তলাইয়া বুঝিলে জাতির জাতিত্বের কথা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। Keepling লিখিয়াছিলেন—"The East is East, and the West is West, never the twain shall meet" অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে, তাহাদের মিলন অসম্ভব।

আবার বিলাতে ও আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন যে, এই মিলন একেবারে অবশ্যম্ভাবী। স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় বলিয়াছেন যে, জাতির বদলে একটা Universal brotherhood of mankind হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি ভ্রাতৃভাবে একত্র হইবে। বোম্বাইএর কংগ্রেসে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলিয়াছেন:—

"The East and the West have met—not in vain. The invisible scribe, who has been writing the most marvellous history that has ever been written, has not been idle. Those who have the discernment and the inner vision to see will note that there is only one goal, there is only one path."

অর্থাৎ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ব্যর্থ হয় নাই. যে অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে আশ্চর্য্য লেখা লিখিতেছেন, তিনি ত নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। যাঁহাদের বিচারবুদ্ধি ও দিব্য চক্ষু আছে, তাঁহারা বলিবেন যে, প্রাচ্য ও

প্রতীচ্যের একই ইষ্ট, একই পন্থা। এই বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করি, মনে হয়, এ দুইটা কথা সত্য, আবার দুইটা কথাই মিথ্যা, ইহার কোনটাই একেবারে সত্য নয়। দুইটা একেবারে বিপরীত রকমের সভ্যতা ও সাধনা লইয়া এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ইহাদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বদলে আমি ইংলণ্ড ও বাঙ্গালা দেশ ধরিয়া লই, তাহা হইলে কথাটা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া আসিবে। এই মিলন কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিচার করা যা'ক্। আমাদের ও ইংরাজের মিলনের মর্ম্ম যদি এই হয় যে, আমরা ইংরাজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিব অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশটা একটা নকল ইংলণ্ড হইবে, আমাদের নর-নারী নকল সাহেব-মেম হইয়া উঠিবে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক হুবহু বিলাতের মত হইবে, আমাদের চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টায় সমস্ত দেশটাই যথার্থ গৃহস্থের আশ্রম না হইয়া, একটা বৃহৎ ভীষণ কলের কারখানা হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে আমি বলি, মিলন একেবারে অসম্ভব। অনেকে হয় ত বলিবেন, কেন অসম্ভব?

এই সহরে ত অনেকেই ইংরাজী রকমে জীবন যাপন করেন। আহার-বিহারে, আচারে, ব্যবহারে, চালচলনে ইংরাজের সহিত তাঁহাদের কোন পার্থক্যই দেখা যায় না। কলিকাতায় আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ত এক রকম বিলাতের ছাঁচেই ঢালা, আর কলিকাতায় যাহা দেখা যায়, তাহা যে ক্রমশঃ দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে, আমরা বিলাতের ছাঁচে গড়িয়া উঠিব না? আমার কথা এই যে, নকল সাজা সহজ, কিন্তু যথার্থ নকল হওয়া বড়ই কঠিন। সাজা জিনিসটা খেয়ালের ব্যাপার, এক দিন থাকে, তার পর থাকে না; কিন্তু হওয়া জিনিসটার সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধ আছে, কোন একটা জাতিকে কিছু হইতে হইলে তাহার স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে সেই হওয়া জিনিসটার বীজ থাকা চাই। আমার কিছুতেই মনে হয় না, বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে ইংলণ্ডের সভ্যতা ও সাধনার বীজ আছে, সুতরাং এই অর্থে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিলন অসম্ভব, এবং এইভাবে দেখিতে গেলে Keeplingএর কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে, প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকিবে, ইহারা কখনও মিলিবে না।

তবে কি এই দুইটা জাতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজ নিজ সত্তা হারাইয়া একটা নূতন রকমের দোআঁসলা জাতি গড়িয়া উঠিবে, না একটা নূতন বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইবে? এ কথা অর্ব্বাচীনের কথা, ইহার বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরাজের যাহা কিছু ভাল, আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল, ইংরাজ লইবে এবং উভয়ের যাহা কিছু মন্দ, তাহা বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের কি ইংরাজের যাহা ভাল, যাহা মন্দ, তাহা কি এমন পৃথক্‌ভাবে জাতির জীবনের মধ্যে অবস্থিতি করে যে, একটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আর একটা লওয়া যায়? একটা বিশিষ্ট জাতির ভালমন্দ যে একসঙ্গে সেই জাতির রক্তমাংসের সঙ্গে জড়ান। খাঁটি ভালটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কি করিয়া? এমন করিয়া ত ছেঁড়া যায় না। একটা জাতির জীবন ত ঠিক ইটের ইমারত নয় যে, ঠেকা দিয়া খানিকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে দিক্‌টা আবার নূতন ধরণে নূতন উপকরণে গড়িয়া তুলিবে। কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না। আমাদের যে সব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে, তাহার বলেই হইবে। বিলাতের সমাজশক্তির বলে আমাদের আবশ্যকীয় সংস্কার সাধিত হইবে না—হইতেই পারে না। দুইটা জিনিস যেমন

আঠা দিয়া জোড়া লাগান যায়, ঠিক তেমনি করিয়া ত বিলাতের ভালটুকু আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জোড়া লাগান যায় না। এ যে জীবনের লীলা—জীবন বিকসিত হয়, তাহার বিকাশের মধ্যে যাহা নাই, সে ত তাহার সঙ্গে জোড়া লাগে না।

এই কথাটি আর এক দিক্ দিয়া দেখা যায়। ধরিয়া লও যে, বিলাতের ভালটুকু তুলিয়া আনিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার ফলে কি হইবে, বিলাতী সামাজিক প্রথা বা অবস্থা যদি আমাদের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই প্রথা বা অবস্থার যাহা স্বাভাবিক ফল, তাহা ফলিবেই, এবং তাহার ফলে আমাদের দেশের যে বিশিষ্ট রূপ, তাহা নষ্ট হইয়া বাঙ্গালী সমাজ একটি দ্বিতীয় বিলাতী সমাজ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া আর একটা জাতির প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিলে আমাদের বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায়?

এ ভাবে যাহারা আমাদের দেশে বিলাতী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা করিতে দাও, আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমি জানি, বাঙ্গালী জাতির একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে, তাহার একটা বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম্ম আছে, সেই স্বভাবধর্ম্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিবে, এবং যাহা সেই স্বভাবধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া এই সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

তবে এই যে মিলন—যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন ও আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের যথার্থ মর্ম্ম কি? এই বিষয়টা দুই দিক্ দিয়া দেখা যায়, ইহাকে জাতিত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরাজ জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটি সত্যের দিক্ দিয়া দেখা যায়। আর একটা দিক্ দিয়াও দেখা যায়, সেটা আমাদের নিজ নিজ শাসন-বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক্ দিয়া।

এই শেষোক্ত দিক্ দিয়া বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটি স্বতন্ত্র জাতি নিজ নিজ বিশিষ্টরূপেই বিকসিত হইয়াও এই দুইটি জাতির শাসনবিভাগের উপরদিকে একটা একচ্ছত্র যোগাযোগ থাকিবে। বাঙ্গালী জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসন-বিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসন-বিভাগ, তাহার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের প্রকৃতি কি হইবে, বাহিরের আকার কি হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব। স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বোম্বাইয়ের কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন:—

"It seems to me that having fixed our goal it is hardly necesssary to attempt to define in concrete terms the precise relationship that will exist between England and India when the goal is reached."

অর্থাৎ:—আমাদের যে উদ্দেশ্য, তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইলে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যে ঠিক কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা আমার মতে এখন অনাবশ্যক।

আমারও ঠিক তাহাই মনে হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এমন সম্বন্ধ হইতে বা থাকিতে পারে না, যাহাতে আমাদের ও ইংরাজের জাতীয় স্বভাবধর্ম্মের বিনাশসাধন হইবে। শুধু জাতিত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর যথার্থ মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটি জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে আদান-প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই উভয় জাতিই সেই প্রকার

উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে। প্রকৃত মিলনের ফল এই যে, শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টরূপে বিকসিত স্বতন্ত্র জাতিসমূহ বিধাতার সৃষ্টিস্রোতে ভাসিতেছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যেই যে একটা একত্ব আছে, এই সব ভিন্নরূপের যে স্বরূপ, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে, সকল বিশিষ্টরূপের মধ্যে যে একত্ব আছে, তাহাই জাগিয়া উঠে। এই জন্যই ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিল। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলন। এই ক্ষেত্রেই Universal Brotherhood of man সম্ভব। তাই শুধু এই দিক্ দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, the East and the West have met—not in vain. অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য যে একত্র হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

কৃষকের কথা

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই আমাদের কৃষিজীবীর কথা মনে আসে, তার পরই আমাদের দারিদ্র্যের কথা মনে হয়। কৃষকের কথা ও দারিদ্র্যের কথা একই কথা বলিয়া মনে হয়। আমরা সকলেই জানি যে, ব্যবসাবাণিজ্যের অভাবে কৃষিকার্য্যই আমাদের উপজীবিকার প্রধান উপায়। আমরা সকলেই জানি যে, বাঙ্গালী জাতির মত এত দরিদ্র জাতি বোধ হয় জগতের আর কোথাও নাই। কিন্তু ঘোর দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা বোধ হয়, ভাল করিয়া জানি না, সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা ত একেবারে এক মুহূর্ত্তে দরিদ্র হইয়া পড়ি নাই—আমরা যে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছি। তাই এই অতি সত্য যথার্থ অবস্থা আমরা ঠিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। বিদেশীয়রা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসে, তখন তাহারা আমাদের সোনা-রূপার প্রাচুর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সে সোনা-রূপা আসিত কোথা হইতে? বাঙ্গালা দেশে ত সোনা-রূপার খনি নাই, তবেই বলিতে হইবে যে, আমাদের কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে আমরা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতাম।

সরকারী কাগজপত্রে পাওয়া যায় যে, আমাদের সমস্ত জনসংখ্যা ধরিলে এবং আমাদের সমস্ত চাষযোগ্য ভূমি হিসাব করিলে জন পিছে দুই বিঘারও কিছু কম থাকে। এই দুই বিঘা জমী চাষ করিয়া এক জনের সমুদয় খরচ নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। তার পরে অনাবৃষ্টি আছে, দুর্বৎসর আছে। আমাদের চাষারা রোগক্লিষ্ট স্বাস্থ্যহীন—এই দুই বিঘা জমীও বারো মাস পরিশ্রম করিয়া ভাল করিয়া কাযে লাগাইতে পারে না।

সরকারী কাগজ হইতে ইহাও দেখা যায় যে, জন প্রতি বৎসরে সাত মণ করিয়া খাদ্য-শস্য আবশ্যক হয়। আমাদের সমস্ত বাঙ্গালা দেশে এই হিসাবে বৎসরে বত্রিশ কোটি কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্য-শস্যের আবশ্যক। আমি এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির যে বাঙ্গালা, তাহার কথা না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের হিসাবে যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা, তাহারই কথা বলিতেছি।

আমাদের উৎপন্ন হয় মোটে চব্বিশ কোটি আশী লক্ষ মণ। তাহা হইতে প্রায় এক কোটি মণ প্রত্যেক বৎসরে রপ্তানী হইয়া যায়। খাদ্য-শস্যের আমদানী বড় একটা বিদেশ হইতে হয় না, সুতরাং যেখানে আমাদের বত্রিশ কোটি কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্য-শস্যের আবশ্যক, সেখানে থাকে মাত্র তেইশ কোটি আশী লক্ষ মণ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির বৎসরে যদি সাত মণ করিয়া খাদ্য-শস্য যথার্থ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের আহারের ব্যবস্থা নাই। আবার আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে আমাদের দারিদ্র্যের কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়। সরকারী কাগজে পাওয়া যায় যে, আমাদের সকল রকম চাষের উৎপন্ন দ্রব্য অর্থাৎ গম, ছোলা, সরিষা ইত্যাদি, পাট, চিনি, তামাক এই সকল উৎপন্নের দাম একশ, ত্রিশ কোটি টাকা এবং সরকারী কাগজপত্র অনুসারে প্রত্যেক জনের বৎসরে ত্রিশ টাকা করিয়া আয়। আমার হিসাবে প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় ষোল টাকা হইতে কুড়ি টাকার মধ্যে। কুড়ি টাকাই হউক, ত্রিশ টাকাই হউক, এই টাকায় কোন চাষাই তাহার নিতান্ত আবশ্যকীয় অভাবগুলিও পূরণ করিতে পারে না,—গবর্ণমেণ্টের জেলেও প্রত্যেক ব্যক্তির পিছে বৎসরে আটচল্লিশ টাকা করিয়া খরচ হয়।—ইহা কি আমাদের ঘোর দারিদ্র্যের স্পষ্ট প্রমাণ নহে?

আমাদের রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, বাঙ্গালায় অনেক পরিমাণে "গুপ্তধন" (Hidden wealth) আছে অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে নাকি অনেকে অলঙ্কার ব্যবহার করেন এবং অনেকে টাকা পুতিয়া রাখেন। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে কাহারও কখনও টাকা পুতিয়া রাখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া আমার ত মনে হয় না। পুরাকালে অনেকে টাকা পুতিয়া রাখিতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে সত্য, কিন্তু যদি এইরূপ কেহ টাকা পুতিয়া থাকেন, তবে সে মাটীতে পোতা টাকা মাটীর মধ্যেই লুকাইয়া আছে, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার বড় একটা সন্ধান পায় নাই। অলঙ্কারের বিষয় একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, খুব অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাঙ্গালীর মেয়েরা রূপার অলঙ্কারই পরিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকায় আমাদের দেশে সেই সোনার দামের ওজনে সব দ্রব্যেরই দাম ঠিক হয়।

ইহার ফলে আমাদের দেশের রূপার দাম কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই যে যৎকিঞ্চিৎ রূপার অলঙ্কার আমাদের দেশে আছে, তাহার মূল্য একটা আকস্মিক ও আমাদের দেশের পক্ষে অস্বাভাবিক কারণে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে,—ইহাও আমাদের দারিদ্র্যের আর একটা কারণ। আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের আরও প্রমাণ আবশ্যক হইলে সরকারী কাগজেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে এমন গ্রাম নাই—যেখানে অন্ততঃপক্ষে শতকরা পঁচাত্তর জন ঋণগ্রস্ত নহে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে শতকরা একশ' জনই ঋণদায়ে পীড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষি-কাযের উৎপন্ন হইতে চাষা ত জীবন ধারণ করিতেই পারে না এবং যাহা কিছু অর্জ্জন করে, তাহারও একটা অংশ মহাজনের ঘরে গিয়া পড়ে। মানুষ ভাল করিয়া জীবন ধারণ না করিতে পারিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। আমি বিলাতী আরামের আদর্শের (standerd of comfort) কথা বলিতেছি না, কিন্তু শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য, মনকে শান্ত ও প্রসন্ন রাখিবার জন্য এবং অনাবৃষ্টি ও দুর্ব্বৎসরের যে বিপদ্, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক, সেই পরিমাণ অর্থাগমের ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, অভাবে

স্বভাব নষ্ট, আমাদের চাষাদের অবস্থা ভাল করিয়া ভাবিতে গেলে এই ঘোর দরিদ্রতানিবন্ধন দুই দিক্ দিয়া আমাদের স্বভাব নষ্ট হইতেছে, এক দিকে অর্থাভাবে আমাদের যে মনুষ্যত্বের আদর্শ, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া আমরা দিন দিন শক্তিহীন, মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছি; আবার অন্য দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের মধ্যে সেই একই কারণে চুরি, ডাকাতী ও অন্যান্য অনেক প্রকার দুষ্কার্য্য বাড়িতেছে। সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যকে দূর করিতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমাদের গ্রামসমূহ ম্যালেরিয়াতে উৎসন্ন যাইতেছে—পল্লীসমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা-সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অস্বাস্থ্যনিবন্ধন পল্লীগ্রাম ক্রমশঃই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, এক দিকে ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক, আর এক দিকে বড় বড় সহরে বিলাতী ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভ ও মোহ, কাজেই এই বড় বড় সহরগুলা এক একটা বৃহৎ অজগর সর্পের মত গ্রামবাসীদের টানিয়া টানিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে; সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই অস্বাস্থ্যের সঙ্গেও আমাদের দারিদ্র্যের যোগ আছে। শরীর দুর্ব্বল হইলেই ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়ে, আমাদের এক হাতে এই দেশের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইবে, আর এক হাতে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে দারিদ্র্য, তাহা ঘুচাইতে হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে এবং চাষারা যাহাতে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের কার্য্যের তালিকা ত এই। কিন্তু কাজ করিবে কে? রাজ-সরকার, না আমরা? সে কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য

যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যায় যে, শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের চলিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য না হইলে আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের অবসান কিছুতেই হইবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বিচার করিতে হইলে আমাদের কি ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং যাহা ছিল, তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার আরও উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

আমাদের বাণিজ্য নাই, তাই মা লক্ষ্মীও বাঙ্গালা ছাড়িয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার সুখ-দুঃখও সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া গিয়াছে, আছে শুধু সুখের মোহ আর দুঃখের যন্ত্রণা ও অবসাদ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আজ আমরা নিজের সুখদুঃখ ভুলিয়াছি, কিন্তু এমনই ত আমরা ছিলাম না, সবই ত আমাদের ছিল, পেটের ভাত, কটির লজ্জা-নিবারণ—আমরা নিজেরাই আমাদের সে লজ্জা নিবারণ করিতাম। আলিপনা দেওয়া আঙ্গিনা, মুক্ত আকাশ, শ্যামল পল্লীবীথি, শ্রমলব্ধ অন্ন, পরস্পরের প্রীতি—সবই আমাদের ছিল। আজ ঘরে লক্ষ্মী নাই, তাই আমরা লক্ষ্মীছাড়া,—কেন আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইলাম? দোষ আমাদেরই,—সব দোষই কি আমাদের? ইতিহাস

নিজকৃত দোষকে কখনও ত্যাগ করে না। তবে প্রবলের সংঘাতে দুর্ব্বলের দোষ শতগুণ বাড়িয়া যায়। আমাদের সে সময়কার ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে মর্ম্মভেদী নিশ্বাসে তপ্ত ও সিক্ত, সে কথার বিচার আর করিয়া কাজ নাই, বিচার করিলেই গরল উঠিবে। আজি মিলনের দিনে সে কথা ভোলাই ভাল। এক দিন ছিল—বাঙ্গালা শুধু নিজের লজ্জা নিবারণ করিত না, জগতের ঘরে ঘরে কাপড় বিলাইত। সে বসন ও বৈভব জগতের নরনারীর সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় উপাদান ছিল। ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালার সেই বৈভব নষ্ট হইয়া গেল। কেন নষ্ট হইয়া গেল, কে নষ্ট করিল? ইতিহাসের সাক্ষ্য—আমি আগেই বলিয়াছি, সে কথা ভোলাই ভাল। সেই দূর শতাব্দীর অন্ধকারে যখন চোখ ফিরাইয়া দেখি—সকল বিভীষিকাময়, ভয় হয়, মনে হয়, সেই কি স্বপ্ন! আমরা বাস্তবিকই মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিলাম, দাবি করিবার কিছুই ছিল না, শুধু প্রাণের দাবি ছিল। হায়, দুর্ভাগা বাঙ্গালী আমরা বণিকের যূপকাষ্ঠে আমাদের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সকলই বলি দিলাম। আমাদের ঘরে ঘরে চরকা ভাঙ্গিয়া গেল, আমাদের হস্তপদ ছিন্ন করিলাম, জীবন্ত অগ্নিতে সকলই দাহ করিয়া দিলাম, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম। আমরা যে অক্ষম, তাই দোষ কারও নয়, দোষ আমাদেরই, আমরা "স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিলাম।" অনাচারে, অশ্রদ্ধায়, শক্তিহীনতায়, ভক্তিহীনতায় আমাদের গৃহধর্ম্মকে, আমাদের স্বভাবধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিলাম।

আমার বাঙ্গালার ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, জলাশয় মাছ দিত, তৃণ-শ্যাম শস্যক্ষেত্র, গোচারণ-ভূমি ছিল, গাছে ফল ছিল, খড়ের ছাউনির ঘর ছিল, সুনীল আকাশ ও সবুজ গাছের ও মাঠের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। চাষা সারা দিনের পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা-ঘরে মেঠোসুরে প্রাণের গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসিত। বাঙ্গালার পুকুরের জল তখন মিঠা ছিল, চাষা বৎসরে ছয় মাস তাহার পেটের জন্য খাটিত, ঘরে ধানের মরাই ছিল, বাকি ছয়মাস সে গৃহস্থালী করিয়া বাঙ্গালার স্বভাব-ধর্ম্ম-সঙ্গত চিরকালের অভ্যাসবশতঃ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য তৈয়ারী করিত। সেই পণ্যদ্রব্যই বিদেশে হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। সে চাষা এখন নাই, সে গৃহস্থালী এখন নাই, সে গৃহস্থধর্ম্মও এখন নাই, আর সে গৃহও এখন নাই। ঘরে চাল নাই, গরু দুধ দেয় না, তৃণ-শ্যাম ক্ষেত্র শুকনা কাঠ হইয়া ফাটিতেছে, ঘরে সন্ধ্যাদীপ পড়ে না, দেবতা উপবাসী—সেবা হয় না, পেটের দায়ে হালের গরু বেচিয়া কোন রকমে খাইয়া বাঁচে। জলাশয় শুকাইয়া কাদা হইয়াছে, জলকষ্টে—বিশুদ্ধ জলের অভাবে নানা প্রকার ব্যাধি আসিয়া চাষার সে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি একেবারে নষ্ট করিয়াছে, তাহার যে সহজ সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল, তাহা হারাইয়া উৎকট ব্যাধি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। যে সুখ তাহার ছিল, তাহা আর নাই। নাগপাশ—অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় ... অবশ হইয়া পড়িয়া আছে।

কেন এমন হইল, কি পাপে মা লক্ষ্মী আমাদের ত্যাগ করিলেন? ইতিহাসের সাক্ষ্য যাহাই হউক, ভিতরের কথা ভাবিয়া দেখিলে দোষ আমাদেরই। যে আপনাকে দুর্ব্বল হইতে দেয়, তাহার বলহীনতা যে তাহারই দোষ। নিজের ঘরের ধন "চৌকি না দিয়া" যে পরের হাতে তুলিয়া দেয়, দোষ তাহার,—না, সেই সুযোগ পাইয়া যে সব ধনরত্ন লইয়া যায় সেই সুযোগ-প্রয়াসীর? আমরা যে সেই সময় নিজের ঘরকে পর করিয়াছিলাম ও নিজের প্রাণের আদর্শ

ভুলিয়াছিলাম, শুধু পরের দোষ দিলে ত আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

ভুল কোথায়? ভুল আদর্শের সংঘাত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের যে বিরোধ, সেই বিরোধেই আমাদের এই দুর্ব্বল শক্তিহীন অবসন্ন দেহ। নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিবার শক্তি ছিল না, সেই দৌর্ব্বল্যই আমাদের দোষ, সে দোষ ত এখনও যায় নাই, আমরা জাগিয়া—নিজের আস্বাদ পাইয়াও নিজের আদর্শকে তুলিয়া ধরিতে পারিতেছি না. সেই আদর্শের সংঘাত এখনও ত চলিতেছে, এখনও ত আমাদের নিজের আদর্শকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি! যে ভুলে নিজের আদর্শকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ভুলের মোহ যে এখনও কাটাইতে পারিতেছি না। বিলাতের আদর্শ বিলাতেই শোভা পায়, তাহা বিলাতেই থাকুক, আমাদের সে আদর্শকে ত্যাগ করিতে হইবে। জীবন গড়িবার সময় ত্যাগের সময়, ভোগের নয়। আমাদের এখন বিলাতী আদর্শজনিত যে বিলাসের ভোগ, তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ সবল করিতে হইবে, জীবনের ধারা ও গতির মুখ একেবারে ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রতীচ্যের যে Industrialism—এই Industrialism, যাহাকে শিল্প-চেষ্টা কি সকল রকমের বাণিজ্য-চেষ্টা বলিলেও ঠিক বুঝা যায় না—সেই Industrialism যাহা আমাদের দেশে কখনও ছিল না ও আমাদের স্বভাব ও ধর্ম্মের মধ্যে থাকিতেই পারে না, সেই Industrialism ধীরে ধীরে চোরের মত আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। আমাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই Industrialism আমাদের দেশে চলিবে না, চলিতে পারে না, বাঙ্গালার আদর্শ তাহা নয়। বাঙ্গালার মাটীতে যাহা হয়, বাঙ্গালার ধাতে যা সয়, তাহাকেই বরণ করিতে হইবে।

বাঙ্গালার নাই কি! ছিল না কি? কি জোরে, কি কল কল স্রোতে গঙ্গা সাগরের সঙ্গে মিশিতেছে। আজিও পদ্মা জলোচ্ছ্বাসে কি উদ্দাম ভাবের ভাঙ্গন অটুট রাখিয়াছে, কি তোড়ে ব্রহ্মপুত্র কলকলনাদে গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া যায়, আর যখন দামোদর ঘোর ঘর্ঘর রবে নাচিয়া উঠে, আজিও তাহার গতি কেহ ত রোধ করিতে পারে না, সাগরের অশ্রান্ত গর্জ্জন আজিও ত থামে নাই। বৃদ্ধ হিমালয় তাহার দুই বাহু লইয়া আজিও তেমনি দাঁড়াইয়া আছেন, তমালতালীবনরাজি-নীলা আজিও আছে—যাহার উপরে বাঙ্গালার প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার স্বভাব-ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছিল, সেই সব ত তেমনি আছে, তবে নাই কি? বাঙ্গালার যে মন্দিরে মন্দিরে মসজিদে মসজিদে সাধন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইত, আজিও ত সেই মন্দির আছে, মসজিদ্ আছে, তবে নাই কি? সে বল, সে স্বাস্থ্য, সে ধৈর্য্য, সে আত্মস্থ জাগ্রত অবস্থা সবই তমের অবসাদে ডুবিয়াছে। দেশ আছে, দেশের আদর্শ চলিয়া গেল কেন? জাতি আছে, সেই জাতির যে প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি, তাহা ভাসিয়া গেল কেন? সে গ্রাম নাই কেন? সে পল্লী নাই কেন? সে পল্লীসমাজ নাই কেন? বাঙ্গালার যে শত শত গ্রাম লইয়া শত শত সমাজ ছিল, সে সমাজ নাই কেন? খর্ব্ব, নগ্ন, স্বাস্থ্যহীন, রুক্ষকেশ, কঙ্কালসার প্রাণীর দল ক্ষুগ্রস্ত মরণাহত পশুর মতন পানা-পুকুরের ধারে পথে পড়িয়া ধুঁকিতেছে কেন? আজ যে বাঙ্গালীর মেয়ে আধপেটা খাইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে চোখের জল চোখে শুকাইতেছে. তাহার কথা ভাবি না কেন? মায়ের ছেলে ম্যালেরিয়ায়, প্লীহা-যকৃতে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তাহার খোঁজ রাখি না কেন? আজ যে আমরা Industrialism, Industrialism বলিয়া আস্থর হইয়া পড়িয়াছি, Joint stock Company—বনিয়াদি

জুয়াচুরির জন্য অহোরাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছি, কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া একটা বড় রকমের ধারকরা Indian Nation তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—এই সব চেষ্টা যে আমাদিগকে কোন্ পথে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? কেহ কি আমায় বলিয়া দিতে পার, আজ দুই শত বৎসরের ভিতর কয়টা নূতন পুষ্করিণী খনন হইয়াছে, কয়টা নূতন দেউল রচিত হইয়াছে, কয়টা নূতন অন্নছত্র খোলা হইয়াছে, গঙ্গার তীরে তীরে কয়টা ঘাট নূতন বাধান হইয়াছে, পথে পথে অশ্বথ-বটের বিবাহ দিয়া তাহার তলাখানি শাণ বাধাইয়া পথশ্রান্ত নর-নারীর বিশ্রাম-সেবার জন্য কয়টা নূতন বট-অশ্বথের সেবা-সংস্কার হইয়াছে, কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পার? কয়টা পল্লী, কয়খানা গ্রাম আজ বাঙ্গালায় আছে? ঘর ভাঙ্গিয়াছে, ব্যবসা গিয়াছে, বাণিজ্য গিয়াছে, রসকস যাহা ছিল, সকলই ফুরাইয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তবু কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? সে কালে যখন গ্রামে গ্রামে দুর্গোৎসব হইত, পল্লীতে পল্লীতে বারো মাসে তের পার্ব্বণ ছিল, তখন সকল গৃহস্থ, সকল গ্রাম, কেমন এক পরিবার হইয়া উঠিত, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উল্লাস, উৎসব এক-সঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করিতাম, এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই? এখন ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বৎসরে একবার সাক্ষাৎ হয় না; খুড়া, ভাইপো, ভাইঝি Cousin হইয়াছে—পরিবারের সে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। একটা প্রবল সভ্যতার সংঘাতে আমরা শক্তিহীন, আরও দুর্ব্বল শতছিন্ন হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু এখনও আমাদের ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, এখন মিল-ফ্যাক্টরির কথা ভাবিতে গেলে আমাদের জিবে জল আসে, আমাদের মধ্যে যাঁহাদের সামান্য কিছু টাকা আছে, তাঁহারা Cheap labourএর কথা ভাবিয়া লোভে, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন,—এই যে দাস-সুলভ-অনুকরণ-মোহ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমাদের জীবনের উপরে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাকে না সরাইতে পারিলে আমাদের বাঁচিবার আশা নাই।

Industrialism বাঙ্গালা দেশে চালাইতে আরম্ভ করিলেই আবার নূতন করিয়া আমাদের বিনাশের পথ প্রস্তুত হইবে। বিলাতী-ফ্যাক্টরি-রাক্ষস তাহার রাক্ষসী মায়ায় আমাদিগকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিবে। বিলাতী কারখানায় নানান কারখানা করিবে, নিজেরা সেই কলকারখানায় কলের চাকার মত ঘুরিব, প্রাণহীন স্তব্ধ জড়বৎ হইয়া সে চাকার দাঁতের সঙ্গে মিলাইয়া আমাদের লাগাইয়া দিব—সেই দাঁতে দাঁতে লাগিয়াই থাকিব, বিদ্যুতের কল টিপিয়া ধনী মালেক আমাদের চালাইবে, তাহাদের টাকা আছে, আমাদের পোকা-পড়া—রস রক্ত অস্থি মজ্জা আছে, যতদূর পারিবে, মালেক আমাদের রসতার হরণ করিবে। এই Industrialism যতটুকু আমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই ফল দিয়া ইহাকে বিচার করা যায়। কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কি ভীষণ অবস্থা। সহরের বাঙ্গালী-বাবুরা বিলাসের চকচকানিতে চকিত হইয়া বেশ সুখের মোহেই বাস করিতেছে। এত যে দুঃখ, এত যে কষ্ট, এত যে দারিদ্র্যের পীড়ন, তাহাও বিলাতী সভ্যতা বা বিলাসের জন্য অকাতরে সহ্য করিতেছে। কালে যে কি হইবে, তাহার ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। আর বাবুদের ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে, তাহার চিত্র আরও ভীষণ। গঙ্গার দুই ধারে বাঁধ আর কলের চিম্‌নীর ধোঁয়া, মা গঙ্গা আর পূতসলিলা নাই, সহরের ও মিলের সকল ময়লা তিনিই গ্রহণ করেন, কলের চিম্‌নী দেশ শুধু কালি ও ধোঁয়ায় ভরিয়া দিতেছে। স্বাস্থ্যের দেখা নাই, একটা মিলে অনেক লোকের

সমাবেশ, এই চিম্‌নীই তাহাদের জীবনী শক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। কেহ কলের চাকার দাঁত হইয়া আছে। কেহ একটুকু ফরসা কাপড় পরিয়া সেই প্রাণ দিয়া বুকের রক্ত ঢালা শ্রমলব্ধ অর্থের ভার ওজন করিয়া, মাথায় করিয়া মালেকের সিন্দুকে তুলিয়া দিতেছে। আমাদের শ্রমজীবীদের যে নৈতিক জীবন, তাহা মিল-ফ্যাক্টরিতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সব রকমের মাদকতা বাড়িয়াছে! হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক মিলের কাছে কাছে যত শুঁড়িখানা আছে, তাহাদের আয় শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে. এই Industrialismকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইউরোপেও এই Industrialism-এর বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা আজকাল অনেক কথা বলিতেছেন, এই Industrialismএর ফলে ইউরোপে কি দুর্দ্দশা—মানুষগুলা, রক্তমাংসের মানুষগুলাকে পাথরের আর লোহার চাকা তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা খাটে শুধু পেটের দায়ে, কিন্তু মানুষ শুধু ত তার পেট লইয়াই মানুষ নয়। তাহার সহজাত ভোগের, প্রবৃত্তির ক্ষুধা আছে, সে ক্ষুধাও পেটের ক্ষুধা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, সে যাহা অর্জ্জন করে, সে তাহা শুধু পেটের জন্য ব্যয় করিতে পারে না। সকল রকমেই সে চাপে পিষ্ট হইতেছে। নেশায় ডুবিতেছে। পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছে, বহুতর অসঙ্গত অনাবশ্যক অভাব জুটাইতেছে, ফলে সামাজিক অত্যাচারে যত প্রকার পাপের সৃষ্টি হয়, সেই সব বীভৎস সর্ব্বদাহী দেহ-মন-পোড়ান রোগে ভুগিতেছে ও পাপের অন্ধতমে ডুবিতেছে।

আমাদের মধ্যে অনেকের ইউরোপের এই ভীষণ ছবি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি দেখিয়াছি, বিলাতের যে কোন মিল-ফ্যাক্টরীর হউক না কেন, তাহার সম্মুখে সন্ধ্যার সময় দাঁড়াইয়া থাকিলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সারা জীবনে ভোলা যায় না। Industrialismএ যে ধনের বৃদ্ধি হয়, সে ধনীর ধনবৃদ্ধি, সাধারণ লোকের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনি থাকে। ধনীর ধনবৃদ্ধি হইলেই ধনের অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই প্রবল ধনীর অত্যাচারে ইউরোপ আজ নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্ম তাহাদের ধারণ করিতে পারে না। যথেষ্ট অর্থ-বৃদ্ধি, কিন্তু টাকা মালেকের, মালেকান্ স্বত্ব মালেকের, এই সব মালেকের দল ধন-কুবের হইয়া উঠে, কিন্তু টাকা ছড়াইয়া পড়িতে পায় না। সমাজের যে স্থানে অর্থশক্তি বদ্ধ হইয়া পড়ে, সেই স্থানই শক্তি-সম্পন্ন হয়; কিন্তু অন্যান্য স্থান অবসাদ, অন্ধকার! শক্তির ধর্ম্মই বিকিরণ সম্প্রসারণ, তবেই শক্তির শক্তিত্ব ও অস্তিত্ব বজায় থাকে, কিন্তু শক্তি বজায় না থাকিলে সব ফলই বিফল হইয়া পড়ে। ইউরোপের এই কলকারখানার ফল, শ্রম ব্যর্থ হইয়া আকাশ পানে নিরর্থক চাহিয়া আছে, এবং যে সব শ্রমজীবীদের রক্ত-মাংস দিয়া এত অর্থ অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছে, সে অর্থও সার্থক হয় নাই। ইহার ফল Strike Combiue Socialism! খৃষ্টান ইউরোপ গত তিন শত বৎসরের Industrialismকে বরণ করিয়া খৃষ্টকে পরিত্যাগ করিয়াছে। মানুষকে মানুষ বা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং শুধু অর্থের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া নিজের জীবনকে পিষিয়া মারিতেছে। আমরাও কি এই Industrialismকে বরণ করিয়া আমাদের জীবনকে অমনি করিয়া সকল রকমে ব্যর্থ করিয়া দিব?

জীবন এক অখণ্ড সত্তা। ব্যষ্টি ও সমষ্টি তাহার এক স্বাভাবিক জীবন্ত প্রকাশ, জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখাই মস্ত ভুল। পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া আরতি করিয়া পাঁচটি আলোকে এক করিয়া দেবতার কাছে তুলিয়া ধরাই অখণ্ড জীবনের পরিচয়। সমস্ত

জীবনকে সেই ঈশ্বরের অনুমুখী করাই শ্রেষ্ঠ সত্য। ব্যক্তি ও সমাজ একসঙ্গে মহাসত্য. উভয়েই পবিত্র। শুধু যে তাহারা উভয়ে মহাসত্য, তাহা নহে, আমাদের মনুষ্য-জীবনের ধর্ম্ম ও মহাসত্য তাহাই। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির নিজস্ব সংবিৎ, সমাজ জাতির আত্মস্থ সংবিৎ। সত্য কাহাকেও ত্যাগ করিয়া ফুটিয়া উঠে না। ব্যক্তিত্ব যদি সমাজকে বাদ দিয়া আপনাকে বড় করিয়া তোলে, তাহাতে ফল হয় অত্যাচার, আর সমাজ যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া আকাশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চায়, তবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ। উভয় যখন সত্য, তখন উভয়কে এই সঙ্গে অখণ্ডভাবেই ধরিতে হইবে। ইউরোপে Industrialismএর ফলে তাহার সমাজ নষ্ট হইতে চলিয়াছে, আর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিবার সুযোগ পায় নাই। তবু এই Industrialism ইউরোপে কতকটা সয়, কেন না, ইউরোপের স্বভাব-ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ আপনার চেষ্টায় আপনার স্বভাব-ধর্ম্মের বলে সুস্থ ও সবল হইলে এই ব্যাধি দূর হইয়া যাইবে। এই যে ইউরোপে আজি সমরানল প্রজ্বলিত, ইহা কি অনল অক্ষরে এই ব্যাধি কি, দেখাইয়া দিতেছে না? ইউরোপ তাহার সমস্যার পূরণ আপনি করিবে। আমি আগেই বলিয়াছি, এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে দেখিবে, ইউরোপ তাহার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু আমরা অকারণে ইউরোপের ব্যাধি আমাদের দেশে আনিয়া তাহাকে পোষণ করি কেন? সমস্তটাই যে আমরা আনিয়াছি, আমি এমন কথা বলি না, ইহার কতকটা যে ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, সে কথা মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু ইহার অনেকটা যে আমরা মোহাবিষ্ট হইয়া আপনারা আনিয়াছি, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। আমরা আহারে-ব্যবহারে, আচারে-বিচারে, ভাষায়-ভাবে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে. সমস্ত জীবনক্ষেত্রে, প্রতি পদক্ষেপে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি. সদাব্রতের বদলে হোটেল করিয়াছি, থিয়েটার করিয়া আনন্দের মূল্য দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারি করিয়া অনাথ আশ্রমের চাঁদা তুলি, দেশে যত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার সহজ উপায় ছিল, তাহার বদলে বিলাতী খেলা আমদানী করিয়াছি, জাতিসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর, ভাবসঙ্কর, নিজেদের প্রাণ, রক্তকেও সঙ্কর করিয়া প্রাণে প্রাণে ফেরঙ্গ হইতে চেষ্টা করিতেছি। অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের প্রকৃত জীবনযাপনের উপায় মাত্র, তাহা ভুলিয়া গিয়া বিলাতী Industrialismএর নকল করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই জীবনযাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। সাবধান, এখনও সময় আছে, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, সে বাণী তখন শুনি নাই, এখন শোনা ও বোঝা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কমলাকান্তের দপ্তরে তিনি বলিয়াছেন:—

"আবার আমাদের দেশ ইংরেজী মুলুক হইয়া এই বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে, ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেটিরিয়েল প্রস্পেরিটির উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইংরেজজাতি বাহ্যসম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজী সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এ দেশের বাহ্যসম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভাল ভাবিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষে অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে। সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে. দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে, দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল, দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাস্য

এই, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? * * * কি ইংরেজী, কি বাঙ্গালা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, স্পিচ, ডিবেট, লেক্‌চার, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্যসম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ে কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে! ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থপ্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর, শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক, টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন? মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই, টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্যসম্পদ! হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর, এই পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত, এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এই পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়। এই উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাক-ঢোল, বাঙ্গালা সংবাদপত্র কাঁসীদার, শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগ-বলি। এই পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক, তবে আইস, সবে মিলিয়া বাহ্যসম্পদের পূজা করি, আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া বঙ্কনাবিবদলে মিষ্টকথা চন্দন মাখাইয়া এই মহাদেবের পূজা করি! বল হর হর বম্ বম্! বাজা ভাই ঢাক-ঢোল, ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড়! বাজা ভাই কাঁসীদার ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং নাট্যাং। আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন! আমাদের এই বহুকালের ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন।”

এই Industrialism-এর যজ্ঞে শুধু হৃদয় নহে, এই নবজাগরিত বাঙ্গালীজাতির যে আত্মা, তাহাই ছাগবলি, আমাদের মরিবার ইহাই প্রশস্ত পথ, আমাদের বাঁচিতে হইলে ইহাকে বর্জ্জন করিতেই হইবে।

আমি আগেই বলিয়াছি যে, শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু সে উপায় বিলাতী Industrialism নহে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা বিশিষ্ট রীতি আছে, পদ্ধতি আছে। আমাদের বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের মধ্যে আমাদের স্বভাবধর্ম্ম সে রীতি, সে পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছে। মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে আমাদের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে মানিয়া চলিলে সে পদ্ধতি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেশে চিরকালই চাষা তাহার কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র অর্থাৎ খাদ্য ও পরিধানের বস্ত্র আপনিই তৈয়ারী করিয়া লইত। তাহার লজ্জানিবারণের জন্য ম্যানচেষ্টারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়াও চাষাদের ঘরে ঘরে অনেক কুটীর-শিল্পের চলন ছিল, সুতরাং এই কুটীরশিল্প পণ্য ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা তাহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা এত ব্যাধিপীড়িত যে, কৃষিকার্য্য ছাড়া আর কোন কার্য্যই করিতে পারে না। কুটীরশিল্পজাত যে পণ্য, তাহা এক রকম উঠিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে আমাদের বাঙ্গালায় ঢাকা, টাঙ্গাইল, শ্রীরামপুর, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর ও আরও অনেক স্থানে কাপড় প্রস্তুত হইত। এখনও যে একেবারে হয় না, তাহা নহে।

কিন্তু প্রায় মরিয়া আসিয়াছে। তুলার চাষ উঠিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে কি এখন এমন তুলা আজিও উৎপন্ন হয় না, চাষ করিলে কি সেটুকু ফসল হয় না, যাহাতে আমাদের মোটা কাপড় লজ্জা-নিবারণের জন্য তৈয়ারী হইতে পারে? এখনও আমরা উপবীতের সূতা আমরা নিজেরাই তৈয়ারী করি, সে সূতা যেমন মোটা হয়, তেমনি সরুও ত হয়। যে ভাবে পূর্ব্বে আমরা কাপড় ও সূতা তৈয়ারী করিতাম, চরকায় আবার কেন তেমনই ভাবে সূতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারীর ব্যবস্থা করি না? আমাদের গৃহস্থের ঘরে পূর্ব্বে যেমন সংসারের কাজ ও ক্ষেতের কাজ সারিয়া আপনাদের লজ্জানিবারণের পরিধেয় বসন নিজেরাই তৈয়ারী করিয়া লইতাম, তেমনই করিয়া আবার করিতে হইবে। ম্যান্চেষ্টারের মিহি বিলাতী ধুতি আর নানাপ্রকারের মাছপাড়, বাগান-পাড় যাহা ঢাকার তাঁতির হাতে বুনা হইত, তাহারই নকলে ছাপা কাপড় পরিতেছি ও পরাইতেছি। কাঁসা-পিতলের বাসন যাহা মুরশিদাবাদ, খাগড়া, ঢাকা, এমন কি, কলিকাতার কাঁসারিপাড়ায়ও তৈয়ারী হইত, তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহার বদলে বিলাতী এনামেলের বাসন আর নানাপ্রকার ফুল-লতাপাতা কাটা রঙ্গিন কাচের বাসন আমাদের ঘরে ঢুকিয়াছে। এইরূপে আমাদের দেশে কাগজ তৈয়ারী হইত, হাতীর দাঁতের অনেক রকম জিনিস তৈয়ারী হইত, সোনা-রূপার অনেক প্রকার অলঙ্কার আমরা তৈয়ারী করিতাম, দিশী রঙ্গের ছোপান কাপড়ের যে শিল্প-ব্যবসা আমাদের দেশে অনেক স্থানে ছিল, তাহা প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঝিনুকের শিল্প, ডাকের সাজ ও অনেক প্রকার শিল্পের কাজ যাহা এক সময় আমাদের দেশের গর্ব্ব ছিল, আজ তাহা তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, আমাদের চাষারা নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেরাই প্রস্তুত করিত, কৃষিকার্য্যও করিতই, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্পের অনেক শিল্পপণ্য অবসর সময়ে প্রস্তুত করিত। যাহারা কৃষিকার্য্য করিত না, তাহারা অন্যান্য শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিয়া আমাদের দেশে ও জগতের হাটে হাটে বিক্রয় করিত। অবশ্য তখন, আজকালকার মত কলকারখানার যে প্রতিযোগিতা, তাহা ছিল না। কারখানার উপরে যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা যে পারিব না, এ কথা নিশ্চিত। তবে আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে উদ্ধার করিতে হইলে ও তাহাদের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, আমাদের কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা বিলাতী Industrialism বর্জ্জন করিব। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের পণ্য-সমূহের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া আমাদের উপায় স্থির করিতে হইবে।

প্রথম কথা, আমাদের বিলাসবর্জ্জন। আমরা চাল বিগড়াইয়া ফেলিয়াছি, যাহা বিগড়াইয়াছে, তাহাকে ফিরাইতে হইবে। সকল প্রকার আক্রমণ হইতে নিজেকে সম্ভ্রমের সহিত রক্ষা করাই মানুষের ধর্ম্ম, আমাদের জীবনের সেই একমাত্র মূল সূত্র। এই বিলাস, এই স্বযাচিত অবসাদ, জড়তা যাহা আমাদের নানাপ্রকার অস্বাস্থ্য ও ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু ভদ্রলোকের গৃহে নয়, কৃষকের কুটীরে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিহার করিতে হইবে। মোটা কাপড় যদি আমাদের কটিতে ব্যথা দেয়, সেই বেদনা আমাদের অকাতরে আপনার ও দেশের কল্যাণের জন্য সহ্য করিতে হইবে। এই বিলাসবর্জ্জনে যে

সংযম আবশ্যক, সেই সংযমের সাধন করিতে হইবে এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভদ্রলোকের ঘরে যাহা আরম্ভ হইবে, চাষার ঘরে তাহা অল্পদিনের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িবে। এই সংযম আমাদের জীবনকে খর্ব্ব করিবার জন্য নয়, কাহারও ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করিবার জন্য নয়, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের সংবিৎকে জাগরণের পথে আনিয়া, সমাজ ও সংবিতের সহিত এক সূত্রে বাঁধিয়া দিবার জন্য। এই সংযমে ব্যক্তিও বাঁচিবে এবং আমাদের বাঁচিয়া উঠা পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে এই সংযম ও বিলাস-বর্জ্জনের ফলে আমরা অনেক অনাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের হাত হইতে রক্ষা পাইব। বাঙ্গালার জীবন সর্ব্বদাই সহজ সরল, তাহা কখনও বিচিত্র বিলাসের মধ্যে জটিল হইয়া উঠিতে পারে নাই, যখনই জটিল হইয়াছে, তখনই তাহার শক্তি হ্রাস হইয়াছে। আজ যদি বিলাতী সভ্যতার ফলে আমাদের সরল জীবনকে জটিল হইয়া উঠিতে দিই, তবে নিশ্চয় জানিও যে, আমাদের উন্নতির পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন আসিয়া ঘটিবে। যে প্রতিযোগিতায় আমরা অসমর্থ, সেই প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে লিপ্ত হইতে হইবে এবং তাহাই আমাদের ধ্বংসের কারণ হইবে।

তার পরেই আমাদের দেখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোথায় কোথায় কি কি পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত, সেই সব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেই সব পণ্যশিল্পের আবার নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল চেষ্টার যে ভিত্তি অর্থাৎ পল্লীগ্রামের ও সহরের স্বাস্থ্য, তাহাকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, যেমন করিয়াই হউক, আমাদের সেই পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে আমাদের—

(১) ইতিহাসের বাণীকে মনে রাখিতে হইবে।

(২) ইউরোপীয় industrialismকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) বড় বড় সহরগুলা যে অজগর সর্পের মত পল্লীগ্রাম হইতে টানিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) পল্লীগ্রামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে তাহার অস্বাস্থ্য দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ-শরীরে বারো মাস পরিশ্রম করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

(৫) কৃষক তাহার কৃষিকার্য্য ছাড়া যাহাতে তাহার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৭) তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকেরা ঘরে ঘরে কি কি শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাও দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৮) আমাদের দেশে যে সব শিল্পপণ্য প্রস্তুত হইত, তাহার অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৯) এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কারবার দেশের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

(১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহা রাখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের অন্য সমুদয় পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

(১১) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রস্তুত হয়, সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে।

(১২) এই সব ছোট ছোট ব্যবসাগুলিকে

ফলপ্রদ করিতে হইলে, তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেই জন্য জেলায় জেলায় জেলা-বাসীদের সাহায্যে ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।

এই ত আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধন ও লুপ্ত ব্যবসা বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের উপায়। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিবার উপায় কি, অথাৎ এই উপায় অবলম্বন করিলে যে সব কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমরা করিব, না গবর্ণমেণ্ট করিবে? ইহা করা উচিত, উহা করা উচিত বলিলেই ত কাজটা আপনা আপনি হইয়া উঠে না, এই কাজের ভার কে লইবে, সেই কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা

যেমন সব বিষয়ে উন্নতিসাধন করিতে হইলে, আমাদের ইতিহাস ও স্বভাবধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলেও সেই দৃষ্টি আবশ্যক। শিক্ষার মূল কথাটি কি? মানুষের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার যে আত্মসংবিৎ, তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্ম্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য। এই অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তখন প্রাণের পরতে পরতে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে, ধর্ম্ম তাহাকে আশ্রয় করে, প্রেম তাহাকে আলিঙ্গন করে এবং মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষ হইয়া উঠে। এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে বিকাশ করাই শিক্ষার বিশিষ্ট কার্য্য। এই শিক্ষাই বাঙ্গালার মাটীর দান, তাহার প্রাণের বাণী। এই শিক্ষার কার্য্য পুরাকালে আমাদিগের দেশে অনেক প্রকারে সাধিত হইত, গুরুর গৃহে সংসারের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে, পল্লীতে পল্লীতে যাত্রা-গানে, কবি-গানে, কথকতার মধ্যে, ভাগবত-পাঠে, রামায়ণ-গানে, চণ্ডীর গানে, ধর্ম্মঠাকুরের কথায়, হরিসভার সংকীর্ত্তনে, মেয়েদের ব্রত উদ্‌যাপনে, এরূপ নানা প্রকারে আমাদের দেশে সরল উপায়ে শিক্ষার বিস্তার হইত। দেশের বড় বড় টোলে, বিক্রমপুরে, নবদ্বীপে, কাশীতে, সংস্কৃত সাহিত্যে, শাস্ত্র ও দর্শনের সাহায্যে আমাদের দেশের সেই সরল শিক্ষাই আরও গভীরভাবে প্রচারিত হইত। যে দেশের চাষারা চাষ করিতে করিতে—

"মন রে তুমি কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব-জনম রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

এই বলিয়া গান ধরে, যে দেশের মাঝিরা দাঁড় টানিতে টানিতে—

"মন-মাঝি তোর বইঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না"

বলিয়া তান তোলে; যে দেশের মেয়েরা—

"তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।
তোমার তলে ঠেকাই মাথা
শুন তুলসী প্রাণের কথা।
তুলসী তোমায় করি নতি
রেখ ধরম আমার প্রতি
তোমার তলে দিলাম আলো
পরকালে রেখো ভাল।"

এই মন্ত্র বলিতে বলিতে তুলসীতলায় সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করে, যে দেশে পণ্যব্যবসায়ী হাট হইতে ফিরিবার সময় খেয়া পার হইতে হইতে—

"দিন ত গেল সন্ধ্যে হ'ল
হরি পার কর আমারে"

বলিয়া গান গায়; যে দেশের বিবাহের অনুষ্ঠানে,

গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়—

"ওঁ ঈশে একপদী ভব, সা মামনুব্রতা ভব"

ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত পদনিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও, যার সপ্তম পদক্ষেপে—

ওঁ সখ্যে সপ্তপদী ভব, সা মামনুব্রতা ভব।"

আমার সহিত সখ্যবন্ধন কর ও আমার অনুব্রতা হও।

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।

সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রি দধাতু নৌ॥"

বলিয়া গৃহকে, গার্হস্থ্য আশ্রমকে, গৃহধর্ম্মকে সকল জীবনের সঙ্গে, সকল কর্ম্মের সঙ্গে ভগবানকে গাথিয়া লয়; যে দেশের তর্পণের শেষ কথা—

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"

যে দেশে সকল কর্ম্মে ও সকল কর্ম্মশেষে প্রাণ-মন খুলিয়া "বিষ্ণুপ্রীতি-কামনায়ৈ" বলিয়া অঞ্জলি দান করিতে হয়; যে দেশের মাটীতে বিশ্বরাজ্যের, প্রাণ-রাজ্যের সকল রূপ, সকল রস, সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়া, সকল জ্ঞান-সমুদ্র শোষণ করিয়াও ভগবৎপ্রেম ও করুণায় নিজেকে ডুবাইয়া, মহাপুরুষ ভোগের বীরত্বে, ত্যাগের বীরত্বে তারস্বরে বলিয়া উঠেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্ বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

সে দেশের শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ কি এবং কি রকম সহজ সরলভাবে সেই শিক্ষার বিস্তার হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

কিন্তু আমাদের সকল আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শও হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং আমরা সেই একই কারণে সহজ সরল উপায় ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষা-দীক্ষাকে জটিল ও দুরূহ করিয়া তুলিয়াছি। এখন আমাদের দেশে যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলে, তাহা বিস্তার করিবার জন্য ইউনিভারসিটীর একটা বিরাট্ স্তম্ভ খাড়া করিয়াছি। রামমোহন যে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা ও যে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে দেশের শিক্ষা-বিস্তার করিবার পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা হয় ত ঠিক সেই সময়ে আবশ্যকীয় ছিল। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষা-বিস্তার করায় অনেক দোষ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আমাদের হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার সবই এত ইংরাজী-নবীশ হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের কোন যোগ নাই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাহার প্রাণের কাছে গিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারি নাই, কেবল উপর হইতেই দেখিয়াছি, আর কতকগুলা ইংরাজী শব্দ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু বেশী চালাক হইয়াছি মাত্র। বক্তৃতার সময় সেই মুখস্থ কথাগুলো তোতার মত আওড়াইয়া যাই এবং সেই কথার ঝুড়ি বোঝাই করিয়া মাথায় করিয়া বেড়াই। কিন্তু কথা এক জিনিস, আর প্রকৃত জ্ঞান আর এক জিনিস—এই কথাটি আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, যাহারা ইংরাজী শিক্ষা পায় নাই, যাহাদের তোমরা অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা কর, তাহাদের দয়া-মায়া আছে, ধর্ম্ম আছে, তাহারা মানুষের দুঃখ বোঝে, অতিথিসেবা করে, দেবতাকে ভক্তি করে। আমাদের যে স্বভাব-জাত শিক্ষায় মানুষকে মাটীর মানুষ করে, সে শিক্ষা তাহাদের আছে। আমার মনে হয়, আমাদের এই নব-জাগরিত জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চালনা করিতে হইলে, আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদেরই ভাষায় দিতে হইবে। নিজের ভাষা শিখিতে হইলে নিজের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে এবং আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার যে সরল সত্যবাণী, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সব দিকে

চোখ রাখিয়া যে উচ্চশিক্ষা, তাহাই প্রকৃতপক্ষে উচ্চ। আমরা এখন যে উচ্চশিক্ষা পাই, তাহা একটা ধার-করা জিনিস, তাহার সঙ্গে সেই কারণে আমাদের দেশের স্বাভাবধর্ম্মের সঙ্গে যোগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শুধু তাহাই নয়, এই যে একটা অলীক শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তারিত হইতেছে, ইহার জন্য এত আড়ম্বরের মধ্যে সে শিক্ষার প্রাণটুকু মরিয়া যায়। দেশে টাকা নাই—ছেলেরা বই কিনিতে পারে না, বই কিনিবার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তবু যেখানে একখানা বই হইলে চলে, সেখানে পাঁচখানা বইয়ের ব্যবস্থা। এই ছেলেদের শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে কত রকম সরল উপায় ছিল, এখন বৃহৎ প্রাসাদ না হইলে শিক্ষা হইতে পারে না। আমরাই শিশুকালে বালির কাগজে অঙ্ক কষিতাম, কলেজে পর্য্যন্ত সেই কাগজেই আমাদের কাজ চলিত। এখন স্কুলের নিম্ন শ্রেণী হইতে রুল-করা ভাল কাগজের বাঁধান খাতা না হইলে নাকি লেখাপড়া হয় না! যে বিলাসকে বর্জ্জন করাই আমাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায়, এই উচ্চশিক্ষা-প্রণালী ও ব্যবস্থা সেই বিলাসকে বাড়াইয়া দিতেছে। বড় বড় কলেজের বোর্ডিংএর জন্য খুব বড় বড় বাড়ীর আবশ্যক। এই সব দ্বিতল বাড়ীতে থাকা যাহাদের অভ্যাস হইতেছে, তাহারা কি আর তাহাদের নিজ নিজ পল্লীগ্রামের কুটীরে গিয়া থাকিতে পারিবে? এই যে শিক্ষা-বিস্তারের উপায়, ইহা ত আমাদের দেশের উপায় নয়, তবে কেন আমরা ইহার বিপক্ষে আন্দোলন করি না! লাভ ত এইটুকু মাত্র যে, বিলাতের ফ্যাকটারিতে যেমন নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আমাদের এই ইউনিভার্সিটী-ফ্যাকটারিতে বি.এ. এম.এ. পি এচ্ ডি, পি আর এস, এইরূপ কতকগুলি জীব তৈয়ারী হয়, প্রকৃত মানুষ তৈয়ারী হয় না। শিক্ষাদীক্ষা যে মূল উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছি, সে উদ্দেশ্যের অন্তরায় হয়। এই শিক্ষাতে আমাদের ছাত্রদিগের আত্মসংবিৎকে জন্মের তরে বিসর্জ্জন দিবার পথ করিয়া দেয়। এই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী, সে আত্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, জ্ঞানের রাজ্যে দাসখত লিখিয়া দেয় আর বিজ্ঞানের বড়াই করে। তাই বলিতেছিলাম, ইহার জন্য এত আড়ম্বর কেন? এত ধনব্যয় কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে বাঙ্গালা পড়া হইত না, এখন হয়, এই লইয়া সময় সময় আমরা অহঙ্কার করি। বাঙ্গালা ভাষাকে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে সমস্ত বাঙ্গালীরই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকা উচিত। শুনিয়াছি, এই চেষ্টার মূলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি যে এ বিষয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই এবং সেই জন্য দেশের ও দশের ধন্যবাদভাজন। কিন্তু আমাদের ভাষাকে কি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে? আমি শুনিয়াছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষার জন্য বাঙ্গালা কবিতা পড়ান হয় না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাঙ্গলা কবিতার কোন বই পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে না। আমি শুনিয়াছি, এই নিয়মের উদ্দেশ্য—শুধু বাঙ্গালা লিখিবার রীতি শিখান হইবে, আর কিছু হইবে না। এ কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। বাঙ্গলা ভাষার যে অশেষ সম্পদ্, তাহাতে কি বাঙ্গালা ছাত্রের কোন আবশ্যক নাই? বাঙ্গালা ভাষা কি শুধু একটা রীতির বিষয়? বাঙ্গলা ভাষার যে অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে, বাঙ্গলা সাহিত্যের যে একটা অতল প্রাণ আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া কি আমাদের শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে? আমার বাঙ্গালা ভাষা যে রাজরাণী, আপনার গৌরবে সে যে গরবিণী। এই যে তোমরা বল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রবেশ

করিয়াছে, মনে রাখিও, তাহার যে নিজস্ব গৌরব, সে গৌরবে তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও নাই, সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটা কোণায় তাহাকে বসিবার একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র।

আমি আজ মহাসভায় সাহস করিয়া বলিতেছি যে, এই শিক্ষা-দীক্ষার প্রণালী সমূলে পরিবর্ত্তিত না করিলে, ইহার মুখ ফিরাইয়া না দিতে পারিলে, ইহাকে আমাদের দেশের যে স্বভবধর্ম্ম, আমাদের দেশের যে সভ্যতা, সাধনা, তাহার সহিত যোগ করিয়া দিতে না পারিলে ও এই শিক্ষাকে সাধারণের সহজসাধ্য করিয়া না তুলিতে পারিলে, আমাদের ঘোর বিপদের কথা।

তার পর, যাহাকে আমরা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বলি, তাহার কথা। কেহ কেহ বলেন, জোর করিয়া আমাদের দেশের সকলকেই ক, খ আর এ, বি, সি, ডি, পড়াইতে হইবে, না করিলে তাহারা মানুষ হইবে না। এই কথা কি কেহ তলাইয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন? না অন্যান্য দেশে আছে বলিয়াই আমাদের দেশে চালাইতে হইবে? আমাদের দেশের চাষারা যে মানুষ, আমাদের চেয়ে তাহাদের মনুষ্যত্ব কোন রকমেই যে কম নয়। আমাদের ইউনিভরসিটী যেমন একটা বৃহৎ, প্রকাণ্ড, অশেষব্যয়সাধ্য বিরাট্ কলের কারখানা হইয়া উঠিয়াছে, নিম্নশিক্ষার জন্যও কি ঠিক ঐরূপ একটি কারখানা তৈয়ারী করিতে হইবে? ইহার উপরে কি আবার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে? আমি স্বীকার করি যে, আমাদিগের চাষাদের লেখা-পড়া শিখান উচিত। কিন্তু দোহাই তোমাদের, তাহাদের আবার কারখানার ভিতরে জুড়িয়া দিও না। আমাদের চাষারা সহজজ্ঞানে ও অনেক দিনকার সাধনার বলে সভ্য। তাহাদের ক, খ, কি এ বি, সি, শিখান এমন একটা কঠিন ব্যাপার নহে। আমরা ইচ্ছা করিলেই তাহা অতি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারি। তাহার জন্য অনেকগুলা স্কুলের দরকার নাই, অনেকগুলা মাষ্টারের দরকার হইবে না, অনেকগুলা বাঙ্গালা ইংরাজী কেতাবের দরকার হইবে না, রুলকরা কাগজের বাঁধান খাতারও আবশ্যক হইবে না। ইংরাজী শিক্ষায় তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত করিয়া তোলারও আবশ্যক নাই। আমাদের গ্রামে গ্রামে যে সকল পুরাতন প্রথা ছিল, সেই সব পুরাতন জিনিসগুলা আবার চালাইয়া দেও। তাহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে দুই একটা মোড়লের বাড়ীতে দুই একটা নৈশবিদ্যালয় স্থাপন কর। তাহা হইলেই আমাদের চাষাদের যে শিক্ষা আবশ্যক, সেই শিক্ষার সহজেই বিস্তার হইবে। বাঙ্গালার মাটীতে, বাঙ্গালার ভাষায় যে শিক্ষা সহজে দেওয়া যায় এবং যে শিক্ষা বাঙ্গালী তাহার স্বভাবগুণে সহজেই আয়ত্ত করে, সেই শিক্ষাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ফল কথা, উচ্চশিক্ষাই হউক, কি নিম্ন-শিক্ষাই হউক, সকল রকমের শিক্ষাকেই বাঙ্গালী জাতির যে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ, তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আগেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর শিক্ষার আদর্শ কি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শিক্ষাকে শুধু কথার ব্যাপার না করিয়া তাহাকে যথার্থ করিয়া তুলিতে হইবে। ধার-করা বিজ্ঞানের অহঙ্কার হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চ্চায় তাহাকে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে এবং সর্ব্ববিষয়ে আমাদের জাতি স্বভাবধর্ম্মের পূর্ণবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই শিক্ষাকে সার্ব্বভৌমিক করিয়া তুলিতে হইবে।

এই ত উপায়। কিন্তু ইহা সাধিত হইবে কিরূপে? এ কার্য্য আমাদেরই করিতে হইবে কি

গভর্ণমেণ্টের করিতে হইবে, সে কথা পরে বলিতেছি।

কাজের তালিকা ত শেষ হইল, এখন কি উপায়ে এই সব কাজ হাতে করিয়া করিতে হইবে, তাহারই বিচার করিব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলিয়া রাখি, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, কেন এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণকে লইয়া আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই, তাই আমাদের দেশ আমাদের কোন কাযই আপনার বলিয়া গ্রহণ করে নাই। আমাদের উচ্চশিক্ষার অভিমান, অর্থের অভিমান, আমাদের বর্ণের অভিমান, আমাদের ধর্ম্মের অভিমান, আমাদের এমনি অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, যাহাদের লইয়া দেশের রক্ত, মাংস, প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই বাদ দিয়া আমরা দেশের কার্য্যকে সার্থক করিতে চাই। যাহার যাহা নাই, সে তাহারই বড়াই করে। যাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই, সে শিক্ষার বড়াই করিবে না ত কে করিবে? আমরা দেশের বাবুরা—প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত, তাই আমাদের এত শিক্ষার অভিমান। আমরা গেঁয়ে অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে মিশিব কি করিয়া? তাই আমরা তাহাদের সঙ্গে পৃথক হইয়া কায করিতে যাই। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতপক্ষে ধনী, তাহারা ধনগর্ব্বে এতই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ লোকের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে নিজেদের অপমানিত বোধ করে। আবার আর এক দল আছে, যাহাদের টাকা নাই অথচ টাকার অভিমান আছে। তাহার বহুদিনের বসতবাটী ও স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া কন্যার বিবাহ দেয় এবং নিতান্ত নির্লজ্জের মত সেই বিবাহে জাঁকজমক করে।

তাহারা প্রাণে প্রাণে জানে যে, তাহারা নিতান্তই গরীব; কিন্তু তাহারা ত আর লাঙ্গল লইয়া চাষ করে না, তাহারা যে মাসান্তে মাহিয়ানার টাকা লইয়া পকেট ঝনঝন করাইতে করাইতে বাড়ী ফেরে। সহরে যিনি বাবু, পল্লীগ্রামে তাঁর একটু সম্পত্তি আছে; যাহার আয় বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা—সেইখানে তিনি ভুঁইয়া। যিনি সহরে বাবু ও পল্লীগ্রামে ভুঁইয়া, তিনি যদি চাষাকে ডাকিয়া একসঙ্গে কাজ করেন, তাঁহার মান থাকে কি করিয়া? তাই বলিতেছিলাম, টাকার অভিমান আমাদিগকে অন্ধ করিয়াছে। এই যে 'শিক্ষিত' আর 'অশিক্ষিত', এই যে 'ধনী' অথবা টাকা না থাকিয়াও টাকার 'অভিমানী', আর বাস্তবিকই যারা গরীব, ইহাদের মধ্যে নূতন করিয়া একটা বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে এখন শাস্ত্রে যাহাকে বর্ণাশ্রম বলে, তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না,—তাই আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের এত বড়াই। এখন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের আলোচনা কমই করে, কেরাণীগিরি করে, ওকালতী করে, ব্যারিষ্টারী করে, জজও হয়, সকল প্রকার ব্যবসাবাণিজ্য করে, জুতার দোকান দেয় ও ভাটিখানার মালিক হয়, 'অশিণ ছ্যাদে' বলিয়া শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ায়। মন্ত্র পড়াইবার সময় কার্ত্তিকে মাসি বলিতে শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতৃস্বসা বোঝে, বিসর্গ অনুস্বারে পূর্ণ ভূরি ভূরি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াও শাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জানে না,—এ হেন যে ব্রাহ্মণ, ইহার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বড়াই কেন? এখন বৈদ্য-কায়স্থও তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যের যে গণ্ডী, তাহার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, ব্রাহ্মণেরা যে সব কার্য্য করে, অশুদ্ধ মন্ত্র পড়ান ছাড়া, তাহারাও সেই সব কার্য্যই করে। তবে বৈদ্য ও কায়স্থের এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বড়াই কেন? আমি ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের মধ্যে কার্য্যগত কোন পার্থক্য দেখিতে পাই নাই। এই যে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম, তাহা বাঙ্গালায় কোথাও খুঁজিয়া পাই না, তাই এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। আমি

এ ক্ষেত্রে কোন সামাজিক প্রশ্ন তুলিতে চাই না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভাল কি মন্দ, কি বর্ণাশ্রম আবার নূতন করিয়া, আমাদের বর্ত্তমান স্বাভাবিক অবস্থার অনুযায়ী করিয়া গঠিত করা উচিত কি না, তার কোন কথাই এ ক্ষেত্রে উঠিতে পারে না। আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, গড়িয়া তুল। কিন্তু তাহার আগে যাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, সেই প্রাণ-হীন জিনিসটাকে টানাটানি করিয়া, মিথ্যা অহঙ্কারের ও অভিমানের সৃষ্টি কর কেন? এখন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে, এই যে দেশের কাজ, তাহা হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া না করিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভিমান এই কার্য্যের অন্তরায়, আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। যাহারা বর্ত্তমান দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একেবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই বাঙ্গালা দেশের একাধারে রক্ত, মাংস, প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে, কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুকুরের মত তাড়াইয়া দিই? এত অহঙ্কার কিসের? এত দাম্ভিকতা কেন? আমরা—যাহারা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আস্ফালন করি, সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্ম্মের যে মর্ম্মস্থান, সেখানে ছুরিকা আঘাত করিতেছি। এমনই আমাদের মোহ, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না—বুঝিয়াও বুঝিব না? বর্ণাভিমান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইব? ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান! সাবধান! ওঠ! জাগ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জ্জন কর! ঐ যে বাঙ্গালী কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গালার মাঠে মাঠে আপনার কাষ ও আমাদের কাষ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে, বাঙ্গালার গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী! মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসী! তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, জাগাও! তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! আততায়ী! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও! বল, এস ভাই, তুমি মুসলমান হও, খৃষ্টীয়ান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি, এ যে আমার কাজ—এ যে তোমার কাজ, এ যে মায়ের কাজ! একবার তবে ডাকার মত ডাক, দেখিবে, সকলেই আসিবে,

দেখিবে, সকল কার্য্যই সার্থক হইবে! আমি আবার বলি, উঠ, জাগ, ডাক। আপনার কল্যাণকে জাগাও!

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—
—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

একসঙ্গে কাজ করিতে হইবে, কিন্তু কি প্রণালীতে কাজ করিব? আমাদের সরল জীবন অনেকটা জটিল হইয়াছে। তাই নিয়ম চাই—প্রণালী চাই। আমাদের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে সমস্ত বাঙ্গলা দেশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইতে হইবে, সে ভাগ নূতন করিয়া করিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশটাকে জেলায় জেলায় ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের কাজ চলিবে। এই প্রত্যেক জেলায় একই রকম নিয়ম, একই রকম প্রণালীতে কাজ করিতে হইবে। আমি একটি জেলা আমার মনে রাখিয়া এই কার্য্যপ্রণালীর কথা বিচার করিতেছি। আপনারা মনে রাখিবেন, এই একই কার্য্যপ্রণালী সমস্ত জেলাতেই চালাইতে হইবে। প্রত্যেক জেলাতেই অনেকগুলি গ্রাম আছে। জনসংখ্যা ও কার্য্যের সুবিধা অনুসারে, কতকগুলি গ্রাম লইয়া, এক একটি পল্লী বা গ্রাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সব গ্রামের ১৬ বছরের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই সমাজভুক্ত হইবে। তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচ জন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করিবে। এই পঞ্চায়েতের উপর ঐ সকল গ্রামসমূহের সকল কার্য্য—সকল শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে। তাঁহারা গ্রামের পথ-হাটের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামের স্বাস্থ্য কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। তাঁহারা এই সকল গ্রামে আমাদের দেশের যে সকল যাত্রা, গান ইত্যাদির কথা বলিয়াছি, সেই সব আবার চালাইতে চেষ্টা করিবেন। যে নৈশবিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছি, তাহা তাঁহারাই স্থাপন করিবেন। চাষাকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে সকল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারাই আবশ্যকীয় নূতন পুষ্করিণী খনন করাইবেন ও পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করাইবেন। সমস্ত গ্রামগুলি যাহাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিবেন। চাষারা যাহাতে বারো মাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে পারে, ও অন্যান্য কি কি শিল্প-পণ্যও প্রস্তুত করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া, এই সব কার্য্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পল্লী-সমাজ প্রতিপল্লীতে একটি সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষামাত্রেই সেই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হইতে কিছু কিছু করিয়া ধান্য দিবে। পল্লী-সমাজ সেই ধান্যাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজের জন্য ধান্যের অভাব হইবে, তখন পল্লীসমাজ, চাষাদের প্রয়োজনমত হিসাব করিয়া ধার দিবেন পরে আবার ফসল হইলে তাহারা সেই পরিমাণ ধান্য ধান্যাগারে পূরণ করিয়া দিবে।

এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন কলহ অথবা ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন এবং বড় বড় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দ্দমা তদন্ত করিয়া সবডিবিসন ও জেলার আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সেই তদন্ত-বিবরণই সব আদালতে নালিশ ও আর্জ্জী বলিয়া গৃহীত হইবে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে অন্য নালিশ বা আর্জ্জী গৃহীত হইবে না।

এইরূপে প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যা অনুসারে

২০টি ২৫টি পল্লীসমাজ থাকিবে. এই প্রত্যেক পল্লী-সমাজ পাঁচ জন পঞ্চায়েত ব্যতীত, জেলা-সমাজের জন্য জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশটি পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই পল্লী-সমাজের নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জেলা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী-সমাজ এই জেলা-সমাজের অধীনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই জেলা-সমাজ—

(১) সেই জেলাভুক্ত সকল পল্লীসমাজের কার্য্য তদন্ত করিবে।

(২) সকল পল্লীসমাজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী, তাহার শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবে।

(৩) কৃষিকার্য্য ও কুটীর-শিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

(৪) সকল পল্লীসমাজের অধীনে সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী, তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলা-সমিতির অধীনে থাকিবে।

(৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোটখাট ব্যবসা চালাইয়া দিবে।

(৬) গ্রামে গ্রামে আবশ্যকীয় চৌকীদার নিযুক্ত করিবে। এই চৌকীদারগণ পল্লীসমাজের পঞ্চায়েতের অধীনে ও জেলা-সমাজের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবে।

(৭) জেলার সাধারণ পুলিসের ভার জেলা-সমাজের হাতেই থাকিবে।

(৮) সেই জেলার যে সব আইনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, তাহা জেলা-সমাজের হাতে থাকিবে না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে হাইকোর্টের অধীনে থাকিবে।

(৯) এই জেলা-সমাজের সভ্যসংখ্যা জেলার জনসংখ্যা অনুসারে দুই শত হইতে পাঁচ শত পর্য্যন্ত হইবে।

(১০) এই জেলা-সমাজ এক জন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে, এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা-সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(১১) জেলার কৃষিকার্য্য কুটীরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, অর্থের সুবিধার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই একটি একটি করিয়া থাকিবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে ভাল করিয়া চলিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষারা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে, এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা চলিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) জেলা ও পল্লী-সমাজের কোন কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না।

(১৩) জেলা-সমাজ ও পল্লী-সমাজের সকল কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য ট্যাক্স করিয়া আবশ্যকীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলা-সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১৪) পল্লী-সমাজ ও জেলা-সমাজের এই সমস্ত কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্যকীয় আইন করিতে হইবে।

(১৫) এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে, এখন যে সব Local Board ও District Board আছে, তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(১৬) এই জেলাসমাজকে আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিতে হইলে জেলার Magistrate-এর এখন যে ক্ষমতা আছে, তাহার আবশ্যকীয় পরিবর্তন করিতে হইবে।

(১৭) এই জেলা-সমাজ-সমূহকে বঙ্গীয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহাতে আরও অনেক জিনিস সন্নিবেশিত করিতে হইবে। আমি শুধু মোটা মোটা কথাগুলির উল্লেখ করিয়াছি।

এই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য না করিলে, আমাদের সিদ্ধিলাভ করা একেবারে অসম্ভব। আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইলে, ইহাই একমাত্র উপকরণ। আমি ইহাকে Home Rule বলিতে চাহি না, স্বরাজ বলিতে চাহি না, স্বায়ত্তশাসন বলিতে চাহি না। আমাদের দেশে আপনার কাজ আপনি করিয়া লইবার যে পুরাতন প্রথা ছিল, আমি সেই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াই এই কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকৃত করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি ও সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের আপামর সাধারণের আপনার আবশ্যকীয় কাজ আপনি করিয়া লইবার কৃতিত্ব বা ক্ষমতার আবশ্যক, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে যাহাদের অশিক্ষিত বলিয়া এতাবৎ তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের জীবনের মধ্যে একটা বড় সভ্যতা সাধনা আছে। আমাদের চাষারা যতই মূর্খ নিরক্ষর হউক না কেন, তাহারা আপনাদের ভাল-মন্দ বিচার করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। আর যদি কোন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহার ব্যবস্থা ত এই কার্য্য-প্রণালীর মধ্যেই আছে।

আমি যে বলিলাম যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া এই কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছি, সেই কথাটি আর একটু বুঝাইয়া বলি। আমাদের দেশে রাজার কর্ম্মক্ষেত্র অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা কর লইতেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কায আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবনযাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।

আমি যে পল্লী বা গ্রাম্য-সমাজের কথা বলিয়াছি, তাহা আগেও ছিল। আমি যে নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াছি, তাহা আগে হয় ত অব্যক্ত ছিল, আমি তাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই। আগে আমাদের জীবন আরও অনেক বেশী সবল ছিল, যে পঞ্চায়েতের কথা আমি বলিয়াছি, তাহা পুরাকালে গ্রাম্য-সমাজের মধ্যে যেন আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠিত। পল্লী-সমাজের যে পঞ্চায়েত, তাহা এমন পাঁচ জনেই হইতেন, যাঁহাদের উপর পল্লীসমাজের দৃষ্টি সহজভাবে আপনা আপনিই পড়িত। পল্লীবাসীদের মধ্যে যে প্রীতি জাগরিত ছিল, তাহা কোন কথা না বলিয়া, কোন আড়ম্বর না করিয়া যেন নিঃশব্দে অলক্ষিতে সেই পাঁচ জনকে দেখাইয়া দিতেন। সেই পাঁচ জন পঞ্চায়েতের অধিকার, স্বভাবগুণে সহজভাবে আকর্ষণ করিতেন ও পল্লী-সমাজবাসীরা সেই একই স্বভাবগুণে, সেই একই প্রকার সহজ সরলভাবে সেই অধিকার মানিয়া লইত। আমি যে সব কার্য্যের কথা বলিয়াছি, বিনা নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত সেই পঞ্চায়েত সেই সব কার্য্যই করিত। জমীদারের কাছে আবেদন করিয়া পুকুর কাটাইয়া সংস্কার করিয়া লইত। সহজভাবে শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিত, পল্লী-সমাজভুক্ত গ্রাম সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্য মিষ্ট কথা বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া করাইয়া লইত।

পল্লী-সমাজের কোন চেষ্টা, কোন কার্য্য তাহাদের অমতে, কি তাহাদের সাহায্য না লইয়া হইতে পারিত না।

এই যে অব্যক্ত নির্ব্বাচন, ইহাও গ্রামবাসীদের বাক্যহীন মতের উপরই নির্ভর করিত। আমরা এখনও কথায় কথায় বলি, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল.' এই কথার তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ পল্লী-সমাজ যাহাকে না মানিবে, সে মোড়ল হইতে পারিবে না। এই যে তখনকার 'মানা' ও এখনকার আমার প্রস্তাবিত 'নির্ব্বাচন', এই দুইয়ের মধ্যে কোন স্বাভাবিক পার্থক্য বা বিরোধ আছে কি? আমি তাই বলিতেছিলাম, এই যে অব্যক্ত নির্ব্বাচন আমাদের দেশে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছিল, আমি আজ তাহাকে ব্যক্ত করিয়া তুলিতে চাই। ইহা একেবারেই বিদেশী নয়, সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী। ইহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত নিজস্ব সামগ্রী।

তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই কেন?—যে পল্লী-সমাজ ছিল, তাহাকে ছাড়িয়া জেলাসমাজ করিতে চাই কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। আমাদের জীবন যে পরিমাণে সহজ সরল ছিল, সে পরিমাণে আর সহজ সরল নাই। অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের সঙ্গে জেলার একটা স্বাভাবিক যোগ হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে নানাপ্রকার কার্য্যকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া গ্রামের লোক অনেকে জেলার সবডিবিসনে, সহরে ও রাজধানীতে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই পুরাকালে যেখানে পল্লী-সমাজই জীবনের কেন্দ্র ছিল, এখন জেলার রাজধানী সেই কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছে তাই সমস্ত জেলাকে একটা বড় পল্লী-সমাজ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত পল্লী-সমাজগুলি এই কেন্দ্র-সমাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদের হস্তে এত ক্ষমতা দিবেন কেন?—একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, আমি ত বেশী ক্ষমতার দাবী করি নাই, আমাদের নিজের ঘরের কাজ যদি না করিতে পারি, তবে আমরা কোন্ কাজে লাগিব? যদি তাঁহারা বলেন, আমরা এ কার্য্যের উপযুক্ত নাই—তবে আমার উত্তর এই যে, তোমাদের অধীনে দেড়শ' বছর থাকিয়া, আমাদের এ ক্ষমতা যদি না জাগিয়া থাকে, তবে কি কোন কালে এই ক্ষমতা জাগিবার কোন সম্ভাবনা আছে? আমি ত কোন নূতন ক্ষমতার কথা বলিতেছি না, যে ক্ষমতা আমাদের চিরকাল ছিল, তাহাকে একটু বাড়াইয়া, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার অনুযায়ী করিয়া, সেই ক্ষমতাই আমি বাঙ্গালার মহাসভায় দাবী করিতেছি। ইহা ন্যায্য, ইহা ধর্ম্মসঙ্গত। কোন্ মুখে এখন তোমরা বলিবে যে, আমরা এই ক্ষমতা ব্যবহার করিবার নিতান্ত অনুপযুক্ত? আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার পরিবর্ত্তন বা পরিসর এই ক্ষেত্রে চাহিতেছি না। সে দাবী যখন করিতে হইবে, তখন করিব। আমি সমস্ত বঙ্গের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছি না। বঙ্গের ব্যবস্থাপক-সভা ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা তোমরা এখন যে রকমে চালাইতেছ, সেই রকমেই চালাও। আমি আজ সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না, আমি শুধু এই চাহিতেছি, যাহা আমাদের নিতান্ত ঘরকন্নার কাজ, সে কাজ করিবার অধিকার না দিলে আর চলে না। তোমাদের মুখেই শুনি যে, আমাদের ক্রমবিকাশের উপায় তোমরা করিয়া দিবে। সে কথা যদি সত্য হয়, আজ তাহার প্রমাণ দাও। আমরা Zulus নই, Hottentots নই, আমরা সভ্য জাতি। যে কাজ আমরা চিরকাল আপনা-আপনি করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহা একটু বাড়াইয়া করিতে পারিব না কেন?

আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমাদের যিনি রাজা,

এই ক্ষমতাটুকু আমাদের হস্তে দিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে বা হইতে পারে। তিনি আমাদের দেশে আসিয়া যে আশার বাণী বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা আশান্বিত হইয়া আছি। আমাদের এই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন না করিলে, আমাদের যে সব দিকে সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া, হিসাব করিয়া আমরা আজ এই দাবী করিতেছি। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, বিলাতের পার্লামেণ্টের মহাসভায় ইহাতে কোন আপত্তি হইবে বা হইতে পারে। রাজার আপত্তি নাই, পার্লামেণ্টের আপত্তি হইবে না, কিন্তু এ দেশে যাঁহারা আমাদের রাজার গোমস্তা, যাঁহারা এ দেশের রাজকার্য্য পরিচালনা করেন, তাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে। যেটুকু ক্ষমতা আমরা চাহিতেছি, সেটুকু এখন যে তাঁহাদের হাতে। মানুষের স্বভাবই যে, নিজের ক্ষমতা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। কি আপত্তি তাঁহারা তুলিবেন, আমি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু সব বিষয়েই ওজর-আপত্তি তোলা সহজ এবং তর্কে সেই ওজর-আপত্তির প্রতিষ্ঠা করা আরও সহজ। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে এমন কোন ইংরাজ কি আছেন, যিনি বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারিবেন যে, আমরা বাস্তবিকই এইটুকু ক্ষমতারও অধিকারী নহি?

তাঁহারা হয় ত বলিতে পারেন—আমি দুই একখানা ইংরাজী কাগজে এই মর্ম্মের কথা পড়িয়াছি, যে দেশে এনার্কিষ্ট অত্যাচারের এত প্রাদুর্ভাব, সে দেশে জনসাধারণের হাতে এই ক্ষমতা দিলে তাহার অপব্যবহার হইবে। এই কথা শুধু বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রথমে সত্য বা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই কথার বাস্তবিক কোন অর্থ নাই। প্রথমেই আমাকে বলিতে হয় যে, যাহাদের এনার্কিষ্ট বল, তাহারা বস্তুতঃ পক্ষে এনার্কিষ্ট নহে। তাহারা রাজদ্রোহী, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা আইনের কাছে অপরাধী, সুতরাং দেশের রাজশক্তিকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহাদের শাসন ও দণ্ড অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই শাসনের সঙ্গে সঙ্গে কি কারণে এই যুবকবৃন্দ রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে এই শাসন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইবে না। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, আমার বিশ্বাস হয় যে, আমাদের দেশে এমন কোন এনার্কিষ্ট নাই, যে সত্য সত্যই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিতে চাহে। তবে তাহারা কেন রাজবিদ্রোহী হইল? এই প্রশ্নের উত্তর কি ইহাই নহে যে, স্বদেশী আন্দোলনের পরে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের মনে ও প্রাণে দেশের জন্য কাজে লাগিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে? অর্দ্ধোদয় যোগের সময় কলিকাতা সহরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহারা যথার্থ কার্য্য করিবার যে ক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছে, তাহা আমাদের রাজকর্ম্মচারীরা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। সেই দিন যখন দামোদরের বন্যায় অনেক গ্রাম, অনেক সহর ভাসিয়া গিয়াছিল, আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া সেই সব বন্যাপীড়িত নিরাশ্রয় গ্রামবাসীদিগের যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে কি তাহাদের দেশের জন্য কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই? এই যে একটা প্রবল কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা, ইহা স্থায়িভাবে দেশের কোন কাজে লাগিতেছে? আমার মনে হয়, এই কাজ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও কাজে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদিগের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব—একটা নৈরাশ্যের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাজদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা ও সেই নৈরাশ্যেরই

কর! আমি আগেই বলিয়াছি যে, ইহাদের শাসন অবশ্য কর্ত্তব্য। অপরাধীর দণ্ড না হইলে রাজত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই অপরাধের যে মূলীভূত কারণ, তাহাও দূর করিতে হইবে। তাহাদের মনের এই বিশ্বাস যে, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের স্বাধীনভাবে দেশের কল্যাণের জন্য কোন কার্য্য করিবার সুযোগ দিবেন না, সেই বিশ্বাস একেবারে দূর করিতে না পারিলে এই যে রাজদ্রোহের সূচনা, তাহাকে নির্ম্মূল করা যাইবে না। তাহাদের গালাগালি দেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক; কিন্তু শুধু গালাগালি দিলে ও দণ্ড দিলেই ত ব্যাধি আরোগ্য হয় না।

যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আরও কঠিন শাসন না হইলে এই ব্যাধির শান্তি হইবে না, তবে যাহারা এই ব্যাধিগ্রস্ত, তাহাদেরই শাসন কর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণকে দেশের কাজে লাগাইয়া এই ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা কর। দেশে রাজদ্রোহের সূচনা হইয়াছে বলিয়া দেশের লোককে দেশের কাজ করিতে না দিলে, সেই রাজদ্রোহেরই পথ প্রশস্ত হইবে। তাহাতে তোমাদেরও অমঙ্গল, আমাদেরও অমঙ্গল। কিন্তু তোমাদের যতটা ক্ষতি না হউক, আমাদের একেবারে সর্ব্বনাশ—এই নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আজি এই সমগ্র বাঙ্গালার মহাসভায় সভাপতিস্বরূপ আমি যুক্তকরে তোমাদের নিকট এই নিবেদন করিতেছি যে, আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে আমাদের দেশের গণ্যমান্য লোক যাহাদের উপর দেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি আছে, এমন কয়েকজনকে লইয়া একটা ছোট কমিটী করিয়া দেও। তাঁহারা দেশের এই রাজদ্রোহ-সূচনার যে যথার্থ কারণ, তাহা অনুসন্ধান করুন এবং এই রাজদ্রোহিতা দূর করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করুন। আমার বিশ্বাস হয় না যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী এমন কেহ আছেন, যিনি একটু তলাইয়া অনুসন্ধান করিলে আমার মত খণ্ডন করিতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠিতে পারে। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, রাজদ্রোহিতার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের অনেক লোকেরই সহানুভূতি আছে। এ কথাও তাঁহাদের বুঝিবার ভুল। এই রাজদ্রোহী যুবকদের দুইটা দিক্ আছে। আমাদের এই নবজাগ্রত জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য ও দেশের কার্য্য নিজের হাতে করিবার জন্য তাহাদের যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই তাহাদের একটা দিক্। আমাদের বাঙ্গালার জনসাধারণের সেই দিক্ দিয়াও সেই কারণে তাহাদের সহিত সহানুভূতি আছে। আবার, দেশের কাজে লাগিতে পারিতেছে না বলিয়া পথভ্রান্ত হইয়া যে কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত হইতেছে এবং শত প্রকারে রাজার কাছে এবং দেশের কাছে যে সব অপরাধে তাহারা অপরাধী হইতেছে, সেই দিক্ দিয়া তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণের কোন সহানুভূতি নাই। আমাদের রাজপুরুষদের এই ভুল বুঝিবার যে কারণ নাই, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা মনে হইতে পারে,—একটু অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলে ইহা আরও বেশী মনে হইতে পারে যে, এই সব রাজদ্রোহী যুবকদের সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের একটা যোগ আছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের সঙ্গে একটা সহানুভূতি আছে। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া তলাইয়া দেখিলেই ভুল ধরা পড়িবে। এই ভুল বিশ্বাসের কারণ কি? ইহার বাস্তবিক কারণ কি ইহা নহে যে, আমাদের দেশের লোকই বিশ্বাস করেন যে, এই সব যুবকদিগের প্রাণ আছে, দেশের প্রতি একটা

প্রাণস্পর্শী মমতা আছে এবং দেশের কাজ করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে? এবং সেই কারণেই তাঁহারা মনে করেন যে, তাহাদের একেবারে ধ্বংস না করিয়া, তাহাদের মুখ ফিরাইয়া, মতি-গতি বদলাইয়া যথার্থ দেশের কাজে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। আমি যাহা বলিলাম, হয় ত আমাদের অনেকেই তাহা সাহস করিয়া স্বীকার করিবেন না! কিন্তু অযথা তর্ক না করিয়া যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহারা রাজদ্রোহী, তাহাদের মতি-গতি ফিরাইয়া তাহাদের যে দেশ-বাৎসল্য, তাহা দেশের কাজে লাগাইয়া দিবার জন্য যে বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, তাহা রাজদ্রোহিতার সঙ্গে সহানুভূতি নহে, তাহা রাজদ্রোহকে কোনমতেই সমর্থন করে না, বরং তাহা যথার্থ রাজশক্তি সহায় এবং রাজদ্রোহের স্বভাববিরুদ্ধ। এই কথা তলাইয়া না বোঝাই আমাদের রাজপুরুষদিগের ভুল এবং সত্য কথা খুলিয়া বলিয়া আমাদের রাজপুরুষদের সাহায্য না করাই আমাদের ভুল। যাহা সত্য, তাহা স্বীকার করিবার সাহস যদি আমাদের না থাকে, তবে কেমন করিয়া আমরা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যে ব্রত, তাহা উদ্‌যাপন করিব?

আর একটা তর্ক উঠিতে পারে, তাহারও বিচার আবশ্যক। আমাদের রাজপুরুষেরা ইহাও বলিতে পারেন যে হিন্দু-মুসলমানে ভাব নাই, হিন্দুদের মধ্যে বর্ণে বর্ণে প্রীতি নাই, এই অবস্থায় সমস্ত হিন্দু ও হিন্দু-মুসলমানে একত্র হইয়া একযোগে কাজ করা অসম্ভব। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভেদজনিত যে বাদ-বিসংবাদ, তাহা একত্রে কার্য্য না করিতে পারিয়া আরও বাড়িয়া যাইতেছে। যে কাজ সকলের আবশ্যকীয় ও সকলের মঙ্গলপ্রদ, সেই কাজ একত্র করাই মিলনের প্রশস্ত উপায়। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাস্তবিক কোন অসদ্ভাব নাই। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে ত একেবারেই ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েকজন স্বার্থপর ব্যক্তির প্ররোচনায় একটা অসদ্ভাব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র; সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রামের ভিতর গিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমার কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। আমি দেখিয়াছি, মুসলমান ও হিন্দু চাষাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। দাদা, চাচা, মামু বলিয়া তাহারা পরস্পরকে সম্বন্ধ-সূত্রে বান্ধিয়া লইয়াছে। তাহারা একই রকম কাজ করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং আচার-ব্যবহার একই রকম। নিজ নিজ বিশিষ্ট ধর্ম্মের একটা পার্থক্য শুধু বাহিরের দিকে—তাহাদের জাতিগত যে ঐক্য, তাহার অন্তরায় হয় নাই। সুতরাং এই যে বর্ণগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্য, তাহা আমাদের একত্র হইয়া কাজ করিবার কোন বাধা জন্মাইবে না। বরং একত্র হইয়া কাজ করিলেই বাহ্যিক পার্থক্য ক্রমে হ্রাস হইয়া আন্তরিক মিলন আরও সত্য, আরও জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

আর একটি আপত্তির কথা আমি শুনিয়াছি। সেটা এই। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে বলেন, যে কার্য্যপ্রণালীর কথা আমি বলিয়াছি, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ফলদায়ক করিতে হইলে প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কি সবডিবিসনের হাকিমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। আমি সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। হয় ত এই সব রাজকর্ম্মচারীদের আমাদের দেশের কাজের সঙ্গে যোগ থাকিলে, এই কাজগুলা বর্ত্তমানে—শুধু বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—আরও ভাল করিয়া সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা যে দাবী করিতেছি, তাহার মূল মর্ম্ম এই যে, আমরা চিরকাল নিজেদের কার্য্য নিজেরাই করিয়াছি এবং সেই একত্র কার্য্য করিবার যে স্বাভাবিক অভ্যাস, তাহা আবার

জাগরিত করিতে চাই। এই সব ছোট-খাট কাজে তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে আঠার মত লাগিয়া থাক, তবে আমাদের কোন কার্য্যেরই স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হইবে না এবং নিজের কাজ নিজে করিবার যে মর্য্যাদা, তাহা হইতে আমরা চিরকালের জন্ম বঞ্চিত হইব। কাজ একটু খারাপ হওয়া ভাল, কিন্তু নিজের কাজ পরে করিয়া দিলে সব কাজই বিফল হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন নিজের উপায় নিজে করিবার, নিজের পায়ে দাঁড়াইবার একটা গৌরব আছে এবং তাহাতে যেমন ব্যক্তির জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয়, সেইরূপ জাতীয় জীবনেও নিজেই পায়ে দাঁড়াইয়া নিজের কার্য্য নিজে করিলে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইলে তাহার সার্থকতা কোথায়? আমাদের মরণ-বাঁচন, শুভাশুভ, আমাদের নব-জাগ্রত জাতির যে জীবন এই কার্য্যপ্রণালীর উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের যে দাবী, তাহা ন্যায়ের উপর; আমাদের ধর্ম্ম তোমাদের ধর্ম্ম, সকলের ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরাই বারে বারে বলিয়াছ যে, আমাদের জীবনকে পুষ্ট করাই তোমাদের উদ্দেশ্য। আমাদে জাতীয় জীবন পুষ্ট করিবার যে এই একমাত্র উপায়, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজি এই সামান্য দাবী পূরণ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন যদি তোমরা আমাদের এই দাবী পূরণ না কর, তবে তোমাদের মুখের কথার উপর আর আস্থা রাখি কি করিয়া? আর তোমাদের কথার উপর যদি আমরা বিশ্বাসস্থাপন করিতেই না পারি, তবে আমরা বাঁচিয়া কি করিব?

এই যে আপনার কাজ আপনি করিবার অধিকার, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই একটি বড় বড় কথার আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা যে শুধু আমাদের ঘরকন্নার কাজ করিতে চাই, তাহা নহে। সমস্ত দেশরক্ষার যে ভার, তাহারও অংশ লইতে চাহি। বোম্বাই-কংগ্রেসে সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আমাদের সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করিবার সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, সেই কথা আমাদের দেশের সকলেরই মর্ম্মের কথা। আমাদের চোখ ফুটিয়াছে। তোমরাই চোখ ফুটাইবার সাহায্য করিয়াছ। এখন জগতের যে দিকে চাই, দেখিতে পাই, সকল দেশেই দেশবাসীরা অস্ত্রধারণ করিয়া দেশ-রক্ষা করিতে প্রস্তুত। আমাদের অস্ত্রধারণ করিবার যে অধিকার নাই, ইহাতে কি আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে বেদনা অনুভব করি না? অস্ত্রধারণ করিবার অধিকার আমাদের না দিলে এই যে নব জাগ্রত দেশবাৎসল্য, ইহার কি অপমান করা হয় না? এই অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করার কি কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? সকল দেশেই অস্ত্রধারণ করিবার অধিকার আছে। আমাদের থাকিবে না কেন? অস্ত্রধারণ সম্বন্ধে আইন রাখিতে হয় রাখ, কিন্তু সেই আইন জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে চালাইয়া দিও। তাহা না হইলে আমরা নিজেদের অপমানিত মনে করিব। সেই অপমানের উপর কোন সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। যেকূলে যে আমাদিগকে অপমান করিয়া গিয়াছে, সে কথায় যে এক দিন আমরাও বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমরা করিয়াছি, এখনও করিতেছি। তোমরা যে এক দিন ঐ কথা বলিতে দিয়াছিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। বাঙ্গালী যে কাপুরুষ, সে ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের নাই, তোমাদেরও নাই। এম্বুলেন্সকোর সম্বন্ধে বাঙ্গালী যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইও না। সে দিন যে বাঙ্গালীর ডবল কোম্পানীর সৃষ্টি করিবার মনস্থ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিলে, ভাবিয়া দেখিও, সে দিন বাঙ্গালীকে কি কঠিন পরীক্ষার ভিতর ফেলিয়াছিলে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে বাঙ্গাদিগকে কোন দিন

অস্ত্রধারণ করিতে দেও নাই, যাহাদিগকে কোন প্রকারে সমরশিক্ষা দেওয়া উচিত বিবেচনা কর নাই, যাহাদিগকে সৈনিকের কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত মনে করিয়া সকল সামরিক চেষ্টা হইতে বহুদূরে রাখিয়াছিলে এবং যাহাদের মধ্যে এই অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ একই কথা বলিয়া যে একটা ভূতের বিশ্বাস জাগাইয়া দিয়াছিলে এক দিন হঠাৎ সেই বাঙ্গালীকেই সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিলে! যদি আমরা সেই আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিতে না পারিতাম, তবে কি চিরকাল তোমরা বলিতে না যে, বাঙ্গালী অনুপযুক্ত? তাহাদের অস্ত্রধারণের কোন অধিকার নাই, তাহাদের জন্য সৈনিক বিভাগে কোন স্থানই হইতে পারে না? আমরা ত তাহাই বুঝিলাম। অশেষ কষ্ট করিয়া, অশেষ যত্ন করিয়া ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিলাম। এই যে কঠিন পরীক্ষার ভিতর আমাদিগকে ফেলিয়াছিলে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। বাঙ্গালা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সে সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ও অধিকারী। এখন অস্ত্র-ধারণের অধিকারে আমরা দাবী করিতে পারি। এখন জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সম-অধিকারে আমরা সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতে পারি। সৈনিকবিভাগে দেশী ও বিদেশীয়দের মধ্যে যে একটা পার্থক্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ, তাহা তুলিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। ইংরাজ যে কমিশন পাইবে, বাঙ্গালী সে কমিশন পাইবে না কেন? লেফ্‌টানেণ্ট, ক্যাপ্‌টেন, করনেল্‌ হইবার ক্ষমতা শুধু ইংরাজের থাকিবে কেন, আমরা চিরকালই জমাদার হাবিলদার থাকিব কেন? মনে রাখিও, যে লালপল্টনেরও সাহায্যে তোমরা এক দিন বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলে, সে লালপল্টন বাঙ্গালী। যদি যোগ্যতার কথা বল, আমি ত যোগ্যতারই পরীক্ষা চাই। কিন্তু সেই পরীক্ষা সমভাবে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে করিতে হইবে। আমরা বিচারের প্রার্থী, পরীক্ষার প্রার্থী। আমরা অনুগ্রহের ভিখারী নহি।

এই যে সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করিবার আমাদের এত আগ্রহ কেন, তাহা যদি শুনিতে চাও, তবে খুলিয়া বলি। এই যে জাতিতে জাতিতে মহাসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংঘর্ষের মধ্যে যে কে শত্রু, কে মিত্র, বুঝিয়া উঠা কঠিন। আজি যাহারা মিত্র, কালই তাহারা শত্রু হইয়া উঠিতে পারে। আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, জাপান পণ্যদ্রব্য দিয়া আমাদের দেশ ভরিয়া দিতেছে। দলে দলে জাপানী আসিয়া আমাদের সহরে বাস করিতেছে। এই যুদ্ধের ফলে তাহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস। এই ভীষণ সময়ে জাপান যে আমাদের মিত্র, তাহা ত একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। জাপান ত জার্ম্মণীর শিষ্য। কে বলিতে পারে যে, এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে আবার জাতির সংঘর্ষে নূতন করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত হইবে না? কে বলিতে পারে যে, সেই সময়ে জাপান আমাদের শত্রু হইবে না? আবার যদি সমরানল প্রজ্বলিত হয়, কে জানে, রুসিয়া কোন্‌ দিকে থাকিবে? আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালী জাপানকে চায় না, জার্ম্মাণীকেও চায় না, রুসিয়াকেও চায় না। বাঙ্গালী তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া তাহার দেশরক্ষার যে ভার, সেই বোঝার ভারের অংশ মাথায় তুলিয়া লইতে চায়। তাই বাঙ্গালী অস্ত্রধারণের অধিকার চায়,—তাই বাঙ্গালী সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতেছে। এই যে বাঙ্গালীর আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে তাচ্ছীল্য করিও না, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিয়া ইহাকে অপমানিত করিও না।

বাঙ্গালীর আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আর একটা কথা বলি। কলিকাতাতে আজিকালি বাঙ্গালী বালকদের

ভবিষ্যতে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা হইতেছে, ইহাকে পোষণ করা আমাদের ও আমাদের রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই Boy Scout Movement আমাদের স্কুলে স্কুলে সহরে সহরে ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাতে যে আমাদের বালকদিগকে ভবিষ্যতে সমরোপযোগী করিয়া তুলিবে, কষ্ট-সহিষ্ণু, শ্রম-সহিষ্ণু করিবে, দয়াদাক্ষিণ্য ও পরোপকারব্রত শিক্ষা দিবে এবং সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত পক্ষে মানুষ করিয়া তুলিবে।

আমরা যে শুধু অধিকার চাহিতেছি, তাহা ত নহে। সেই অধিকারের জন্য যে স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, আমরা ত তাহাতে কুণ্ঠিত নহি। বাঙ্গালীকে সমর-শিক্ষা দিবার জন্য এবং সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালী দরিদ্র হইলেও যোগাইতে প্রস্তুত। স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে আমরা কেমন করিয়া অধিকারের দাবী করিব?

এই যে প্রস্তাবিত সমর-ঋণ, ইহা কি আমাদের স্বার্থত্যাগের সত্য প্রমাণ নহে? যে যাহা পারে, সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। যে যত পারে, আরও সংগ্রহ করিয়া আনিবে। তোমরা ভাবিয়া দেখিও যে, শুধু অর্থের হিসাবে ইহাতে বাঙ্গালীর যথেষ্ট ক্ষতি। যে টাকা উঠিতেছে, তাহার অধিকাংশই ইংলণ্ডে কিংবা অন্য অন্য দেশে ব্যয়িত হইবে। ইহার খুব অল্প অংশই এ দেশের জনসাধারণের হাতে ফিরিয়া আসিবে। এই টাকার যে সুদ, তাহা আমাদের রাজস্ব হইতেই দিতে হইবে। সুতরাং শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাতে বাঙ্গালীর বিশেষ ক্ষতি। কিন্তু বাঙ্গালী ত কোন দিন কোন জিনিস শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখে নাই এবং দেখাও ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচনা করে না। শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে সব দিক্ দেখা হয় না। এই যে ইউরোপে ঘোর সমর চলিতেছে, ইহার সঙ্গে কি বাঙ্গালীর সুখদুঃখ জড়িত নাই? এই সমরে ইংলণ্ডের জয়লাভের উপর কি বাঙ্গালীর আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে না? এই সমর-ঋণে বাঙ্গালীর যাহা দেয়, তাহা যদি বাঙ্গালী সংগ্রহ করিয়া না দিতে পারে, তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিব? যেমন করিয়াই হউক, এই সমর-ঋণ প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিতেই হইবে। ইহাতে যে স্বার্থত্যাগের আবশ্যক, তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ইংরাজ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে এবং তাহার জন্য আমাদের চিরকালই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকা উচিত। এ কথা অনেকবার বাঙ্গালীর কাছেও শুনিয়াছি, ইংরাজের কাছেও শুনিয়াছি। ইংরাজ আমাদের দেশে আসিয়া যে একটি বিপরীত সভ্যতা ও সাধনার আদর্শ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে এবং সেই বাহিরের আঘাতেই যে আমাদের জাতীয় জীবনের নবপ্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি এবং চিরকাল স্বীকার করিব। এ দেশে ইংরাজের আগমন যে বিধির বিধান, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি এবং চিরদিনই করিব। ইংরাজের আগমন হইতে যে আমাদের দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতেছে ও হইবে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি ও চিরকাল স্বীকার করিব। এই কারণে আমার যে স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা, তাহা আমার চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে, কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার একটা দিক্ আছে, তাহা যেন ইংরাজ ভুলিয়া যায় না। এ দেশে আসিয়া রাজত্ব বিস্তার করিয়া কি ইংরাজের কোন লাভ হয় নাই? জগতের ইতিহাসে বাঙ্গালা দেশে আসিবার আগে ইংরাজের যে স্থান ছিল, এখনও কি ঠিক সেই স্থান? এই দেশের ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে কি ইংরাজের অবস্থার শত সহস্র গুণ উন্নতি হয় নাই? সমগ্র মানবসমাজে ইংরাজ

যে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কি বাঙ্গালার, সমস্ত ভারতবর্ষের কোন হাতই ছিল না? এই যে কৃতজ্ঞতা, ইহা কি শুধু আমাদেরই? ইংরাজের কৃতজ্ঞ হইবার কি কোন কারণ নাই? সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না কেন? এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, ইহাতে আমাদের ও তোমাদের পরস্পরের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমরা চিরকালই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি ও কার্য্যক্ষেত্রে সহস্র প্রকারের সেবা দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছি। তোমাদের যে কৃতজ্ঞতা, তাহার প্রমাণ আজি চাই। শুধু মুখের কথায় আর আমরা ভুলিব না। আমাদের যে নিজের হাতে নিজের কাজ করিবার নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না কর—এই সামান্য অধিকার যদি আমাদের না দাও, তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতার কোন অর্থ নাই।

তাই আজ তোমাদের কাছে আমার প্রাণের নিবেদন জানাইতেছি। যে কার্য্য করিবার অধিকার চাহিতেছি, তোমরা প্রাণে প্রাণে জান, সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। মনকে চোখ-ঠার দিও না। ভাবের ঘরে চুরি করিও না। বৃথা তর্ক করিয়া সত্যকে ঢাকিবার চেষ্টা করিও না। আজি আমাদের জীবন-চাঞ্চল্যকে শান্ত কর। আমাদের এই নব-জাগ্রত জীবনকে সমস্ত প্রাণ দিয়া মর্ম্মে-মর্ম্মে পোষণ কর। ঐ যে ইউরোপের সমরক্ষেত্রে চিতার আগুন জ্বলিতেছে, ঐ শ্মশান-ভস্মের উপর মিলন-মন্দির স্থাপন কর! হাত বাড়াইয়া আমাদের হাত ধর! তোমাদের ও আমাদের মিলন সত্য যথার্থ হইয়া উঠুক! তোমরাও ধন্য হও, আমরাও ধন্য হই এবং এই মিলনের যে যথার্থ বাণী, তাহা আপনাকে সার্থক করুক।

আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গালার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ-চিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ—সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তি-সঙ্গত, ন্যায়-সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সঙ্গত, আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গত, জগতের ধর্ম্ম-সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না. একবার এস, আমরা সকলে সমস্বরে বলি—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" একবার এস, আমরা হিন্দু,-মুসলমান, খৃষ্টীয়ান সমস্বরে বলি—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" একবার এস, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া সমস্বরে বলি,—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।"—সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে 'চাই', জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে! এস ভাই খৃষ্টীয়ান, খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই মুসলমান, তুমি আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই হিন্দু. তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল 'চাই!' ঐ যে মা ডাকিতেছে। এস এস, সবাই এস। সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লা. বল নারায়ণ, বল বন্দে মাতরম্।

[১৯১৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণ]

বিক্রমপুরের কথা

আজ আমি দু'একটি কাজের কথা বলিতে চাই। আপনারা হয় ত অনেকে ভাবিতে পারেন, আমি নিজেই কাজের লোক নই—সুতরাং কাজের কথা বলিবার আমার ক্ষমতা নাই, অধিকারও নাই। যখন আপনারা আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন,, তখন আমারও মনে ওই কথা জাগিয়াছিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, আমি কাজের লোক না হইলেও অনেক কাজের কথা জানি। ব্যবসাক্ষেত্রে আজ ২৩ বৎসরের মধ্যে অনেক কাজের লোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। কি করিলে দেশের উপকার হয়, কি করিলে আমাদের বিক্রমপুর আবার সেই পুরাতন গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারে, এই বিষয় অনেক আলোচনা করিয়াছি এবং একেবারে যে চিন্তা করি নাই, তাহাও নয়। তাই আজ আমার সকল ত্রুটি, সকল রকমের অক্ষমতা সত্ত্বেও আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপনাদের কাছে দু' চারিটি কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি।

প্রথম কথা বিক্রমপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে। বিক্রমপুরের সঙ্গে আমার নিজের জীবনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি নাই সত্য কিন্তু সে দোষ বিক্রমপুরের নয়, আমার নিজেরই। তবে যে দেশেই থাকি না কেন, যত বিদেশেই ঘুরিয়া বেড়াই না কেন, যখনই মনে করি, আমি বিক্রমপুরবাসী, তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব্ব অনুভব করি। বিক্রমপুর যে আমার শরীরের শিরায় শিরায় আমার অস্থিমজ্জাগত। বিক্রমপুরের শত শত কাহিনী যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছে। আমরা যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, আমরা বিক্রমপুরবাসী। এই যে ভাব, যাহা সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চিন্তা, সকল সাধনার মধ্যে আপনাকে জানাইয়া দেয়; এই যে স্মৃতি, যাহা ফুলের সঙ্গে জড়ান গন্ধের মত আমাদের জীবনে জড়াইয়া আছে; এই ভাব ও এই স্মৃতিকে সর্ব্বদা জাগ্রত দেবতার মত আমাদের হৃদয়-মন্দিরে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই দেবতাকে জাগ্রত করিতে হইলে তাহার সংস্কার আবশ্যক—আবার তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইতিহাস ইহার একমাত্র মন্ত্র। সে ধারা মাটির গর্ভে বালুর মধ্যে লুকাইয়া আছে—তাহাকে মাটী খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। অনেকে হয় ত বলিবেন, এ ত কাজের কথা নয়, এখন যে কাজের সময় আসিয়াছে; অতীত গৌরব লইয়া কি আমরা ধুইয়া খাইব? কিন্তু ইতিহাস ব্যতীত কোন কর্ম্মই সার্থক হয় না। পুরাকালে নাবিকেরা যেমন আকাশে ধ্রুবতারা দেখিতে না পাইলে তাহাদের অর্ণবপোত ঠিক দিকে চালনা করিতে পারিতেন না, আমরাও ঠিক সেইরূপ। আমাদের যথার্থ ইতিহাস যাহা, তাহাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি না করিতে পারিলে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে ঠিক দিকে অগ্রসর হইতে পারিব না। দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া বিপথে অপথে চলিয়া যাইব।

সমস্ত বাঙ্গালা দেশে একটা চিরন্তন বাণী আছে। বাঙ্গালা দেশের ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে অখণ্ড ইতিহাস, তাহা সেই বাণীকেই চিরকাল ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে ও চিরকাল করিবে। আমরা সকলেই বাঙ্গালী, সেই ইতিহাসের ধারা আমাদের সকলকেই স্পর্শ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। যেমন সমস্ত বাঙ্গালা দেশের একটা চিরন্তন বাণী আছে, আমাদের বিক্রমপুরে সেইরূপ একটা বাণী আছে। আমরা কান পাতিয়া তাহাই শুনিতে চাই। সে বাণী শুধু আমাদেরই জন্যে। কর্মক্ষেত্রে সে বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সে বাণী বুঝা চাই—শুনা চাই, তাহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা চাই। এই

ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমাদের দেশে অনেক চেষ্টা হইতেছে। এইখানে যোগেন্দ্র বাবু ও যতীন্দ্র বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা এ কাজ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এখনও আমরা সেই ইতিহাসের ধারাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে পারি নাই।

এই ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে চাই? শুধু গুটিকতক জমীদারের কাহিনী ও দু'একটি রাজার কীর্ত্তিকলাপের কথা শুনিয়া আমাদের কোন লাভ নাই।

প্রথমেই আমরা শুনিতে চাই, বিক্রমপুর কোথায় ছিল। চীন পরিব্রাজকের যে সমতট ভূমি, কোথায় তার আরম্ভ, কোথায় তার সীমানা। আমি কোন পরগণার কথা বলিতেছি না। সমস্ত বাঙ্গালা দেশের জীবনের মধ্যে যে বিক্রমপুর একটা সত্য অনন্ত-জাগ্রত জীবন-খণ্ড, আমি সেই বিক্রমপুরের কথা বলিতেছি। বিক্রমপুরের যে একটা বিশিষ্ট ভাব আছে, একটা স্বতন্ত্র প্রাণ আছে, যাহারা সেই ভাবে ও প্রাণে অনুপ্রাণিত, তাহাদের সকলের কথাই শুনিতে চাই। বিক্রমপুর সমাজের কথা শুনিতে চাই। বিক্রমপুরের গৌরব যাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিত, বিক্রমপুরের পাণ্ডিত্য যাহাদিগকে পণ্ডিত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া দিত, বিক্রমপুরের কারুকলা যাহাদিগকে রসের টানে বাঁধিয়া দিত, বিক্রমপুরের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার যাহাদিগকে এক সূত্রে গাথিয়া ফেলিয়াছিল,—তাহাদের কথা শুনিতে চাই। এই যে অখণ্ড জীবন-খণ্ড, তাহার বাণী শুনিতে চাই।

তার পর শুনিতে চাই—এই যে বৃহত্তর বিক্রমপুর, ইহার সমাজের ইতিহাস। কি করিয়া সমাজ বাড়িয়াছে; কি করিয়া ছোট হইয়াছে। এই সমাজে কত শত বিপ্লব বাধিয়াছে, কি করিয়া আবার সেই বিপ্লবের সমন্বয় হইয়া গিয়াছে। বর্ণভেদের উৎপত্তি এ দেশে কোথা হইতে; কেমন করিয়া হইল, সামাজিক জীবনে এই বর্ণভেদ-প্রথা কি উপকার ও কি অপকার সাধন করিয়াছে। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে এখানে বর্ণভেদ ছিল কি ছিল না; যদি থাকিয়া থাকে, তবে কেমন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার কেমন করিয়া, কি কি কারণে ফিরিয়া আসিল। আমাদের দেশে যাহাদিগকে 'পতিত জাতি' বলিয়া গণ্য করি, তাহারা কি করিয়া পতিত হইল; কেন তাহাদের 'পতিত' বলি, কেন তাহাদের জল চল নয়—এই সব কথা স্পষ্ট করিয়া শুনিতে না পাইলে কেমন করিয়া সমাজের সংস্কার সাধিত হইবে? বিদেশ হইতে কতকগুলি কথা আমদানী করিলেই সমাজ-সংস্কার হয় না—সে কথা যত উঁচু দরেরই হউক না কেন, তাহা সমাজের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না। যে পথে চিরকাল আমাদের সমাজসংস্কার হইত, সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। সমাজের ইতিহাস ধারাকে পাইলে সেই পথের সন্ধান পাইব।

তার পর সমাজের শিক্ষা দীক্ষার কথা শুনিতে চাই। কি করিয়া আমাদের সমাজের শিক্ষার বিস্তার হইত, আমরা শিক্ষা কাহাকে বলি,—সেই সব কথা খুলিয়া বলা চাই। আমি যখন অধ্যয়নের জন্য বিলাতে গিয়াছিলাম, সেই সময় আমাদের এক জন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, Bengal cultivators are a highliy civilised paople অর্থাৎ আমাদের চাষারা খুব সভ্য। এই সভ্যতার মূলে কি? কেমন করিয়া ক খ, আর নামতা না শিখাইয়াও, আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তার হইত, সে কথা স্পষ্ট করিয়া শুনিতে চাই। বিদেশীয় শিক্ষাপ্রণালী হয় ত আমাদের শিক্ষা-বিস্তারের উৎকৃষ্ট উপায় নহে। সে কথা না জানিতে পারিলে, না

বুঝিতে পারিলে, আমরা কেমন করিয়া শিক্ষা-বিস্তার করিব ? সে কথা শুনিতে পাইলে আমরা বুঝিতে পারিব, কেমন সুন্দর সরলভাবে আমাদের শিক্ষা-বিস্তার হইত। কবি-গান, যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন শিক্ষাবিস্তারের এইরূপ আরও কত কত উপায় ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা লাগিত না, বিপুল আয়োজনের আবশ্যক ছিল না, সহজে, অনায়াসে, বাগানে যেমন ফুল ফোটে, তেমনি করিয়া আমাদের দেশ যেন আপনা-আপনি আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইত। সে সব কথা লুপ্ত-প্রায়—ঐতিহাসিকদের কাছে সেই সব কাহিনী ভাল করিয়া শুনিতে চাই।

তার পর শিল্প-বাণিজ্যের কথা—আজকাল যাহাকে অর্থনীতি বলে—ইংরাজীতে যাহাকে Political Economy ও Economice History বলে—ঐতিহাসিকদের কাছে তাহার সব কথা শুনিতে চাই। কৃষিকার্য্য শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইবে, এ কথা আমরা সকলে বুঝি ; কিন্তু কি উপায়ে সে উন্নতিসাধন করিতে হইবে, তাহা কি আমরা ভাল করিয়া বুঝি ? আমরা সকলেই জানি, ইউরোপ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া এত বড় হইয়াছে এবং আমাদের সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে ; তাহা হইলেই আমরা বড় হইতে পারিব। আমাদের প্রথম উদ্যমে আমরা ইউরোপেরই নকল করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমাদের ইতিহাসের বাণীকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। ইউরোপের Industrialism'র যে কি ফল হইয়াছে, বিলাতে Socialism তাহার সাক্ষী। টাকার জোরে কেমন করিয়া যে মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে পারে, ইউরোপে বর্ত্তমান কালে "Strike" "combine," বা ধর্ম্মঘট এবং অন্যান্য অনেক ঘটনা তাহার প্রমাণ। ধনীর ধনবৃদ্ধি হইলেই দরিদ্রের ধন-বৃদ্ধি হয় না। দেশের আপামর সাধারণে যদি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন না করিতে পারিল, তবে "দেশের ধন" লইয়া দেশ কি করিবে ? এই Industrialism ইউরোপের পন্থা হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পন্থা নহে। আমাদের দেশের টাকার জন্যই টাকার আদর কখনই হয় নাই। অর্থ জীবনযাপনের উপায় মাত্র। আমাদের গ্রামে গ্রামে ধান ছিল, প্রচুর আহার্য্য ছিল, আমাদের জীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে শান্তিতে পূর্ণ ছিল। কি উপায়ে তাহা সাধিত হইত, ঐতিহাসিকদের কাছে সে সব কথা শুনিতে চাই। সেই উপায়ই আমাদের উপায়—সেই পথই আমাদের পথ। না বুঝিয়া শুনিয়া বিলাতী ঢংএর কলকারখানা চালাইতে আরম্ভ করিলে, আমরা শুধু ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইব। যত দূর জানা গিয়াছে, আমাদের পথ অতি সহজ সরল পথ ছিল। হেরডোটাস তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ অত্যাশ্চর্য্য দেশ—ভারতবাসীরা সমস্ত জগতের ধন লইয়া যায়, কিন্তু তাহার বদলে জগতে কিছুই ফিরাইয়া দেয় না। ইহার অর্থ কি ? আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা কৃষিকার্য্যের সময় জমী কর্ষণ করিত, অন্য সময় আপনাদের আবশ্যকীয় আহার্য্য ও পরিধেয় প্রস্তুত করিত এবং বাকী সময় প্রত্যেক ঘরে ঘরে সূতা ও অনেক অনেক শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী হইত। আমাদের যাহা আবশ্যক, তাহার জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী ছিলাম না, কিন্তু আমাদের শিল্প-দ্রব্য দিয়া আমরা বিশ্বজগতের হাটবাজার ভরিয়া দিতাম। এই রকম করিয়া আমরা জগতের ধনরাশি আপনার ঘরে তুলিতাম। আমাদের বিক্রমপুরে কত রকমের শিল্প-বাণিজ্য চলিত, তাহার সব কথা এখনো জানা যায় নাই। শুনিয়াছি, গ্রামে তুলার চাষ হইত, সূতা ও কাপড় তৈয়ারী হইত। আইনের কাগজ এখনো পাওয়া যায়। যে শঙ্খ-শিল্প এখন ঢাকার গৌরব, বিক্রমপুর তাহার জন্মস্থান। আমাদের কুম্ভকারেরা হাঁড়ী-পাতিল বানাইত ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত রকমের

শত শত মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিত। সোনা-রূপার কাজ বিক্রমপুরের গৌরব ছিল। স্থপতি-শিল্পে আমাদের দেশ প্রধান ছিল। রাজনগরে সৌধরত্ন-মালা—আমাদের স্বদেশবাসীরাই গাঁথিয়া তুলিয়াছিল। প্রস্তর-শিল্পে - আমাদের দেশে খুঁজিলে অপূর্ব্ব ভাস্কর-কীর্ত্তি এখনো পাওয়া যায়—যে সব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া শিল্পকলাবিদেরা মোহিত হইয়া গিয়াছেন। আমাদের ঝিনুকের অলঙ্কারে আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্য ছিল। আমরা মাটীর পুতুল, ন্যাকড়ার পুতুল দেশে দেশে ছড়াইয়া দিতাম। আমরা কাঁসার থালা, ঘটী-বাটি দিয়া দেশ ভরিয়া দিতাম।

আর কত ছিল, কে জানে। সবই যেন স্বপ্নের মতন মিলাইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকদিগের কাছে আমাদের এই দাবী যে—তাঁহারা দেশের-শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ কাহিনী আমাদের ভাল করিয়া শুনাইবেন—তাহার প্রকৃত ছবি আমাদের চোখের সামনে ধরিবেন। তবেই আমাদের পতিত শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার হইবে। এই ইতিহাস এক দিনে লেখা হইবে না, দুই দিনে হইবে না,—কিন্তু হইতেই হইবে। আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার কোন কারণ নাই। "ধৈর্য্য ধরিলে মিলিবে মুরারি।"

এই যে ইতিহাসের কথা বলিলাম, সেই কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সব কথা বলা হইয়াছে। আমাদের সকল চেষ্টা, সকল কর্ম্ম সেই ইতিহাসের বাণীকেই সার্থক করিবে। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, বাণিজ্যে সকল কার্য্যে, সকল কর্ম্মে, সকল ধর্ম্মে, আমাদের প্রাণে প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে সেই একই বাণী ঘোষিত হইবে। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের দেশের কাজ করি, দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করি, পীড়িতের পীড়া নিবারণ, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করি, লোকের চলাচলের ব্যবস্থাবিধান, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শিক্ষা-দীক্ষার উপায় উদ্ভাবন করি, পতিত শিল্পবাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করি, সমাজের আবশ্যকীয় সংস্কার করি।

ইহা এক জনের কাজ নহে, সকলের কাজ। ছোট বড় সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে। জীবন নারায়ণের লীলা। ইহা অণু হইতে অণীয়ান্—মহৎ হইতে মহীয়ান্। ছোট বড় সবাই যে এ লীলার অন্তর্গত। ওই যে কৃষক, উহাকে আহ্বান কর, ওই যে পতিত, উহাকে বুকে টানিয়া লও, নইলে তোমার অমঙ্গল হইবে। ওই যে স্বার্থপর, উহাকে টানিয়া তুলিয়া ধর, তোমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে। ওই যে ধনী, আপনার ধনভার বহন করিতেছে, উহাকে ডাক; ওই যে দরিদ্র, উহাকে কোল দেও; ওই যে শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সবাইকে ডাক! ডাক! যাহার যাহা আছে, লইয়া আইস। আপনার ভার লাঘব কর। ঢাল ঢাল এই জীবনযজ্ঞে। নারায়ণ যিনি জীবের অয়ন এবং যিনি নিজেই নর-নারায়ণ, তাঁহাকে প্রণাম করি!

মালা

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

নিবেদন

এই সবগুলি কবিতাই সাগর-সঙ্গীতের অনেক আগে লেখা। দু'একটি মালঞ্চেরও আগে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

মালা

প্রেম ও প্রদীপ

১

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?
তোমার ও প্রদীপের কনক-কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া!
কেন রাখিয়াছ আহা! সুখ-বাতায়নে
সোহাগে স্বহস্তে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া?
আপনারে কেহ কভু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া?
তোমার লাবণ্য-মূর্ত্তি পড়ে না আঁখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া।
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা জাগে দেখিতে দেখিতে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?

২

অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—
কেন গো এমন ক'রে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভ'রে—পরাণ-মাঝারে!
আমি অশ্রুজল লয়ে—শুধু চেয়ে থাকি
আমি ত জ্বালিনি দীপ, কি করিয়া ডাকি?

৩

তবু মনে হয় তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্ত্ত স্বর—অন্তর-মাঝারে।
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার,
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর আঁধারে!
জ্বাল গো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার!

৪

তোমার চঞ্চল দীপ আলোক বন্ধন;
ব্যাথছে সকল মন সর্ব্বাঙ্গ আমার!
কত না অশান্ত সুখ অজানা ক্রন্দন
ঝাপটিছে গরজিছে অন্তরে আমার!
হে মোর নিষ্ঠুরা! কি যে বেদনা-বন্ধনে
টানিতেছ সর্ব্ব হৃদি তব সন্নিধানে!
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে!
প্রজ্বলিত হৃদিমাঝে, শূন্য সব ঠাঁই!
হে প্রেম নিষ্ঠুরা! আমি যে তোমারে চাই

৫

আমি যে তোমারে চাই, সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ও প্রদীপের আলো-অন্ধকারে;
সকল সুখের মাঝে, সর্ব্ব-বেদনায়!
কর্ম্মক্লান্ত দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যা'য়
ওই তব প্রদীপের আলো-অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে!
হে মোর লুকান ধন! হে রহস্যময়ি!
আজি জীবনের শেষ—আজো তুমি জয়ী!

তোমারে খুঁজেছি আমি আলোকে আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি ; মরণ-মাঝারে—
সকল সুখের মাঝে সর্ব্ব-সাধনায় !
আজি শ্রান্ত জীবনের ধূসর-সন্ধ্যায়
হে মোর লুকান ধন ! আজো তুমি জয়ী !
আজো খুঁজিতেছি তোরে হে রহস্যময়ি !

৬

একই সন্ধ্যা আমাদের পরে
ঢালিয়াছে ঘন ছায়া তার !
আমাদের দুজনের তরে
পাতিয়াছে মহা অন্ধকার !
আর কিছু নাই—কেহ নাই
আছি আমি—আছে অন্ধকার,
আছ তুমি,আর কেহ নাই
আছে শুধু সাঁঝের আঁধার !
হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার ?

৭

কি জানি কেমন ক'রে জ্বালায়ে রেখেছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপখানি ?
আমি মুগ্ধ বাক্যহীন, আমি শুধু চেয়ে রই !
কি দিয়ে কেমন ক'রে জ্বালায়ে রেখেছ ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপখানি ?
কি দিয়ে জ্বালিলে বল, হে চির-কৌতুকময়ী
রহস্য প্রদীপখানি ?
কোন্ তপস্যার বলে ওই যে দীপের বুকে
কি সঙ্গীত দিলে টানি ;
কোন্ পূর্ব্বপুণ্যফলে ফুটায়ে তুলেছ তাহে
আপন প্রাণের বাণী !
সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন-ছায়া
সকল ধরণী পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া !

এরি মাঝে সত্য-রূপে উজলি উঠেছে ওই !
তোমার প্রদীপখানি !
কি সত্য সুন্দররূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই—
অপূর্ব্ব প্রদীপখানি !

৮

আমি মুগ্ধ চেয়ে আছি ! ওগো মোর বাক্যহীনা
ওগো মোর নেত্রাতীত চির-অন্ধকার-লীনা !
এ কি তব চির-জনমের অগীত সঙ্গীত ?
এ কি তব দীপ্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত ইঙ্গিত ?
এ কি তব নির্জ্জনের নীরব প্রস্ফুট বাণী
তুলিছে সফল করি আপন সাধনখানি ?
এ কি তব মরমের সঞ্চিত স্বপনরাজি
পরাণ ছাপায়ে কি গো উছলি উঠেছে আজি ?
এ কি গো অনন্ত পূজা ! এ কি গো জীবন্ত আশা !
গুপ্ত প্রাণ-কুঞ্জে কি গো আলোকিত ভালবাসা ?
এ কি তব সুখ ? ওগো এ কি তব দুঃখে গড়া
এ পুণ্য প্রদীপখানি ?
এ কি তব অন্তরের সকল সৌরভভরা—
আলোক-গৌরব-বাণী ?

৯

এই যে এসেছে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলিছে
আমি শুধু চেয়ে আছি, মুগ্ধ—একমনে !
অনন্ত গগনভরা আঁধার নামিছে
নয়ন চাহিয়া আছে, স্তব্ধ একমনে !
ওগো আমি চেয়ে আছি, তৃষার্ত্ত নয়নে
তোমার প্রদীপ জ্বালা দীপ্ত বাতায়নে !
কেমনে জ্বালিলে দীপ হে অপরিচিতা !
এমন মধুর—মরম সুন্দর ক'রে—
হে মোর সাধন-স্বপ্ন ! হে মর্ম্ম-নিহিতা
এ কি অর্দ্ধ পরিচয় অনুরাগ-ভরে !
কি অপূর্ব্ব অভিসার ! কি সঙ্গীত বাজে
তোমার পরাণ-দীপ্ত প্রদীপের মাঝে ?

আমি শুধু চেয়ে আছি মুগ্ধ, একমনে !
কি অনন্ত অভিসার—নীরবে নির্জ্জনে !

১০

কবে জেলেছিলে দীপ হে রহস্যময়ি !
কবে কোথাকার, ওগো কোন্ মহা বিজনে ?
সৃষ্টির প্রথম সে কি ? ওগো মর্ম্মময়ী !
সৃষ্টির প্রথম সাঁঝে কোন্ কম-কাননে ?
সে কি এমনি গভীর নীরব গর্জ্জন
অনন্তের ? সে কি আলো ? সে কি অন্ধকার ?
সে কি এমনি সাঁঝের তিমির নির্জ্জন
মায়া-মন্ত্রালোক ভরা এমনি সন্ধ্যার ?—
উজলি উঠিল যবে সেই সে প্রথম,
অনাদি কালের বক্ষে প্রদীপ তোমার—
সকল সোহাগ তব সকল সরম
সকল স্বপন তব—আকুল আশার !
তখন কি উড়েছিল বসন্ত-বাতাসে
এমনি পাগল-করা সন্ধ্যা-অঞ্চলখানি ?
তখন কি বেজেছিল হৃদয়-আকাশে
এমনি উদাস-করা বিধাতার বাণী ?—
উজলি উঠিল যবে সেই যে প্রথম
আলো অন্ধকারভরা প্রদীপে তোমার
সকল ধেয়ান তব সকল ধরম
সকল আলোক ওগো ! সকল আঁধার !

মরণের সুখ

আমি দুঃখ জানি তাই হে প্রিয় আমার !
বুঝিয়াছি মর্ম্মে মর্ম্মে সুখের গৌরব !—
রুধিয়া রেখেছি মর্ম্মে ! হে প্রিয় আমার !—
আন হাস্য, আন গীতি, পুষ্পের সৌরভ
সাজাও অন্তর মোর ! এই যে কাঁপিছে
দুই বিন্দু অশ্রুজল নয়নের কোণে,
এ শুধু সুখের ছল ! আমারে ছলিছে,
তোমারেও ছলিতেছে ! মর্ম্মমন-বনে
আগ্রহে ফুটিতে চাহে শত পুষ্পদল !
দেখাতে পারি না তাহা ! হে আমার প্রিয় !
তাই আঁখি-প্রান্তে মোর ভাসে অশ্রুজল !—
তুমি মর্ম্মে মর্ম্ম আনি সব বুঝি নিও !
আমি দুঃখ জানি নাই হে আমার প্রিয় !
আমারি মরম-তলে সুখেরে খুঁজিও ।

সে কি শুধু ভালবাসা ?

কেমন সে ভালবাসা ? বলা কি সে যায় ?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমারি তোমারি গীতি ! স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে, তারি পানে ধায়
আকুল আশায় !
তুমি যবে দূরে থাক, ওগো প্রিয়তম
তোমার আশার আশে, নর্ত্তকীর সম
অঞ্চল দোলায়ে তার নূপুর-গুঞ্জনে
পরিপূর্ণ ছন্দে নাচে, এ অন্তর মম
ওগো প্রিয়তম !
কি সে তার চারু বাসে তরঙ্গ-হিল্লোল !
কি যে তার প্রাণে-প্রাণে সঙ্গীতের রোল !
তরঙ্গিত দেহপূর্ণ আশান্বিত হিয়া,—
সোহাগেতে সুখে দুঃখে কাতর কল্লোল,
কি যে সে কল্লোল !
তোমা যবে কাছে পাই, হে আমার প্রাণ—
কোথা ছন্দ, কোথা তাল, উন্মাদের গান !
অন্তর-তরণী সম বিক্ষুব্ধ সাগরে
চোখে মুখে বক্ষে তার ঝাপটে তুফান
পাগল তুফান !

এই ভাসে এই ডুবে, জীবন মরণ
আলো অন্ধকার শূন্য ছায়ার মতন।
সর্ব্বমন, সর্ব্বদেহ, সমস্বরে গায় ;
এস মৃত্যু, এস প্রাণ, এস আলিঙ্গন
চির-আলিঙ্গন !

প্রেম-প্রতীক্ষায়

তখনো হয় নি সন্ধ্যা ! বিমল আকাশ,
কোমল যেন গো মোর প্রিয়ার বরণ,—
ঢালিতেছে মৃদু মধু, স্বর্গের আভাস
চুম্বি' সরোবর-জল, আম্রের কানন !
তখনো আসেনি প্রিয়া ! প্রাণ পেয়েছিল,
সেই আলো-মাঝে শুধু প্রিয়ার আভাস।
আম্র-শাখা দুলাইয়া বহে'ছিল বায়,—
বসে ছিনু প্রিয়া লাগি' প্রেম-প্রতীক্ষায় !
তার পর এল সন্ধ্যা ধূসর বরণ !—
আমার প্রিয়ার যেন বক্ষের অঞ্চল
ঢেকে দিল দেহ হিয়া ধরণী গগন !—
করে' দিল সর্ব্ব-মন অধীর চঞ্চল !
বাড়াইনু আলিঙ্গন !—প্রিয়া আসে নাই
পাঠা'য়ে দিয়াছে শুধু প্রিয়ার স্বপন !
কাননের মাঝে শুধু পাখী গান গায়,
প্রাণ ছিল প্রিয়া লাগি প্রেম-প্রতীক্ষায়।
তার পর সন্ধ্যা গেল, আসিল রজনী !
পরশি সকল দেহে প্রিয়ার কুন্তল
হিয়া মোর দিশাহারা ! আঁধার ধরণী !
'ওগো ঢাক, ঢাক মোরে প্রসারি' অঞ্চল !'
কোন শব্দ নাহি হায় ! প্রিয়া আসে নাই—
প্রিয়ার কুন্তল-স্বপ্ন এসেছে রজনী !
তখন বহিল ক্ষুব্ধ বসন্ত বাতাস,
তৃষার্ত্ত তমসা-ভরা ধরণী আকাশ !
তখনো গভীর রাত্রি ধরণী ছাইয়া !
প্রিয়ার গভীর সেই প্রেমের মতন !
পাখীরা কানন-শাখে ছিল ঘুমাইয়া !
ও কি—ও কি দেখা যায়—ছায়া না স্বপন ?
এলো মেলো চুলে ওই প্রিয়া আসিয়াছে
আবেশে চঞ্চল তার ভূমে লুটাইয়া !
এখন যে প্রভাতের পাখী গান গায়,
প্রিয়া মোর চলি গেছে কখন্ কোথায় ?

স্বর্গের স্বপন

হে সুন্দরি ! সেই দিন বসন্ত প্রভাতে
মন প্রাণ অন্ধ করা সুবাসিত রাতে
ঝলসিলে আঁখি মোর, পরশিলে মন !
অবাক্ অন্তর তোমা করিল বারণ,—
ভাল ক'রে দেখে নাই করেনি জিজ্ঞাসা
প্রেমাতুর প্রাণ, দিয়া সর্ব্ব-ভালবাসা,
সেই দিন, সর্ব্ব কাজে চিত্ত আনমনা
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চ্চনা।

আর সেই, সেই দিন বসন্ত-বাতাস,
আপন আবেগে পূর্ণ নিশীথ আকাশ,
চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন,
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এ মন !-
অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে মনে হ'ল মোর
স্বর্গ হ'তে নেমে এলে ! জগতের ঘোর
ঢাকিলে স্বর্গের করে। গরবী পরাণ
করিল পূজার লাগি পুষ্প অর্ঘ্য-দান !

সব মনে নাই, শুধু মনে আছে মোর,
উজ্জ্বল অধর তব অবাক্ বিভোর,
চরণে পরশি যেন অজানিত দেশ !—
নূতন রাজ্যের মাঝে আশ্চর্য্য অশেষ !

রহস্য মধুর হাসি! কৌতুকে অপার
পরিপূর্ণ দুই নেত্র!—প্রতি পত্রে তার
বিস্তারিত স্বর্গ-ছায়া স্বরগের সুখ!
নিতান্তই স্বরগের ভাবিনু সে মুখ!

তার পর গেছে দিবা গেছে নিশা কত!
গিয়াছে স্বপনপ্রায় আশা শত শত,
প্রভাতের মুক্ত বায়ু, শ্রান্ত রজনীর
অলস অঞ্চল-গন্ধ সুরভি সমীর,
এ মোর পরাণ পরে! সুখে দুঃখে শোকে,
পরিম্লান ধরণীর মলিন আলোকে,
সম্পূর্ণ আঁধারে কভু, এ মোর জীবন
কত দীর্ঘ দিবানিশি করেছে যাপন!

হে মোর প্রভাত-পুষ্প, হে অপরিচিতা!
হে আমার যৌবনের পূর্ণ প্রস্ফুটিতা!
হে মোর মানস স্বর্গ, হে স্বপ্ন অঞ্চলা,
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা!
হে আনন্দ নিখিলের! হে শান্ত রঙ্গিণী!
হে আমার যৌবনের স্বপন-সঙ্গিনী!
হে আমার আপনার! হে আমার পর!
হে আমার বাহিরের হে মোর অন্তর!

হে আমার, হে আমার চির-মর্ম্মময়!
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয়!
আছিলে গোপনে মোর মন-অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, আমারি পঞ্জর জুড়ে!
যেমনি বাজানু বাঁশী সলাজ চরণে—
বাহিরিলে দাঁড়াইলে—অপূর্ব্ব ধরণে;
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প মস্তকে গগন!—
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন।

উপহার

ফুটেছিল শত পুষ্প বিচিত্র বরণে,
ফুটেছিল নিভৃত এ অন্তর-কাননে,
মুক্ত বায়ু রবি-দীপ্ত প্রভাত প্রভায়,
পুরবী সঙ্গীত শ্রান্ত প্রশান্ত সন্ধ্যায়!
ফুটেছিল আলোকিত মধ্যাহ্ন-গগনে
ফুটেছিল অন্ধকার নিশীথ-পবনে,
কি আনন্দে কাঁপিত যে পাগল পরাণ
এ জগতে কেহ তার পায়নি সন্ধান!
তার পর তুমি এলে, দাঁড়াইলে হেসে!
সলাজ অন্তর মোর বাহিরিল শেষে;—
বিশাল এ জগতের বন উপবনে
ফুটিল সে পুষ্পরাশি আছিল যা মনে!
থর থর সেই ফুল সাজায়েছি ডালা
পর পর সেই ফুলে গাঁথিয়াছি মালা।

শূন্য প্রাণ

ওরে রে পাগল!
জলিছে নয়নে তব কি নব বাসনা,
কি গীত রয়েছে বাকি;—কি নব বাঞ্ছনা?
উচ্চারিত হয় নাই কি প্রেম-মন্তর,
কোন্ পূজা লাগি তব আকুল অন্তর?
আমি ত দিয়াছি যা' কিছু আছিল সার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!

নিবিড় নয়ন হ'তে দিয়াছি দরশ,
এ শুভ্র দেহের আমি দিয়াছি পরশ,
পরাণের প্রীতি-পুষ্প, প্রতি হাসি গীত,
জীবন যৌবন ভরা সকল সঙ্গীত,
তোমারে করেছি দান! কি চাহ আবার!
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!

তোমারে করেছি পূজা, দেবতা সমান,
প্রভাতে মধ্যাহ্নে গাহি সুমঙ্গল গান ;
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালি, ধূপ ধূনা দিয়া
আরতি করেছে মোর প্রেমপূর্ণ হিয়া !
আর কি করিব দান, কি আছে আবার
ওরে রে পাগল ওরে পাগল আমার !

সন্ধ্যা-শেষে পুনর্ব্বার করেছি বরণ
সমস্ত রজনী ভ'রে করেছি স্মরণ,
তোমারে, তোমারে শুধু ; হাসিয়া প্রভাতে
আনিয়াছি পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া দুহাতে।
আর কি আনিতে পারি কি আছে আমার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার !

সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি ! কি দিব গো আমি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।
তবে কি মিটিবে আশ, চাহিবে না আর ?
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার !

সাঁঝের ছায়ায়

ওগো আধ-পরিচিত !
আধ-অজানিত
অতিথির প্রায় ।—

এসেছ ভ্রমিয়া শেষে—
আমারি এ দেশে—
ধূসর ছায়ায় !

নয়ন অধর প্রান্ত
কত সুখ-ক্লান্ত
প্রখর প্রভায় !

বক্ষে মোর রাখি মাথা
জুড়াইব ব্যথা
শীতল সন্ধ্যায় ?

অগ্নিরূপে চ'লে গেলে,
ভস্ম হয়ে এলে
সাঁঝের বেলায় ;

আমার যৌবন তপ্ত
প্রেম অভিশপ্ত
অন্তর মেলায় !

থাক্ বঁধু সেই ভাল !
কাজ নাই আলো
প্রভাত-প্রভায় !

যাহা আছে তাই দাও
আঁখিপানে চাও
সাঁঝের ছায়ায়।

প্রেম

এ প্রাণ আছিল শূন্য অলঙ্কারহীন,
তব প্রেম আজি তার বসন ভূষণ ;
জড়ায়ে অন্তরে মোর প্রতি নিশি দিন
করিতেছে নগ্ন প্রাণে লজ্জা নিবারণ !
আমার হৃদয় ছিল সর্ব্বগীতহারা,
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী !—
সুখ-পূর্ণ, শান্তি-পূর্ণ, অমৃতের ধারা—
করেছে জীবন মোর সঙ্গীত-বাহিনী !
সর্ব্বসুখে বিভূষিতা গরবিত প্রাণ
বক্ষেতে চাপিতে চায় সে প্রেম-গৌরব !
বৃথা আশা ! বিশ্বমাঝে বেজে উঠে গান,
বাতাসে ভরিয়া যায় ফুলের সৌরভ !
তবে এস নমি মোরা দেবতা-চরণে—
সেইখানে বাঁধা রব জীবনে মরণে।

প্রেম সত্য

জ্ঞানচক্ষু দিয়ে
তোমারে দেখিনি প্রিয়ে !
তোমারে দেখেছি শুধু
হৃদি-নেত্র দিয়ে।
তাই মোর, এত ভালবাসা !
বিচার করিনে, তুমি
শুভ্র কি কাল ;
বিচার করিনে, তুমি
মন্দ কি ভাল !
কাননের পুষ্প সম
ওগো পুষ্প মম !
যে মুহূর্ত্তে দেখিয়াছি
বাসিয়াছি ভাল !
তাই মোর এত ভালবাসা !

অনন্ত সরল নিত্য
সত্য যে প্রকার
একেবারে মন প্রাণ
করে অধিকার—
তুমি ত কেমনি ক'রে
মন প্রাণ ভোরে
তব প্রেম সত্য রাজ্য
করেছ বিস্তার
তাই মোর এত ভালবাসা !
জ্ঞান-চক্ষু দিয়ে
তোমারে দেখিনি প্রিয়ে !
তোমারে দেখেছি শুধু—
হৃদি-নেত্র দিয়ে !
তাই মোর এত ভালবাসা !

টান

রচনা বিভোর কবি যেমন করিয়া
আপন রচনাগুলি হাতে তুলি' নিয়া
উলটি পালটি তারে পরাণ ভরিয়া
শতবার পড়ি পড়ি করে সম্ভাষণ।—
সেইরূপ হে প্রেয়সি ! আমিও তোমার
সৌন্দর্য্য-সম্পদরাজি হেরি বারে বার,
শতবার চ'লে গিয়ে ফিরিয়া আবার
তব প্রেম-মন্ত্র প্রিয়ে ! করি উচ্চারণ !
কবিতা কবির আত্মা, তাই তারে টানে
তুমি মোরে কিসে টান, কে জানে কে জানে

দান

ওগো, আমার প্রাণে যত প্রেম আছে
তোমারে করিনু দান ;
তুমি, নয়ন মুদিয়া, তুলিয়া লইও
ভরিও তোমার প্রাণ !
তুমি, সরমের বাধা যেন না যেন না
চেও না কাহারো পানে ;
ওগো, এ প্রেম নির্ম্মল ফুলের মতন
দেবতা সকলি জানে !

রাগ

'রাগ করেছ কি' ? ওগো ! কার নাই রাগ
হৃদয়ে জ্বলিছে দেখ কত অত অনুরাগ !
কত না সুখের লাগি কত ভাবনায়,
কত না সুখের মাঝে কত বেদনায়,
সকল প্রভাতবেলা সারাদিন মান
কত না তোমার তরে কেঁদেছে পরাণ !

যেমনি আসিলে তুমি সারাদিন পরে
দাঁড়ালে আমার কাছে হাতখানি ধ'রে
সোহাগে সরমে মোর চোখে জল ভাসে
মরা দেহে ভরা-প্রাণে কথা নাহি আসে!
ব্যথা-ভরা আঁখি দিয়ে চেয়ে আছি তাই
ভাবিছি আমারে আমি কেমনে বুঝাই!
রাগ করি নাই ওগো! করি নাই রাগ
আমার যে পোড়া প্রাণে ভরা অনুরাগ!

অন্তিমে

নিভিয়া গিয়াছে হাসি,
শুকায়ে এসেছে ফুল,
নিষ্প্রভ জীবন আজি,
মৃত্যুর এ কি রে ভুল!

যৌবন চলিয়া গেছে,
স্বপন গিয়াছে তার,
চরাচরে ছেয়ে গেছে,
পরাণের অন্ধকার!

বঁধু নাই—বাঁশী নাই—
বৃন্দাবন? তা'ও নাই,
অন্তরের সাধগুলি,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই!

আজ শুধু মধু-স্মৃতি
শ্মশানে কুসুম সম,
পুরাতন জীর্ণ গৃহে,
মলিন প্রদীপ মম।

মৃত-রবি-কর-রেখা,—
শুষ্ক ফুল সঙ্গে তার,
জীবন ভরিয়া মোর;
কাঁদে অন্ধ হাহাকার।

শুকায় শুকা'ক ফুল,
থেকে যায়, যা'ক্ হাসি,
লক্ষ্যহীন অন্ধকারে,
হৃদয় যাইবে ভাসি।

চাহি না শুনিতে আর
বসন্তের পুষ্পরাণী,
প'শে না শ্রবণে তব,
বীণা-বিনিন্দিত বাণী।

জ্বেল না জীবনে আর
তোমার সোনার বাতি
আছে প্রাণে, থাক্ থাক্
আমার আঁধার রাতি।

শত ছিন্ন ছিদ্র বস্ত্র
পরিধানে আছে যা'র
কনক-আলোক-রেখা,
লজ্জার কারণ তার।

ভাসিয়া গিয়াছে স্বপ্ন
ভুলিয়া গেছি গান
সাজে না জীবনে আর
বসন্ত ব্যাকুল তান।

সকলি হারায়ে গেছে,
জীবন দিয়াছি ছেড়ে—
আঁধার হৃদয়মাঝে,
আঁধার গিয়াছে বেড়ে।

নিভিয়া এসেছে হাসি
শুকায়ে এসেছে ফুল
বিধাতার এ কি লীলা,—
মৃত্যুর এ কি রে ভুল।

প্রাণের স্বপ্ন

নীরব আঁধার নিশীথ সমীর
বিমল আকাশ—জীবন অধীর
আনত ভূমে!

শত সুখ দুঃখ, আছিল ফুটিয়া
পরাণ আমার পড়েছে লুটিয়া
আজি ঘোর ঘুমে

গেছে দুঃখ আজ গেছে ভয় লাজ
গেছে ভেঙ্গে সুখ—শত শত কাজ
শুধু স্বপ্ন চুমে!

আজিকে সত্যের কল্পনা-কাহিনী
সকলি অলীক,—বিরামদায়িনী,
স্বপনের ধূমে
শুধু আশা চুমে।

যদি যায় যাক্—জীবন ভাসিয়া—
যদি আসে থাক্ মরণ জাগিয়া,
বিজড়িত ঘুমে
শুধু স্বপ্ন চুমে।

স্বপ্নে

এত ক'রে বাঁধি বুক,
কেন ভেঙ্গে যায়?
জীবনের মহাব্রত স্বপনে মিলায়।

একটি প্রভাত লাগি
এত কাল ছিনু জাগি,
আজি এ সাঁঝের মাঝে,
পড়েছি ঘুমায়ে।
অবশ শিথিল দেহ
নাহি দুঃখ নাহি গেহ
ভাঙিয়া গিয়াছে হৃদি
পড়িয়াছি নু'য়ে।

অই ত উষার হাসি,
আকাশে উঠিছে ভাসি,
আশার স্বরগ এই আছিল আমার!
আজি জাগিয়াছি ভবে,
পূরেছে বাসনা সবে,
এইবারে ডেকে লও দেবতা আমার!
নানা স্বপনের মায়া,
হৃদয়ে ফেলেছে ছায়া,
এল হে উষার হাসি—নিশি আঁধিয়ার
নিরাশ-কম্পিত হৃদে স্মৃতি সাধনার।

মহাশূন্য

জীবন, জীবন কোথা?—যেন নিরবধি,
মরণ-নিশ্বাস বহে অতৃপ্তি লইয়া,
যেন চুপি চুপি অই—কাঁদাইছে হৃদি,
অতীত সে জীবনের প্রতিধ্বনি দিয়া।
জীবন, জীবন কোথা?—ভ্রান্তি স্বপনের,
দৃপ্ত সুরা পান ক'রে শুধু ভুলে থাকা!
এ কি হাসি এ কি কান্না! শুধু ব'সে ব'সে
ভবিষ্যের চিত্রপটে অতীতেরে আঁকা!
মহান্ মুহূর্ত্ত এক জীবনে পশিয়া
ভাসাইয়া লয়ে গেছে—গ্রাসিছে সকল!
কোথা তুমি কোথা আমি,—গেছে হারাইয়া
রয়েছে অনন্ত ব্যথা হৃদয়-সম্বল।
সে ব্যথা বাজিছে আজো; আমার জীবন
তারি যেন প্রতিধ্বনি, আর কিছু নয়!
যত হাসি যত অশ্রু—যাতনা স্বপন,
করেছে জীবন যেন মহাশূন্যময়।

মোছ আঁখি

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব-সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
রাবণের চিতা সম যদিও আমার
জ্বলিছে অলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সম্বল অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম-কলি নয়ন-কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক-ভরা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

বিদায়

বসেছিনু তোমা তরে ওগো সারা রাতি
চাঁদের আলোয় আর প্রাণের খেলায় ;
কখন্ ঘুমালে তুমি নিবাইলে বাতি।
এখনো বসিয়া আছি ভোরের বেলায়
তোমারি দুয়ারে প্রিয়ে! ঘুমাও ঘুমাও
করুণ উষায় লব নীরব বিদায়!
যদি ভেঙ্গে যায় ঘুম দেখিবারে পাও
অকস্মাৎ মনে পড়ে প্রভাতবেলায়!
কি জানি কহিবে গো! কি গীত গাহিবে!
পলকে টুটিয়া যাবে স্বপন আমার!
কি জানি কি গাহিবে গো! কি ব্যথা বাজিবে!
অজানা তরাসে প্রাণ কাঁপিছে আবার!
ঘুমাও ঘুমাও তব স্বপ্ন-মহিমায়।
করুণ উষায় লব নীরব বিদায়!

আমার মন

ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,—
তোরে বক্ষ হ'তে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা!—

মন তুই ঘুমা।
গগনে গরজে ঘন,
আঁধার ধরণী।
কোথা যাবি অন্ধকারে
পাগলের মণি ?

ওরে মন তুই ঘুমা
ওরে মন তুই ঘুমা
তোরে বক্ষ হ'তে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা,
মন তুই ঘুমা।

কার চোখে আলো জাগে ?
কারে তোর ভাল লাগে ?
কোন্ রূপ—কোন্ হেম ?
কার যত্ন—কার প্রেম ?
সংসারে সকলি মন
—দুদিনের ধুমা।

ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,
তোরে বক্ষ হ'তে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা,
মন তুই ঘুমা।

কে তোরে বাসিবে ভাল
আমার মতন ?

কে তোরে করিবে আর
এত বা যতন ?
মেলিস্ না পক্ষ তোর
রে মোর বিহঙ্গ।
বাহিরে গর্জ্জিছে শত
আঁধার তরঙ্গ।

অনন্ত অচেনা দেশ —
কোথা যাস ভাসি ?
বক্ষেতে লুকায়ে থাক্
চির বক্ষোবাসী।
ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,
তোরে বক্ষ হ'তে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা,
মন তুই ঘুমা।

চুম্বন

আমার চুম্বন এক চঞ্চল বিহঙ্গ
নিমেষে উড়িয়া যায় তব মুখপানে!
উড়ায়ে আরক্ত পাখা ভাসাইয়া অঙ্গ।
যত ডাকি আয়! আয়! পরিচিত তানে
শুনে না সে! ঠেলি ঠেলি নীলিম-তরঙ্গ
যত দূরে তুমি আছ তত দূরে যায়!
কাছে গিয়া মুগ্ধ-হিয়া আমারি বিহঙ্গ
স্বর্গে হ'তে ফিরে আসে পাগলের প্রায়।

কামনা

আমি নই, আমি নই! হে পূর্ণ সুন্দরী,—
সত্যই আমার তুমি নহ কামনার;
কি শুনিতে কি শুনেছ! মরিছে গুমরি,
আমারি পঞ্জরমাঝে, গীত বাসনার;—
মোহ-মুগ্ধ লাজ-দীপ্ত গীতি বাসনার।

আমি নই! আমি নই! নব শিশু সম,
জন্মেছে মরমে মোর এ নব বাসনা,
নয়ন আলোকে তব! ক্ষম মোরে ক্ষম,
এ নহে এ নহে আমি, এ কোন কামনা
অযাচিত আশাতীত, এ কোন কামনা!

বসন্তের শেষে

জীবন স্বপ্নের মত শূন্য হয়ে গেছে!
কিছু আর নাহি মোর ধরিতে ছুঁইতে।
কত স্বর্ণ কত রত্ন পড়িয়া রয়েছে,—
সাধ নাই, সাধ্য নাই, তুলিয়া লইতে।
তুমি যে সুধার পাত্র ধরিয়া সম্মুখে
সাধিছ আকুল নেত্রে করিবারে পান!—
গঠিত তোমার রাজ্য শত দুঃখে সুখে
আমার সকলি শূন্য স্বপন সমান।
ভুলেছি কি ? ভুলি নাই, ভুলিনি তোমায়,
ভুলি নাই সে দিনের বসন্ত রজনী!
কত সুখ-দুঃখ ভরা বসন্তের বায়
পূর্ণ পালে বহে যেত অন্তর তরণী!
তবে প্রিয়ে আজ তুমি সত্য হয়ে এসে
সত্য কর এ জীবন বসন্তের শেষে।

আপনার গান

হে সুন্দর! প্রভাহীন বাক্যদলমাঝে
কেমনে রচিব তব আনন্দ-নিলয় ?
সকল গগন ঘেরা জলদের মাঝে
শরৎ নিশীথে যেন ম্লান চন্দ্রোদয়!

তব বক্ষে জ্বলিছে যে অপূর্ব্ব আলোক
জগতের চক্ষে তাহা ক্ষীণতম ভাসে!
তোমার প্রদীপ হ'তে ওই যে আলোক
বাহিরে আসে না! ওগো ছায়া শুধু আসে
তব কুঞ্জে বাজে চির-বসন্ত-বাঁশরী
প্রতিদিন প্রতিরাত্র উন্মাদিয়া প্রাণ।—
দুটি ক্ষীণ ধ্বনিহীন ম্লান ছন্দ ভরি
কেমনে উঠিবে ফুটি সে গোপন গান?
আপনা ফিরাও তবে আপনার পানে!—
আপনি আনন্দ পাবে আপনারি গানে।

তুমি

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্ব্বজীবনের
চির-প্রেমার্জ্জিত শত তপস্যার ফল!
ওগো প্রিয় তুমি মোর পূর্ণ মরণের
সহস্র আসন্ন আশা সহায় সম্বল
নিতান্ত আমারি তুমি!
তুমি আছ দাঁড়াইয়া বিরাট অটল,
অতি উর্দ্ধে দৃষ্টি স্বর্গপানে ধায়!
সমস্ত জীবন তব সম্পূর্ণ সফল।
আমি আছি তোমারি ও চরণের ছায়
তোমারি চরণ চুমি!
যদি কোন দিন তব উজ্জ্বল নয়ন
হেথায় ফিরিয়া আসে দেব স্বপ্ন ভুলে!
আমি তাই পাতিয়াছি আমার শয়ন
চেয়ে দেখ তোমারি ও চরণের মূলে
নিষ্ফল ক'র না মোরে।
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য্য আছে যত না স্বপন;
সর্ব্ব-কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি ক'র ওগো ক'র আমার জীবন
তোমার চরণ-ভূমি!

তুমি ও আমি

আমার এ প্রেম মোর চিত্ত হ'তে এসে,
তোমারি লাবণ্যমাঝে নিত্য খেলা করে,
কৌতূহল-দীপ্ত আঁখি সুখশ্রান্তি শেষে,
আবার তোমারি বক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে।

আমার আকাঙ্ক্ষা সখি! পতঙ্গের মত
দিবসে নিশীথে শুধু দগ্ধ হ'তে চায়,
ঢলিয়া পড়িছে তব সর্ব্বাঙ্গে সতত,
অতৃপ্তের তৃপ্তি লাগি উন্মত্তের প্রায়।

আমার এ মন সখি! মুগ্ধ কবি সম,
সর্ব্বদা করিছে শত সঙ্গীত রচনা,
গাঁথি গাঁথি সুখ দুঃখ পুষ্প অনুপম,
আপনি চরণে তব ঢালিছে আপনা।

তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি
দুজনার মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি!

আপনার মাঝে

ওরে রে অশান্ত মন!
কারে তুই চা'স্?
আজি এ সন্ধ্যার মাঝে
কোথা তুই যাস্?
ভুবন ভ্রমিয়া এলি
কোথাও কি পেলি!
মিছে তবে কেন তুই
ঘুরিয়া বেড়াস্?
সুখ-হীন শান্তি-হীন
ঘুরিয়া বেড়াস্।
আপন হৃদয়ে তবু
খুঁজেছিস্ কভু?—

আপন মরমতলে
পাস কিনা পাস্!—
সকল ভুবন ঘুরি
যারে তুই চাস্?

ওরে পাখি সন্ধ্যা হ'ল আয় রে কুলায়!
সমস্ত গগন ভ'রে,
আঁধার পড়িছে ঝ'রে
ওরে পাখি! অন্ধকারে! নীড়ে ফিরে আয়!
বন্ধ কর পক্ষ তোর আয় রে কুলায়।

যতক্ষণ আলো ছিল মিটে নি কি আশ?
ওরে সারা দিনমান,
তুই করেছিস্ পান,
যত মধু ছিল ভরি গগন আকাশ
এবে আলো সাজ হ'ল মিটেনি পিয়াস?

ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে,
ওরে বন্ধ কর পাখা,
অপূর্ব্ব আলোকমাখা,
অনন্ত গগনতল হেথায় বিরাজে!—
ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে।

ভয় নাই ভয় নাই হে আমার মন!
এ যে শুধু ক্ষণিকের মোহ-অন্ধকার!
আবৃত অন্তরে তোরা জ্যোতিঃ চিরন্তন
ডুব্ দে ডুব্ দে তবে আপন মাঝার।
পূর্ণ কর ওরে পাখি! পক্ষ দুটি তোর
আপন আনন্দে ভরা আত্মার আলোকে,
আপনারি জ্ঞানে হয়ে আপনি বিভোর
অন্তর গগনতলে উড়িস্ পুলকে।

ব্রহ্মাণ্ডে পড়িবে তোর চরণের ছায়া
বাসনা বিলুপ্ত হবে আত্মার মাঝারে,
দুই হাতে ছিন্ন করি শত মিথ্যা মায়া
আপনার মহিমার দুন্দুভি বাজা রে।
ভয় নাই ভয় নাই, রে আমার হিয়া,
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আনিছে আঁধার!
জীবনের জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া
দেখা রে আপন পথ আপন মাঝার।

তবু যে তরাসে কাঁপে শ্রান্ত হিয়াখানি
আপনার অন্তরের পথ নাহি জানি!
সম্মুখে পশ্চাতে তার
অন্তহীন অন্ধকার
ঘিরিছে সতত তারে ঘন আবরণে,
এই ঘোর অন্তরের অন্ধকার বনে।
ভয় নাই ওরে মন! কর রে নির্ভর
অন্ধকারাক্রান্ত এই আপনারি পর!—
এই যে আঁধাররাজি
নয়ন ভরিছে আজি,
এরি মাঝে পাবি তুই আত্ম পরিচয়
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আর কিছু নয়!

নিবেদন

হে মোর বিজয়ী রাজা এস তবে আজ
সমর উল্লাস ভরা বিজয় হুঙ্কারে!—
দর্পভরে সগৌরবে! ওগো রাজরাজ!
এস আজ রুদ্ধ এই অন্তর-দুয়ারে!
ছিন্ন কর বক্ষ মোর কৃপাণে তোমার
চূর্ণ ক'রে দাও মোর সোনার মন্দির!

ধূলিসাৎ হয়ে যাক্ হৃদয়-আধার,
বিজয় দুন্দুভি তব বাজুক গম্ভীর!
আমি অশ্রুজল চোখে পরাইব আজ
জয়মাল্য তব কণ্ঠে ওগো রাজরাজ!

প্রার্থনা

নিখিলের প্রাণ তুমি! তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আধার;
জাগরণে কর্ম্মভূমি,
শয়নের স্বপ্ন তুমি,
ওগো সর্ব্বপ্রাণময়! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আধার!
নিও পাপ নিও পুণ্য
হৃদয় করিও শূন্য
ভরি দিও শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায়!
মহান্ করিয়া দিও তব মহিমায়!
আমারে জড়ায়ে নিও
আমারে ঢাকিয়া দিও
ওগো মহা আবরণ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আধার!

গান

আমার পরাণ ভরি উঠে যত গান
তোমার পরাণ হ'তে পায় যেন প্রাণ!
হে অনন্ত! হে মহান্! তুমি প্রাণ-সিন্ধু!
পরাণ-তরঙ্গে তব আমি প্রাণ-বিন্দু!
আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ-পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ-হরষে!
আজিকে ডুবুক যত ছোটখাট গান
ওই তব মহাগানে! ওগো মোর প্রাণ!
ওগো প্রাণ-স্পর্শী! করহ পরশ মোরে!
তোমার অনন্ত গানে প্রাণ যা'ক ভ'রে!

নীরবতা

আজি শান্ত হিমগিরি, শান্ত তরু লতা!
প্রশান্ত গগনকোলে তপন জ্বলিছে!
পরাণ-মন্দিরে আজি মহা নীরবতা
হে নীরব! হে মহান্! তোমারে বরিছে
পূর্ণ ক'রে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর-নিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান্ সঙ্গীতে!

সাগর-সঙ্গীত

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

গণইতে দোষ-গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।

হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক’ তোমা, ছন্দে গেঁথে লই!
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র-করে
করিতেছে টল্ মল্ কি যে স্বপ্নভরে!
সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি!
দাঁড়াও অন্তরমাঝে, ছন্দে গেঁথে লই!
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি অর্ণবের গানে,
পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের তানে,
ছন্দাতীত ছন্দে আমি তোমারে গাঁথিব!
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব!
তুমি কি রবে না সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা!
ছন্দোবদ্ধ, পরিপূর্ণ, নিত্য অচঞ্চলা?

সাগর-সঙ্গীত

আজিকে পাতিয়া কান,
শুনিছি তোমার গান,
হে অর্ণব! আলো ঘেরা প্রভাতের মাঝে:
এ কি কথা! এ কি সুর!
প্রাণ মোর ভরপুর,
বুঝিতে পারি না তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত-মুখরিত প্রভাতের মাঝে!

২

ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি ও গানে।
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।
কখনো বাজিছে ধীর,
কখনো গভীর,
কখনো করুণ অতি, চোখে আনে জল,
উদ্দাম উন্মাদ কভু করিছে পাগল!
তোমার গীতের মাঝে,
কি জানি কি বাজে!
তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে,—
আমার সকল অঙ্গ শিহরে, শিহরে!
ওই তব পরাণের অন্তহীন তানে;
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।

ওই তো বেজেছে তব প্রভাতের বাঁ
আনন্দে উৎসবে ভরা! সূর্য্যকররাশি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে আজ আনন্দে লুটায়,
উজল উছল জলে কুসুম ফুটায়।
গীত-ভরা স্বর্ণালোকে ফুটে পুষ্পদল,
তোমার চরণ বেড়ি করে টলমল!

তোমার সঙ্গীত আজি বিহঙ্গের প্রায়,
মাখি সে সোনার স্বপ্ন তার সর্ব্ব-গায়,
উড়িয়া বেড়ায় মোর হৃদয়-আকাশে,
প্রেমের তরঙ্গে আর বসন্ত-বাতাসে!

৪

কোথায় রাখিব আজ এ সুখের ভার,
কারে দিব আজ মোর অশ্রু উপহার!
এই অজানিত সুখ এ দুঃখ অজানা,—
বাধাহীন এ উৎসবে, মানে না যে মানা।
সকল সুখের রাশি পুষ্প হয়ে ফুটে,
সব দুঃখ আজ মোর, গীত হয়ে উঠে!
বিচিত্র এ গীত-লোক, পুষ্পের কানন!
কি জানি কেমন ক'রে কাঁপিছে এমন!—
কোথায় রাখিব বল অন্তরের ভার,
তোমার উৎসবে আজি, হে সিন্ধু আমার!

৫

তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে,
সোনার স্বপন ভরা প্রভাতের মাঝে;
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার,
গগনে পবনে বহে সেই গীতধার!
কি মোরে করেছ আজ! মনখানি মম,
শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম'—
পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
গরবে গৌরবে আজ উঠিছে বাজিয়া।

৬

এই তো এসেছে ঊষা অনন্তে ভাসিয়া,
স্বপ্ন সম শুভ্রালোক অঙ্গে জড়াইয়া,
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝরিয়া পড়িছে,
শুভ্র এই স্বপ্নালোকে স্বপন রচিছে।

পূর্ণ আজ এ আলোকে সকল আকাশ,
অনন্ত সঙ্গীত মাঝে নীরব বাতাস।
নিঙাড়ি ও বক্ষোভরা সর্ব্ব আকুলতা,
গীত-ধ্যানে রচিতেছ শব্দ নীরবতা।
হে গায়ক অনন্তের! কোথা গীত বাজে?
শব্দহীন কোন্ লোকে? কোন্ উষামাঝে?

৭

জানি না কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানি না গানের সুর, তান লয় মান,
আমার অন্তরতলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়া-ভরা আমার পরাণ।
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো-মাঝে, সাঁজের আঁধারে।
তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয়-দুয়ার,
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে।
অপূর্ব্ব এ মিলনের গোটা কত গীতে
পরাণ ভরেছি আজ তব পায়ে দিতে।

৮

তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,—
আমি হে রয়েছি তব হাতের বিষাণ!
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী!—বাজাও আমারে
দিবস-রজনী ভরি আলোকে আঁধারে,
বাজাও নির্জ্জন তীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়,—
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায়!
ওগো যন্ত্রি! আমি যন্ত্র, বাজাও আমারে—
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে!

৯

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে!
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে!
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন!
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল!
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু! দিবস-যামিনী!

১০

অপূর্ব্ব এ গীত-লোকে উড়িয়া বেড়ায়
সঙ্গীত আকুল হৃদি বিহঙ্গের প্রায়!
কোন কালে কোন-খানে অন্ত নাহি পাই,
অনন্ত এ গীত-লোকে উড়িয়া বেড়াই!
অনন্ত শবদ ভরা আকুল নির্জ্জন,
বিচিত্র এ সঙ্গীতের নীরব গুঞ্জন।
অনন্ত এ গীত-লোকে আপনা ডুবাই,
কোন কালে কোনখানে তল নাহি পাই।
হে অকূল! হে অগাধ সঙ্গীতমণ্ডল!
কি শব্দে নিঃশব্দে ফোটে চিত্ত শতদল!

১১

ওগো চিত্রকর কত রঙ্গে রচিতেছ,
কত বর্ণে বর্ণে তুমি ফুটায়ে তুলেছ!
তোমারি কুসুমপুঞ্জে অপরূপ ফুল!
অপূর্ব্ব আলোকে তব ঐশ্বর্য্যে অতুল!
আঁখি মোর ছুটিতেছে দরশ-লোলুপ
ঘিরিয়া ফিরিয়া তব পুষ্প অপরূপ!
চাহি না কুসুমকুঞ্জ চাহি শুধু গান,
শবদ-তরঙ্গে আমি ভাসাইব প্রাণ!
তবে দাও দাও মোরে দাও ডুবাইয়া,
সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া,
আমার নয়নপটে! আমি অন্ধ হব,
শবদ-সাগরমাঝে আমি ডুবে রব!
আর কিছু রহিবে না। ভুবনমণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিবে কেবল।

১২

কি আজ ভাসিছে তব বক্ষ পরকাশি
উজল স্বপ্নের মত পরিপূর্ণ চাঁদে!
কি অনন্ত শান্তিভরা জোছনার রাশি,
পরাণে ঝঙ্কারি উঠে আনন্দে, অবাধে!
পূর্ব্ব-জনমের এ কি স্বপনের ছায়া,
কোন পূর্ব্ব-পুণ্যফলে উঠেছে ভাসিয়া
তোমার হৃদয়-তলে! কোন পূর্ব্ব মায়া
রচিতেছে স্বপ্ন তব জীবনে জাগিয়া!
আমার পরাণে আজি, কাঁপিছে কেবল
জোছনা-তরঙ্গে শত স্মৃতি-পুষ্পদল।
শত জনমের যেন হাসি অশ্রুভারে,
পরাণ উঠিছে গাহি গীত-পারাবারে।
সকল জনম যেন এক হয়ে গেছে,
একটি পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে।

১৩

আজি মেঘ-পূর্ণ দিন ধূসর আঁধার,
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝাঁপায়ে পড়িছে
অশান্ত বেদনা-ভরে দুলিছে ফুলিছে,
কাঁপিছে গর্জ্জিছে যেন মহা হাহাকার!
আজি যে আকাশভরা ধূসর আঁধার!
আজি যে বক্ষের মাঝে মহা হাহাকার!
এ কি সুখ? একি দুঃখ,—প্রণয় গভীর
এ কি? উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত অধীর!
কি গাহিছে, কি চাহিছে, হৃদয় আমার!
আজি যে আকাশভরা ধূসর আঁধার!

আজি যে আঁধার ভরা তোমার আকাশ!
আজি যে পাগল করা তোমার বাতাস।
আজি যে ফেলেছে ছায়া প্রলয় তুফান
তোমার আঁধার বুকে আজি তব গান
অন্তহীন দিশাহারা, উন্মাদের মত
আমার হৃদয়তলে গরজে সতত।
তবে এস, ভেসে এস, উন্মাদ আমার!
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব, ডুবিব, আজ প্রলয় আভাসে,
মরণ আঁধার-ভরা আকাশে বাতাসে!

এ নহে স্বপন কুঞ্জে কুসুমের হার,
এ নহে কোমল বক্ষে মধুর ঝঙ্কার।
এ যে গো নির্দ্দয় রুদ্র! মরণের রঙ্গে,
চরাচর ডুবে যায়, প্রলয়-তরঙ্গে!
ঘন ঘোর অট্টহাসে মরণ ডম্বরে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড় পাতালে অম্বরে;
বিদ্যুত-বিহীন নিশা অশনি বরজে
ছিন্ন-ভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে!
উন্মত্ত তরঙ্গে তব অসুত ফণিনী
বিস্তারি অসংখ্য ফণা অনন্ত রঙ্গিণী,
ঘন ঘোর ঝঞ্ঝা-বায়ু আঁধার পরশে
ভীষণ-ভৈরব এ কি প্রলয় বরষে!
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্ত্রিছে মরণ-গীতি অনন্ত আঁধারে।

১৬

অনন্ত এ প্রভঞ্জন মোর বক্ষ ভরি
ছিন্ন পাল ভগ্ন হাল ডুবে মন-তরী!
প্রলয় পয়োধি জলে মরণের পারে
আশ্রয়-বিহীন প্রাণ অনন্ত আঁধারে!
এস তবে মৃত্যুরূপে ওগো সিন্ধুরাজ!
অবারিত বক্ষোমাঝে তুমি রবে আজ।

১৭

হে রুদ্র মরণদেব! জটী জটাধর!
প্রলয়-ত্রিশূল তব সংহর! সংহর!

জীবনেরে ছেড়ে দাও বাঁচিতে মরিতে,
আপন হৃদয়কুঞ্জে আপনারি গীতে !
অনাদিকালের বক্ষে সৃষ্টি শতদল,
আপনারি সুখে দুঃখে করে টলমল,
অনন্ত সঙ্গীত-ঘেরা গগনের তলে
তোমার সঙ্গীত-ভরা তরঙ্গিত জলে।
তাহারে ছাড়িয়া দাও ফুটিতে ঝরিতে,
হে রুদ্র প্রলয়-সিন্ধু !—বাঁচিতে মরিতে !

১৮

রাখ, রাখ, রথ তব, হে অন্ধ বিজয়ী,
নামাও হস্তের অস্ত্র, সন্ধ্যা আসে ওই,
শান্তিময়ী, ধীরে ধীরে, মৃদুল চরণে,
গগন ভরিয়া গেল ধূসর বরণে !
রাখ রথ ! শান্ত হও ! ওগো রণশ্রান্ত,
হে মোর বিজয়ী বীর, হে আমার ক্লান্ত !
আমার পরাণ ত'রে বৃথা যুদ্ধ করা
আমি ত আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা !
জ্বেলে দিব সন্ধ্যা-দীপ তোমার পরাণে
হৃদয়-মন্দির তব ভরি দিব গানে।
পাতিব তোমার তরে শয্যা সুশীতল
তোমার চরণতলে রবে শান্তি-জল ;
আমার পরাণ তরে মিছে যুদ্ধ করা
আমি যে আপনা হ'তে দিতে'ছিনু ধরা।

১৯

আবার ফিরেছে প্রভু ! হৃদয়-গহনে
ফলে ফুলে পরিপূর্ণ আনন্দ পবনে !
থেমে গেছে আজ তব প্রলয়-সঙ্গীত,
অধরে নয়নে ভাসে জীবন ইঙ্গিত।
আমি চেয়ে আছি তব প্রভাতের পানে
কি আনন্দ বহে যায় পরাণে পরাণে !
সঙ্গীত উন্মুখ প্রাণ ফুটিবে এখনি
হৃদয় ভরিব গানে, ডাকিবে যখনি !—

তোমার সঙ্গীত-ঘেরা ঝঙ্কৃত গগনে,
তোমার কুসুম-ভরা পুষ্পিত পবনে

তরুণ উষার আলো প্রতি অঙ্গে তব,
সোনার ঢেউয়ের মত ব'হে চ'লে যায়,
উছলি, উছলি উঠে স্বপ্ন নব নব !
দুলিতেছ আজ তুমি সোনার দোলায়।
আজি যে সেজেছ সিন্ধু, রাজার মতন।
সোনার তরঙ্গে বহে প্রেম আপনার :
তরুণ প্রেমিক এক রাজার মতন।—
সোনায় ভরিয়া গেছে হৃদয় আমার।
উষার আলোকে ভরা পরাণ এনেছি
রেখে যাব আজ তব চরণতলায়,
সোনার কমলে আমি মালিকা গেঁথেছি
দোলাইব আজ তব সোনার গলায়,
একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে
তরুণ উষার কোলে স্বপন বিজনে !

আজি যে আকাশ গাহে করুণ সুরে !
হৃদয় উদাস করা করুণ সুরে !
মেঘেরা কি কথা কহে, বাতাস কাঁদিয়া বহে
সাগর চুমিয়া আর গগন ঘুরে—
করুণ সুরে।

আজি যে পরাণ মোর
বাজিয়া উঠেছে ঘোর
করুণ সুরে।

কিবা খোঁজে কিবা চায়,
কোথা থাকে কোথা যায়,
দূরে অদূরে !

ওই যে মেঘের পানে, ছুটে যায়
কোন টানে
গাহিছে সকল প্রাণে
করুণ সুরে।
নাহি ছন্দ নাহি তান
পরাণ পুরে—
আজি যে আকাশ-ভরা করুণ সুরে।

২২

ঘুমাও ঘুমাও এবে হে সিন্ধু আমার!
নির্জ্জন গগনতলে, গীতশ্রান্ত চোখে।
মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ চারিধার।
ঘুমাও ঘুমাও এই স্তিমিত আলোকে!
আমি ব'সে আছি একা এ পারে তোমার,
দুই চোখে চেয়ে আছি তব মুখপানে!
ঘুমাও ঘুমাও তুমি। হৃদয় আমার
জাগিছে কাঁপিছে কোন শব্দহীন গানে।
কবে পাব পরিচয় হে বন্ধু আমার!
কখন জাগিবে তুমি? কোন্ গীতমাঝে?
আমি রব প্রতীক্ষায়। দুহাত তোমার
বাড়াইয়া দিও তবে অন্ধকার সাঁঝে!

২৩

কবে দেখেছিনু তোমা, হাত ধরেছিনু,
চেয়েছিনু চোখে? কোন্ কালে কোন্ দেশে
সে দিন কি তব সাথে কথা কয়েছিনু—
তুমি গেয়েছিলে গান? চেয়েছিলে হেসে?
সে দিন কি ছিল প্রাণ এত ভরপূর—
গভীর আবেগভরা এত অশ্রুজলে?
এত কথা এত ব্যথা ওগো এত সুর
সে দিন কি বেজেছিল পরাণ অতলে?
আমারে কি ধরেছিলে বক্ষে আঁকড়িয়া
স্নেহার্দ্র বন্ধুর মত দু'হাতে তোমার?
অথচ সকল কথা গেছিল ভাসিয়া
প্রেমের মোহন মন্ত্রে হৃদয় তোমার?
ওগো সব মনে নাই। শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন্ দেশে।—
তোমার পরশখানি মনে জেগে রয়,
এত কাল পরে তাই আসিয়াছি ভেসে।
মনে হয় আজি কোন গুপ্ত অভিসারে
ভাল ক'রে দেখা হবে, হবে পরিচয়
যেন কোন স্বপ্নময় আলোক-আঁধারে
জাগিবে মোদের সেই পুরাণ প্রণয়।

২৪

এখনো জাগেনি কেহ, আমি জাগিয়াছি
নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়,
এখনো উঠেনি রবি আমি উঠিয়াছি
সিনান করিব তব প্রাণ মহিমায়।
বাহিরের গীত হবে, বাহিরে পড়িয়া,
সবাই শুনে না সে ত সবাকার তরে!—
দিও মোরে দিয়ে যা' হৃদয় ভরিয়া
যে গীত অন্তরে তব দিবানিশি ঝরে!
হে সিন্ধু! হে বন্ধু! ওগো তাই আসিয়াছি,
সে গীত বাজিবে প্রাণে আমি জাগিয়াছি।

২৫

এখনও উঠেনি রবি, মোহন আঁধার
ঘিরেছে তোমারে যেন স্নেহ আবরণে?—
প্রশান্ত অধর আর নয়ন তোমার
কিবা নিদ্রা, কিবা স্বপ্ন, কিবা জাগরণে!
কি শান্ত সুন্দর চোখে, অর্ণব আমার!
চাহিছ আমারে পানে এ মোহ আঁধারে।
কথা মোর, ব্যথা মোর, সঙ্গীত আমার,
স্তব্ধ হয়ে গেছে এই সন্ধ্যার মাঝারে।

আমি আছি তব ছোট ভাইটির মত
আমারে স্নেহের চোখে দেখ মাঝে মাঝে!
যে গীত বাজিছে তব বক্ষে অবিরত
আমার পরাণে যেন মাঝে মাঝে বাজে।

২৬

রবিকর পড়িয়াছে অধরে তোমার
প্রশান্ত গভীর তব গৌরবের মত।
আমারি অন্তর হ'তে লইয়া আমার
সোনার স্বপন ঘেরা পুষ্প শত শত
কণ্ঠে দেছে উপহার। আমি শূন্য হাতে
আসিয়াছি তব পাশে। হে সিন্ধু আমার!
শুনাও একটি গীত। মোর প্রাণপাতে
ঢালি দেও অন্তহীন অমৃতের ধার
চিরদিন চিরকাল প্রতিধ্বনি তার
বাজিবে উজ্জ্বল করি অন্তর আমার।
আজ হ'তে আমি, হে অর্ণব! হে অশেষ!
গাহিব তোমার গান ফিরি দেশ দেশ।

২৭

থাক থাক আজ নয়। এত লোকমাঝে
যে গান সকলে শুনে সেই গান গাও।
এরা ত সেজেছে আজ প্রমোদের সাজে
এদের হৃদয় লয়ে হাসাও নাচাও।
যবে অন্ধকার আসি ঢাকিবে তোমায়
থেমে যাবে হেথাকার হাসির লহরী
দুই জনে মিলিব হে! গান দুজনায়
চারিদিকে অন্ধকার রহিবে প্রহরী।
তুমি এক গান গাবে আমি গাব আর
দুজনে ভাসিয়া যাব অনন্ত হরষে!
তোমার অন্তর হ'তে অমৃতের ধার
আমারে ডুবায়ে দিবে তোমার পরশে।
দুই জনে মিলিব হে! গান দুজনায়
আঁধার রজনী যবে ঢাকিবে তোমায়।

২৮

ওগো কত কাল ধ'রে বহিতেছ তুমি
এ গীত বেদনারাশি হৃদয় ভরিয়া।
কত জন্ম-জন্মান্তর,
কত যুগ-যুগান্তর।
ওগো কত যুগ হ'তে ওই চিত্ত চুমি
এ গান ধ্বনিছে বিশ্ব পাগল করিয়া।—
কত যুগ-যুগান্তর
কত জন্ম-জন্মান্তর।
হে অনাদি, হে অনন্ত, তব ব্যাপ্ত মহিমায়
এ চির ক্রন্দনধারা কেমনে বহিয়া যায়
কাঁদিছেছে এ কি ক্ষুধা এ কি তৃষ্ণা অনিবার!
এ কি ব্যথা গরজিছে শ্রান্তিহীন দুর্নিবার!
কত জন্ম-জন্মান্তর
কত যুগ যুগান্তর।
হে আমার অভিশপ্ত! হে বন্ধু আমার!
হে আমার শান্তিহীন অশ্রু পারাবার!
আমি যে তোমার লাগি
এসেছি সকল ত্যাগি,
আমি যে তোমার লাগি আসিব আবার
কত যুগ-যুগান্তর
কত জন্ম-জন্মান্তর।

২৯

তোমায় আমায় যোগ ওগো পারাবার!
কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ পরপার
উদারা মুদারা তারা বল কোন্ গ্রামে?
কোন্ মহা শব্দের—কোন্ নিত্য ধামে?
কোন্ সঙ্গীতের কোন্ রাগিণীর প্রাণে?
কোন্ সুরে কোন্ তালে কোন্ মহাগানে,
অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দুজনে এসেছি যেন দুটি প্রাণ-স্রোতে!

তার পর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে,
কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার !
তুমি ভেসে যাও সখা ! অনন্তের পানে !–
আমি যে ভাসিছি শুধু তোমারি এ গানে !

নিদ্রাহীন নিশি মোর ভরি দিলে আজ
সঙ্গীত-তরঙ্গে তব ওগো গীতরাজ !
অন্ধকারমাঝে আজি কি শব্দ-কল্লোল
চোখে মুখে বক্ষে মোর তরঙ্গ-হিল্লোল
সম, পড়িছে ঝাপটি ! কাঁপিছে পরাণ,
ঝটিকায় পূর্ণাহুতি পুষ্পের সমান !
সকল সুখের সর্ব্ব-বেদনার ভারে,
উদ্দাম সঙ্গীত-ঘেরা এই অন্ধকারে ।
তোমারে দেখিতে নারি ! শুধু পরশিছে
আমার বক্ষের মাঝে কি যে বিপুলতা !
কত শত শব্দহীন সঙ্গীত জাগিছে,
কত শত সঙ্গীতের পূর্ণ নীরবতা !
সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী,
সকল সঙ্গীত-মাঝে অগীত কি জানি !

৬১

ছোট ছোট দীপ লয়ে খেলিতেছিলাম,
গুন্ গুন্ গাহি গান ঘরের ভিতরে—
ক্ষুদ্র প্রাণে আনমনে আঁকিতেছিলাম
ছোট ছোট স্বপ্ন-ছবি প্রদীপের করে !
তোমারে ভুলিয়াছিনু হে সিন্ধু আমার !—
আপনার স্বপ্নবদ্ধ ক্ষুদ্র খেলাঘরে—
আলস্যে রচিত মোর পুষ্পমালিকার
তুলিয়া ধরিতেছিনু ক্ষুদ্র দীপকরে !
যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জ্জনে,
অনন্ত রাগিণী-ভরা ধ্বনিতে তোমার,
হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জ্জনে,
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার !
ভাঙ্গিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিভিল !
আমারে তোমার বক্ষে ডুবাইয়া দিল !

৬২

এখনো নামেনি সন্ধ্যা, দিনমণি অস্তপ্রায়,
আলো অন্ধকার ঝরে, তোমার সকল গায় ।
মেঘেরা ভাসিয়া যায়, তোমা পানে চাহি চাহি,
মুগধ বাতাস বহে গুন্ গুন্ গাহি গাহি ।
অনিশ্চিত আলোকের অপূর্ব্ব এ অন্ধকার !
আকাশ চাহিয়া আছে অবাক্ নয়ন তার ।
ওগো সিন্ধু ! অন্ধ তুমি কোন্ ছায়ালোক জুড়ে
গাহিছ করুণ গীত দ্বিধায় জড়িত সুরে ?
কোন্ প্রশ্ন উঠিয়াছে পাওনি উত্তর তার ?
হৃদয় ভরিয়া আছে কোন্ সমস্যার ভার ?
জীবন-মরণ সাথে কি কথা কহিছ আজি ?
কোন্ তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে কি ব্যথা উঠেছে বাজি ?
তোমার পরাণ হ'তে আমার পরাণ পরে
সকল আলোক আর সকল আঁধার ঝরে ।
পরাণ কাঁপিছে এই ছায়ালোকে ছায়াময়,—
এ কি সত্য ? এ কি মিথ্যা ? এ কি আশা ?
এ কি ভয় ?

আজিকে সঙ্গীত তব কোথা ভেসে যায় ?
ধূসর তরঙ্গমাঝে নীরব সন্ধ্যায় !
কোন্ দূরে অন্ধকারে কোথা উঠে বাজি ?
আমার পরাণ লয়ে কি করিছে আজি !

আরতির শঙ্খ যেন উঠিল বাজিয়া
তোমার পূজার লাগি ধূপ-ধূনা দিয়া
পুণ্য ধূমে সুপবিত্র হৃদয়-মন্দির !—
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর !
হে পূজারি ! আজি তুমি কোন্ পূজা কর ?
পরাণ-প্রদীপ মোর উর্দ্ধে তুলি ধর,
কার পানে, কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ ?
কোন্ পূজা লাগি বল এত আয়োজন ?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু ! মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভ'রে !

৩৪

ওই যে এসেছে সন্ধ্যা ! পূরবী রাগিণী বাজে,
হে সাগর ! তোমার এ প্রশান্ত বুকের মাঝে !
হৃদয় উদাস-করা গভীর ঝঙ্কারে তার
প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছে নীরব সঙ্গীতধার !
মুখর তরঙ্গগুলি শান্ত হ'য়ে আসিতেছে
চঞ্চল বাতাস-দল স্থির হয়ে থেমে গেছে !
গগন আলোকহীন, শশী তারা কিছু নাই,
যেন কোন্ মহাশূন্য ঘিরেছে সকল ঠাঁই !
আজি কি মরমে তব, নাহি বাসনার লেশ ?—
হয়েছে সকল প্রেম—সকল কর্ম্মের শেষ ?
মায়াহীন ছায়া-ভরা ধূসর এ অন্ধকারে,
আপনার মাঝে তাই ডুবাইছ আপনারে !
আমিও আপন মাঝে আপনা লুকায়ে রাখি !—
যবে যোগ ভেঙ্গে যাবে আমারে তুলিও ডাকি !

৩৫

শব্দহীন মহাকাশ, শান্তিভরা সমুদায়,
আজি বরষিছে সন্ধ্যা তোমার সকল গায়
মহাশান্তি নীরবতা ! হে সাগর ! হে অপার !
বাক্যহীন আজ তুমি শুদ্ধ শান্তি-পারাবার !
নীরব সঙ্গীত তব—শান্তিভরা অন্ধকারে
আনন্দে উজ্জ্বল রাখে মর্ম্মমাঝে আপনারে !
সে আনন্দে বিরাজিছে তোমার সকল দেহ !
মগ্ন হয়ে গেছে তার সকল বিষাদ গেহ !
সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম প্রায় ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণতলে !
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগিবর !
নিবিড় নিশ্বাসহীন ধীর স্থির আঁখিকর,
পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে ব'সে আছি কর মোরে একাকার !

৩৬

সাধন-ভজনে আজি কুসুম উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভ'রে ! তোমার নয়ন দুটি
ভক্তি-রসে ঢুলু ঢুলু ! বিগলিত করুণায়
তোমার তরঙ্গদল নেচে নেচে বহে যায় !
গগন ভরিয়া গেছে সঘন গম্ভীর বোলে,
চরাচর ছেয়ে আছে মধুর কীর্ত্তন-রোলে !
হরিবোল ! হরিবোল ! করতাল বাজে যেন,
হৃদয়ে বাজেনি কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন !
মুক্ত বায়ু প্রভাতের—আনন্দ কীর্ত্তনভারে,
নাচিছে পাগল হয়ে অন্তরের চারিধারে !
দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি ! কি মধু বিরহ দিয়া !
প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! তোমা পাই কি না পাই,
আমি ভেসে ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই !
হে সাধক, হে ভকত, করহ কীর্ত্তন নব !
সঙ্গে রেখো চিরকাল, সাধনে ভজনে তব !

৩৭

এ পারে আলোকভরা ও পারে আঁধার !
পার ক'রে দাও মোরে ওগো পারাবার !
হোথায় তোমার মাঝে
কি জানি কি বাজে !—
তোমার গানের মাঝে, আলো কি আঁধার !

(আমি) দেখিব ও পারে গিয়ে
শুনিব পরাণ দিয়ে!—
তোমার গানের মাঝে, আলো কি আঁধার!
এ পারের গীতগুলি
পরাণে লয়েছি তুলি,
মালিকা গাঁথিব তার ও পারে তোমার!—
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ও পার।

৩৮

ও পারে কি আলো জ্বলে রহস্যের মত,—
যে আলো দেখেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায়?
ও পারে কি গীত-ধ্বনি জাগে অবিরত,—
যে গান শুনেনি কেহ দিবসে নিশায়?
ও পারে কি বসে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত আকুল,
পরাণ-পরশ তরে আমারি মতন?
ও পারে কি দেখা যায়, অনন্ত অতুল,
তোমার অন্তর-ছায়া পরাণ-স্বপন?
আমি যে তৃষিত বড় ওগো মহাপ্রাণ!
আমি যে তৃষ্ণার্ত্ত অতি পরাণ-মাঝারে!
আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ!
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ও পারে!
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন?
কাঙাল পরাণ হবে রাজার মতন?

৩৯

এ পার ও পার করি পারি না ত আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!
পরাণ ভাসিয়ে গেছে কূল নাহি পাই!—
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই!
আজি যে ঘিরেছে মোরে গাঢ় অন্ধকার!
সাড়া শব্দ নাহি পাই পরাণ-মাঝার!
নীরব ক্রন্দনে ভরা চোখে নাহি জল,
আজি যে তোমার তরে পরাণ পাগল।
খুঁজেছি তোমারে কত রঙ্গের মাঝে,
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে!
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে,
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে!
হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!

অপ্রকাশিত কবিতা

দারজিলিংএ রচিত
দেশবন্ধুর কবিতা

এ যে আমার ফুলের হার,
এ যে আমার কাঁটার মালা,
এ যে সকল মধুর মিঠে,
এ যে আমার বিষের জ্বালা.
দিয়েছ যা কিছু নিতে যে হবে,
যত না সুখ যত না জ্বালা,
ঐ দেখ তব চরণমূলে
দিয়েছি ভ'রে কিসের ডালা।

চিত্তরঞ্জনের শেষ কবিতা

নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন চূড়া,
সেই ত হাতে মোহন বাঁশী,
সেই মূরতি হেরবো ব'লে
পরাণ বড় অভিলাষী ;
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে,
আলো করি কুঞ্জ-দুয়ার।
এস আমার পরশমাণিক,
বেদবেদান্তে কায কি আর।

বাঙ্গালীর সঙ্গীত

আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ
গাহিছে আশার গীতি, পূর্ণ কর আশ ;
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।

করহ সার্থক আজ সত্যেরে সাধিয়া
দূর করি' হিংসাদ্বেষ বিদ্রূপ বিলাস ;
এই মহামন্ত্র রাখি বক্ষেতে বাঁধিয়া
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।

ওই হের, দেবতারা প্রসন্ন হইয়া
লিখেছে গগন-ভালে রবি-রশ্মি দিয়া—
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।

ওই শুন, দৈববাণী গগনে গর্জ্জিয়া
আলোড়িছে বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রাণমন ;
আপন কর্ম্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন!

শুনো না অলীক কথা মিথ্যা প্রলোভন
সঁপিও না সর্ব্ব আশা বিদেশি-চরণে,—
দূর কর দুর্দ্দিনের মিথ্যা আরাধন
সত্যেরে সহায় কর জীবনে মরণে!

দেবতা কহিছে কথা অন্তর ভরিয়া
দেবতার বাক্যে আজ পূর্ণ কর মন!
আপন কর্ম্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন।

অবসাদ

এই ত সেই তমালতলে
মোহন মালা দিলে গলে,
আদর ক'রে কইলে কথা
ভিজিল মালা চোখের জলে !
সেই ত সেই মাধবী রাতে
জড়িয়ে নিলে বুকের পরে
সকল সুখ সকল ব্যথা
গলিয়ে দিলে সোহাগ ভরে
আজি—বঁধু ! কোথায় তুমি ?
হাহা করে তমালতল !
কোথায় গেল মুখের হাসি
কোথায় গেল চোখের জল !
সকলি শুষ্ক মরুভূমি,
হাহা করে হৃদয়তল !
কেন নিলে প্রাণ হাসি ?
কেন নিলে চোখের জল ?

গান

কাছে কাছে না বা এলে—তফাৎ থেকে বাসব ভাল ;
দুটি প্রাণের আঁধার-মাঝে প্রাণে প্রাণে প্রদীপ জ্বাল ।
এ পার থেকে গাইব গান—ও পার থেকে শুনবে ব'লে ;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে ।
আশার মত চুমোর রাশ পরাণ হ'তে উড়াইব ;
গানের সাথে তোমার ওই মুখে চোখে বুলাইব ।
পাগল যত পরশ তৃষা কোমল হয়ে ভাসবে গানে ;
ফুলের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেব তোমার পানে.
লাগবে যখন কোমল করে তরুণ তব প্রাণের পারে ;—
আশার মত ফুলের মত পরাণ ঘেরা অন্ধকারে,
ভয় পেয়ো না চমকে উঠে ; প্রাণের মাঝে চেয়ে থেক,
ভেসে আসা প্রাণের নিধি প্রাণে প্রাণে বেঁধে রেখ ।

নারায়ণ

জগৎরূপে যে বিকাশ তোমার
তাহা কি ভুলিতে পারি ?
তাই অম্বুমেলায়, সৌরকিরীটে,
শষ্প আস্তৃত শ্যাম পাদপীঠে,
তাই-নীরদ কুন্তলে নির্ঝরোপবীতে,
স্নিগ্ধ কৌমুদীবরণ সিতে,
সদা নিরখিছ চিত্তহারী
তাই আঁখি রেখে ওই আঁখি-তারকায়
আপনা পাসরি প্রভাত সন্ধ্যায়
আঁখি-পথ দিয়ে ও মাধুরী পিয়ে
যেন বা তিয়াষ মিটে না ।

বিচিত্র তোমার এ কি রূপ হরি !
ধরে না নয়নে বুঝি পড়ে ঝরি,
যেন জনম জনম দেখি আঁখি ভার
তবু দরশ-পিয়াস ছুটে না ।

তোমার মাঝারে হব না অচিন,
তোমা হ'তে যেন রহি চির-ভিন,
জলবুদ্‌বুদ্ জলে হলে লীন,
যে সুখ—সে সুখ চাহি না ।

গান

কীর্ত্তন—একতালা

মিটায়ো না এই পিয়াসা এই ত আমার মিষ্টি লাগে,
ওগো বিরহী চির-বিরহী, এ তৃষা যেন নিত্য জাগে ,
মিলন আমি চাই না যে হে এই পিয়াসা যেন থাকে,
চোখের জল এত মধু—প্রাণবঁধু হে প্রাণবঁধু
মুছায়ো না চোখের বারি নাই বা এলে আঁখির আগে.
নাই বা হ'ল মিলন যদি—এই বিরহ নিত্য জাগে

সাধন-সঙ্গীত

[১৯০৬ খৃঃ রচিত, পুরাতন খাতা হইতে]

তারিণী ! নিজেরে তরা
তোর সকল অঙ্গ মরণ-ভরা ।
নীরস নয়ন, নির্ব্বাক্‌ মুখ, শিথিল হস্তে খড়্গ ধরা !
নিজেরে তরা !
মুখে চোখে হায় !
মরণ তার চরণ-প্রান্তে কোটি কোটি মরা
তারিণী ! নিজেরে তরা ।
জেগে উঠ মা, জীবন পেয়ে
সে জীবন যাক জগৎ ছেয়ে
ভীম গভীর অট্টহাসি মরমে বাজুক শঙ্খ বাঁশী—
মরণ তাড়ায়ে জাগায়ে তুলুক মরণপ্রাপ্ত অসংখ্য মরা !
অসহায় ছাগ ঠেলে ফেলে দে ভারতের প্রাণ,
নে, মা, নে, মা, নে ;
হৃদয়-রক্তে হাসুক কৃপাণ—রক্ত অধর রক্ত নয়ান
হাসিয়া ডাকিয়া কাঁপায়ে তুলুক
মরণপ্রাপ্ত অসংখ্য মরা।
চেয়ে দেখ তুই আপনি মরা
তারিণী ! তারিণী ! নিজেরে তরা ।

গীত

কেদারা—কাওয়ালী ।

দুরাশা-কম্পিত স্বরে
কি গান গাইব আর ।
এত গীতি মনে মনে
এত ভুল বার বার ॥
অপূর্ব্ব বাসনা আর
গীত ভরে পূর্ণ প্রাণ,
শত গীত আলো ভরা
হৃদয় মন দিব যার
কি যেন গাহিতে যাই,
কি যেন গাহিতে চাই
কি যেন গাহিতে যাই
অভিশপ্ত হৃদি ।
ধ্বনিত বসন্ত তানে
অন্তরের চারি ধার,
আমার দুর্ব্বল ভাষা
শক্তিহীন ছিন্নতার ॥

গান

এই যে ছিল কোথায় গেল !
কেন আমার জাগালি
এমন মধুর বঁধুর ঘুম !
কেন সে ঘুম ভাঙ্গালি !
অচেতনে ছিলেম ভাল
বুকে ক'রে বুকের আলো,
কেন তোরা অমন ক'রে
প্রাণের আলো নিবালি !
সে যে তারে পেয়েছিলাম
প্রাণের মাঝে ছুঁয়েছিলাম
কেন চেতন বেদন দিয়ে
প্রাণের ব্যথা বাড়ালি !
সেই যে আমার বুকের মাঝে
বরণ করা বনমালী ।
স্বপন যদি দেখেছিলাম
কেন স্বপন ভাঙ্গালি !

বঙ্কিম-প্রতিভা

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু এক জন ব্যক্তি নহেন—যদিও তিনি খুব ব্যক্তিত্বশালী পুরুষই ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিমসাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস—দুই-ই।

আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নাম-গন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে Comteএর Positivsm থাকিতে পারে। Europeএর দুর্দ্ধর্ষ Nation idea থাকিতে পারে, Middle Ageএর সন্ন্যাস থাকিতে পারে—পারিপার্শ্বিক অবস্থাচিত্রণে অসঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে, আর্টের মাপকাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনার অপরিহার্য্য ত্রুটি থাকিতে পারে—পারে কি, হয় ত আছে; কিন্তু তথাপি ইহাতে বাঙ্গালী আছে—যে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শের, এমন কি, ভারতীয় আদর্শেও কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে! আমি আবার বলি—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।

আমি বঙ্কিম-সাহিত্যকে একটা যুগ-সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু যুগ-সাহিত্যের নানা দিক্ আছে। সেই নানা দিক্ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-রূপে যুগ সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে এবং সেই পূর্ণাবয়ব দেহের ভিতর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর Europeএর সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম-সাহিত্য—আত্মস্থ, সমাহিত, তেজঃপূর্ণ অথচ প্রশান্ত ও গভীর। ইহা সমুদ্রবিশেষ।

সাহিত্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্রে যতই পার্থক্য থাকুক, বঙ্কিম ও গিরিশ যুগের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, প্রতিভার বরপুত্র এই দুই মহাকবিই য়ুরোপের সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও—সাহিত্যের দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত বাঙ্গালীর যুগ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি। বাঙ্গালার—এমন কি, জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইঁহারা পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই, যেমন ইঁহাদের পরবর্ত্তী নাটক-নভেলে অন্যান্য ঔপ-ন্যাসিক ও নাটকরচয়িতৃগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহা দুঃখের বিষয় যে, তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা লইতেছেন।

বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপ্রয়োগ হউক—স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালায় তাহাই করিয়াছে—যাহা ফরাসীদের Voltaire Rousseau সাহিত্য করিয়া-ছিল। এই দিক্ হইতে বঙ্কিমসাহিত্যের আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আমার বিবেচনায় আর অধিক বিলম্ব না করিয়া তাহা আরম্ভ করা উচিত। আমি অনুরোধ করি যে, বাঙ্গালায় বঙ্কিম-সাহিত্যের সহিত ফ্রান্সের Voltaire ও Rousseau সাহিত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ আপনাদের মধ্যে কেহই শীঘ্র লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। কেন না, আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাঙ্গালায় Voltaire ও Rousseau

বক্তৃতাবলী

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত

বক্তৃতাবলী

-:*:-

মিঃ মহম্মদ আলী

(১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতা মেছুয়াবাজারে মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী প্রভৃতির অন্তরীণের বিরুদ্ধে যে সভা হয়, আলোচ্য বক্তৃতা তথায় প্রদত্ত হইয়াছিল)

ভদ্রমহোদয়গণ, আজ প্রাতঃকালে মিঃ আক্রাম খাঁ যখন আমাকে এই সভাক্ষেত্রে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন স্বতঃই আমার মনে হইয়াছিল যে, ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আজ হিন্দু ও মুসলমান সভাক্ষেত্রে সমবেত হইয়া একই স্বার্থের জন্য যুদ্ধে বদ্ধপরিকর—এ দৃশ্য দর্শনে আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, আমি বলিয়াছিলাম যে, অচিরে এমন দিন আসিবে, যখন হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়াইয়া, দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও আমার এ কথার সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনিও আমার ন্যায় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু তখনও আমি জানিতাম না যে, সেই দিন এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সেই আনন্দের কথা প্রকাশ করিতে গিয়াও আজ আমার হৃদয়প্রান্তে একটি দুঃখ, প্রিয়জন-বিরহের শোক উথলিয়া উঠিতেছে। আমার বন্ধু, সোদরোপম সুহৃদ্ পরলোকগত মিঃ রসুলের কথাই আমি বলিতেছি। হায়! আজ যদি তিনি উপস্থিত থাকিতেন! আজ তাঁহার উপস্থিতিতে আমাদের সকলেরই হৃদয় মহোৎসাহে ভরিয়া উঠিত! ভদ্রমহোদয়গণ, যে দিন প্রভাতে তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করেন, সেই দিনই আমি মহৎ শূন্যতা অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ এই বিশাল সভাক্ষেত্রে বিরাট জনসঙ্ঘ দেখিয়া সেই দিনের অপেক্ষা চতুর্গুণ অভাব অনুভব করিতেছি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন সর্ব্বজনপ্রিয়, সকলের শ্রদ্ধাভাজন আর কাহাকেও আমি দেখি নাই। হিন্দু ও মুসলমানকে সৌভ্রাত্রের পবিত্র বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার মত আর কেহ এ দেশে পরিশ্রম ও চেষ্টা করেন নাই। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এ বিষয়ে তিনি মুসলমান-সমাজের অগ্রণী ছিলেন। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পার্থক্য সত্ত্বেও, হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ যে এক, ইহা সর্ব্বপ্রথম তিনিই অনুভব করিয়াছিলেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, কর্ত্তৃপক্ষের অন্তরীণনীতির প্রতিবাদ করিবার জন্য এবং যাঁহারা অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে আলোচনা করিবার জন্য আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। আজ আপনারা যাঁহাদের মুক্তি-কামনায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞাপনে কাহার নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে? আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, সেই সকল ব্যক্তি হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই পরম শ্রদ্ধাভাজন।

মহম্মদ আলীর নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। সে জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। যখনই তিনি কলিকাতায় আসিতেন, আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। আমি আপনাদিগকে অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তাঁহার তুল্য একনিষ্ঠ দেশবন্ধু ও উৎসাহী মাতৃভূমির সেবক আমি আর দেখি নাই। মৌলানা সৌকত আলীর সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। কিন্তু আমার বহু অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ প্রশংসার কথা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় ধারণা যে, তিনি স্বার্থলেশহীন স্বদেশপ্রেমিক। সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান যাহাতে মিলনের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়, মৌলানা সৌকত আলী চিরজীবন সেই মহৎ কার্য্য-সাধনে আত্মপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে আমাদের সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও সমাদরভাজন, সে বিষয়ে অধিক বলাই নিষ্প্রয়োজন। শেষোক্ত নামটি শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে জানি। তাঁহার সহিত আমার অনেক দিনের প্রণয়। আমি আপনাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতেছি যে, তিনি এমন কোনও কাজ করেন নাই, যে জন্য তাঁহাকে অন্তরীণে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। আলোচ্য বিজ্ঞাপনে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আমি তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলাম। কিন্তু এই কয়টি নাম ব্যতীত, পূর্ব্ববঙ্গের এমন পরিবার নাই যে, সেই গৃহ হইতে কোন না কোন ব্যক্তিকে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয় নাই। আজ পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে ঘনঘোর বিষাদচ্ছায়া বিরাজ করিতেছে, কারণ, বিনা প্রমাণে, বিনা বিচারে, প্রত্যেক গৃহ হইতে কোন না কোন বালক, যুবক অথবা প্রৌঢ় কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া কালযাপন করিতেছেন। আমি আপনাদের তরফ হইতে এবম্প্রকার অন্তরীণনীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। আমি বলিতেছি, এই নীতি ইংরাজের অযোগ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্য বহু প্রাচীনকাল হইতে যে সত্যধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই নীতি তাহার পরিপন্থী। যাহার এতটুকু বিবেচনাশক্তি আছে, বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়ান্যায়জ্ঞান আছে, সে এই নীতির কখনই সমর্থন করিতে পারিবে না। সাম্রাজ্যের শান্তিরক্ষা ও মঙ্গলের জন্য, শীঘ্র এই নীতি পরিত্যক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

ভদ্রমহোদয়গণ, যে সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে আংশিকভাবে হোমরুল দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, যখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যের রক্ষাকল্পে কোনও না কোন আকারে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত করিতেই হইবে, যে সময়ে রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দেশমধ্যে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, সেই সন্ধিক্ষণে লোকমতে উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ কার্য্য করা কি সঙ্গত হইয়াছে? সমগ্র ভারতবাসীর মতের বিরুদ্ধে এ কার্য্য কি সমীচীন হইয়াছে? আর কেনই বা তাঁহারা অন্তরীণে আবদ্ধ থাকিবেন? এ জন্য যাঁহারা দায়ী, আমরা তাঁহাদিগকে কি বলিতে পারি না—'তোমরা যাঁহাদিগকে রাজনীতিক ব্যাপারের জন্য ভারতরক্ষা-আইনের দোহাই দিয়া আবদ্ধ করিয়াছ, তাহা অসঙ্গত? উঁহারা ভারতরক্ষা-আইনের কোনও ধারায় আবদ্ধ হইতে পারেন না। কারণ, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ও ভারতবর্ষের বিচারকগণ ঐ কার্য্যকে অবৈধ ও অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" ভদ্রমহোদয়গণ, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতির রায়ের একাংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমি আপনাদিগকে শুনাইতেছি। যে বিধান সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিচারপতি রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের এই দেশের "ভারতরক্ষা-আইন"—যে আইনের বলে আমাদের বন্ধুগণ আজ অন্তরীণে আবদ্ধ, সেই

আইনের সহিত সকল বিষয়েই এক। সুবিজ্ঞ বিচারপতি—লর্ড শ, (সমগ্র ইংলণ্ডে, এরূপ পণ্ডিত ও মহৎহৃদয় বিচারপতি আর নাই) বলিতেছেন, ভদ্রমহোদয়গণ স্মরণ রাখিবেন যে, যাঁহাদের জর্ম্মণ রক্তে উদ্ভব, সেই সকল ব্যক্তিকে ইংলণ্ডে অন্তরীণ অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; সে সম্বন্ধে লর্ড শ বলিতেছেন,—"এই নীতি কি শুধু স্বাধীনতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হইতেছে; ইহা কি মানুষের জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতেছে না?" বিচারক মহোদয়ের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে কলমের খোঁচায় তুমি একটি ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিতে পার, সেই লেখনীর একটি রেখাপাতে কি তুমি তাঁহার জীবনটাকেও গ্রহণ করিতে পার না? বিচারপতি মহোদয় বলিতেছেন;—"সাধারণের মঙ্গলার্থে, এই বিধানানুসারে গবর্ণমেণ্ট যদি বিনা বিচারে কোনও নাগরিককে অবরুদ্ধ করেন, তবে সেইখানেই কি গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইবেন? বিনা বিচারে তাহাকে হত্যাও করিতে পারেন ত? শত্রু-শোণিত হইতে উদ্ভূত এবং শত্রু-সম্পর্কিত বলিয়াই যদি কোনও ব্যক্তিকে, সাধারণের মঙ্গলার্থে বন্দী করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, তাহা হইলে সেই একই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, সেই ক্ষমতা-প্রয়োগে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে গুলী করিয়াও হত্যা করিতে পারেন না কি? আমি সুবিজ্ঞ এটর্ণি জেনারেলের নিকট এই কথাটা মীমাংসার জন্য উত্থাপিত করিয়াছিলাম, তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ঐ প্রকার ঘটাই সম্ভব। আমি ত মনে করি, ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অশান্তির সময়ে কর্ত্তব্যানুমোদিত ভাবিয়া এবং লোকের উত্তেজনা দর্শনে বিচলিত হইয়া, গবর্ণমেণ্ট যে এরূপ কার্য্য করিতে পারেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে লোকমত প্রবল হইয়া শত্রু সংশ্লিষ্ট ও শত্রুরক্তে উদ্ভূত ব্যক্তিগণের প্রতি বলিতে পারে যে, 'এরূপ বিপদ্ সমূলে উন্মূলিত করা চাই; যাহাদের উপর এমন সন্দেহ আছে, তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হউক,' আমার মনে হয়, এই উক্তির স্বপক্ষে উল্লিখিত নীতিই প্রবর্ত্তিত হইবে। এই নীতির উপরেই নিম্নতন আদালতের রায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সাধারণের মঙ্গলের জন্য, রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি এই ভাবে সেই ক্ষমতার পরিচালনা করেন, তাহা হইলে সে ক্ষমতা যে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারপূর্ণ এবং তাহার মত স্বেচ্ছাচারী কমিটী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, তাহা বলিতেই হইবে।"

উল্লিখিত মন্তব্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ বিচারকের লেখনী-নিঃসৃত। এখন আমরা বিশিষ্ট ঘটনাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। আপনারা সকলেই জানেন, মিঃ মহম্মদ আলীকে (তিনি আমার বিশেষ বন্ধু, এ জন্য তাঁহার সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতেছি, আশা করি, আপনারা তজ্জন্য আমায় মার্জ্জনা করিবেন) কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিনি সে সকল সর্ত্তে অনুমোদন করিয়াছিলেন, তবে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন যে, "আমার ধর্ম্মানুমোদিত হওয়া চাই।" তাঁহার মাতা যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার জননীর পত্রপাঠে তাঁহার উপর আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই পত্র পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, যেহেতু তিনি বিনা ওজর-আপত্তিতে সর্ত্তে স্বীকৃত হন নাই বলিয়া তিনি মুক্তি পান নাই। যেহেতু তিনি বলেন নাই, "আমার ধর্ম্মের অনুশাসন যাহাই হউক না কেন, আমি সর্ত্তে সম্মত হইতেছি। আপনারা আমায় যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিতে রাজি।" ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছি, এ দেশের গবর্ণমেণ্টই

হউন বা ভিন্ন দেশের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষই হউন, কোনও লোকের ব্যক্তিগত মত ও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহাকে প্রশ্ন করিবার কাহারও কি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে? আর বাস্তবিক তিনিও কি সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন? তাঁহার কি কর্ত্তব্য নয় যে, তিনি মুখের উপর তখনই বলিয়া দেন, "আপনারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, আমি তাহাতে ভয় করি না; আমি আমার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিব না। আমি আমার ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিব, এ বিষয়ে আমি কাহারও দাস নহি, আমি স্বাধীন। আপনারা আমার দেহকে কারারুদ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু আমার আত্মা ভগবানে অর্পিত।" যে মহামতি ইংরাজ বিচারপতির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি এ বিষয়ে ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দৃষ্টান্তের অধিক দূর যাইতে হইবে না। কারণ, লর্ড মহোদয়গণ, মানুষের কার্য্যপদ্ধতিকে পরিচালিত করিবার জন্য এমন একটা ব্যাপার আছে, যাহা বংশ অথবা সংশ্রবের কোনও ধার ধারে না। ধর্ম্মই উহার পরিচালক। ইহার প্রভাবে মানুষের মনে এমন সকল বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, যাহা তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের হয় ত বিরোধী, এমন মতও লোকে পোষণ করে,—যে মতকে গবর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যের বিঘ্নস্বরূপ মনে করেন। তবেই দেখুন, আমরা এখন কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! সমগ্র রোমান্ কাথলিক অথবা শুধু দক্ষিণ আয়র্লণ্ডস্থিত রোমান্ কাথলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যদি একটা আইনের ধারা পাশ করা যায় বা ইহুদী সম্প্রদায়, ধরুন, যদি শুধু লণ্ডনের পূর্ব্বভাগস্থিত ইহুদীদিগের সম্বন্ধেই কোনও বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, তবে বিনা বিচারেই তাহাদের স্বাধীনতা অপহৃত হইবে। যে বৃটিশ জাতি সমদর্শী বলিয়া বিশ্ব-বিখ্যাত, যুদ্ধের সময়ে শুধু কোনও সেক্রেটারী অব ষ্টেটের কলমের একটি খোঁচায় তাহা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। * * * আমাদের সর্ব্বপ্রধান স্বাধীনতা হইতেছে—মতের স্বাধীনতা। স্বাধীনভাবে সকলেই স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে পারে।"

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যদি না থাকে, তবে সে জীবনধারণে প্রয়োজন কি? আমার মতের সহিত আপনাদের মতের সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে; আপনাদের মতের সহিতও হয় ত আমার মতের মিল না থাকিতেও পারে; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, আপনাদের মত আপনাদের কাছেই থাকুক, আমার মতে আমিও চলিতে থাকি। সিভিল সার্ব্বিসের সদস্যগণের একটা মত থাকিতে পারে, আমারও স্বতন্ত্র মত থাকা অসম্ভব নয়। মাননীয় রাজপ্রতিনিধির নিজের একটু স্বতন্ত্র মত থাকিতে পারে। স্বয়ং সম্রাট্ বাহাদুরের হয় ত এক রকম অভিমত, আবার আমার মত হয় ত ঠিক তাহার বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া উহা কি অপরাধ? সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে কোথাও কি এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত মত একটা অপরাধ? আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, কুসংস্কারের যুগ, অন্ধকারের যুগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, উহা একেবারে যায় নাই। যাহা হউক, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিচারপতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিতে পারি।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মনে হয়, গবর্ণমেণ্ট অথবা রাজপ্রতিনিধি বা মন্ত্রি-সভার সদস্যগণের কেহ এ কথা বলিতে পারেন না যে, ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ হইলেও কোনও ব্যক্তিকে সে কার্য্য করিতেই হইবে। এরূপ অধিকার কাহারও নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাণীর বিরুদ্ধে ও

কার্য্য করা হইয়াছে। রাজপ্রতিনিধি মন্ত্রিসভার সদস্যগণ জানিয়া রাখুন যে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে আশ্বাসবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি ঠিক তাহার বিপরীত হইতেছে। এ জন্য তাঁহারা রাজার অসন্তোষ-ভাজন হইতেছেন। আমরা রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি না, যে নীতির দ্বারা এই সাম্রাজ্য পরিচালিত হইবার কথা, আমরা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছি না। যাহারা বিনা বিচারে, অকারণে আমাদের অধিকার কাড়িয়া লইতেছে, তাহারাই রাজার এবং প্রচলিত রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ভদ্রমহোদয়গণ, গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে এই সকল কথা উপস্থাপিত করিতে পারিলে চলিত, আমার বিশ্বাস, এ সকল কথা শুনিলে গবর্ণমেণ্ট হয় ত সুবিচার করিবেন, কিন্তু সে পথে একটা বিঘ্ন আছে।

সে বিঘ্ন ইউরোপীয় সভা। আমারা ইউরোপীয় সভার কল-কৌশল সব ধরিয়া ফেলিয়াছি, বুঝিতে পারিয়াছি। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালে আমরা দেখিয়াছি, ভারতবাসী ইংরাজগণ কি করিতে না পারে। কিন্তু একটা কথা আছে, সে সময় লোকমত দেশমধ্যে এমন প্রবল হইতে পারে নাই। আজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যখন স্বায়ত্ত-শাসন-নীতি ভারতবর্ষে প্রচলিত করিতে চাহিতেছেন, তখনও ভারতীয় ইংরাজগণ সেইরূপ চীৎকার ও গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল ইংরাজ এ দেশে শুধু অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছে। এখানে যখন তাহারা আসে, সে সময় তাহারা কপর্দ্দকশূন্য, তার পর ভারতবর্ষের অর্থে বিত্তশালী হইয়া তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। এই সকল ব্যক্তিই ভারতবর্ষের তথাকথিত বন্ধু সাজিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা করিতে থাকেন। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে! তাঁহারাই চীৎকার করিতে থাকেন পাইতে পারেন না, কারণ, তাঁহারা জানেন যে, যদি ইঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলে স্বত্ত-শাসনকামী দল আরও পুষ্টিলাভ করিবে অর্থাৎ মিঃ মহম্মদ আলী, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি দেশের সুসন্তানগণ মুক্তি পাইলে স্বায়ত্ত-শাসনলাভের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিবেন। যদি এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা শ্বেত বণিকের নীতি কোথায় মুছিয়া যাইবে! স্বায়ত্ত-শাসনপ্রভাবে জেলার হাকিমদিগের ক্ষমতার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী, তখন এই সকল শ্বেতাঙ্গ মহাপ্রভু আর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা কালেক্টরকে এ কথা লিখিতে পারিবেন না, "প্রিয় অমুক, তুমি এ কাজটা আমার জন্য করিয়া রাখিও, যাহাতে এ বিষয়টা ঘটে, তুমি একটু দেখিও ইত্যাদি।" আমাদের দেশে এ কথা খুবই সত্য—আমি বহু ভারতীয় কয়লার ব্যবসায়ীকে অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি যে, ইংরাজ বণিকেরা যথেচ্ছসংখ্যক গাড়ী পাইয়া থাকেন, কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে বেশী গাড়ী পায় না। শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌গণ এ দেশে এই সকল সুবিধা পান। এখন যদি ইংরাজ ব্যুরোক্রেশীর পরিবর্ত্তে দেশের লোক দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করে, তাহা হইলে ইংরাজ বণিক্‌গণের সে সুবিধা লুপ্ত হইবে, এই জন্যই তাহারা এত চীৎকার করে, বিঘ্ন জন্মায়।

ভারতবাসী ইংরাজ-সমাজের মুখপাত্র যাহারা, তাহাদের বক্তৃতার কথা আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি। স্বায়ত্ত-শাসন-নীতি ও দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই সকল ইংরাজ কিরূপ খড়্গহস্ত, তাহা আমি তাহাদের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। আর্চ্চিন উড নির্ব্বোধের মত যে বক্তৃতা করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহাই আমার আলোচ্য। এই ভদ্রলোকটি বলিয়াছেন, "যদি জাতিগত বিদ্বেষ ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গ হয়, তাহা হইলে আমরা

—ইংরাজজাতি, হয় ভারতবর্ষ হইতে নয় ত পুনরায় ইহাকে জয় করিব।" ভদ্রমহোদয়গণ, এ বক্তৃতার প্রতি আস্থাস্থাপন করা বড়ই কঠিন কার্য্য। যদি ভারতবর্ষে অবস্থান করিলে তাঁহাদের ক্ষতি হয়, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে পুনরায় জয় করিবার কথা বলাটা নিতান্তই কৌতুকজনক। এ কথা শুনিয়া পিস্তলের বীরত্ব ও কর্পোর‍্যাল নিম্ফের গল্প আমার মনে পড়িতেছে। তিনি না জানিলেও আর্ডেন উড ত জানেন যে, ভারতবর্ষ কোনও দিন বিজিত হয় নাই। ভারতবর্ষ শুধু প্রেম ও সুশাসনে শাসিত হইবে, এই অঙ্গীকারেই বিদেশীয় হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে কেহ কখনও জয় করিয়া লয় নাই। ভবিষ্যতেও কেহ ইহাকে জয় করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ তাহার আদর্শ-শিক্ষা ও সভ্যতা সমগ্র বিশ্বকে বিলাইয়া দিবে। আজ সে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে এমন দিন আসিবে, যখন ভারতবর্ষের কথা সমগ্র বিশ্ববাসীকে কান পাতিয়া শুনিতেই হইবে।

কোন কোন শ্বেতাঙ্গ বক্তার বক্তৃতায় উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছিল। এক জন ভদ্রলোক নাকি বলিয়াছেন যে, যদি জনসাধারণের জন্যই শাসনকার্য্যের ব্যবস্থা হয় এবং জনসাধারণের হাতেই সে শাসনকার্য্যভার অর্পিত হয়, তাহা হইলে ধনপ্রাণ লইয়া এ দেশে বাস করাই কঠিন হইবে, ভবিষ্যৎ উন্নতি সুদূর-পরাহত হইবে। "ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য ও উন্নতি" কথাটা আপনারা লক্ষ্য করিবেন। জানি না, ইহা মুদ্রাকরপ্রমাদ কি না। এই বক্তার মনের কথাটা এই যে, স্বায়ত্ত-শাসন চলিলে জীবন নিরাপদ নহে, উন্নতিও সুদূর-পরাহত। আমরা এখন প্রশ্ন করিতে পারি, কাহার উন্নতি? ভারতবর্ষের উন্নতি —ভারতের কোটি কোটি ব্যক্তির উন্নতি, অথবা স্যার আর্চ্চি বার্কমায়ারের উন্নতি? যদি ভারতবর্ষে হোমরুল প্রণালী প্রচলিত হয় এবং তাহার ফলে স্যার আর্চ্চি বার্কমায়ার গরীব হইয়া পড়েন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের চাই। স্যার আর্চ্চি বার্কমায়ার বা তাঁহার মত কয়েকটি শ্বেতবণিকের জন্য ভারতবর্ষ নহে। তাঁহারা শুধু আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া আমাদের অর্থ ডাকাতী করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই এ দেশে আসিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ ভারতবাসীদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ এই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। ভবিষ্যতেও তাহার একই উদ্দেশ্য প্রতিপালিত হইবে। এই বক্তার আর একটা কথায় আমার ভয়ানক ক্রোধ হইতেছে, হাসিও পাইতেছে। বক্তা বলিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন ভারতবর্ষে ইংরাজের স্বার্থ-রক্ষার জন্য সৃষ্ট! ভারতবর্ষে ইংরাজের স্বার্থ! চারিদিকে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত, গবর্ণমেণ্ট যখন নিরুপদ্রব হইয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে এই সকল স্বার্থান্ধ সংকীর্ণচেতা বণিক্ সভা-সমিতি করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া, সমগ্র দেশটার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, দেশের লোকের বিরুদ্ধে—তাহাদের আদর্শ ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য ও গালাগালি দিতেও পশ্চাৎপদ নহে। ইহারাই আবার ইংরাজের স্বার্থরক্ষার কথা আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধা রাখে! তাহারা ইংরাজই বটে! মহিমান্বিত রাজার মন্ত্রিগণ বলিতেছেন, ভারতবর্ষে হোমরুল প্রদান কর, স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হউক, ভারতবর্ষের জনসাধারণ ইংলণ্ডের নাগরিকের ন্যায় তুল্য অধিকার পাইবে, আর সেই সময় এই সকল বণিক কি না ইংরাজের স্বার্থরক্ষার দাবী করিতে আসে? কে তাহারা? ভদ্রমহোদয়গণ, এই ইংরাজ-সম্প্রদায়ের কৌশল নানা প্রকার। "ষ্টেটস্‌ম্যান" নামক দৈনিক পত্র "ভারতবন্ধু" বলিয়া আত্মপরিচয় দিত; এখন এই পত্র সে অভিনয় ত্যাগ করিয়াছে। সে

দিন এই কাগজে একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহাতে চরমপন্থী দলকে তীব্রবেগে আক্রমণ ও মধ্য-পন্থী দলের প্রশংসার সমাবেশ ছিল। কিন্তু পরদিবস ঠিক তাহার বিপরীত প্রবন্ধ বাহির হইল। তাহাতে দেখান হইয়াছিল যে, প্রকৃতপক্ষে চরমপন্থী ও মধ্য-পন্থীর মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। বাস্তবিক উভয় দলের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। উক্ত "ষ্টেটস্‌ম্যানই" কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ প্রভেদ কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। আমরা শ্বেতাঙ্গ-সমাজকে স্পষ্টভাবেই বলিতে পারি যে, আমাদের মধ্যে চরমপন্থী বা মধ্যপন্থী কেহ নাই। বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান, প্রত্যেকেই জাতীয় দলভুক্ত। তাহা-দের কেহই চরমপন্থী বা মধ্যপন্থী নহে। বরং আমি বলিব, এই সকল ইংরাজই চরমপন্থী। যে সকল ভারতীয় ইংরাজ তারস্বরে চীৎকার করিয়া গোলযোগ বাধাইতেছে, তাহারাই অতি জঘন্য চরমপন্থী। কে বাঙ্গালার শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে উত্তেজনাপূর্ণ করিয়া তুলিল? আমি বলিব, ইংরাজ বণিক্‌গণ, এজন্য তোমরাই দায়ী, তোমরাই গোল-মাল সৃষ্টি করিয়া অশান্তির অনলে ফুৎকার দিতেছ। স্যার হিউ ব্রে, পঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর, ইউ-রোপীয় সম্প্রদায়ের বক্তারাই সে জন্য দায়ী। আমি আজ তাঁহাদিগকে বলিতেছি, এখনও বিবেচনা করিয়া সতর্ক হউন। ইল্‌বার্ট বিলের আন্দোলনের যুগ এখন আর নাই। এ দেশে এখন গণতন্ত্রবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। এখন আমরা আর ঐ প্রকার কটূক্তির হলাহল নীরবে পান করিব না। তথাপি যদি তাহারা নিরস্ত না হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাহাদের মুখ বন্ধ করিতে হয়, তাহার উপায় আমাদের জানা আছে। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। রাজার মন্ত্রিগণ যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নীতি যাহাতে এ দেশে প্রচলিত হয়, আমরা তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। যদি তোমরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হও, উত্তম; আমরা তোমাদের মুখ বন্ধ করিবার ঔষধ জানি। তোমরা জানিয়া রাখিও, আমরা ভারতবাসী বেশ জানি, এ দেশে তোমাদের স্বার্থ কতটুকু, অংশ কতটুকু। এ দেশের গবর্ণমেণ্টকে পরিচালিত করিবার কতটুকু অংশ তোমাদের আছে, তাহাও আমরা যে না বুঝি, তাহা নহে। তোমরা যখন বল যে, স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে এ দেশের কোটি কোটি লোকের অমঙ্গল হইবে, তখন আমরা বুঝি, কোন্ স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া এ কথা তোমরা বলিতেছ। তোমাদের এ ভণ্ডামী কি আমরা বুঝিতে পারি না? আমি আজ স্পষ্টাক্ষরে এ কথা বলিতেছি, এ কথা আমার নিজের যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কোটি কোটি দেশবাসী স্বায়ত্ত-শাসনের আমলে না আসিবে, ততক্ষণ আমি কোনও হোমরুল, কোনও স্বায়ত্ত-শাসন চাহি না। যখন আমি বলি হোমরুল, স্বায়ত্ত-শাসন, তখন আমি এ কথা বলি না যে, একটা ব্যুরোক্রেশীর বদলে আর একটা ব্যুরোক্রেশী সৃষ্ট হউক। না, আমরা তাহা চাহি না। আমরা চাহি হোমরুল, স্বায়ত্ত-শাসন। দেশের জনসাধারণের দ্বারাই তাহা পরিচালিত হইবে। দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য জন-সাধারণই দেশকে শাসন করিবে, ইহাই আমার মনের কথা। দরিদ্রতম প্রজা হইতে ঐশ্বর্য্যশালী প্রতাপান্বিত জমীদার সকলেই তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করিতে পাইবে। সে শাসন-কার্য্যে প্রত্যেকেরই কথা কহিবার অধিকার থাকিবে। ভারতের জনসাধারণ যাহা চাহে, তাহার উপরেই হোমরুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য। এখনও কি তাহারা এ কথা বলিতে পারে যে, ভারতের কোটি কোটি লোকের জন্যই আমরা স্বায়ত্ত-শাসন, হোমরুল চাহিতেছি না? যদি তাহারা বলে যে, ভারতের কোটি কোটি লোকের জন্য আমাদের এত

মাথাব্যথা কেন, আমাদের কোন অধিকার নাই। তাহার উত্তরে আমি বলিব, তোমাদের তুলনায় আমাদের সহস্রগুণ অধিকার আছে। তোমরা কে? তোমরা তাহাদের চেন না জান? এই শ্রেণীর লোকের প্রতি ভারতবর্ষ চিরকাল সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। যাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস যেরূপই হউক না কেন, ভারতবর্ষে যে বসবাস করিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। এমন যাহারা, আমি তাহাদিগকে ভাই বলিয়া বুকে টানিয়া লইতে রাজি আছি। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে এ তথ্যটি সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। পারসিকগণ ভারতবর্ষে বসবাস করায়, আমরা তাঁহাদিগকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। মুসলমান নেতৃগণ ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করায়, আমরা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিয়াছি। আজ যদি ইংরাজগণ ভারতবর্ষে চিরদিনের জন্য বাস করিতে চাহেন, তাঁহারা সে কার্য্যে অগ্রসর হউন। আমরা সকলে একযোগে ভারত-সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করিব। কিন্তু যদি তাঁহারা শুধু অর্থসঞ্চয় করিবার জন্যই দেশে আসিয়া থাকেন এবং সেই কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিতেই নিযুক্ত থাকেন, তবে আমি বলিব, তাঁহারা ভারতবর্ষের বন্ধু নহেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ভারতীয় বলিয়া পরিচিত করিবার কোনও অধিকার পাইতে পারেন না। ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রদান ব্যাপারের বিরুদ্ধাচরণ করিবার কোনও ন্যায়সঙ্গত অধিকারও তাঁহাদের নাই। আমি তাঁহাদিগকে বলিব—"ইচ্ছা হয়, এ দেশে আইস—পার যদি অর্থ উপার্জ্জন কর—যদি চাহ, তবে শান্তিতে ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিয়া যাও।"

ইউরোপীয় সংঘের অনিষ্টকরী চেষ্টাই আমাদের প্রধান বাধা, তাহা আমি বলিয়াছি। এখন আসুন, আমরা সকলে ঐক্যসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হই। এই স্বার্থপর অহেতুকী উত্তেজনা ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া চেষ্টা করিব; গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের মোহপাশ হইতে মুক্ত করিব। বিজয়লাভ নিশ্চয়ই ঘটিবে।

আংলো-ইণ্ডিয়ান্ উত্তেজনা

(১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বক্ষ্যমাণ বক্তৃতা প্রদান করেন)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আজ আমাকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করায়, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ময়মনসিংহে এই আমার প্রথম আগমন। এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমি জানিতাম না যে, এখানে আমার এতগুলি বন্ধু আছেন। আমার বন্ধু গুহ মহাশয় আমার স্বার্থলেশহীন কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ প্রশংসার আমি অযোগ্য। তবে এ কথা বলিব, দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার অবসর পাইলেই আমি কখনও তাহাতে পশ্চাৎপদ হই নাই। হয় ত সকল সময়ে ঠিক পথ আমি ধরিতে পারি নাই, হয় ত আমি অসঙ্গত পথেই চলিয়া থাকিব, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, দেশের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়াই আমি সর্ব্বদা কাজ করিয়াছি। ইউরোপীয় রাজনীতির অনুকরণে আমি কোনও দিন কাজ করিতে যাই নাই। ইহা আমার ধর্ম্ম। আমার চিরজীবনের আদর্শই ঐ প্রকার। দেশ বলিলে, আমি আমার ইষ্টদেবতাকেই বুঝি। পাশ্চাত্যের দার্শনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি জাতীয়তাকে বুঝিতে শিখি

নাই। আমার মনে হয়, জাতির উন্নতির প্রয়োজন আছে বলিয়াই প্রত্যেক জাতিই উন্নত হইবে। ভগবানের রাজ্য বৈচিত্র্যময় জীবনস্পন্দনে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক জাতিই সেই জীবনস্পন্দনের একটি বিন্দুমাত্র। আবর্ত্তনবাদের নীতি অনুসারে প্রত্যেক জাতিই উন্নত হইবে। যে জাতির মধ্যে আমার জন্ম হইয়াছে, তাহাও বড় হইবে। শুধু সেই উন্নতি, সেই আবর্ত্তনের সহায়তাকল্পে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। চারিত্র্য-মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মনীতিকে আমি যেমন মানি, শ্রদ্ধা করি, জাতীয়ত্বের এই নীতিকেও আমি তেমনই মূল্যবান্ বলিয়া বিশ্বাস করি। দেশকে সেবা করিলে, জাতিকে সেবা করিলে মানব-সমাজের সেবা করা হয়। আর মানব-সমাজের, মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার কথা সম্বন্ধে আমি আজ কিছু আলোচনা করিতে চাই। ভদ্রমহোদয়গণ, দেশকে, মাতৃ-ভূমিকে রাজনীতিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কল্পনা করিবেন না। আপনাদের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে রাজনীতিক আন্দোলনের পর্য্যাপ্ত সংস্রব আছে। উহা আপনাদের ধর্ম্মের অভিব্যক্তি। এ দেশের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, সমগ্র মানব-জীবন স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত। তাঁহারা মনে করেন, রাজনীতি স্বতন্ত্র পদার্থ। ধর্ম্ম ও শিক্ষার সহিত উহার কোনও সংযোগ নাই। তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, মনুষ্যের আত্মা সর্ব্বত্রই সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা যেমন এক, জাতীয় প্রাণও তেমনই এক। ইউরোপীয় রাজনীতির চশমা পরিয়া আমি এ দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার বিচার করিতে সম্মত নহি। আমি ইউরোপীয় শিক্ষাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, ব্যক্তিগতভাবে আমি এ জন্য ঋণী; ইউরোপই আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিব না।/ কিন্তু তথাপি আমি বলিব, বাঙ্গালার এমন একটা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ইউরোপীয় শিক্ষার অনেক উপরে অবস্থিত। ইউরোপীয় রাজনীতি হইতে ধার-করা জিনিস লইয়াই আমাদের জাতীয়তা গঠিত হইবে, ইহা আমার মনের কথা নহে। সে জন্য আমি বলিতেছি, সমগ্র জগৎকে বাঙ্গালার কিছু জানাইবার আছে, দান করিবার আছে। এ কথা আমি পূর্ব্বে অন্যত্রও বলিয়াছি। আপনারা যখন দেখিবেন, আমরা জাতীয়তার শৈশবাবস্থা ছাড়াইয়াছি, আমাদের মত করিয়া আমরা গড়িয়া পিটিয়া উঠিয়াছি, সেই সময় আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের জগৎকে তাহার সেই বিশিষ্ট কথাটি শুনাইবে, বিলাইবে। আর সমগ্র বিশ্ববাসী তাহা কান পাতিয়া শুনিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতিক ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়টা প্রবল? আমাদের দেশে কোন না কোন প্রণালীতে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে. আমি তাহারই কথা বলিতেছি। কেহ তাহাকে হোমরুল, কেহ বা তাহাকে স্বায়ত্ত-শাসন আখ্যা দান করিয়াছে—আবার কেহ তাহাকে স্বরাজও বলে। আমরা শব্দ লইয়া ঝগড়া-মারামারি করিব না। কথা যাহাই হউক না কেন, উহার একই অর্থ। আমার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, আপনারা নাম লইয়া ঝগড়া না করিয়া আসল বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দান করুন। স্বায়ত্ত-শাসন দ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, শুধু তাহাই ভাবিয়া দেখুন। এখন পরিস্ফুটভাবে বুঝা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—আমাদের দেশের রাজনীতিকগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দেশের শাসনসংরক্ষণকল্পে একটা শাসননীতির

অনুবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে, অবশ্য তাহা জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এ ক্ষেত্রে একটা কথা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই। আংলো-ইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রনিচয় ও ভারতবাসী আন্দোলনকারী ইংরাজগণ বলিতেছেন যে, আমাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য শুধু গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দেওয়া। আমি তাঁহাদের এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছি। আমাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য এই যে, আমরা এমন একটা গবর্ণমেণ্ট চাই, যাহাকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য, তাহা রাজবিধানের অনুমোদিত হইবে। আমরা এমন একটা শাসন-পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে দেখিতে চাই, যাহার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ, শাসিত জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকিবেন। ব্যক্তিগত হিসাবে কাহারও সহিত আমাদের বিরোধ নাই। যদি কোনও রাজকর্ম্মচারী কোনও স্থলে কোনও অন্যায় কার্য্য করেন, তাঁহার সেই বিগর্হিত কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার আমাদের আছে। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, সিভিল সার্ব্বিসে যত লোক আছেন, সবই বাঙ্গালী হইবেন। শুধু তাহা করিবার জন্য আমি বলিতেছি না। কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। আমি প্রচলিত ব্যবস্থার নিয়ম-পদ্ধতির বিরুদ্ধেই বলিতেছি। এরূপ প্রণালী অতি কদর্য্য। হয় ত কোনও সময়ে ঐরূপ প্রণালীর প্রয়োজন ছিল। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন আর তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহাতে আমাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইতেছে। যাহা কিছু আমাদের জাতীয়তার উন্নতির পরিপন্থী, আমি তাহাকে মুক্তকণ্ঠে অতি জঘন্য পদ্ধতি বলিয়া উল্লেখ করিব। এখন সেরূপ পদ্ধতিকে জীর্ণ কন্থার ন্যায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যদি একবার এ কথা স্থির করিয়া লন যে, এমন কোনও শাসনরীতি প্রবর্ত্তিত হউক, যাহা জনসাধারণের কাছে দায়িত্বপূর্ণ থাকিবে, তখনই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আপনারা তবে কি প্রকার শাসন-পদ্ধতি চাহেন। এ কথা আমরা বিস্মৃত হইব না যে, আমরা একটা সাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করি। আর সে সাম্রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মহত্ত্ব-প্রভাম্বিত। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ইংলণ্ডের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বার্থের সহিতও আমাদের স্বার্থের বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমরা সকলেই একই সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে অবস্থান করিতেছি। এই সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক প্রসারতার কথা যদি ভাবিয়া দেখেন, ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বর্ণ-সম্প্রদায়, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী, বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রভৃতির বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, এতগুলি বিভিন্ন মানবসম্প্রদায়কে তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও সকলকে মিলনের দৃঢ়-সূত্রে বাঁধিবার কি মাহেন্দ্রসুযোগ উপস্থিত। ইহাই আমাদের বর্ত্তমানে জাতীয়তার দার্শনিক ব্যাখ্যা। সেই জন্য আমরা প্রথমতঃ এমন একটা গবর্ণমেণ্ট চাই, যাহা জনসাধারণের কাছে দায়িত্বপূর্ণ থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কোনও কেন্দ্রস্থিত গবর্ণমেণ্টের সহিত যুক্ত থাকিবে। আবার সেই কেন্দ্রীভূত গবর্ণমেণ্ট সমগ্র সাম্রাজ্যের সকল অংশের সহিত সংযোগ-সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে। সেই প্রকার গবর্ণমেণ্ট আমাদের এখন প্রয়োজন সে জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাবাণীতে এই প্রকার স্বাধীন শাসন-পদ্ধতির স্বীকারোক্তির অভিপ্রা

ছিল। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কত অঙ্গীকারের আশ্বাসবাণী আমরা পাইয়াছি; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি অঙ্গীকারও প্রতিপালিত হয় নাই। সে দিনও মহিমশ্রী সম্রাট্ বাহাদুর এ দেশে আসিয়াছিলেন তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত আশ্বাসবাণী তখনও আমরা পাইয়াছিলাম। যদিও আমরা প্রতিবারেই হতাশ হইয়াছি, এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, আমাদের নিকট যে সকল অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, তাহা এখন পালন করিতেই হইবে। আমাদের কাছে কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইবে। বর্ত্তমানের রাজনীতিক অবস্থার সংশ্রবে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, বিগত ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত-সচিবের উক্তির কথা আপনারা ভালরূপে প্রণিধান করিয়া দেখুন। সেই উক্তির দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তাঁহার উক্তির অর্থ এই যে, প্রত্যেক প্রদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে। এই শাসন-পদ্ধতি ভারত-গবর্ণমেণ্টের কাছে নহে, শুধু জনসাধারণের কাছে দায়িত্বপূর্ণ থাকিবে। জনসাধারণই ভোট দিয়া তাঁহাদের মনোনীত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া মন্ত্রিসভায় পাঠাইবে। এইরূপে কার্য্য হইলে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে এবং ভারত-গবর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত থাকিবে। এইরূপ ভাবে ভারত-সচিব সেই গবর্ণমেণ্টের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র অঙ্কিত করিবার পর বলিতেছেন, "তাঁহারা (ইংলণ্ডের রাজনীতিক) স্থির করিয়াছেন যে, এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা হইবে ইত্যাদি।"

অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, ভারত-সচিবের এই উক্তি হইতে দুইটি বিষয় বেশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে। আপনারা সে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। প্রথমতঃ দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্টের আদর্শ। অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট বলিলে উহার অর্থ যাহা বুঝায়, ঠিক তাহাই। দ্বিতীয়তঃ উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অবিলম্বে কোনও ব্যবস্থা হইবে। ভারত-সম্রাটের নীতি, ভারত-সচিবের উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। সুতরাং কার্য্যতঃ আমরা, সেই আদর্শের অনুরূপ অধিকার শীঘ্রই লাভ করিবার আশা করিতেছি।

তার পর রাজপ্রতিনিধি, বড়লাট মহোদয় বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি অতঃপর তৃতীয় কার্য্যটি সম্বন্ধে কিছু বলিব, অর্থাৎ আইন কানুন ও শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমি রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল হিসাবে প্রথম মন্ত্রণাসভায় সচিববৃন্দকে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। (১) ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য কি? (২) সেই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে কোন্ পথে কি ভাবে চলিতে হইবে? আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষ যখন বৃটিশসাম্রাজ্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ, তখন এখানে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করাই ইংরাজ শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সম্রাট মহোদয়ের সচিববৃন্দ এ বিষয়টি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।"

উল্লিখিত মন্তব্য-প্রকাশের পর রাজ-প্রতিনিধি মহোদয় বলেন যে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে গেলে, গ্রাম, নগর ও মিউনিসিপালিটীতে সর্ব্বাগ্রে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।।

দ্বিতীয় পথ হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যসমূহে ক্রমশঃ অধিক-সংখ্যক ভারতবাসীকে

নিযুক্ত করা। যাহা হউক, রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম হইতে এইরূপ বুঝা গিয়াছিল যে, অচিরে আমরা স্বায়ত্ত-শাসনরূপ কোন অধিকার পাইব।

উল্লিখিত ঘোষণার পর নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। আমরা সকলেই আশায় ও উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে আমাদের অধিকাংশই এই উক্তিটাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি নাই। তখন আমাদের এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছিল যে, অতঃপর কি করা যাইবে; সন্দেহের ছায়াও একটু আধটু যে না ছিল, তাহাও নহে। কিন্তু মোটের উপর আমাদের আশা হইয়াছিল যে, বিগত ৫০ বৎসরের সাধনা বুঝি এত দিনে সফলতা লাভ করে। অন্যপক্ষে এক দল লোক হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। আপনারা তারিখগুলি লক্ষ্য করিবেন। ভারত-সচিব ২০শে আগষ্ট তারিখে বক্তৃতা করেন। রাজপ্রতিনিধির স্মরণীয় উক্তি ১৩ই সেপ্টেম্বর ঘটে, ২০শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় মন্ত্রণা-সভায় স্যার হিউ ব্রে ও মিঃ হগ বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের বক্তৃতা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-সাসন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহা কল্পনা করাও নাকি বাতুলতা। আমি স্যার হিউ ব্রে ও মিঃ হগের বক্তৃতা সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্যার হিউ ব্রে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা শাসন-পদ্ধতির কোনও পরিবর্ত্তন চাই নাই।" ছয় দিন পরে ইউরোপীয় সভা ঘোষণা করিল যে, তাহারাও গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতি বা রীতি সম্বন্ধে কোনও পরিবর্ত্তন চাহে না।

উল্লিখিত দুইটি ব্যাপার হইতে ইহা কি স্পষ্টই প্রতীত হয় না যে, এ দেশের প্রচলিত শাসন নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিলে এই সকল ব্যক্তির অসুবিধা হইবে, সেই জন্যই তাহারা শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবের বিরোধী? বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতে তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা ও লাভের ব্যাপার আছে, এরূপ অনুমান করা কি অসঙ্গত? যিনি এমন অনুমান করিবেন, অমনই তিনি বড় ভীষণ লোক বলিয়া লোকের মনে ধারণা জন্মিবে। আমার কথা হইতেছে এই, আপনারা তারিখগুলি লক্ষ্য করুন, তাহা হইলেই ব্যাপারটা সব বুঝিতে পারিবেন। ইহার পর যদি তাঁহারা বলেন যে, আমরা কোনরূপ পরিবর্ত্তনের বিরোধী নহি, আমরা শুধু আমাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তবে তাহা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া আমরা মনে করিব। সোজা কথা এই যে, তাঁহারা কোনও পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী নহেন। কেনই বা হইবেন? আমি নিজে যদি কোন ইংরাজ বণিক হইতাম আমিও পরিবর্ত্তন চাহিতাম না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, এ দেশে তাঁহারা অপর্য্যাপ্ত অর্থ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য কত টাকা, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে এ স্থলে আমার বক্তব্য এই, অবশ্য আমার ভ্রম হইতে পারে, তাঁহারা যত অর্থই এ দেশে ছড়াইয়া রাখুন না কেন, তাহার বহু গুণ অধিক লাভ তাঁহারা পাইয়াছেন। যাক্ সে কথা। তাঁহাদের কথাই মানিয়া লইয়া ধরিলাম, বহু অর্থ তাঁহারা এ দেশে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের এমন কি অধিকার আছে যে, এ দেশের বিশিষ্ট শাসন-নীতির কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না? এদেশবাসীর কাছে তাঁহারা ইহ নির্দ্দেশ করিতে চান? ইংরাজের অর্থ আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানীতে খাটিতেছে, তাই বলিয়া কোনও ইংরাজ মহাশয় কি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন যে, তাঁহারা মার্কিন, ফরাসী অথবা জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের বিশিষ্ট শাসন-নীতির সম্বন্ধে কোন কিছু নির্দ্দেশ করিতে সাহস করেন? তবে এ দেশে টাকা ছড়াইয়াছেন বলিয়াই ফল এমন ভিন্ন হয় কেন?

কারণ স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। আমেরিকায় কেহ এরূপ পাগলামী করিলে, মার্কিণগণ সে ব্যক্তিকে তখনই উচিতমত শিক্ষা প্রদান করিত। ফ্রান্সে এমন কথা কেহ বলিলে তখনই তাহাকে বলা হইত; "বাপু হে,তুমি চুপ করিয়া থাক।" কিন্তু এ দেশেই শুধু এই সকল বণিক দাবী করিতে পারে যে, এ দেশবাসীর স্বার্থ রসাতলে যাউক, তথাপি শাসন-রীতির কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। তাহারা বুঝে যে, তাহাদের কোন দাবী নাই, ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই, তাহা বুঝিয়াও স্বার্থের দায়ে তাহারা গায়ে পড়িয়া জানাইতে আসে যে, তাহারাই এ দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি। তাহারা বলে, "আমরা শুধু আমাদের জন্য বলিতেছি না, কোটি কোটি এদেশবাসীর সম্বন্ধেই বলিতেছি। তোমরা ব্যবসাদার আন্দোলনকারী।" উহারা "ব্যবসাদার আন্দোলনকারী" অর্থে কি বলিতে চাহে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি অথবা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্য কেহ বক্তৃতার দ্বারা কখনও অর্থ পাই নাই, কেহ এক কপর্দ্দকও সে জন্য আমাদিগকে দান করে না। যাহাই হউক, উহাদের কথার অর্থ এই যে, আমরা এক শ্রেণীর অন্তর্গত বক্তা। আমি আইন-ব্যবসায়ী। আমার বন্ধুবান্ধবগণের অনেকেই হয় চিকিৎসা, নয় ত অন্য কোন কার্য্য করেন। কিন্তু ইউরোপীয় বক্তৃগণের সকলেই ত কোন না কোন ব্যবসা লইয়া আছেন। সুতরাং সে কথার কোন মূল্য নাই। গালাগালি দিতে গেলেই কোন না কোন অজুহাত চাই, তাই তাহারা বলে, "ব্যবসাদার উত্তেজনাকারী, দুষ্টবুদ্ধি, আন্দোলনকারী, উহাদের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও শুনিও না, দেশের কোটি কোটি নরনারী উহাদিগকে চাহে না।" বাস্তবিক আমাদের দেশের লোক আমাদের চাহিবে কেন? তাহারা ষ্টেটস্‌ম্যানের জোন্স সাহেবকেই চাহে। উঁহার মত আর যাঁহারা গালাগালিতে পরিপক্ক, তাহাদিগকেই চাহে!

ষ্টেটস্‌ম্যানের জোন্স সাহেব বলেন যে, ভারতবর্ষের ৩১ কোটি অধিবাসীর মধ্যে অতি সামান্য কয়েকজন লেখাপড়া জানে। আমি মানিয়া লইলাম, ইহা দ্বারা তিনি আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না, তাহারা অযোগ্য; তাহাদের নিজেদের কোন বিবেকবুদ্ধি নাই। কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা মন্দ, তাহা তাহারা বিবেচনা করিতে জানে না। কিন্তু আমি সে কথা মানি না। অবশ্য ইউরোপের কথা বলিতে পারি না। তবে আমাদের দেশের বহু নিরক্ষর ব্যক্তিকে জানি যে, তাহারা ব্যবসা-বুদ্ধিতে বেশ পরিপক্ক। কে তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও কে তাহাদের শত্রু, তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারে। স্যার আর্চি বার্কমায়ার অথবা আমাদের কেহ তাহাদের বন্ধু কি না, তাহা তাহারা ভালরূপই জানে। সে কথা বুঝিবার বিচারবুদ্ধি তাহাদের যথেষ্টই আছে। আর যদি তাহারা মূর্খ, বর্ণজ্ঞানহীন বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে চাহ, তবে আমি বলিব, এত দিন কেন তাহাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখিয়াছ? দেড়শত বৎসর শাসনের পরও যদি দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিতই রহিয়া থাকে, নিজেদের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ক্ষমতাই তাহাদের না থাকে, তবে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট কি করিলেন? শুধু এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই বলিতেছি, আমাদের বর্ত্তমান শাসনরীতির সংস্কার যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এ শাসন-রীতির পরিবর্ত্তন হওয়া চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শাসনরীতির পরিবর্ত্তন ঘটিলে, স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে এমন অবস্থা ঘটিবে যে, ভারতের কোনও স্থলে একটি নিরক্ষর লোক দেখা যাইবে না। আমি নিশ্চয় করিয়া

বলিতে পারি, আমাদের মঙ্গলার্থে আমাদিগকে যদি ক্ষমতা দান করা হয়, তাহা হইলে অচিরে আমাদের দেশের লোক পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের অধিবাসীর অপেক্ষা উন্নতমনা বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমাদের দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিত বলিয়াই আমরা এমন প্রবলভাবে স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করিতেছি। আমরা সর্ব্বদাই বলিতেছি, আমাদের ক্রমোন্নতির পথে বাধা পড়িতেছে। আমরা বলিতেছি, আমাদের শিশু জাতীয়তার কণ্ঠরোধ করা হইতেছে। আমাদের দেশে এক দিন যে উন্নত শিক্ষার প্রচার ছিল, আমরা সেই শিক্ষা, সেই জ্ঞানভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী। যে আধ্যাত্মিকতার অনন্ত ভাণ্ডারের চাবী আমাদের হাতে আছে, আমরা তাহার দ্বার মুক্ত করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে সেই অপূর্ব্ব ভাব-সম্পদ বিলাইতে চাই। সেই অগ্নিকে আমরা পুনরায় প্রজ্বলিত করিতে চাই স্বায়ত্ত-শাসন ব্যতিরেকে তাহা সম্পাদিত হইবার নহে। যিনি এখন স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষে দাঁড়াইবেন, তিনি ভারতীয়ই হউন বা ইউরোপীয়ই হউন, তিনি মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের অগ্রবর্ত্তক বলিয়া মনে ভাবিব। এ দেশবাসী ইংরাজগণের সে সুবর্ণ-সুযোগ রহিয়াছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতিতে আমাদের মধ্যে অনেকের মতানৈক্য ঘটিয়াছিল। সে কটি আমরা সংশোধন করিয়া লইয়াছি। সে সকল বিষয়ের কথা আমি এখানে আলোচনা করিতে চাহি না। যেখানে একটা সংঘ গড়িয়া উঠে এবং যে সংঘের জীবনীশক্তি আছে, সেই খানেই মতানৈক্য ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, আমাদের মধ্যে এই মতানৈক্যরূপ সংঘর্ষ দর্শনে "ষ্টেটস্‌ম্যান"পাদ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিলেন, হে চরমপন্থিগণ, তোমাদিগের মনের কথা টের পাওয়া গিয়াছে; তোমরা ধরা পড়িয়াছ, ওহে সাধু মধ্যপন্থিগণ! তোমরা চরমপন্থীদিগের সহিত মিশিও না। আমরা তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিব। সাবধান, ভুল করিও না যেন!" ষ্টেটসম্যানে পত্রে ধারাবাহিকরূপে এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। চরমপন্থীদিগকে গালাগালি দিয়া "ষ্টেটস্‌ম্যান" আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলেন। যদি কোন ভারতীয় বক্তা ষ্টেটস্‌ম্যানের গালাগালির সামান্য অনুকরণ করিতেন, তাহা হইলে উক্ত সংবাদপত্র সেই বক্তাকে জাহান্নমে পাঠাইতেন। যাহা হউক, গালাগালি দিয়া কিছুকাল "ষ্টেটসম্যান" খুব বাহাদুরী লইলেন। আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইয়া গেল। তখন পরিহাস-রসিক "ষ্টেটসম্যান" বলিলেন যে, চরমপন্থীরূপ ব্যাঘ্র-ছাগল-ছানারূপ মধ্যপন্থীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার অত্যল্পকাল পরেই মিঃ জে সেন গুপ্ত সংশোধিত হইয়া গেল। তিনি পুনরায় আবিষ্কার করিলেন, ভারতবর্ষে মধ্যপন্থী বলিয়া কেহ নাই। এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত শুধু তাঁহার সঙ্গে এই কথাটা বলিতে চাই যে, এ দেশে চরমপন্থীও কেহ নাই। আর সকলেই জাতীয়-দলভুক্ত।

কিছুকাল পরে মিঃ মহম্মদ আলীকে অন্তরীণে আবদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে লাগিল তদুপলক্ষে কলিকাতায় একটি সভা আহূত হইয়াছিল, আমি তথায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলাম। সভায় অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই অন্তরীণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে আসিয়াছিলেন। পর দিবস "ষ্টেটসম্যান" এক বিরাট হাঙ্গামার প্রকাণ্ড বিবরণ ছাপাইয়া লিখিলেন, এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের একতা কখনই হইতে পারে না। ষ্টেটসম্যানের নীতিই ঐ প্রকার সে জানে না যে, হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ এক, উদ্দেশ্য এক ; দেশে

যে চরমপন্থী বা মধ্যপন্থী কেহ নাই, তাহাও কি ষ্টেটস্‌ম্যানের অজ্ঞাত আছে? সবই জানে; কিন্তু স্বার্থের অজুহাতে সে সত্য কথা বলে না, বলিতে চাহে না।

মিঃ জোন্সের সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়াই আমি নিরস্ত হইব। আপনারা বোধ হয় জোন্সের বক্তৃতা পাঠ করিয়া থাকিবেন। যখন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারত-সচিবের কথা-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই সময় দর্শকবৃন্দ হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া উঠিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টকে যদি কেহ অপদস্থ করিয়া থাকেন, তবে তাহা মিঃ জোন্সই করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাতেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবমাননার ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যাহারা নিজেদের রসনাকে সংযত করিতে পারে না, ভাবকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেয়, স্বার্থের প্রেরণায় মুখে যাহা আসে, তাহাই বলিতে পারে, তারাই আবার আমাদিগকে সংযত হইতে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা রাখে! এখন আপনারা বলুন, এই সকল লোককে আমি যদি চরমপন্থী বলিয়া উল্লেখ করি, তবে কি আমি অন্যায় করিব? আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে, আমাদের মধ্যে চরমপন্থী বা মধ্যপন্থী কেহ নাই। যাহারা কার্য্য ও কথার দ্বারা এ দেশের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণকে প্রতারিত করে, তাহারাই চরমপন্থী।

আমাদের ব্যবহার রাজভক্তিমূলক। আমরা সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে দাঁড়াইয়া স্বায়ত্ত-শাসন চাই। কিন্তু উহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাগল। আমরা একটা বিরাট আদর্শের জন্য লালায়িত, উহারা শুধু টাকা কুড়াইতে আসিয়াছে। আমাদের সঙ্গে এ দেশের ইংরাজের পার্থক্য ঐখানে। ভদ্রমহোদয়গণ এই সকল শ্বেতাঙ্গ আন্দোলনকারীর ব্যবহারে ভয় পাইবেন না, চিন্তিত হইবেন না। উহারা যাহা পারে, তাহা করুক। উহাদের জানা উচিত যে, ইল্‌বার্ট বিলের আন্দোলনের যুগ এখন আর নাই। গবর্ণমেণ্টের নিকট চোখ রাঙ্গাইয়া কিছু চাহিবার অধিকার উহাদের নাই।

এ দেশের গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টভাবে তাঁহার নীতির কথা এ দেশের লোককে জানাইয়াছেন। আর আমাদের দেশের জনসাধারণেরও সে বিষয়ে পর্য্যাপ্ত সহানুভূতি আছে। উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টকে প্রাণপণে সাহায্য করিবে। যদি তাহাতে এ দেশবাসী চরমপন্থী ইংরাজগণ বাধা দিতে আসেন, তখনই তাহাদিগকে মুখের উপর বলিয়া দিতে হইবে, ভারতবর্ষ তাহাদের দেশ নহে। ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এ দেশে বাস করিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা বাস করিতেছি। এ দেশের ধূলিকণা আমাদের কাছে অতি পবিত্র। কে তোমরা? তোমরা ত শুধু লাভ কুড়াইতে আসিয়াছ। গবর্ণমেণ্ট ও আমাদের মাঝখানে তোমরা অনধিকারচর্চ্চা করিতে আসিতেছ কেন?

সম্রাট্ মহোদয়ের আশ্বাসবাণী অচিরে সার্থকতা লাভ করিবে। সাম্রাজ্যের বিজয়কেতু ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতেছে। আসুন, আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে, একপ্রাণে, একমনে অগ্রসর হই। ভয় রাখিলে চলিবে না, মূর্খতার পরিচয় দিবার অবকাশও এখন নাই। এ দেশের কল্যাণের জন্য প্রাণপণে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, সংঘর্ষে জয়লাভ করিতে হইবে।

স্বায়ত্ত-শাসন

(১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বক্ষ্যমাণ বক্তৃতা করেন।)

মাননীয়া সভাধিষ্ঠাত্রী মহোদয়া, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সম্মুখে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে, আমি তাহার সমর্থন করিতেছি। সোদরোপম প্রতিনিধিগণ, আপনারা এইমাত্র যে সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন, আমি তৎপ্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ সঙ্গীত ভারতবর্ষের গৌরব-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত ও জয়যুক্ত করিবার জন্যই আজ আমরা এইখানে সমবেত হইয়াছি। প্রস্তাবিত বিষয়টি সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া যে তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হইল, তাহার অন্তরালে যে আসল তত্ত্বটুকু রহিয়াছে, তাহা আপনারা কেহ যেন ভুলিবেন না। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, সমগ্র ভারতবাসীকে একই বিরাট ভারতীয় জাতিতে পরিণত করিয়া তোলা। সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও মতদ্বৈধ নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কি উপায়ে সে কার্য্য সমাধা করা যাইবে। উদ্দেশ্যসম্বন্ধে আমরা একমত, কিন্তু উপায় সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিতেছে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়, এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার কি আদর্শ, তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছেন। আমি সে আদর্শকে বরণ করিয়া লইতেছি। যদি এ প্রস্তাবের কোথাও সে আদর্শের সহিত পার্থক্য থাকিত, তাহা হইলে আমি তাঁহার এ প্রস্তাব সমর্থন করিতে দাঁড়াইতাম না। বঙ্গের প্রাদেশিক সম্মিলনে বাঙ্গালার আদর্শ কি, তাহা সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান প্রস্তাবে সে আদর্শের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, সে আদর্শটি কি? সে আদর্শ হইতেছে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অর্থাৎ ভারত গবর্ণমেণ্টকে সীমা ও কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের প্রস্তাবের সহিত সে আদর্শের কি সামঞ্জস্য নাই? আপনাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে স্ব স্ব অধিকারের একটা সীমা থাকিবেই, অতএব আদর্শের সহিত আমাদের প্রস্তাবের কোনও অনৈক্য নাই দেখিয়া, আমি উহার সমর্থন করিতে উঠিয়াছি। তার পর এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার দ্বিতীয় আদর্শ কি? আমি তাহা বলিতেছি। কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রণা-বিভাগ জনসাধারণের দ্বারাই গঠিত হইবে, সেই প্রদেশের শাসন-বিভাগকে মন্ত্রণা-বিভাগের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। এখন দেখুন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কি না। হইতে পারে, বাঙ্গালার তরফ হইতে এ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহার সহিত আপনাদের ব্যাখ্যার একটু পার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু আমাদের সকলেরই আদর্শ যাহার তাহার সহিত বাঙ্গালার তরফের প্রস্তাব ও বর্ত্তমান প্রস্তাবের কোনও অসামঞ্জস্য নাই। আলোচ্য প্রস্তাবে আপনারা বলিয়াছেন যে, অর্থ-ভাণ্ডারের উপর ক্ষমতা মন্ত্রণা-বিভাগের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। মুহূর্ত্তের জন্য একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করুন। এ কথাটার অর্থ কি? আচ্ছা, আমরা ধরিয়া লইলাম, আপনাদের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিলেন; তাহার দ্বারা কি বুঝাইবে? ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, শাসন-বিভাগ মন্ত্রণা-বিভাগের অধীন হইবে। যদি শাসনবিভাগ মন্ত্রণাবিভাগের কথা না শুনে, না মানে, তখন মন্ত্রণা-বিভাগ বলিবে, "আমরা টাকা দেওয়া বন্ধ করিলাম।" এ কথা উঠিতে পারে যে,

বৃটিশ পার্লামেণ্ট এ অধিকার দিবে না; কিন্তু আমরা কি সে কথা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি? যখন তাঁহারা কোনও ঘোষণা করিবেন, সেই সময় আমরাও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার প্রস্তাব করিব। এখন সে সময় উপস্থিত হয় নাই, কারণ, তর্কের তুফানে আমাদের আসল আদর্শটি তলাইয়া যাইতে পারে। একটা কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখন সময় আসিয়াছে। এ সময় আর অপেক্ষা করিলে চলিবে না। প্রভুত্ব-প্রয়াসী রাজকর্ম্মচারীদিগের হস্তে যে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, এখন বৃটিশ পার্লামেণ্টকে সে ক্ষমতা ভারতবর্ষের জনসাধারণের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। এ দেশে রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রাধান্যের ও প্রভুত্বের চরমলীলা হইয়া গিয়াছে। আমরা আর তাহা চাহি না। বিগত দেড়শত বৎসরের কু-শাসনে আমরা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি। আর এক দিনও কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই। যত শীঘ্র আমাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করা চাই। অর্থাৎ প্রভুত্বপ্রয়াসী রাজকর্ম্মচারীদিগের হস্ত হইতে ক্ষমতা তুলিয়া লইয়া জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করা হউক,ইহাই শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ভদ্রমহোদয়গণ, আদর্শানুসারে ধরিতে গেলে, আমি স্পষ্টই বলিব যে, বাঙ্গালার প্রস্তাবের সহিত বর্ত্তমান প্রস্তাবের কোনও বৈসাদৃশ্য নাই। কিন্তু আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত তিলক বলিতেছেন যে, আলোচ্য পদ্ধতিটি অন্যান্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু আমি ত কোনও পার্থক্য দেখিতেছি না। শ্রীযুক্ত তিলক মহোদয় বলিতেছেন যে, অধিক প্রার্থনা করা সঙ্গত নহে। আমি তাঁহাকে আলোচ্য প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালা যাহা চাহিয়াছিল, আলোচ্য প্রস্তাবে তাহার একটিও বাদ পড়ে নাই। এ প্রস্তাবের দ্বারা সম্পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ শাসন-ক্ষমতা প্রার্থনা করা হইয়াছে। ধন-ভাণ্ডারের উপর ক্ষমতার অর্থ অন্যরূপ বুঝিবার যে কোনও উপায় আছে, তাহা ত বুঝি না। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য দায়িত্বপূর্ণ শাসন-ক্ষমতা না চাহিয়া যদি বলা যায়, "আমি অন্য কিছু চাহি না, শুধু ধন-ভাণ্ডারের ক্ষমতা, আয়ব্যয়ের ক্ষমতা আমার উপর অর্পণ কর। তাহার অর্থ একই হইবে। টাকার উপর ক্ষমতা থাকিলেই আমরা ইচ্ছামত কাজ করিতে পাইব। শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ, তোমরা যদি আমার কথা না মান, আমি তোমাদের রসদ যোগাইব না। তখন তোমরা কোথায় থাকিবে? তখন তোমাদিগকে আমার কথা শুনিতেই হইবে। তখন যদি আপনার কথা তাহারা শুনে, তাহা হইলে এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি যে, আমরা দায়িত্বপূর্ণ শাসন-ক্ষমতা চাহিতেছি না। আপনারা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাহা বলিতেছেন, তাহা বাঙ্গালার তরফ হইতে আমরা স্পষ্টাক্ষরে চাহিতেছি। আপনারা শুধু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা চাহিতেছেন না, কেন্দ্রীভূত গবর্ণমেণ্টের উপরও দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে চাহিতেছেন। অবশ্য হইতে পারে যে, কথাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাষাটাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিতে হইবে, সে বিষয়ে আমার ভিন্নমত নাই।

আমার বন্ধু মিঃ জিন্না যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার সমর্থন করি। তিনি বলিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্টভাবে কিছু ঘোষণা করুন—গবর্ণমেণ্টের ঘোষণাটা অস্পষ্ট—তাঁহারা কি করিতে চাহেন, কি দিতে চাহেন—তাহা সরলভাবে ব্যাখ্যা করুন। তখন আমরা প্রস্তাবটির পুনরালোচনা করিতে পারিব। তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের ভাষাটাকেও তদুপযোগী করিয়া ভাবটাকে প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইব। এখন

আমরা নিরর্থক বিতণ্ডা করিতেছি। আদর্শ সম্বন্ধে আমরা একমত, তাহাতে কোনও পার্থক্য নাই। আসুন, আমরা শক্তি সঞ্চয় করিয়া সে বিষয়ের জন্য প্রস্তুত হই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সমস্তটাই না পাইতেছি, ততক্ষণ আমরা হাল ছাড়িব না। সকল বিষয়ে আমরা দায়িত্বপূর্ণ শাসন-ক্ষমতা চাই। জনসাধারণ যে পর্য্যন্ত না দায়িত্বপূর্ণ শাসন-ক্ষমতা পাইতেছে, ততক্ষণ আমরা কোনও মতেই নিরস্ত হইব না। আমি রাজনীতিকের উক্তির উপর নির্ভর করি না, আমি চাহি, আমার ন্যায়সঙ্গত প্রকৃতিদত্ত অধিকার। আমি ইংলণ্ডের, সুইজারল্যাণ্ড অথবা অষ্ট্রেলিয়ার রাজনীতি, নিয়মপদ্ধতি কি, তাহা জানিতে চাহি না। আমি আমাদের নিয়মপদ্ধতি কি হইবে, শুধু তাহাই চাহি। এ দেশের মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন, আমি সেই ভাবে আমাদের নিয়মপ্রণালীর প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী। ইহাই আমার কাম্য, আমি তাহাই চাহিতেছি; ইহা আমাদিগকে পাইতেই হইবে। এখন আমাদিগকে তর্ক করিয়া কাল হরণ করিলে চলিবে না, কারণ, বিতণ্ডায় তর্কের অবসান কোনও দিন হয় না। আমরা এখন হইতে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীতে এই কথা প্রচার করিতে থাকি যে, যতক্ষণ জনসাধারণের হস্তে দেশের শাসনভার সমর্পিত না হইতেছে, ততক্ষণ আমরা কোনমতেই নিরস্ত হইব না, সন্তুষ্ট হইব না। প্রত্যেক জাতিরই তাহার জন্মগত অধিকার অনুসারে বাঁচিতে হইবে, বড় হইতে হইবে, উন্নত হইতে হইবে। আমরা সেই অধিকারের দাবী করিতেছি। সে অধিকার হইতে এত কাল আমরা বঞ্চিত ছিলাম, এত দিনে আমরা তাহা অধিকার করিয়াছি, এত দিন আমরা মহানিদ্রায় মগ্ন ছিলাম, এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের সে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, তাই আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার এখন দাবী করিতেছি।

অন্তরীণের প্রতিষেধক

(বিগত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মিঃ মহম্মদ আলীর অন্তরীণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য কলিকাতায় সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান-সমাজের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তথায় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন)

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, সমবেত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, অন্তরীণ নীতি সম্বন্ধে আজ আমি কয়েকটি কথা বলিতে বাসনা করি। যে সকল সরকারী কর্ম্মচারীর উপর শাসন-ক্ষমতা অর্পিত আছে, আমি তাঁহাদের নিকট প্রায়ই প্রশ্ন করিয়া থাকি যে, যাহারা অন্তরীণে আবদ্ধ হইতেছে, তাহাদের অপরাধটা কি? কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে,সে প্রশ্নের কোনও সদুত্তর এ পর্য্যন্ত আমি পাই নাই। তাঁহারা যদি এ কথা বলেন যে, শাসন-সৌকর্য্যার্থে অন্তরীণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হইলে সে প্রয়োজনের যথার্থ স্বরূপ আমি জানিতে চাই। মধ্যযুগে যে নীতির প্রচলন ছিল, বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে কেন সে নীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা আমরা চাই। যে সকল ব্যক্তি অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের কি কারণে আবদ্ধ করা হইল, তাহার যথার্থ হেতু জানিবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে। আমি সকলের সম্বন্ধেই বলিতেছি— মহম্মদ আলী, অন্যান্য মুসলমান এবং হিন্দু— অন্তরীণে আবদ্ধ যাবতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধেই আমি এ কথা বলিতেছি। কেন তাঁহারা অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে চাই। যদি সরকার বলেন যে, প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের নিকট সে কথা প্রকাশ করা যাইতে পারে না, তাহা

হইলে আমরা একটা ছোট-খাট সমিতি গঠন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বলি যে, এই সমিতির নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলুন, কেন উহাদিগকে আবদ্ধ করা হইয়াছে? আমি কতকগুলি ব্যক্তির কথা জানি, যাঁহারা বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াও বিচারের পর অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেই তাঁহারা বিচারালয়ের দ্বারসীমা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অমনই পুলিস পুনরায় তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। আমি এই প্রকার অনেকগুলি ঘটনার কথা নিজে জানি। গবর্ণমেণ্ট কি আমাদিগকে বলিতে চাহেন যে, বিচারালয়ের বিচারে—যে বিচারালয়ে স্বয়ং ইংরাজ বিচারক অধিষ্ঠিত,—যাঁহারা নিরপরাধ বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতই অপরাধী? আমরা ইহাতে কি এই বুঝিব যে, দণ্ডবিধি আইনে অপরাধের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই? অথবা আমরা এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন বা হোমরুল চাহিতেছি, তাই তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি এই প্রকার হইয়াছে? আমাদের বাসনা যাহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, আমাদের চেষ্টা যাহাতে ব্যর্থ হয়, সেই জন্যই কি এই সকল লোককে অন্তরাণে আবদ্ধ করা হইতেছে? যদি তাহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, গবর্ণমেণ্ট সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমরাও তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদেরও কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিব। এ কথা আপনাদিগকে বলাই বাহুল্য যে, এ প্রকার প্রথা নিতান্তই অন্যায়, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী। এখন আসুন, আমরা আলোচনা করিয়া দেখি যে, কি উপায়ে ইহার গতিরোধ করা যাইতে পারে। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা এই;—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন ও সভা-সমিতি করা আবশ্যক। একটা, দুইটা বা দশটা বা এক শতটা নহে। লক্ষ লক্ষ সভার অধিষ্ঠান করা আবশ্যক। প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে, প্রত্যেক গ্রামে ইহার বিরুদ্ধে তীব্রতর আন্দোলন হওয়া চাই। যেখানে যখন যিনি অন্তরীণে আবদ্ধ হইবেন, তিনি হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন, অমনই সেই অন্তরীণের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকুক। সমগ্র দেশের ক্রোধ যে সে ব্যাপারে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বুঝিতে দিতে হইবে। যদি এই নীতি আমরা অবলম্বন করি, তাহা হইলে অবিলম্বে অন্তরীণে আবদ্ধ করিবার পদ্ধতি উঠিয়া যাইবে। সমগ্র দেশকে একটিমাত্র ব্যক্তি কল্পনা করিয়া আমরা যোড়-হস্তে সরকার বাহাদুরকে বলি যে, "যদি আপনারা এক জনকে আবদ্ধ করেন, তবে জানিবেন যে, সমগ্র দেশটাকে অন্তরীণে আবদ্ধ করিতে হইবে।"

ভারতরক্ষা আইন

(১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে টাউনহলের বিরাট সভায় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন)

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, সমবেত মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ, এই অবৈধ ও যথেচ্ছাচারমূলক আইনের বিরুদ্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিবার অবকাশ-প্রদানের জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই আইনটি যে অত্যন্ত অন্যায়মূলক, সে সম্বন্ধে আপনাদিগকে বুঝাইবার কোনও প্রকার যুক্তিজালের অবতারণা করার প্রয়োজনীয়তা আমি এখন আর অনুভব করিতেছি না। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই আপনারা বিষয়টি বিশদরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং সে

সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। অতএব আমি এখন শুধু প্রস্তাবটি সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলিতে চাই।

প্রস্তাবটিতে পাঁচটি ধারা আছে।

"ভারত-রক্ষা বিধান ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল রেগুলেশনের তৃতীয় বিধান অনুসারে গবর্ণমেণ্ট অন্তরীণ ও দেশান্তর সম্বন্ধে যে নীতির অবলম্বন করিয়াছেন, এই সভা তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

(১) ভারত-রক্ষা আইন যুদ্ধের জন্য প্রযুক্ত নহে, উহা দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং উহা পরিত্যক্ত হউক।

(২) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল রেগুলেশন নং ৩ পরিত্যক্ত হউক।

(৩) অন্তরীণে আবদ্ধ যে সকল ব্যক্তির অপরাধের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট প্রমাণ-প্রয়োগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে অভিযুক্ত করুন।

(৪) যাহাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই, তাহাদিগকে এখনই মুক্তি প্রদান করুন।

(৫) দমননীতি-সংক্রান্ত যদি কোনও প্রকার আইন প্রণয়ন করিবার কল্পনা থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

আমি প্রথমতঃ তৃতীয় ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কারণ, আমার মতে এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার আলোচনার প্রয়োজনই নাই। রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ের গবর্ণমেণ্টের প্রযুক্ত যাবতীয় যুক্তি-তর্ক মানিয়া লইলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, বর্ত্তমান নীতি অবলম্বন করিবার কোনই হেতু নাই। অন্তরীণে আবদ্ধ এই সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয় কোনও প্রমাণ আছে, নয় ত কিছুই নাই। যদি কোনও প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই। যদি প্রমাণ থাকে, তবে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইতেছে না কেন? ইহাতে শুধু লোকের মনে এই সন্দেহ প্রবল হইতেছে যে, যাহারা অন্তরীণে আবদ্ধ, তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণাভাব আছে বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করিতেছেন না। যদি পর্য্যাপ্ত প্রমাণই থাকে, তবে আমি আবার বলি, কেন তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে বিচারার্থ উপস্থাপিত করা হইতেছে না? বর্ত্তমান বিচারপদ্ধতি পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া যে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। প্রমাণ সত্ত্বেও মানুষকে গবর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হেফাজতে অথবা কারাগারে রাখিতেছেন, অথচ বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিতেছেন না, এ ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেলে সেটা অত্যন্ত আশঙ্কার কথা হইবে। আমি আবার বলিতেছি, এ ধারণা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া গেলে, তাহাতে আশঙ্কার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ, জনসাধারণ ইহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যেন কোনও প্রমাণ নাই; যাহাতে তাঁহাদিগকে বিচারালয়ে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। ইহা অপেক্ষা বিপজ্জনক ব্যাপার আমার কল্পনারও বহির্ভূত।

প্রস্তাবের অন্য ২ ধারা সম্বন্ধে আমি এইবার আলোচনা করিব। আমি সোজা কথা ভালবাসি। বর্ত্তমান আইনটি সঙ্গত কি অসঙ্গত? যদি ইহা অসঙ্গত হয়, তবে ইহাকে কোনওরূপেই আইনের কেতাবে স্থান দান করা কর্ত্তব্য নহে। সভাপতি মহোদয় আপনাদিগকে স্পষ্টভাবেই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি এই আইনটিকে "আইনবর্জ্জিত বিধান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লোকপ্রসিদ্ধ সভাপতি মহোদয়ের কথাটি আমি আপনাদিগকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছি। উক্ত কথাটায় এই বুঝাইতেছে যে, আলোচ্য আইনের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার

আছে, সবই উহাতে বলা হইয়াছে। "বিধানশূন্য আইন" কাহাকে বলে? যে আইনের দ্বারা সমাজের স্থায়িত্ব-রক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হয় না, তাহাকেই "বিধানশূন্য আইন" বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। আইনের পোষাক-পরিহিত হইলেও ইহা আইন নহে। যাহা ন্যায়সঙ্গত, যথার্থ ইহা তাহার বিরোধী। ন্যায়বিচারকে এই আইন মানিয়া চলে না, কাজেই ইহা বিধানকেও অস্বীকার করে। এই আইন মানুষের জন্মজাত অধিকারকে ধ্বংস করিতেছে বলিয়া আমরা ইহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষকে গ্রেপ্তার করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তাহাকে আটক রাখা হইবে, অথচ দেশের প্রচলিত বিধানানুসারে তাহার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে, আদালতে তাহাও বলা হইবে না, প্রমাণ-প্রয়োগ করা হইবে না, ইহা মানবের জন্মজাত স্বাভাবিক অধিকারের পরিপন্থী। কাজেই ইহা বিধানশূন্য, শৃঙ্খলাবিরহিত "উদ্দাম আইন!"

এই বিধানটা কি, তাহা আপনারা বুঝিয়া দেখিবেন। ইহার কিয়দংশ আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি। কারণ, আপনাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবহারাজীব নহেন এবং সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না, এই বিধানের বাস্তবতঃ নিরঙ্কুশ বাক্যাবলীর অন্তরালে কি ভীষণ অন্যায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে এই বিধান প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণের মঙ্গল কোথায়, তাহা এই বিধানের কুত্রাপি ব্যাখ্যাত হয় নাই। জনসাধারণ ইহা চাহে না; যে আইন অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কি বাধ্য হইয়াই জনসাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে?

আইনটাকে আরও ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। এই বিধানের দ্বারা কোন কোন রাজকর্ম্মচারীকে (সামরিক বা অসামরিক) এরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা যদি মনে করেন যে, কোনও ব্যক্তির কার্য্য সন্দেহজনক অথবা যদি সেই ব্যক্তির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে, কিংবা সে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে সাধারণের ক্ষতি হইতে পারে, তবে তাঁহারা সে ব্যক্তিকে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না বা তাঁহাদের নির্দ্ধারিত এলাকার মধ্যে সে ব্যক্তিকে বাস করিতে আদেশ দিতে পারেন;—কিংবা সে ব্যক্তিকে এমন ভাবে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে অমুক কার্য্য তিনি করিবেন না ইত্যাদি। দেখুন, কি চমৎকার অস্পষ্ট ভাব ও ভাষা! অবশ্য, এ কথাগুলির মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহা দোষযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। যখন এই আইন প্রথম পাশ হয়, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে, এই আইনের কার্য্যপ্রণালী এইরূপ আকার ধারণ করিতে পারে? তখন কে ভাবিয়াছিল যে, এই আইনের বলে যুবকদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে লইয়া যাওয়া হইবে? নির্জ্জন কারাকক্ষে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য তাহারা রক্ষিত হইবে? যখন উহা আইনে পরিণত হইয়াছিল, তখন আইনপ্রণয়নকারীর মনে কি এই প্রকার উদ্দেশ্যই ছিল? যুদ্ধের সময় যদি কোন বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য লোকে বুঝিতে পারে, গৃহদ্বারে যখন শত্রু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যদি কোনও কঠোর বিধান প্রচলিত হয়, লোকে তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারে। কিন্তু মাতার ক্রোড় হইতে কিশোরবয়স্ক বালকগণকে কাড়িয়া লইয়া গৃহকোণ হইতে যুবকগণকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া এবং কোন্ অপরাধে তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা প্রকাশ না করা কি ন্যায়সঙ্গত? বিশেষতঃ বিচারালয়ে তাহাদিগকে অভিযুক্ত না করা কি আরও গুরুতর অন্যায় নহে? এই আইন যে অন্যায় অত্যাচারমূলক এবং অবশ্য পরিহর্ত্তব্য, এখনও কি তৎসম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের অবকাশ আছে? সমাজ-রক্ষার জন্য

আইনের প্রয়োজন ; কিন্তু তাহা এই আইন নহে। এই বিধানের ন্যায় অন্যায় ও অত্যাচার-মূলক আইন আর আছে কি ? প্রয়োজনবশে এই আইনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুন। শত্রুর আক্রমণে বাধা দিবার জন্য, ভারতবর্ষকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কখনই এই আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই ; বাঙ্গালাদেশকে রক্ষা করিবার জন্যও উহার প্রয়োজনীয়তা নাই। এই আইনের দ্বারা বাঙ্গালাদেশই অত্যন্ত কঠোরভাবে নিপীড়িত হইয়াছে। এই কঠোর শাসনমূলক আইনের ভারে জনসংঘ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে, তাহারা আইনের অর্থ অন্য প্রকারে বুঝিতেও বা পারে। তাহারা মনে করিতে পারে যে, স্বাধীনতার জন্য দেশের যে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্যই বুঝি এই আইনরূপী বজ্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ; কোনও রাজ-ক্ষমতালুব্ধ সরকার জনসাধারণের এবম্প্রকার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে মুহূর্ত্তের জন্য বরদাস্ত করিতে পারেন না, তাই বুঝি এইরূপ আইনের দ্বারা তাহার গতিরোধ করা হইতেছে !

এই নীতি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অবলম্বিত হইয়াছে। সভাপতি মহোদয় আমাদিগকে সে কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সেই সময় হইতে কতকগুলি অবৈধ সার্কুলারও জারী হইয়া আসিতেছে। সে সকল ঘোষণা-লিপি হইতে অনেকেই একটু ভুল বুঝিতেও আরম্ভ করিয়াছে। "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি বন্ধ করিবার জন্য কতকগুলি ঘোষণালিপি বাহির হইয়াছিল। আর কতকগুলি ঘোষণালিপি ছাত্রদিগের বিরুদ্ধেও প্রকাশিত হয়। ইহাতে কাহারও কাহারও মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এই সকল ঘোষণার দ্বারা আমাদের আত্মোন্নতি ও ক্রমবর্দ্ধনশীল স্বাধীনতালাভের প্রয়াসকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমি সরকার বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এইরূপ অন্যায় ও অবিচারে প্রপীড়িত হইয়া যদি জনসাধারণ তোমাদের উদ্দেশ্যের স্বরূপ বুঝিতে না পারে, তোমাদের কার্য্যের অর্থ অন্য প্রকারে করিয়া লয়, তবে কি তোমরা তাহাদিগকে দোষ দিতে পার ?

এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই আইন-প্রবর্ত্তনে যে উদ্দেশ্যের আরোপ করা হইয়াছে, তাহা যথার্থ নহে। প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? উহারা বলিতেছে, "দেশমধ্যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে।" আমি উত্তরে বলিব, আচ্ছা, স্বীকার করিয়া লইলাম আমি জানি, উহা সত্য, আমি বিশ্বাস করি, সে কথা মিথ্যা নহে। বাঙ্গালাদেশে যে বিপ্লববাদী একটি দল আছে, তাহা আমি সত্য বলিয়া মানি। আজ আমি এখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছি, ইহা যেমন সত্য, বাঙ্গালায় বিপ্লববাদী দল যে আছে, তাহা তেমনই সত্য। কিন্তু তাহাতে কি তোমরা মনে কর যে, এই উপায়েই তোমরা বিপ্লবপন্থী দলকে পিষিয়া ফেলিতে পারিবে ? কোনও দেশের বিপ্লব কি এই প্রকার নীতি-বিগর্হিত আইনের দ্বারা লুপ্ত করা গিয়াছে ? এমন একটা উদাহরণ ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাও, যাহাতে কোনও দেশের কোনও বিপ্লব এই প্রকার পীড়নমূলক আইনের দ্বারা তিরোহিত হইয়াছে। আমি স্বীকার করিতেছি যে, বিপ্লববাদটা ভাল জিনিস নহে। আমি মানিয়া লইতেছি যে, বিপ্লববাদী দলের কার্য্যকলাপ এ দেশের প... কল্যাণপ্রদ নহে এবং তাহার মূলোচ্ছেদ ... আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি ... যাহাতে প্রকৃতই বিপ্লববাদের মূলোচ্ছেদ ..., তাহাই কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয় ? গবর্ণমেণ্ট কি প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, বিপ্লববাদী দল অন্য কোনও বৈদেশিক শক্তিকে এ দেশে আনিতে চাহে ? আমার বিশ্বাস, কখনই

তাহা হইতে পারে না। যদি তাহা না হয়, তবে তাহারা কি চাহে? এই বিপ্লববাদের মূল কোথায়, কারণ কি, গবর্ণমেণ্ট কি কোনও দিন তাহার সন্ধান লইয়াছেন? ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল ইহার কথা শুনিয়াই আসিতেছি। একের পর আর একটি দমননীতি অনুসৃত হইয়াছে; কিন্তু বিপ্লববাদের মূল উদ্দেশ্য কি, কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান কখনও হইয়াছে কি? আমি আপনাদিগকে বলিতেছি, গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বসম্পন্ন কর্ম্মচারীদিগকেও পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি যে, এই সভাক্ষেত্রে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, আমি তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা এই বিপ্লববাদী দলের সকলকে ভালরূপে জানি। আমি এই দলের বহু ব্যক্তির মোকদ্দমায় তাহাদের পক্ষসমর্থন করিয়াছি, সুতরাং তাহাদের মানসিক অবস্থা, মনোবৃত্তির দার্শনিকতা সম্বন্ধে আমার পর্য্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে। এই বিপ্লববাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা। বিগত দেড় শত বৎসরের মধ্যে তোমরা এমন কি করিয়াছ, যাহাতে এ দেশের লোক স্বাধীন হইতে পারে, অথবা এমন কি শিক্ষা দিয়াছ, যাহাতে তাহারা স্বাধীন হইবার যোগ্য হইতে পারে? আমরা কি সর্ব্বদাই এ কথা শুনিতে পাই না যে, আমরা এখনও স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য হই নাই?—আমরা অশিক্ষিত, উপযুক্ত-পরিমাণ শিক্ষা আমাদের হয় নাই? ইহার উত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি—"তোমরা এ দেশে দেড় শত বৎসর রহিয়াছ, তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযোগী করিয়া তোলাই তোমাদের উদ্দেশ্য, তবে এত দিন কেন তোমরা সে কার্য্য কর নাই?"

বিপ্লববাদের মূল-তত্ত্ব ইহাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ দেখিতেছে, পৃথিবীর সকল জাতিই স্বাধীন। অন্য জাতির অবস্থার সহিত আপনাদের অবস্থার তুলনা করিয়া তাহারা পরস্পর বলাবলি করিয়া থাকে, "আমরা এমন অবস্থায় কেন থাকিব? আমরাও স্বাধীনতা চাই।" এই ইচ্ছাটা কি অসঙ্গত? তাহাদের এ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা কি কঠিন কার্য্য? আমরা কি সকলেই বুঝি না, স্বাধীনতার ক্ষুধা কি প্রকার? এই সকল যুবক যৌবনের উৎসাহ ও উত্তেজনায় অধীর হইয়া সর্ব্বদাই মনে করিতেছে যে, তাহাদের দেশের শাসন-ব্যাপারে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের সুযোগ তাহারা পাইতেছে না, জাতীয় ক্রমোন্নতির সুবিধা হইতেছে না। আজ তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দান কর, দেখিবে, দেশে আর বিপ্লববাদ নাই। আজই তাহাদিগকে তাহাদিগের অধিকার প্রদান কর, এ দেশের জনসাধারণকে বল, "এই লও, তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা দিলাম, আমরা গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতি পরিবর্ত্তন করিতে চাই, এখন তোমাদেরই গবর্ণমেণ্ট হইল—জনসাধারণের জন্য জনসাধারণই শাসন-কার্য্য চালাইবে। তোমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করিয়া যাও, তোমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তোল, ইতিহাসের গতি ফিরাইয়া দাও, নূতন করিয়া জাতীয় ইতিহাস গড়িয়া তোল।" আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, ইহা বলিবার পরই দেশ হইতে বিপ্লববাদী দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এ কথা আমি কতবার বলিয়াছি। আমাদের নেতৃবৃন্দ বহু, বহুবার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এ কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের কথা কেহ কানে তুলেন নাই।

তাহার পরিবর্ত্তে আমরা শুনিয়াছি যে, উহার প্রতিষেধক ভারতরক্ষা আইন। আমাদিগকে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক অপরাধ, এই আইন প্রবর্ত্তনের পর হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু আমি বলিতেছি, তাহা সত্য নহে। চারিদিকে অসন্তোষ যখন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, তখন কেমন করিয়া বলা যায় যে, রাজনৈতিক অপরাধ হ্রাস পাইয়াছে?

বিপ্লবপন্থী দলের সভ্যগণ হয় ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, এই আইনের বলে যেমনই এক এক জন ব্যক্তিকে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হইতেছে, অমনই দেশমধ্যে অসন্তোষের মাত্রা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে কি বিপ্লববাদী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না? এইখানেই যথার্থ বিপদ্। ইহাতে বিষের ন্যায় ক্রিয়া হইতেছে এবং আমাদের জাতির মধ্যে সংক্রামিত হইয়া জাতীয় জীবনীশক্তিকে হ্রাস করিতেছে। এই আইন আমাদের স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া আমি উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছি। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ রাজভক্তির মূলদেশে এই আইন কুঠারাঘাত করিতেছে বলিয়া আমি উক্ত আইন রদ করিতে চাহি।

এ দেশে এমন লোকও আছে, যাহারা বলিবে যে, গবর্ণমেণ্ট কখনই এই আইনের প্রত্যাহার করিবেন না। আমার দেশবাসীকে আমি বলিতেছি—"হতাশ হইও না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, যদি দেশের সমগ্র লোক মিলিত হইয়া সমস্বরে বলিতে পারে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি জগতে নাই। আসুন, আমরা সমস্বরে বলি,—"আমরা এই আইন চাহি না, আইন তুলিয়া লও।" আমাদের এই কণ্ঠস্বর দেশের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হউক, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক পল্লী হইতে কণ্ঠস্বর মিলিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে উত্থিত হউক। এই সভার ন্যায় শতসহস্র লক্ষ সভার অধিষ্ঠান হউক। আমরা সমস্বরে, মিলিত-কণ্ঠে এই আইন রদ করিবার জন্য দাবী করিতে থাকি, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, এ আইন থাকিবে না, উঠিয়া যাইবেই।

প্রধান মন্ত্রীর উক্তি

(১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ডালহৌসী ইন্‌ষ্টিটিউটে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত করাইবার জন্য আমাকে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে হইবে না। প্রস্তাবটিতে সব কথাই বলা হইয়াছে। শুধু কেহ কেহ এ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়াই আমি উহার সমর্থনের জন্য কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আমাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছেন যে, তাঁহারা মনে করেন, এই বিপদের দিনে গবর্ণমেণ্টকে রাজনীতিক অধিকার ও সুবিধা লাভের জন্য বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। সেই সকল সমালোচককে আমি বলিতে চাই, যে দেশের লোক বহু বৎসর যাবৎ রাজনীতিক অধিকারলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, যে দেশের লোকের আবেদন নিবেদন ঘৃণাভরে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, সে দেশের লোক স্বতঃপরতঃ বিপুলবাহিনী গঠন করিয়া দিবে, ইহা কি সম্ভবপর? যদি তাহাদিগকে উৎসাহে উত্তেজনায় মাতাইয়া তুলিতে পার, যদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পার, তাহারা আপনাদের মঙ্গলের জন্যই, দেশের জন্যই লড়াই করিতে যাইতেছে, তবেই দেশের লোক এই আহ্বানে প্রাণ ভরিয়া সাড়া দিবে। এই দেশটা যে তাহাদের নিজের দেশ, ইহা কি দেশের লোককে বুঝিবার সম্যক্ অবকাশ কখনও দিয়াছ যে, আজ তাহাদিগকে সেনাদলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছ?—এই যে বিশাল সাম্রাজ্য, ইহা কি তাহাদের সাম্রাজ্য? ইহা কি তাহাদিগকে অনুভব

করিবার সুযোগ কখনও দিয়াছ? এই সাম্রাজ্যে তাহাদের কোনও অধিকার—কোনও অংশ আছে কি? আজ যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ, এ অবস্থায় সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া কি তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর?

তার পর আমরা চাহিতেছি কি? আমাদের সে অনুরোধ কি অসঙ্গত? বাঙ্গালাদেশের বহু বংশধর, যাহাদিগকে তোমরা অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, তাহাদিগকে মুক্তি দান করিবার কথা বলা কি অসঙ্গত? এই ঘোর দুর্দ্দিনে, যখন গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়েরই পক্ষে সঙ্কট আসন্ন, সেই সময় অবরুদ্ধ যুবকদিগকে মুক্তিদান করিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, দেশটা তাহাদেরই দেশ, তাহারা অনুভব করিতে পারিবে যে, দেশের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সুখ-দুঃখে উদাসীন নহেন; দেশের সরকার তাহাদের অধিকার ও সুবিধার বিষয়ে অনবহিত নহেন। এ সময়ে গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে বিবেচনা করিবার প্রস্তাব করা কি অন্যায়? অস্ত্রধারণ কর, সেনাদলে যোগদান কর, এই আহ্বানবাণী আমরা শুনিয়াছি। এ আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এ কথা আমি বলিতেছি, তাহার প্রধান কারণ—গবর্ণমেণ্টকে ইহা জানান আমার কর্ত্তব্য। এই সন্ধিক্ষণে, যাহাতে দেশবাসীরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেনাদলে যোগদান করে, সে জন্য যাহারা এখন কারাগারে আছে, বিনা বিচারে অবরুদ্ধ অবস্থায় যাপন করিতেছে, তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এমন প্রশ্ন তুলিতেছি না যে,তাহারা দোষী অথবা নির্দ্দোষ—আগে বিপদ্ কাটিয়া যাউক, তার পর সে বিচার হইবে। আমি শুধু গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, তাহা হইলে তাহারা সেনাদলে যোগদান করিবে। তাহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখিয়া কি কখনও এ দেশ হইতে হাজার সৈনিককে সেনাবাহিনীতে পাইবে? তাহাদিগকে মুক্তি দান কর। কত সৈন্য তোমরা চাও? বাঙ্গালা কত সৈন্য দিতে পারে, তাহা দেখিতে পাইবে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ছয় মাসের জন্য আমি আমার কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া সমগ্র দেশমধ্যে পর্য্যটন করিয়া হাজার হাজার সৈনিক সংগ্রহ করিয়া দিব। আমরা যে সেনাদল অবলীলাক্রমে সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার পথ গবর্ণমেণ্ট পরিষ্কার করিয়া দিন।

ভদ্রমহোদয়গণ, যখন আমি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া দেখি, আসন্ন বিপদের কথা ভাবিয়া দেখি, গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ ক্ষমতাপ্রয়াসী রাজকর্ম্মচারী ও জনসাধারণের বর্ত্তমান সম্বন্ধের কথা আলোচনা করি, তখন সত্যই আমার মনে হয়,ইহার মত করুণ,বিয়োগান্ত ব্যাপার আর কিছু নাই। রাজকর্ম্মচারিগণ জনসাধারণকে সন্দেহের চক্ষে দর্শন করেন। এ কথা আমরা শত শত বার উল্লেখ করিয়াছি, বলিয়া বলিয়া আমাদের গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আবার সে কথা এখনও বলিতেছি, আমি জনসাধারণের মনের গতির সহিত পরিচিত, আমি মোকর্দ্দমায় তাহাদের পক্ষে দাঁড়াইয়াছি, বিপ্লববাদী দলের আমি এমন একটি লোককেও জানি না যে, সে কোনও বৈদেশিক শক্তিকে দেশে আনিতে চাহে—সে বৈদেশিক শক্তি জর্ম্মণই হউক বা জাপানই হউক। যদি এ সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান হয়, যদি নিরপেক্ষ লোক এ অনুসন্ধান করেন, আমি তাঁহাকে প্রমাণ করিয়া দিব যে, আমার কথা খাঁটি সত্য। কিন্তু আমাদের এ অনুরোধ অরণ্যে রোদনে পরিণত হইয়াছে। কেন? কারণ, গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে বিশ্বাস করেন না। তাহার ফল এই, তাঁহারা আমাদের কথা ভাল করিয়া বুঝেন না এবং আমাদের উক্তির অন্য প্রকার

অর্থ করিয়া লন। আর আমরাও তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করি, কারণ, তাঁহারা আমাদিগকে, জনসাধারণকে বিশ্বাস করেন না বলিয়া। আমি সত্যই স্বীকার করিব যে, অনেক সময় আমরা তাঁহাদের বিঘোষিত বাণীর ভিন্ন অর্থ করিয়া লই, অনেক সময় অন্যায়রূপে তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করি। কিন্তু ব্যাপারটা সত্য, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিয়া আসিতেছি। সেই নিমিত্ত আমি এ অবস্থাকে করুণ ও বিয়োগান্ত বলিয়া উল্লেখ করিলাম। আমি এ কথা গবর্ণমেণ্টকে নিশ্চয় বলিয়া দিতেছি যে, আমি প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, বাঙ্গালার যে কোনও রাজনীতিক দলের এমন একটি ব্যক্তি নাই যে, কখনও এ কথা মনে করে যে, ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজের কোনও সম্বন্ধ থাকিয়া কাজ নাই; এমন কোনও ব্যক্তি নাই যে, সে অন্য কোনও বৈদেশিক শক্তিকে এখানে আনিবার কল্পনাও মনের মধ্যে স্থান দান করে। আপনারা কেহই তাহা বিশ্বাস করেন না। আমরা শুধু ইহা অনুভব করিতে চাই যে, এ দেশ প্রকৃতই আমাদের—আমরা যে একটা জাতি, তাহা আমরা বুঝিতে চাই, আমাদের যে ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহাও আমরা অনুভব করিবার কামনা রাখি। আমাদের আদর্শকে প্রকাশ করিতে চাই, অন্যান্য জাতির পার্শ্বে আমরাও দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি যে, আমরাও একটা জাতি। আর আমরা বিশ্বাস করি যে, ইংরাজজাতির সংস্রবে থাকিয়া এ কার্য্যটি আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। জনসাধারণের প্রকৃত মনের ভাবই এইরূপ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজকর্ম্মচারিগণ আমাদের কথা বিশ্বাস করেন না, সুতরাং তাহার ফলে এই হইতেছে যে, অনেক সময় আমরাও তাঁহাদিগের কথায় ও কাজে বিশ্বাস করি না। এই কারণ আমি এ অবস্থাকে পুনঃ পুনঃ বিয়োগান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আমি আবার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা আর উপেক্ষা করিবেন না, অগ্রসর হউন। প্রধান মন্ত্রী মহোদয় সেনাদল সংগ্রহের আদেশ করিয়াছেন। এ আহ্বান শুধু সৈন্য-সংগ্রহের জন্য নহে, ইহাতে কর্ত্তব্যে অবহিত হইবার আহ্বানবাণীও শুনা যাইতেছে। আমাদের কর্ত্তব্যপালন করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। তোমরাও একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তোমাদের কর্ত্তব্যপালনে তৎপর হও, সম্মুখে অগ্রসর হও, জাতিগত বৈষম্যের কথা বিস্মৃত হও, বৃথা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানকে সরাইয়া দেও, আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াও—আমাদের হাত ধরিয়া থাক, আমাদিগকে আপনার করিয়া লও, দেখিবে, এ দেশে আমরা এমন সেনাদল গঠন করিয়া তুলিব যে, বৈদেশিক আক্রমণকারী শক্তি যতই প্রবল-পরাক্রান্ত হউক না কেন, আমরা তাহাকে পরাজিত করিয়া হটাইয়া দিব। গবর্ণমেণ্টকে আমি বলিতে চাই, যদি তোমরা প্রকৃতই এ দেশ হইতে বিরাট বাহিনী গঠিত করিতে চাও, ইহা সম্ভবপর বলিয়া যদি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পার, জাতীয় দলভুক্ত হইলেও আমি বলিতে চাই যে, যুদ্ধশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের রাজনীতিক বিরোধ মূলতুবি রাখিতে আমি সম্মত আছি। সম্ভব হইলে কর, আমাদের কোনই আপত্তি নাই। ত্যাগস্বীকার করিবার জন্য আহ্বান কর, দেখিবে, বাঙ্গালার জনসাধারণ সর্ব্বাগ্রে সে জন্য অগ্রসর হইয়াছে। এই বিপদের সময়েও আমি যে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য বলিতেছি, তাহার প্রধান কারণ, তোমরা যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ, উহাদিগকে মুক্তি দিলে তাহা নির্ব্বিঘ্নে ও সহজে সম্পন্ন হইবে। তোমরা যদি মনে কর, উহাদিগকে এই মুক্তি না দিলেও সে কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে, তবে তাহাও করিতে পার। তোমরা কর্ত্তব্যপালনে আমাকে উদাসীন দেখিতে

পাইবে না। আমি পরবর্ত্তী কালের জন্য অপেক্ষা করিব। আমি যদি দেখি যে, আমাদের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা হইতে একটি বৃহৎ সেনাদল গঠন করিতে পারিয়াছেন, ভালই, আমি যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, সেই সময় শপথ-ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিব। তত দিন ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিব। আমরা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। শুধু একবার তোমরা আহ্বান কর। এখন আর কোন কথা বলিব না। কার্য্য শেষ হউক, সময় আসুক, তখন সব দেখা যাইবে।

বিরাট পরিবর্ত্তন

[১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেনের সভাপতিত্বে যে হোমরুল লীগের অধিবেশন হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন তথায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন]

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সভ্যবৃন্দ, আজ অপরাহ্নে আপনাদের সুবিখ্যাত সভাপতি মহোদয় আপনাদের নিকট মাদৃশ ব্যক্তিকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, আপনারাও আমাকে সমাদরে আহ্বান করিয়াছেন, এ জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি যখন চট্টগ্রামে আসিবার জন্য যাত্রা করি, সে সময় আমি সংকল্প করিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রধান ব্যাপার আমাদের আলোচনার যোগ্য, সে সম্বন্ধে আমার ও মদীয় কলিকাতাস্থিত বন্ধুবর্গের মতামত চট্টগ্রামবাসিগণের সম্মুখে বিবৃত করিব। বিচারালয়ের মোকদ্দমা-পরিচালনের পর আমি পরিশ্রান্ত, সুতরাং আমি যতটা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তদনুযায়ী আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিব না। তবে যতটা সম্ভব, সংক্ষেপে আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।

ভদ্রমহোদয়গণ, স্বায়ত্ত-শাসনই এখন আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিলেই অন্যান্য প্রশ্নের সমাধান সহজ হইয়া আসিবে। আমাদের জাতীয় পূর্ণ-পরিণতি ইহার উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমি এবং আমার বন্ধুবর্গের এইরূপ ধারণা যে, যতক্ষণ না আমরা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে পারিতেছি, দেশের শাসনভার আমাদের হস্তে লইতে পারিতেছি, তত দিন জাতিগঠন-কার্য্য অসম্ভব। অতীতযুগে আমরা মনে করিতাম, গবর্ণমেণ্ট আমাদের জন্য সকল কার্য্য করিয়া দিবেন, এই ভাবিয়া আমরা আলস্যে কালহরণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু দীর্ঘ দেড় শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের পর আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে? এই দীর্ঘ দেড় শতাব্দীর পরে আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

আমাদের আপনার বলিবার কি আছে? আজ যদি শত্রু আসিয়া আমাদের গৃহদ্বারে হানা দেয়, যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারি, এমন শক্তি কি আমাদের আছে? কোনও যুদ্ধাস্ত্র কি আমাদের আছে? আমাদের স্ত্রী, পুত্র ও গৃহকে রক্ষা করিবার উপযোগী একগাছি যষ্টিও কি আমাদের আছে?—না, নাই। অর্থ আছে?—না। বাঙ্গালার জনসাধারণ কি শিক্ষিত?—না। দেড় শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তথাপি এ দেশের লোক প্রকৃত শিক্ষা পায় নাই। কেন পায় নাই, তাহার কারণ-নির্দ্ধারণের প্রয়োজন নাই। আমি শুধু আমাদের বর্ত্তমান নৈরাশ্যজনক অবস্থার একটা চিত্র প্রদান করিতেছি। আমাদের কিছুই নাই—অর্থ নাই, অন্ন নাই, শিক্ষা পর্য্যাপ্ত নাই। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এইটুকু স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, এ সমস্যার সমাধান করিতে

হইলে স্বায়ত্ত-শাসনের একান্ত প্রয়োজন। স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিবার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি, তর্ক ও অবস্থার উল্লেখ করা হয়, আমার মতে তাহাই আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিবার উপযুক্ত কারণ। কর্তৃপক্ষ বলিয়া থাকেন, এ দেশের লোক শিক্ষিত নহে বলিয়াই স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার আমরা যোগ্য নহি। ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই, এত দিন তাহারা শিক্ষা পায় নাই কেন? অন্য দেশে শিক্ষারম্ভের বিশ অথবা পঁচিশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা-কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়। কোথাও কোথাও তদপেক্ষা অল্পসময়ের মধ্যে জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ দেশে দেড় শত বৎসরের ইংরাজ-শাসনেও কেন জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠে নাই? ইহার কারণ কি? তাঁহাদের প্রয়োজন হয় নাই। এ দেশের রাজক্ষমতা-দর্পিত রাজকর্ম্মচারিগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই; কিন্তু উহা এ দেশবাসীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমাদের জাতির উন্নতির পক্ষে উহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জাতীয়তাকে বজায় রাখিতে গেলে উহা পাইতেই হইবে। যদি তুমি বল যে, আমরা অশিক্ষিত, তাই আমরা স্বায়ত্ত-শাসনের অনুপযুক্ত, আমি বলিব, আমরা অশিক্ষিত বলিয়াই আমরা হোমরুল চাই। কারণ, উহা পাইলে আমরা বিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের সমগ্র দেশবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিব।

এ কথার উত্তরে হয় ত কর্তৃপক্ষ বলিবেন, যদি স্বায়ত্ত-শাসন তোমাদিগকে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে শুধু যাহারা শিক্ষিত, তাহারাই উহার ফলভোগ করিবে মাত্র। সমগ্র দেশের কি তোমরা প্রতিনিধি? তখন দেশের শাসনভার রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর না থাকিয়া কয়েক জন শিক্ষিত ভারতবাসীর হাতেই থাকিবে, তাহাতে সমগ্র দেশবাসীর উপকার হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, আমাদের সে উদ্দেশ্য নহে। আমরা সেরূপ স্বায়ত্ত-শাসন চাহিতেছি না। শুধু কয়েক জন শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে উহা আবদ্ধ থাকিবে না। দেশের আপামর জনসাধারণ, প্রজা ও কৃষক যাহাতে স্বায়ত্ত-শাসনের সুধাময় আস্বাদ পায়, আমাদের কাম্যই তাহাই। সেরূপ স্বার্থপরতা আমাদের নাই। সমগ্র দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতে পারে, তাহাই আমাদের কামনা। ব্যুরোক্রেশীর দল হোমরুল দিতে অনিচ্ছুক, কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারের ধ্বংস হইবে। কলিকাতাস্থিত ইংরাজ বণিকগণ ইহার বিরোধী, কারণ, উহা তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী। ব্যুরোক্রেশীর ছায়াতলে তাঁহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহারা সে সুবিধা ত্যাগ করিতে সম্মত নহেন। আমরা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিলে তাঁহাদের এ সুবিধা দিন অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা, তাই তাঁহারা নারাজ। আমাদের স্বার্থও ইহাতে সঙ্কুচিত হইবে। কারণ, যদি শুধু শিক্ষিত কয়েকজন ভারতবাসীর হাতে স্বায়ত্ত-শাসনের ভার থাকে, তবেই ভাল, নহিলে জনসাধারণের মধ্যে উহা বিস্তৃত হইলে শিক্ষাভিমানী ভারতবাসীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। সকলকে এ অধিকার দিলে আমরা যাইব কোথায়? আমার কোনও বন্ধুর সহিত এ বিষয়ে একটু আলোচনা হইয়াছিল। বন্ধুটির নাম এখন অপ্রকাশ। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, হোমরুলের মানে কি? ইহার অর্থ এই যে, জনসাধারণের কথা শুনিতে হইবে। আমাদের মত তাহাদেরও সকল বিষয়ে ক্ষমতা থাকিবে। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, আমরা কোথায় যাইব? আমি তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলাম, তাঁহাদের যেখানে যাওয়া উচিত, সেইখানেই যাইবেন। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথার অর্থ সম্যক্ অবধারণ করিবেন।

ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনায় আমরা এ সংঘর্ষে

প্রবৃত্ত হই নাই। শুধু বর্ত্তমানে সুবিধা-লাভের জন্য আমরা লড়াই করিতেছি না—আমার বা আপনার সুবিধার জন্যও এ আন্দোলন নহে, বর্ত্তমান বংশধরগণের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্যও এ আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। যদি আমাদের মধ্যে কেহ ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন, আমি তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য করিতে সম্মত নহি। আমি চাহি সমষ্টির কল্যাণ, সমগ্র দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা। আমার কি হইবে, তাহা আমি জানিতে চাহি না, বর্ত্তমান বাঙ্গালীর কি হইবে, তাহাও জানিবার প্রয়োজন নাই, আজিকার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু চাই, আমার জাতির কি হইবে। আমি ভবিষ্যতের সেই দিনের দিকে চাহিয়া আছি, বাঙ্গালী জাতি যখন গৌরবে ও যশের মহিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। সে সময়ে আমি বাঁচিয়া থাকিব কি না, তাহা জানিতে চাহি না; সন্তানসন্ততিগণ তখন বিদ্যমান থাকিবে কি না, তাহাও আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এমন এক দিন আসিবে, যখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালী জাতি সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, একটা জাতি বলিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমি শুধু এই কামনাই করিতেছি। আমার ভিতর হইতে কে যেন আমাকে বলিয়া দিতেছে, ইহাই আমার একমাত্র কার্য্য। আমার যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু শ্রেয়, আমি এই কার্য্যসাধনের জন্য তাহাই প্রয়োগ করিব, যদি তাহাতে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? এই কাজ করিতে করিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে, আমি আবার এই পৃথিবীতে এই বাঙ্গালা দেশেই জন্মগ্রহণ করিব, আবার আমার দেশের জন্য কাজ করিব, আবার চলিয়া যাইব, আবার আসিব, এইরূপে যত দিন না আমার মনের কামনা সম্পূর্ণ হইবে, আমার আদর্শের পূর্ণ পরিণতি ঘটিবে, তত দিন এই ভাবেই এখানে কাজ করিতে আসিব।

ভদ্রমহোদগণ, যে দিন হইতে আমরা এই আদর্শকে পাইবার জন্য আন্দোলন তুলিয়াছি, সেই সময় হইতেই ব্যুরোক্রেশীর দল আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য, সেটা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতায় এক দল বাঙ্গালীও এই মহৎ আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। "ষ্টেটস্‌ম্যান" অথবা "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় যখন এই আদর্শের বিরুদ্ধে সমালোচনা বাহির হয়, তখন বুঝিতে পারি যে, তাহাদের অযথা বিধিবিগর্হিত অবস্থার কথা আমরা প্রকাশ করিতে পারিয়াছি, সুতরাং তাহাতে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু "বেঙ্গলী" পত্রিকায় যখন ঐ প্রকার সমালোচনা পাঠ করি, তখন প্রকৃতই অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়া থাকি। বাস্তবিকই বুঝিতে পারি না, কি করিয়া উহাতে এই সকল কথা বাহির হয়। ব্যক্তিগত ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়াই কি আমাদের আদর্শ পরিচালিত হইবে? আমরা শুনিতে পাই, পূর্ব্বে যিনি নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই সকলকে পরিচালিত করিবার দাবী রাখেন। অবশ্য, তাঁহার পরিচালনা করিবার দাবী আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু শুধু তিনি অতীত যুগে নেতা ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিব এবং তাঁহার কথামত চলিব, এমন কথা আমি স্বীকার করিতে রাজী নই। অবশ্য, তিনি পথ দেখাইয়া লইয়া চলুন, নেতার কার্য্য করুন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। বর্ত্তমান সময়ে দেশের রাজনীতিকে যিনি পরিচালিত করিবেন,

তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য দিব। আমি তাঁহার পদধূলি-গ্রহণে উদাসীনতা প্রকাশ করিব না। কিন্তু যদি কেহ আমার কাছে আসিয়া বলেন, দেখ, তোমাকে এই কাজটা করিতে হইবে—বাঙ্গালার জনসাধারণ কি চাহে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই—আমি বাঙ্গালার নেতা—আমি ইহা করিয়াছি—ইহাকে সমর্থন কর। ইহার উত্তরে আমি বলিব, "কে হে তুমি? গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল। কে তোমাকে চায়?" এমন অধিকার কাহারও নাই। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই আমাদের সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছি, যদি জনসাধারণের মঙ্গল হয়, ভালই; নহিলে আমি কে? কেহ নই। কোনও নেতাও কিছু নহেন। আমি জাতির প্রতিনিধি মাত্র। যে শক্তির কথা বলিতেছি, তাহা আমার নিজের শক্তি নয়। উহা জনসাধারণের শক্তি। সেই শক্তির পার্শ্বে দাঁড়াও, আমি তোমাকে নেতার অর্ঘ্য প্রদান করিব, তোমাকে পূজা করিব। কিন্তু আদর্শ হইতে এক চুল যদি নষ্ট হও, তবে সেখানে আর তোমার স্থান নাই, কোন দাবী নাই। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যদি কিছু তীব্র ভাষার প্রয়োগ করিয়া থাকি, মনে রাখিবেন, আমি এরূপ আচরণে মর্ম্মাহত হইয়াছি বলিয়াই আবেগ দমন করিতে পারিতেছি না। জাতির মতকে অবজ্ঞাত হইতে দেখিয়া আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট আমাদিগকে কোনও প্রকার স্বায়ত্ত-শাসন দান করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা আমরা করিতেছি। কি ভাবে তাঁহারা কতটা আমাদিগকে দিবেন, তাহা আমি জানি না। উহা জানিবার অধিকার কাহারও নাই। কিন্তু আমরা কিছু পাইব বলিয়া প্রত্যাশা করিতেছি। আমরা শুনিয়াছি যে, মিঃ মণ্টেগু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মান্দ্রাজের মিঃ শাস্ত্রি-প্রমুখ কয়েকজনকে খসড়াটা দেখাইয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা সত্য কি না, আমি জানি না, তবে আমার সন্দেহ হয় যে, ব্যাপারটা ঠিক। আমরা এমনও শুনিয়াছি যে, উক্ত ভদ্রলোকগণের মধ্যে কেহ কেহ ভারত-সচিবের নিকট এমনও অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, এ দেশের জনসাধারণ যাহাতে মণ্টেগু সাহেবের প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার গ্রহণ করে, সে জন্য চেষ্টা করিবেন। ইহা যে খাঁটি সত্য কথা, তাহা আমি বলিতেছি না, আমার শোনা কথামাত্র।

কিন্তু তার পর কি দেখা গেল? মিঃ মণ্টেগুর প্রস্তাবের কয়েক দিবস পরেই বাবু সত্যানন্দ বসুর স্বাক্ষরিত একখানি গোপনীয় পত্র প্রচারিত হইল। সে পত্র পাঠ করিলে যে কেহ বুঝিতে পারে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে,—ভারত-সচিব যাহা দান করিতে চাহিতেছেন, শুধু তাহাই গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। সে গোপনীয়পত্র কেন প্রচারিত হইয়াছিল? শুধু সত্যানন্দ বাবুই কি উক্ত পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, না তিনি একটা দলের মুখপাত্রস্বরূপ উহা প্রকাশ করিয়াছেন? আমরা জানি, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক জন চেলা। এখন প্রশ্ন এই যে, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, না মিঃ মণ্টেগু যৎকিঞ্চিৎ যাহা দান করিতেছিলেন জনসাধারণকে শুধু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবার জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছিল? ইহার অব্যবহিত পরেই আমরা জানিতে পারিলাম যে, কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন বোম্বাই সহরে হইবে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস-সমিতির সম্পাদকগণ অতঃপর এইরূপ পত্র প্রচার করেন :—

"মহাশয়, প্রস্তাবিত সংস্কার সম্বন্ধে ভারত-সচিবের ঘোষণা অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে, সেই

ঘোষণার অব্যবহিত পরেই প্রাদেশিক সমিতির ও কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। আমাদের একটি কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে। সংস্কার আইনের প্রকৃতির উপর অন্ততঃ আমাদের এক পুরুষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আপনি প্রস্তুত থাকিবেন। যদি শাসন-সংস্কারে আমাদের আদর্শানুরূপ প্রস্তাবের উল্লেখ না থাকে, তবে তৎসম্বন্ধে তীব্র ও নির্ভীক আলোচনার জন্য আপনাকে হয় কংগ্রেস, না হয় ত প্রাদেশিক সম্মেলনে উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা সম্মিলিত-কণ্ঠে প্রতিবাদ করিব, আমাদের বিধিসঙ্গত আশা ও আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত হইলে আমরা নিরস্ত হইব না। ইতি।—বশংবদ আই, বি, সেন ও বিজয়কৃষ্ণ বসু সম্পাদক।"

আমি সমগ্র পত্রখানি আপনাদের নিকট উদ্ধৃত করিলাম। এই পত্রে আপত্তিকর কোনও কিছু দেখিতেছেন কি? পত্রে লেখা আছে যে, মিঃ মণ্টেগু অবিলম্বে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে ঘোষণা-লিপির প্রচার করিবেন, আমরা শুধু দেখিব যে, আমরা যাহা চাহিয়াছি, সংস্কার সেই আদর্শানুরূপ হইয়াছে কি না। যদি তাহা না পাই, তবে তদ্বিরুদ্ধে আমাদিগকে তুমুল আন্দোলন করিতে হইবে। আমরা অধিকসংখ্যায় কংগ্রেস অথবা প্রাদেশিক সমিতিতে মিলিত হইয়া সম্মিলিত-কণ্ঠে নির্ভীকভাবে আলোচনা করিব। ইহাতে জাতীয় দলের কোনও ব্যক্তির—দেশের মঙ্গল যাহার কাম্য, এমন কোনও ব্যক্তির বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে কি?

এখন "বেঙ্গলী" পত্র এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, আমি তাহাই আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইব। দুর্ভাগ্যবশতঃ "বেঙ্গলীর" সহিত উহার সম্পাদকের অস্তিত্ব যে বিজড়িত, সে কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না! নহিলে অদ্য আমি উহার কথা তুলিতাম না। ৬ই জুন তারিখের বেঙ্গলী লিখিতেছেন:—

"আমরা স্বীকার করিতেছি যে, উল্লিখিত বিষয়টি পড়িতে পড়িতে আমরা নিতান্ত দুঃখ পাইয়াছি। কিন্তু বিস্মিত হই নাই। সংপ্রতি আমরা একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন-সমিতির উদ্দেশ্য কি। যে সকল প্রবীণ নেতা বহু চেষ্টায় "নব ভারত" গঠন করিয়া তুলিয়াছেন, এ সভায় এখন তাঁহাদের মতের কোন মূল্য নাই। কারণ, তাঁহার অপেক্ষা এখন আমরা বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি। তাঁহাদের নিকট ঋণ-স্বীকার করিলে আমাদের মর্য্যাদার হানি হইবে, সুতরাং আমাদের মতকেই প্রাধান্য দিতেই হইবে। কিন্তু একটি কথা তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন। তাঁহাদের এই নীতিতে বিপদ্ আছে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সুদে আসলে তাঁহাদিগকে আবার ইহা ফিরাইয়া দিবে।"

আমি বুঝিতে পারি না, প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদকগণের প্রকাশিত পত্রে এমন কি ছিল, যাহাতে তাঁহাদিগকে এমন ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিতে পারা যায়? ভারত-সচিবের ঘোষণাবাণী কি হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার কথা দেশবাসীকে বলা হইয়াছে বলিয়াই কি আমাদের অপরাধ ঘটিয়াছে? যদি আমাদের আদেশানুরূপ সংস্কার আমরা না পাই, তবে আমরা সম্মিলিতভাবে তাহার আলোচনা করিব, প্রতিবাদ করিব, সভাসমিতির অধিবেশন করিব, দেশবাসীকে এই কথা বলায় কি আমাদের অপরাধ ঘটিল? "অধিক সংখ্যায়" কথাটা 'বেঙ্গলী' পত্র বাঁকা অক্ষরে ছাপিয়াছেন। বেঙ্গলীর মতে উহার অর্থ হয় ত এই যে, সভায় জনতাবাহুল্য হওয়া একটা অপরাধ। অতীতকালে উহাতে অপরাধ ঘটিত না; কিন্তু এখন উহা অপরাধ বটে! এই প্রবন্ধ হইতে আমি আরও একটু উদ্ধৃত করিতেছি।—

"ঘোষণালিপি সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাউক। উহার লিখনভঙ্গীতে খাপি

নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, তাহা ছাড়াও কিছু বেশী। আমরা যেন কোন মহাবিপদের সম্মুখীন হইয়াছি, এই ভাবে আতঙ্কের সাড়া দেওয়া হইয়াছে।"

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সত্য কথা বলিব। বাস্তবিক আমার সন্দেহ হয় যে আমরা মহাবিপদের সম্মুখীন হইয়াছি। নামে স্বায়ত্তশাসন, অথচ কার্য্যতঃ কিছুই নহে, এমন স্বায়ত্তশাসন আমরা চাহি না। উহা গ্রহণ করিলেই বিপদ্। জাতীয় দলভুক্ত প্রত্যেকেরই তাহাতে শঙ্কিত হইবার পর্য্যাপ্ত হেতু আছে। লক্ষ্য রাখিতে কোনও ক্ষতি নাই। আর যদি শাসন-সংস্কারে আমাদের অভিলষিত বিষয় না পাই, তবে তাহা গ্রহণ না করিয়া একবাক্যে উহা ফিরাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। তখন বলা দরকার, এ দেশের লোক উহা চাহে না, তোমাদের দান তোমরা ফিরাইয়া লও।

তার পর আবার কি লেখা হইয়াছে দেখুন,—"পুলিস যখন বরিশালের কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া দেয়, তখন যাঁহারা সর্ব্বাগে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পলাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখ দিয়াই দেখিতেছি, এখন বীরবাণী নির্গত হইতেছে।"

বাঙ্গালী জাতির নেতার উপযুক্ত কথাই বটে? এই মিথ্যাবাণীর প্রচার তিনি করিতেছেন। এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, বোধ হয়, তাঁহাদের অনেকের সে সময়ের কথা মনে থাকিতে পারে—আমাদের অদ্যকার সভাপতি মহোদয়ের বোধ হয় সে কথা স্মরণ আছে—এই মিথ্যাকথা ১৯০৬ বা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলুটোলা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই সময় এই মিথ্যার প্রচার হইয়াছিল। আবার আজ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গলী" পত্রের সত্যবাদী সম্পাদক সেই মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া জনমতের বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করিতেছেন।

পত্র বলিতেছেন, "এই ঘোষণাকারীরা এই বুঝাইতেছেন যে, মিঃ মণ্টেগুর প্রস্তাব নিশ্চিতই অসন্তোষজনক হইবে, অর্থাৎ কিছুই পাওয়া যাইবে না।"

কিন্তু উক্ত সার্কুলারে কোথায় এমন কথা লেখা হইয়াছে? উহাতে শুধু ইহাই প্রচারিত হইয়াছে, যদি আমরা আদর্শরূপ স্বায়ত্তশাসন না পাই, তবে আমরা উহার তীব্র প্রতিবাদ করিব, কারণ, তাহাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই বলা হয় নাই।

আমাদের সম্পাদক মহাশয় তৎপরে বলিতেছেন, "যদি সন্তোষজনক হয়, তবে আমরা উহা কে সাদরে গ্রহণ করিব। যদি আংশিক সন্তোষজনক হয়, তবে তাহাকেও সেই পরিমাণ সমাদর করিতে হইবে।"

কেন?

কারণ, "ইংরাজ জনসাধারণ নহিলে একেবারেই উহা বর্জ্জন করিয়া দিবে।"

একেবারে বর্জ্জন করিবে! এখন সম্পাদকের প্রবন্ধ হইতে বুঝুন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি? যদি সংস্কার সন্তোষজনক হয়, আমরা ত লইবই, যদি না হয়? পরদিনের প্রবন্ধে সম্পাদক আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, শ্বেতাঙ্গগণ ইহার বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন তুলিয়াছেন। ইংলণ্ডে "ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ-সভা" তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন, এখন যদি বাঙ্গালার জনসাধারণ, তোমরা বল যে, তোমরা ইহা চাহ না, তখন ইংরাজ জনসাধারণ বলিবে, 'তবে থাক, আর দিয়া কাজ নাই।' ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি, যদি সন্তোষজনক না হয়, তবে আমরা উহা চাহি না। তোমরা বন্ধ করিয়া দাও। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমি তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"অতীতকালে কাগজে-কলমে অনেক প্রকার

ঘোষণা জারী করা হইয়াছে। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শপথভঙ্গের বহু দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইবে, ইহাও সত্য।”

বর্ত্তমানের শপথটাও এই প্রকারের অবস্থা প্রাপ্ত হউক, সেও ভাল; কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণ যেন উহাতে সায় না দেয়। যদি অবস্থা এই হয় যে, “আমরা তোমাদিগকে এতটুকু দিব, আর দিব না”, তবে তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই দান করুন, আর আমাদের তরফ হইতে কি আমরা বলিব, স্বায়ত্ত-শাসনের এক বিন্দু অনুগ্রহপূর্ব্বক তোমরা দিয়াছ, উহাই বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত? আমার মনে হয় না যে, আপনারা কেহই এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কোন একটা উদ্দেশ্যের জন্যই আমরা স্বায়ত্ত-শাসন চাই। ইউরোপীয় রাজনীতিতে কেহ কেহ যেরূপ পদ্ধতি আনিয়াছেন, আমরা সেরূপ স্বায়ত্তশাসন চাহি না। ব্যুরোক্রেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্রস্বরূপ স্বায়ত্তশাসন আমাদের কাম্য নহে। আমরা উহা দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়াছি। আমরা এখন বলিতে চাই, দোহাই ভগবানের, বাঙ্গালায় শক্তি দান কর। আমরা এখন স্বায়ত্তশাসন চাই, যাহার বলে আমাদের দেশের কৃষি, শ্রমশিল্প প্রভৃতির উন্নতি ঘটে; দেশের লোকের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা যাহাতে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়, এমন ব্যবস্থা আমরা করিতে চাই। এই জন্য আমরা শাসন-পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী হইয়াছি।

ভদ্রমহোদয়গণ, এখন ধরুন, যদি মিঃ মণ্টেগু আমাদিগকে বলেন, তোমরা অত এখন পাইবে না। সামান্য কিছু, যৎকিঞ্চিৎ—এই এক বিন্দু এখন লও। এ অবস্থায় কি করিব? আমার কথা আমি বলিতে পারি, অন্যের কথা আমি জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের লোকের এ সাহস আছে যে, তাহারা বলিতে পারিবে, “আমরা উহার কিছুই চাহি না। তোমার দান ফিরাইয়া লও। যদি ব্যুরোক্রেশীর দাসত্বই করিতে হয়, যদি আমাদের প্রতি পদেই বাধা-বিঘ্ন ঘটাইতে চাও, যদি ব্যুরোক্রেশীর ইচ্ছামাত্রেই আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে, তবে ঐরূপ সংস্কারে আমাদের প্রয়োজন নাই। তোমার জিনিস তুমিই ইংলণ্ডে ফিরাইয়া লইয়া যাও। এখানে উহার কোনও প্রয়োজন নাই।” ইহা বলিবার মত সাহস আমাদের থাকা চাই, এ কথা আমি স্বীকার করি। আমরা হোমরুল চাহিতেছি, অথচ আমাদের এ কথা বলিবার সৎসাহস যদি না থাকে, তবে এত বড় জিনিসের দাবী করি কোন্ মুখে? স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করিতেছি, অথচ গবর্ণমেণ্টকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারিব না, না, আমরা উহা চাহি না, তুমি যাহা দিতে চাহিতেছ, তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে না! জনসাধারণ যাহা চাহে না, এমন জিনিস তাহাকে দিবার প্রয়োজন কি?

ভদ্রমহোদয়গণ, দিল্লী নগরীতে যাইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া আসিয়াছেন যে, পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বপূর্ণ শাসনক্ষমতা ভারতবাসীকে না দিলে এ দেশের লোক নিশ্চিন্ত হইবে না, সন্তুষ্ট হইবে না। ঝুনঝুমি-চুষিকাঠি দিয়া ভুলাইবার সময় আর নাই। এক হাতে দিয়া অন্য হাতে কাড়িয়া লইবে, এমন ভাবে চলিবে না। ইত্যাদি। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে দিল্লীযাত্রার পরই হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমরা স্যার সুরেন্দ্রনাথকে—ভদ্রমহোদয়গণ, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহার ছায়া আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাই মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া গেল, হ্যাঁ, ভাল কথা, আমরা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথকে অবশ্যই প্রশ্ন করিতে পারি, সে দিন যাহা না পাইলে তিনি কোনও মতেই সন্তুষ্ট হইবেন না, জনসাধারণ কোনও মতেই সামান্য পাইয়া ভুলিবেন না প্রভৃতি

বলিয়াছিলেন, সহসা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এমন কি হইল যে, ভারতসচিব যাহা কিছু দিন না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব, তাহাই গ্রহণ করিব, এমন কথা প্রকাশ করিতেছেন? আমরা তাঁহার কাছে ইহার কৈফিয়ৎ চাই। তিনি বাঙ্গালার নেতৃত্ব দাবী করেন, আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার সে দাবী মানিয়া লইতেছি। কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছে, সম্মান প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, বিগত ত্রিশ বৎসর তাঁহার কথায় উঠিয়াছে বসিয়াছে। এখন কি আমরা তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে পারি না, কেন তিনি এত শীঘ্র তাঁহার মতের পরিবর্তন করিলেন? কিছু টাকা অথবা বিশেষত্বসূচক ফিতা কোটের উপর ঝুলাইবার লোভে অবশ্য তিনি তাঁহার মতপরিবর্তন করেন নাই। তবে সে কারণটা কি?

দিল্লীর বাতাসে এমন কিছু ছিল কি, যাহাতে এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল? সেখানে কি তিনি কোন নূতন কথা শুনিয়া আসিয়াছেন অথবা কেহ তাঁহাকে তুকতাক করিল?—হস্তের স্পর্শে এমন ঘটিল, না মস্তিষ্কের কোনও গোলযোগ ঘটিয়াছে? ব্যাপারটা কি? বৃদ্ধবয়সের বিজ্ঞতা বশতঃই কি তিনি এমনতর একটা বিপরীত কাণ্ড করিলেন? বাঙ্গালার জনসাধারণকে এ বিষয়ে তাঁহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি যত দিন বাঁচিব, তত দিন বলিব, এমন সংস্কার আমি চাহি না, যাহাতে এ দেশের জনসাধারণ মানুষের প্রকৃতিগত, জন্মগত অধিকার পাইয়া ধন্য না হয়। ইংলণ্ড পূর্ণমাত্রায় এ অধিকার না দিলে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। খানিকটা অনুগ্রহের আমি ভিখারী নহি। আমি আমার স্বত্বানুরূপ অধিকার চাই।

যে অধিকার আমি নিজের মধ্যে অনুভব না করি, ইংরাজ কি আমাকে তাহা দিতে পারেন? মানুষ কি কাহারও অধিকার সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে? যে অধিকারের সত্তা আমি নিজের মধ্যে অনুভব করিতেছি, তাঁহারা শুধু সেই অধিকার স্বীকার করিলেই হইল। আমার নিজের যেটুকু অধিকার, তাহা ভগবানের দান, কোনও মানুষের তাহা কাড়িয়া লইবার অধিকার নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার নিজের অধিকারের উপর নিজে দাঁড়াইতে পার, যে পর্য্যন্ত না নিজের অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পার, ততক্ষণ ইংরাজের পার্লামেণ্টই হউক বা নিখিল বিশ্বের কোনও পার্লামেণ্টই হউক না কেন, যাহা তোমাতে নাই, এমন জিনিস তোমাকে দান করিতে পারিবে না। যাহা তোমার নিজের, তাহার জন্যই চেষ্টা কর। মানুষের মত, পুরুষের মত তাহাদিগকে বল, "ইহাতে আমাদের জন্মগত অধিকার।" আর সমগ্র জাতি যাহাতে একবাক্যে সে কথায় সায় দেয়, তাহার চেষ্টা কর। এরূপভাবে কথায় ও কাজে এক হইতে পারিলেই দেখিতে পাইবে, পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নাই যে, তোমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে তোমাকে বঞ্চিত রাখিতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি বুঝিতে না পার, জিনিসটা তোমার নয়, ততক্ষণ সে তোমাকে উহা দিবে না। কিন্তু যেমনই তুমি বুঝিতে পারিবে, জিনিসটা তোমার, তখনই উহা তোমার হস্তগত হইবে। আর কেহ উহা হইতে তোমাকে বঞ্চিত রাখিতে পারিবে না। আধা-আধি চেষ্টায় তাহা হইবে না। একটু আধটু সংস্কারের দ্বারা কোনও জাতিকে জাতি বলিয়া গঠন করা যায় নাই, ভবিষ্যতেও তাহা সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কি অসংখ্যবার বলেন নাই যে, জাতিকে গঠন করিয়া লইতে হয়?

আমরাও আমাদিগকে গড়িয়া তুলিব। কিন্তু ইহাই কি সেই পথ? শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ যে

পথের নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই পথে চলিলে কি জাতি গড়িয়া উঠিবে? আমাদের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসে এখন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। এমন সঙ্কট-জনক অবস্থা আর কখনও আসে নাই। এই সময়ে কি আমাদের নেতা বলিবেন, যৎকিঞ্চিৎ যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই আমাদিগকে দাও, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব? ইহাই কি রাজনীতি? ইহাই কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? অথবা ইহাকে উন্মত্ততা বলিব? জনসাধারণ নিশ্চয়ই ইহার একটা কৈফিয়ৎ চাহে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এ কথাটা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন। যদি আপনারা নিজেকে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে আজ হইতে এই ব্রত গ্রহণ করুন যে, এজন্য তীব্র আন্দোলন করিবেন। শুধু কথাতেই অধিকার জন্মে না। কখনও তাহা হয় নাই। নিজের অবস্থা যদি বুঝিয়া থাকেন, তবেই অধিকার পাইবেন। যদি ইতস্ততঃ করেন, তবে মারা যাইবেন, কিছুই পাইবেন না। জাতির অধিকার কাপুরুষের যোগ্য নহে।

আপনারা ধৈর্য্য সহকারে আমার কথা শুনিয়াছেন, সে জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। আমার বলিবার অনেক কথা আছে, যদি সে অবকাশ ঘটে, আমি আরও কিছু পরে বলিব।

না

[১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন।]

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, এইমাত্র যে হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা হইয়া গেল, তাহার পর আমাকে কিছু বলিতে যাওয়া শোভন নহে, কারণ, তাহা হইলে উক্ত বক্তৃতার সমুদয় মাধুর্য্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। মিঃ ফজলল হক্ হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে নানা দিক্ দিয়া নানা কথা অতি চমৎকারভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রত্যেক কথাটির আমি সমর্থন করিতেছি।

আজ আমি আপনাদিগকে "না" সম্বন্ধে একটি গল্প বলিব। সে দিন আমাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, আমরা মহা সমস্যা-সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছি। আমিও বলিয়াছি, আমাদের ইতিহাসে এরূপ সঙ্কটকাল আর কখনও আসে নাই। কিন্তু আজ আমি আপনাদিগকে প্রচণ্ড, বৃহৎ, বিরাট 'না' গল্পটি বিবৃত করিব। আমার এই কাহিনীর উপক্রমণিকাস্বরূপ আমি আপনাদিগকে বৃটিশ শাসনের অন্তর্গত আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে স্মরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। দেড় শত বৎসরেরও অধিককাল অতীত হইয়াছে, আমরা দেখিতেছি, এই দীর্ঘকালের শেষেও বাঙ্গালায় অধিকাংশ নরনারী অশিক্ষিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। আর এই অশিক্ষিত অবস্থার উল্লেখ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহার উত্তর আমি পূর্ব্বেও দিয়াছি, এখন আবার তাহার উল্লেখ করিতেছি। যদি তাহারা শিক্ষা না পাইয়া থাকে, সে দোষ কাহার? এই দেড়শত বৎসর ধরিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এখানে কি করিতেছিলেন? কেন তাঁহারা এত দিনেও দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন নাই? এই ব্যর্থতার কি উপযুক্ত কৈফিয়ৎ আছে? কোন্ দেশে এমন জাতীয় শাসন-পরিষদ আছে, যেখানে কার্য্যারম্ভের কাল হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হয় নাই? আজ যদি আমরা স্বায়ত্তশাসন লাভ

করি, তবে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশবাসীকে যে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিব, সে বিষয়ে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ আছে? কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্য করেন নাই কেন? ব্যুরোক্রেশী ইহার জবাব দিন—'না' গল্পের ইহা একটি অধ্যায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, এখন এ দেশের কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এক সময়ে ভারতবর্ষের পল্লী-জীবন পৃথিবীর আদর্শ-স্বরূপ ছিল। কিন্তু সে পল্লীর এখন কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে? আমাদের দেশের কৃষির অবস্থাই বা কিরূপ? বিগত দেড়শত বৎসরে গবর্ণমেণ্ট উহার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি? উত্তর—না। কেন হয় নাই? কারণ, এ দেশে কৃষির সহিত ব্যুরোক্রেশীর সরাসরি কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যুরোক্রেশীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য "কৃষিবিভাগ" নাম দিয়া একটি বিভাগ খোলার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। দুই একটা কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির কোনও উপায় অবলম্বিত হয় নাই। কৃষিকার্য্যের তাহাতে বিন্দুমাত্র উন্নতি হইয়াছে কি? ব্যুরোক্রেশীর স্বার্থরক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন হইয়াছে কি না, আমি অবশ্য তাহা জানি না। আমাদের দেশের কৃষক-সম্প্রদায় উন্নত অবস্থায় জীবন-ধারণ করিবে, ইহা জাতির মঙ্গলের জন্য অত্যাবশ্যক। যাঁহারা এ দেশে "স্বরাজ" বা স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার কামনা করেন, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই কার্য্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কল্যাণ-কামী হইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে; প্রাণপণে কাজ করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান লইয়াই বাঙ্গালী জাতি, সুদৃঢ়রূপে এই সমগ্র বাঙ্গালী জাতি একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, জাতীয়তার গৌরবে মণ্ডিত হইয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে দাঁড়াইবে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য। বাঙ্গালার জনসংখ্যা বলিতে কাহাদিগকে বুঝায়? আমরা যাহা আদালতে মোকদ্দমা চালাই অথবা বিচারক এবং ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বিচারাসনে অধিষ্ঠিত থাকি, তাহারা নহি। তবে তাহারা কাহারা? যাহারা কৃষিকার্য্য করে, তাহারাই এ দেশের প্রকৃত লোক, জাতি বলিতে তাহাদিগকেই বুঝায়। যদি কখনও এ দেশের উন্নতি ঘটে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে উহা নিশ্চয়ই ঘটিবে,—বিশ্ববাসীর সম্মুখে জাতীয়ত্বের দাবী লইয়া দাঁড়ায়, তবে তৎপূর্ব্বে এ দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া চাই। হোমরুল যে আমরা চাহিতেছি, ইহাও তাহার কারণ। তাহা আমরা এত দিন পাই নাই এবং বিরাট 'না' গল্পের ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের দেশের ব্যবসায় ও সে শ্রমশিল্পের কাহিনী কি, তাহা জানেন? একেবারে সূচনাকাল আমি আলোচনা করিতে চাহি না। আমাদের দেশের বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের কি উপায়ে উচ্ছেদ করা হইয়াছিল, তাহার কোনও কথা আজ আমি আলোচনা করিব না, আপনাদিগকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেও চাহি না। অতীতের অতল গুহায় তাহা সমাহিত অবস্থায় থাকুক, "গতস্য শোচনা নাস্তি।" কিন্তু বর্ত্তমানের কথাটা কি? ইদানীং গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের ব্যবসায় ও শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য কি চেষ্টা করিয়াছেন? এখন উহা যে এ দেশে আবশ্যক, এ সমস্যার মীমাংসা না করিতে পারিলেই চলিবে না। কিন্তু ব্যুরোক্রেশী কি তাহার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিয়াছেন? প্রত্যেক সভ্য গবর্ণমেণ্টই বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের উন্নতি-বিধানের জন্য যথাশক্তি সাহায্য করিয়া থাকেন। ব্যুরোক্রেশী কি বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহারা সে কর্ত্তব্য-পালন করিয়াছেন? উত্তর হইবে—'না।' এই কারণেই আমরা স্বায়ত্ত-শাসন চাহিতেছি।

ভদ্রমহোদয়গণ, 'না' গল্পের ইহাই তৃতীয় অধ্যায়।

আপনারা প্রমাণ চাহেন? বাঙ্গালার রাজস্ব দেড়কোটি টাকা হইতে গবর্ণমেণ্ট চব্বিশ লক্ষ টাকা কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। এ টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্ট কি করেন? ব্যুরোক্রেসী বলেন, আমরা যাহারা স্বায়ত্ত-শাসন চাহি, জনসাধারণের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য নহি! গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য কি করিয়াছেন? তাঁহারা চব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, অর্থাৎ অপব্যয় করিয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত কৃষির কোনও উন্নতি হইয়াছে? এখানেই ত পরীক্ষা। উচ্চবেতনে শ্বেতাঙ্গ কৃষি-বিষয়ক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু কৃষির বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই।

ঘটনা যাহা, তাহা আমি বলিলাম।

তার পর স্বাস্থ্য-রক্ষার কথা। এ বিষয়ে কি করা হইয়াছে? গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এ দেশের লোক স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থার অভাবে কিরূপ ভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, তাহার কাহিনী আপনাদিগকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন আছে কি?

নিম্নে তালিকার প্রতি লক্ষ্য করুন,—

১৯১১—১২ খৃষ্টাব্দে ৯ লক্ষ লোক শুধু ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ করে।

১৯১২—১৩ খৃষ্টাব্দে	৯৫৯০০০	প্রাণত্যাগ
১৯১৩—১৪ "	৯৬৫০০০	"
১৯১৪—১৫ "	১০৬১০০০	"
১৯১৫—১৬ "	১০৬৪০০০	"

এইরূপ বিগত পাঁচ বৎসরে আমাদের দেশের পঞ্চাশ লক্ষ লোক শুধু স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থার অভাবে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ! গ্রেট বৃটেন ও আয়র্লণ্ডের সমগ্র সেনা-বাহিনীর তুলনায়ও অনেক বেশী লোক শুধু ম্যালেরিয়ায় প্রাণ দিয়াছে! আমরা আবেদন-নিবেদন করিয়াছি, কতিপয় বিশেষজ্ঞ কয়েকটি পরীক্ষার পর তাঁহাদের মতামতও দিয়াছেন, ব্যস্, ঐ পর্য্যন্ত। কাজে এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট প্রতীকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন, এই ভীষণ ব্যাধি কি দেশ হইতে বিতাড়িত হইত না? ভদ্রমহোদয়গণ, যদি আজ আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হয়, কার্য্যকরী জাতীয় শাসন-পরিষদ গঠিত হয়, তবে কি আমরা এ ব্যাধিকে তাড়াইয়া দিতে পারি না? বাঙ্গালার জাতীয় জীবন-গঠনের জন্য এই দূষিত ব্যাধিকে বিতাড়িত করা অত্যাবশ্যক। ইহার প্রকোপে প্রতিবৎসর মৃত্যুর হার বর্দ্ধিত হইতেছে, শক্তি কমিয়া যাইতেছে, জাতীয় জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, এরূপ ভাবে যদি আমাদের শক্তির অপচয় ঘটিতে থাকে, তবে অচিরে এমন একটা অবস্থা আসিবে, যখন আর জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার পথ থাকিবে না। প্রতিবৎসর কত লোক মরিতেছে, আমি শুধু আপনাদিগকে তাহারই তালিকা দিয়াছি। কিন্তু সমগ্র দেশমধ্যে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কত লোক যে জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করিতেছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করি নাই। সমগ্র বাঙ্গালাদেশ এমনই জরাজীর্ণ নরনারীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে কিরূপ প্রতীকারের বন্দোবস্ত করিয়াছেন? কিছুই না বলিলেই চলে।

এখন শিক্ষা-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ব্যয় করিতেছেন, আমি তাহার উল্লেখ করিব। গবর্ণমেণ্ট গড়ে ৮৫ লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার লোকসংখ্যা সাড়ে চারি কোটি। তাহা হইলে বৎসরে গড়ে টাকায় পাঁচ জন শিক্ষা পায় অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট বৎসরে এক জনের জন্য মাত্র তিন আনা পয়সা ব্যয় করিয়া থাকেন। তাহা হইলে মাসে এক পয়সা মাথা পিছু ব্যয়িত হইয়া থাকে। এ দিকে কিন্তু আমরা শুনিতে পাই যে, শিক্ষা-বিস্তারের সাহায্যে ভারতবর্ষের অধঃপতিত

জনসাধারণকে উন্নত করিয়া তোলাই ইংরাজের কর্ত্তব্য! এই মহৎকার্য্যের জন্ম তাই গবর্ণমেণ্ট বৎসরে মানুষ প্রতি তিন আনা ব্যয় করিতেছেন? কিন্তু আপনারা মনে করিবেন না যে, এ সবই শিক্ষাকার্য্যে ব্যয় হয়। এই টাকাতে অট্টালিকা-নির্ম্মাণের ব্যয়ও নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার ব্যয়ও এই টাকার মধ্যে ধরা আছে। শিক্ষকগণের বেতন অপেক্ষা ইহার ব্যয় অনেক বেশী। সুতরাং এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঠিক কত টাকা প্রকৃত শিক্ষার জন্ম ব্যয়িত হয়। শিক্ষার কথা বলিতেছেন? শিক্ষা কে চাহে? ব্যুরোক্রেশী উহা চাহেন না।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প শিক্ষার জন্ম গবর্ণমেণ্ট প্রায় কিছুই ব্যয় করেন না। আমি এ স্থলে প্রমাণস্বরূপ মিঃ জে সোয়ান্ সাহেবের বাক্য উদ্ধৃত করিব। ইনি গবর্ণমেণ্টের জনৈক কর্ম্মচারী। বাঙ্গালার শ্রমশিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি একটা বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া ছাপাইয়াছেন।

"এই প্রদেশের শ্রমশিল্পের উন্নতি, সাধারণের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত চেষ্টার উপর নির্ভর করে সত্য; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ যাবৎ ঐ পক্ষে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, কার্য্যতঃ তদপেক্ষা কিছু অধিক চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন।"

সিভিল সার্ভিসের অন্তর্গত কোনও রাজকর্ম্মচারী ইহার অপেক্ষা বেশী আর কি লিখিতে পারেন!

আবার শুনুন;—

"শ্রমশিল্পের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে, উপযুক্ত মূলধন আবশ্যক। ভারতীয়গণ যদি ভারতীয় মূলধন লইয়া স্বয়ং শ্রমশিল্পে প্রবৃত্ত হন এবং উহার তত্ত্বাবধান ভারতীয়গণের উপর ন্যস্ত হয়, তবে ব্যাঙ্কের সাহায্য আবশ্যক; কিন্তু কোনও ব্যাঙ্ক এরূপ অবস্থায় ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত কোনও শ্রমশিল্পব্যবসায়ে টাকা ধার দিতে প্রায়ই অসম্মত হইয়া থাকেন।"

মিঃ সোয়ান্ উল্লিখিতভাবে মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা আপনারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কিছুই করেন নাই। অবস্থা এইরূপ; বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এই ভাবেই কাজ চলিয়া আসিতেছে। আমরা এত দিন নিদ্রিত ছিলাম। প্রতিবৎসরের শেষে আমরা একবার করিয়া কংগ্রেসে মিলিত হইতাম, বক্তৃতা করিতাম, তাহার বেশী কোনও কাজ হইত না। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এ দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেই আন্দোলনই আমাদিগের নিদ্রাভঙ্গের সহায়তা করিয়াছিল। সেই সময় হইতেই গবর্ণমেণ্টও একে একে নানাপ্রকার দমন-নীতিও অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। সেই দমন-নীতির ফলে এ দেশে—এই বাঙ্গালার এক দল লোক জাগিয়া উঠিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নামকরণ করিয়াছেন এনার্কিষ্ট; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাহারা এনার্কিষ্ট নহে। তাহারা বিপ্লবপন্থী। তাহারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা কোনও ক্রমেই মঙ্গলজনক নহে এবং সে বিষয়ে তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তথাপি আমি বলিব, বিপ্লববাদী হইলেও তাহারা এনার্কিষ্ট নহে। সকল প্রকার শাসনরীতির যে তাহারা বিরোধী, তাহা নহে—শাসনপদ্ধতি দেশ হইতে তুলিয়া দেওয়াও তাহাদের সংকল্পের অন্তর্গত নহে। শুধু প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনই তাহাদের কাম্য। "কংগ্রেস" ও "মোস্‌লেম্ লীগের" যে উদ্দেশ্য, এই তথাকথিত এনার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যও ঠিক তাহাই, সে সম্বন্ধে কোনও পার্থক্য নাই, ইহাই আমার ধারণা। শুধু পদ্ধতির পার্থক্য দেখিতে পাইতেছি। তাহারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা নিয়ম ও শৃঙ্খলার বহির্ভূত,

কংগ্রেস ও লীগ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিয়ম ও শৃঙ্খলার অন্তর্গত। প্রভেদ এইখানে। তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য। তাহারা কঠোর তিরস্কারের যোগ্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে এনার্কিষ্ট উপাধি দেওয়া যায় না। তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি গুরুতর অবিচার করা যাইবে। সে যাহা হউক, উপর্য্যুপরি দমন-নীতির প্রবর্ত্তনে আমরা বাঙ্গালাদেশে এক দল বিপ্লববাদীর অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি।

এই বিপ্লববাদী দলের অস্তিত্বের জন্যই আমরা স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য নহি, এই কথাও আমরা যখন তখন শুনিতে পাইতেছি। ইহার উত্তরে আমি বলিব, এ দেশে যে এক দল বিপ্লববাদী আছে, আমি তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু জাতীয় শাসন-পরিষদ ব্যতীত বিপ্লববাদী দলের প্রচেষ্টাও অন্য কোনও গবর্ণমেণ্ট কখনই দূরীভূত করিতে পারিবেন না। তাহারা কি চায়, তাহাদের উদ্দেশ্য কি? তাহারা স্বাধীনতা চাহে। গবর্ণমেণ্টের শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন-সাধনই তাহাদের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস ও মোস্‌লেম্ লীগের উদ্দেশ্যের সহিত তাহাদের লক্ষ্যের কোনও পার্থক্য নাই, তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে আপনাদিগকে বলিয়াছি। আমি আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি যে, তাহাদের এই উদ্দেশ্য—পদ্ধতি নহে—যে বিধিসঙ্গত, তাহা বৃটিশ মন্ত্রিসভার অনুমোদিত। গত বৎসরের আগষ্ট মাসে বৃটিশ মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন যে, কোনও প্রকার দায়িত্বপূর্ণ শাসনরীতি এ দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। এ কথার অর্থ কি? এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, এ দেশে এখন যে শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত, তাহা আমলা-তান্ত্রিক, উহা এখন চলিতে পারে না। আমাদের যাঁহারা বিধাতা—বৃটিশ মন্ত্রিসভাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা, যে আমলা-তন্ত্র এ দেশে প্রবর্ত্তিত, তাহার কর্ত্তারা আমাদের বিধাতা নহেন—তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, আমলা-তন্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকার শাসন-রীতি ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগের উদ্দেশ্যের সহিত বিপ্লবপন্থী দলের উদ্দেশ্যের পার্থক্য ত নাই, বরং উহার প্রয়োজনীয়তা ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তাও স্বীকার করিয়াছেন। ভদ্রমহোদয়গণ, সেই জন্য আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, এই বিপ্লববাদকে দূরীভূত করিতে হইলে, এ দেশের লোক যাহা চাহে—স্বাধীনতাই তাহাদের কাম্য—তাহাই তাহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য। যে মুহূর্ত্তে তাহারা স্বাধীনতা পাইবে, অমনি দেখা যাইবে যে, দেশ হইতে বিপ্লববাদ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এ কথা বহুবার বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্যুরোক্রেশী (আমলা-তন্ত্র) তাহা শুনিয়াও শুনিবেন না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ। আমাদের দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমশিল্প, ব্যবসায় সবই উপেক্ষিত হইতেছে, তাহা ছাড়া দেশমধ্যে বিপ্লবপন্থী দলের অভ্যুত্থান। আমাদের দেশের অবস্থা এইরূপ দেখিয়াই বিগত বর্ষের আগষ্টমাসে বৃটিশ মন্ত্রিসভা উক্তরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে এখন আমাদের বক্তব্য কি? আমি যাহা বুঝিয়াছি, আপনাদিগকে আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। "তোমরা ঘোষণা কর একরূপ, তোমাদের কার্য্য-পদ্ধতি অন্যপ্রকার।" দেশের লোকের ইহাই প্রকৃত অভিযোগ। যদি প্রয়োজন-বোধ হয়, তোমরা খোলাখুলিভাবে বল, "তোমরা স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য নহ, আমরা তোমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দিব না।" সে কথা আমরা বুঝিতে পারি। আমি স্পষ্ট কথার ভক্ত। যে স্পষ্ট বলে, আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। আমি নিজে স্পষ্ট কথা ভালবাসি। ব্যুরোক্রেশী স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করুন, "আমরা তোমাদিগের হস্তে

দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি দিতে পারি না। আমরা ইহাকে আরও আমলা-তান্ত্রিক করিয়া রাখিব। তোমরা একটু আধটু পরিবর্তন পাইতে পার, রাজনীতিক চুষিকাঠি দিতেছি, তাহাতেই তোমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, আমরা তোমাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট দিব না।" আমলাতন্ত্র এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিন, আমরা তখনই রাজনীতিক আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিব। আমাদের প্রকৃত অসুবিধা এই যে, আমরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘোষণাবাণীর উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সভাসমিতি করিতেছি, আলোচনা-আন্দোলন করিতেছি, স্বায়ত্ত শাসন কি প্রণালীতে হইবে, তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি; গবর্ণমেণ্টকেও সে সম্বন্ধে আমরা আমাদের অভিপ্রায় জানাইতেছি।

ভদ্রমহোদয়গণ, ইতোমধ্যে আমরা আর একটা ঘোষণাবাণী শুনিতে পাইলাম। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং ঘোষণা করিলেন যে, তিনি আমাদের সহায়তা চাহেন। যে ভীষণ দুর্নিমিত্ত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে উদ্যত, তাহাকে দূরীভূত করিতে হইবে। এই ঘোরতর সঙ্কটকালে ভারতবর্ষের সাহায্য অত্যাবশ্যক। সে ঘোষণাবাণী শুনিয়া আমরা কি করিয়াছিলাম? আমরা সভাসমিতি করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছিলাম যে, এই সন্ধিক্ষণে তোমরা সমগ্র ভারতবর্ষের শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তুল। এ দেশের লোক যাহাতে অকৃত্রিম উৎসাহে অধীর হইয়া উঠিতে পারে, এমন ব্যবস্থা কর। তাহা হইলে এ দেশের লোক সকল প্রকারে আত্মোৎসর্গ করিবে। দেশের জন্য, সাম্রাজ্যের জন্য তাহাদের কিছুই অদেয় থাকিবে না। আমরা বলিয়াছিলাম যে, দমননীতি তুলিয়া দাও, রাজনীতিক বন্দী যাহারা আছে, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। সমগ্র দেশ যেন ক্ষুব্ধ হইয়া আছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছিলাম,—"দমননীতি বন্ধ কর। স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপিত কর, সমগ্র দেশ তোমাদের সহিত কায়মনোবাক্যে যোগদান করিবে। সহস্র সহস্র সৈনিক তোমাদের জন্য জীবন দান করিবে, ভারতবর্ষ এবং সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ করিবে—ধনীর স্বর্ণ-ভাণ্ডার, দরিদ্রের তাম্রখণ্ড তোমাদের কাজে উৎসৃষ্ট হইবে—দেশের জনসাধারণ অকুণ্ঠিতচিত্তে, সাগ্রহে, অনন্দোৎফুল্ল-আননে সাম্রাজ্যের কল্যাণকল্পে গৌরব-রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে, যাহা কিছু চাহ, তাহারা সর্ব্বস্বই অর্পণ করিবে। কিন্তু বুরোক্রেসী আমাদের সে প্রস্তাব কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমি হতাশভাবে স্বীকার করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট আমাদের কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই দিল্লীনগরীতে একটা পরামর্শ-সভা হয়। রাজপ্রতিনিধি সেই সভাস্থলে কি বলিয়াছিলেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতেছি। কিরূপ বিপদ্ আসন্ন, তাহা তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন :—

"মধ্য-এসিয়ায় জর্ম্মণ তাহাদের প্রসিদ্ধ ষড়্যন্ত্রকারিগণকে—ধ্বংসকারী দূতগণকে পাঠাইয়া দিয়াছে। রুসিয়ার বিপ্লবে সে এই শিক্ষা পাইয়াছে যে, অস্ত্রবল অপেক্ষাও শত্রুকে পরাজিত করিবার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হইতেছে—ভিতরের শক্তির দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করা।"

তাহার পরেই বলিতেছেন :—

"আমি হেতুনির্দ্দেশ করিয়াছি। পশ্চিম-সীমান্তে মৃত্যুর কঠোর বন্ধন কিরূপ দৃঢ় হইয়াছে, তাহাও বলিয়াছি, আর পূর্ব্বসীমান্তে জর্ম্মণীর ষড়্যন্ত্র কিরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাও আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম।"

সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষ কিরূপ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা জানিবামাত্র আমরা গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। সে

বিপদ্ যে কিরূপ, তাহা স্বয়ং রাজপ্রতিনিধিই স্বীকার করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীই তাহার আভাষ দিয়াছিলেন; রাজপ্রতিনিধি অতি স্পষ্টভাবেই উহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবের অবস্থা কি হইল? এ দেশের আমলাতন্ত্রকে শুধু এই দেশ নহে, ইংলণ্ড ও সমুদয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যখনই কোন ভাল পরামর্শ প্রদান করি, তখনই কি তাঁহারা নিতান্ত ঘৃণাভরে উপেক্ষা ও বিদ্রূপভরে আমাদের সে পরামর্শকে গ্রহণ করেন না? রাজপ্রতিনিধি কি বলিতেছেন? চারিদিকের অসুবিধা ও বাধার বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতেছেন :—

"আমার বিশ্বাস, এইরূপ করিলেই ভাল হয়। (আমীরকে সাহায্য করা) তাহাতে শত্রুরা বুঝিবে, সমগ্র ভারতবর্ষ পর্ব্বতের মত সুদৃঢ়। তাহাকে টলাইতে পারা যাইবে না।"

আমি এখানে একটু থামিতেছি। অবশ্য, তাহা করাই দরকার। রাজপ্রতিনিধি মহোদয় স্বীকার করিতেছেন যে, এই সন্ধিক্ষণে এমন কিছু করা দরকার, যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ যে পর্ব্বতের মত দৃঢ়, কোনও ভেদ কোথাও নাই, তাহা শত্রুপক্ষকে দেখান আবশ্যক। কিন্তু তাহা কিরূপে দেখান হইতে পারে? যতক্ষণ না আপনার স্বদেশ ভারতবর্ষ বলবান্ হয়, ততক্ষণ সে যে পর্ব্বতের মত অচল, অটল ও ভেদরহিত, তাহা কিরূপে দেখাইতে পারিবে? নাগরিকের অধিকার ত ভারতবাসীর থাকা চাই।

রাজপ্রতিনিধি বলিতেছেন :—"আমার বিশ্বাস, আমরা এইরূপে শত্রুগণকে দেখাইয়া দিব যে, ভারতবর্ষ পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় এবং ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসমূলক সঞ্চরণমান অগ্নিশিখা এ দেশে দহনীয় কোন পদার্থই পাইবে না। যদিও বা কোথাও একটু আধটু স্ফুলিঙ্গ উঠে, আমাদের একতার চাপে তাহা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে।"

ভদ্রমহোদয়গণ! এ পর্য্যন্ত রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতার সহিত আমাদের মতের কোনও অসামঞ্জস্য নাই। কিন্তু এই বক্তৃতার একাংশে তিনি আমাদের প্রস্তাবকে এই বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন :—

"কিন্তু যখন চারিদিকেই টানাটানি ও চাপ, সেই সময় প্রথম প্রস্তাবেই যখন মতভেদ, তখন তাহাদের নিকট সাহায্য চাওয়াই বৃথা।"

আমাদের মতানৈক্য আছে কি? ভারতবর্ষের জাতীয়দলভুক্ত যাহারা, রাজপ্রতিনিধির কোনও কথার সহিত তাহাদের মতের অসামঞ্জস্য আছে কি? আমার বিশ্বাস, তাহা সত্য নহে। আমরা কি করিয়াছি? ভারতসম্রাট্ নিজ মুখে আমাদিগকে যে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। আমরা বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার বাক্য সফলীকৃত হইবে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার ঘোষণাতেও বুঝিয়াছিলাম যে, দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট আমরা লাভ করিব। প্রধান মন্ত্রী আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাহিয়াছিলেন, লোকবল ও অর্থবল উভয়ই চাহিয়াছিলেন। উত্তরে আমরা বলিয়াছি, সবই আমরা করিতে রাজি আছি, তবে দমননীতি তুলিয়া দিতে হইবে, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে এবং স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমরা কি প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশমত কাজ করিতেছি না? তবে রাজপ্রতিনিধি এমন কথা তুলিলেন কেন? এই রকম ঘোষণাতেই ত আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, আমরা ভয় পাই। তাঁহারা কি চাহেন যে, রাজার ঘোষণাবাণী চিরদিনই অপূর্ণ অবস্থায় থাকিবে? বৃটিশ পার্লামেণ্টের স্বীকারোক্তি কি শুধু মুখের কথাতেই পর্য্যবসিত হইবে? কোনও দিন কি তাহার সার্থকতা হইবে না? এখন কি আমরা এইরূপই বুঝিব যে, ঘোষণাবাণী যেমনই হউক না কেন, আমলাতন্ত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

তাঁহারা কোনও দিনই এ দেশে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-নীতির প্রবর্ত্তন করিবেন না?

প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশানুসারে কাজ করিতে গেলে কতিপয় কার্য্য প্রথমে পালন করা কর্ত্তব্য, এ কথাটা গবর্ণমেণ্টকে আমরা জানাইতেছি বলিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, ইংলণ্ডের দুঃসময়ে আমরা সুবিধা পাইয়া দর-কশাকশি করিতেছি! কিন্তু ইংলণ্ড এখন কি করিতেছেন? সোজা কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল। ইংলণ্ড আমাদিগকে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতে বলিতেছেন। কিন্তু আমরা সে সাহায্য করিব কেন? তাঁহাকে যদি সাহায্যই করিতে হয়, তৎপূর্ব্বে আমাদিগকে বুঝিতে দাও যে, এই দেশটা আমাদেরই, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু নামে নহে, কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের যথার্থ অধিকার আছে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকগণ এই কথাই বরাবর বলিয়া আসিতেছেন। যদি প্রকৃতই তাহা তোমার মনোগত অভিপ্রায় হয়, তবে দেশবাসীকে স্পষ্ট করিয়া বল—এ দেশ তোমাদের নিজের দেশ, আপনার দেশকে আপনারা রক্ষা কর, প্রতিপালন কর, তখন দেখিবে, আমরা কি না করিতে পারি। আমরা দেশটিকে আপনার বলিয়া বুঝিতে চাই। যদি নিজের না হয়, তবে বৃথা চেষ্টা করিব কেন? আর যদি আমাদের হয়, তখন স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া, আমরা সকল প্রকার ত্যাগস্বীকার করিতে বাধ্য হইব। তোমরা বলিতেছ, ইংলণ্ডের দুঃসময় দেখিয়া আমরা সুযোগ পাইয়াছি; কিন্তু কথাটা ঘুরাইয়া ত আমরাও বলিতে পারি যে, আমাদের নিঃসহায় দেখিয়া ইংলণ্ড আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতেছেন। তখন সকলেই সে কথাটাকে অবিবেচকের কথা বলিয়া নিন্দা করিতে থাকিবেন।

দিল্লী ছাড়িয়া আমরা বাঙ্গালার কথা এখন বলি। বঙ্গেশ্বর সে দিন যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদিগকে রাজনীতিক আন্দোলন বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। সে সম্বন্ধে তিনি কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শত্রুরা যেন এ কথা ভাবিবার অবকাশ না পায় যে, ইংলণ্ড সমগ্রভাবে যুক্ত নহে—ভারতবর্ষ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নহে, এ কথা জানিবার অবকাশ যেন না পায়। আমরাও সেই জন্য প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। যাহা কিছু অভাব-অভিযোগ আছে, তাহার প্রতীকার কর, দেশটা যে আমাদের, তাহা বুঝিবার অবকাশ দাও, জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্মগত অধিকার যে ভারতবাসীর আছে, তাহা তাহাদিগকে বুঝিবার সুযোগ প্রদান কর, তাহারা ইংরাজের শত্রুকে আপনার শত্রু বলিয়া মনে করিবে। বঙ্গেশ্বরের কথার উত্তরে আমি স্পষ্টভাবে বলিতেছি, আমাদিগকে একতাবদ্ধ করিয়া তুল। লেখনীর একটি আঘাতে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে। যদি প্রকৃতই সে উদ্দেশ্য থাকে, তবে কালই তাহা ঘটিতে পারে। তোমরা যদি তাহা কর, তবে শত্রু কোথাও কোনও ফাঁক দেখিতে পাইবে না। সে উদ্দেশ্য অনায়াসে সিদ্ধ করা যাইতে পারে এবং তাহা করাও অত্যাবশ্যক।

আমাদের বঙ্গেশ্বর আর একটা হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ইংরাজ ন্যায়পরায়ণ। যুক্তি-তর্কের দ্বারা সহজেই তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভবপর, অতি সহজেই তাহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করা, সহানুভূতি আকর্ষণ করা অথবা কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু যখন সে বিপদের সম্মুখীন, সে অবস্থায় কেহ সুযোগ বুঝিয়া সুবিধা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সন্দেহ যদি তাহার হয়, তবে সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইবে।"

ভদ্রমহোদয়গণ, এ কথার অর্থ বুঝিয়াছেন ত? মনে রাখিতে হইবে যে, জার্ম্মণগণ এ দেশের

কোথায় কোন্ দুর্ব্বলতা আছে, তাহা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতিরও মতি-গতির কথা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা-দের এ অবস্থায় যদি তোমরা কোনও অধিকার চাহিতে যাও, তবে তাহারা রাগ করিবে। শুধু ভারতবাসীরই কোন স্বার্থের বালাই থাকিবে না, তাহাদের দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ প্রকাশ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা ত মানুষ নহি! আমাদের সুখ দুঃখ কিছুই থাকিতে পারে না! আমাদের যাঁহারা প্রভু, তাঁহাদের মতেই আমাদের সুখ-দুঃখ সবই নিয়ন্ত্রিত হইবে! আমাদের প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করিতে যেন নাই!

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বঙ্গেশ্বরের উক্তির এই অংশ পাঠ করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। জনসাধারণের মনের ভাব বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ দেশের লোক সাম্রাজ্যের ভক্ত প্রজা। তাহারা আমলা-তন্ত্রকে পছন্দ না করিতে পারে, সে কথা সত্য। বৃটিশ মন্ত্রিসভা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্যুরোক্রেশী বিশৃঙ্খলে কাজ করিয়াছেন বলিয়া এ দেশের জনসাধারণ যে অভি-যোগ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের অপরাধ নাই। ব্যুরোক্রেশীর তাহারা ভক্ত নহে; কিন্তু তাহারা রাজভক্ত, সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি আবার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন বুঝিয়া কাজ করেন, প্রজার মনোবেদনাজনক কোনও কার্য্য যেন না করেন। এ দেশের জন-সাধারণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা উহা সহ্য করিতে পারিতেছে না।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই বিরাট 'না' অধ্যায় যেন এইখানেই শেষ হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে

সভাপতির অভিভাষণ

(ফরিদপুর, ১৩৩২)

যুগে যুগে ভারতবর্ষ এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "মুক্তি কোন্ পথে?" ইহাই ভারত-বর্ষের আত্মপ্রশ্ন। বেদের শ্রুতি প্রাচীনতম মন্ত্রে এই প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর চৈতন্যচরিতামৃতেও এই প্রশ্নের সমাধানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কেবল ধর্ম্ম নহে, কেবল দর্শন নহে, কেবল কাব্য --মহাকাব্য বা সাহিত্যও নহে, পরন্তু কত বড় বড় সাম্রাজ্য—কত বড় বড় রাজপ্রতাপ আমা-দের জাতির ইতিহাস পথে গড়িয়া উঠিয়াছে—আবার কালক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের পথ—গতিমুক্তির পথ। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস—তাহাও এক প্রচণ্ড গতি-পথে—যুগে যুগে মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস, অথবা এক চিরন্তন মুক্তি-পথে পুনঃ পুনঃ অতি দুর্দ্দম গতিবেগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল ধর্ম্মের ইতিহাস নহে। শুধু সংগ্রহের ইতিহাসও নহে।

যুগের অবসানে অথবা যুগের প্রারম্ভে—ভারতবর্ষ আবার আজ সেই সনাতন প্রাচীন প্রশ্নই—নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মুক্তি কোন্ পথে?" এই প্রশ্নের সমাধানে আবার কোন্ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবে,--এবং কোন্ সাম্রাজ্যই বা ভাঙ্গিয়া পড়িবে—তাহা ইতিহাসের ভাগ্য-বিধাতাই জানেন। আমরা জানি না। নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে ভাঙ্গা-গড়া লইয়াই যদি ইতিহাস হয় এবং ভবিষ্যৎ ভারতের যদি ইতিহাস থাকে—তবে কোন কিছু ভাঙ্গিবেই,

এবং কিছু না কিছু গড়িয়া উঠিবেই, ইহা নিশ্চিত। ইহা সৃষ্টির নিয়ম। ভারতবর্ষ সৃষ্টির বাহিরে নয়। অনিয়মে ভারতবর্ষ চলিবে না।

আলোক ও অন্ধকারে মেশামিশি—প্রাচীন ভারতের যে অতীত অস্পষ্ট যুগ—তাহার মধ্য হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে সে সুস্পষ্ট বাণী—যুগের পর যুগে যে বাণী রূপ গ্রহণ করিয়াছে,—রূপ হইতে রূপান্তরে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—সেই রূপ, সেই বিগ্রহ—সেই সুর—সেই আরাব মুক্তির —বন্ধনের নহে। ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই জড় জগতের পরিবর্ত্তনশীল মায়াপ্রপঞ্চ—প্রকৃতির দাসত্ব হইতে জীবের বা জীবাত্মার মুক্তি খুঁজিয়া আসিয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু আলো ও আঁধারের মত যেখানে আসিতেছে —যাইতেছে; যাহা নশ্বর, যাহা দুদিনের, তাহাকে চিরদিনের বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে ভারতবর্ষ কোন দিন পরামর্শ দেয় নাই। যাহা দেখায় সত্য—অথচ মিথ্যা, তাহাকে ভারতবর্ষ মিথ্যা বলিয়াই জানিয়াছে। প্রকৃতির দাসত্ব হইতে আত্মার মুক্তির পথ যে দুর্গম—ক্ষুরধার-শাণিত—তাহা জানিয়াও মুক্তিকামী ভারত সেই কণ্টকময় সঙ্কট-পথে বীরদর্পে চলিয়া গিয়াছে। ভয় পায় নাই—থামে নাই—পশ্চাতে তাকায় নাই।

আজ আবার বর্ত্তমান ভারত মর্ম্মে মর্ম্মে নিপীড়িত হইয়া তাহার সমষ্টীভূত জাতীয় চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া পুনরায় আত্মপ্রশ্ন করিতেছে—"মুক্তি কোন্ পথে?" ইহা প্রাচীন ভারতের ব্যষ্টি-মুক্তি নয়। ইহা বর্ত্তমান ভারতের সমষ্টি-মুক্তি। হে ভারতের অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ—হে বাঙ্গালী, আমি আপনাদের সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ আপনাদের সম্মুখে ভারতের সেই সনাতন প্রশ্নই উত্থাপন করিতেছি—এ সঙ্কটে, এ দুর্দ্দিনে "মুক্তি কোন্ পথে?" আমি অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম। কেন না, অতি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতরূপে আমাদের জানিতে হইবে যে, কি আমরা চাই—এবং তাহা পাইবার জন্য কি আমাদের করিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে আত্মার মুক্তি চাহিয়াছে, বর্ত্তমান ভারতে সমগ্র ভারতের নরনারী—সমষ্টিভাবে সেইরূপ জাতীয় মুক্তি চাহিতেছে। ব্যক্তিই হউক বা জাতিই হউক, মুক্তির প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম বিচার করিতে হইবে, কি হইতে মুক্তি? সকলেই বলে যে, দাসত্ব হইতে মুক্তি। আমি তাহার সঙ্গে আরও বলিতে চাই—পাপ হইতেও মুক্তি। কে এই পাপ করে? আমি বলি, যে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল ক্রীতদাসের গলায় বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া দেয়, সেই পাপ করে। আমি আরও বলি, যে জীব, তাহার দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময় বাধা দেয় না, সে-ও পাপ করে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে—

"অন্যায় যে করে—আর অন্যায় যে সহে,
তব দণ্ড যেন তারে বজ্র সম দহে।"

চিন্তার ধারায়, বিকাশের পথে একের পর আর অথবা যুগপৎ, জাতীয় মুক্তি-প্রসঙ্গে অনেক রকম আদর্শ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছে। Self-Government—Home-Rule Independence বা Swaraj. ইহা এক একটা কথা মাত্র। ইহার কোন্ কথাটি কি বুঝায়, তাহা না বুঝিতে পারিলে এবং বুঝিয়া আয়ত্ত করিতে না পারিলে যেমন সর্ব্বত্র তেমনি—আমি মনে করি, বিশেষভাবে জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে, নিরর্থক কথা নিতান্তই ব্যর্থ। আর যদি এই সমস্ত আপাতিক সমতুল্য,—অথচ বিশ্লেষণ-মুখে বৈচিত্র্য-বহুল আদর্শগুলির গূঢ় ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝা যায়, তবে ঐ আদর্শ জাতীয় জীবনে আয়ত্ত করিতে হইলে কি বিশেষ উপায় অবলম্বন

করিতে হইবে—তাহা খুব বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

উপায়-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দুই শ্রেণীর মত এবং ঐ ঐ মতাবলম্বী ব্যক্তি আছেন—আমি জানি। এক শ্রেণী বলেন—বৈধ এবং নিতান্ত নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতীয় মুক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য অধ্যবসায় করা হউক। আর এক শ্রেণী বলেন—যে - বৈধই হউক আর অবৈধই হউক—বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে স্বরাজ-লাভ অসম্ভব। অন্যান্য দু এক শ্রেণীর মতবাদও যে দেখা না দিয়াছে, তাহা নয়। তবে তাহা এতদূর স্পষ্ট নয় যে, উল্লেখ করিতে পারি এবং উল্লেখ করিলেও আশঙ্কা আছে যে, উহা আমার বা আপনাদের বোধগম্য হইবে না।

জাতীয় মুক্তির আদর্শ সম্বন্ধে এবং তাহা আয়ত্ত করিবার উপায় সম্বন্ধে আমি আমার যা অভিমত, তাহা আপনাদের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত করিতেছি। এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে আমার অভিমত আপনাদের বিচার্য্য হইতে পারে—আশা করি। আমার অভিপ্রায় এই যে, বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন মুক্তকণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুক - যে, আমাদের জাতীয় মুক্তির আদর্শ কি? এবং ঐ আদর্শ আয়ত্ত করিতে হইলে সমগ্র জাতিকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচনাপ্রসঙ্গে আমার মনে হয়, স্বরাজের আদর্শ অপেক্ষা, Independenceএর আদর্শ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইহা সত্য যে, Independence অর্থ dependence বা অধীনতার অভাব। সুতরাং এই আদর্শ মূলতঃ অভাবাত্মক। কিন্তু অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্ম (Positive) কিছু স্বতঃই আমরা লাও পাইতে পারি। আমি অবশ্য ইহা বলি না যে, Independence ও স্বরাজ পরস্পর বিরোধী অথবা ইহার একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্যবিধান হইতে পারে না। এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয়—ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ Independent অর্থাৎ অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, যদি যে কোন উপায়েই হউক ইংরেজরাজ এ দেশ হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু ইংরেজ চলিয়া গেলে আমরা অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইতেও বা পারি, তথাপি কেবল তাহাতেই আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। ইংরেজ চলিয়া যাওয়া একটা অভাবাত্মক ব্যাপার। স্বরাজ অভাবাত্মক কিছু নয়। সুতরাং ইংরেজ চলিয়া যাওয়া আর স্বরাজ-লাভ এক বস্তু নহে। স্বরাজলাভ একটা বিশেষ রকমের ভাবাত্মক বস্তুর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা। কি বস্তুর এই উদ্ভব? কি উপায়ে ইহার প্রতিষ্ঠা? ইহাই প্রশ্ন—এবং সত্যই ইহা সুস্পষ্ট উত্তরের দাবী আমাদের নিকট করিতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে আমি আমার গয়া কংগ্রেসের অভিভাষণের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে পারি। আমি ঐ অভিভাষণে বলিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে একটা জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বড় বিস্ময়কর ঘটনা। কেন না, এখানে কালক্রমে একের পর আর এক কবির ভাষায়—"শকহুন-দল—পাঠান—মোগল" প্রভৃতি আসিয়া একত্র হইয়াছে। এখানে বৈচিত্র্য যে শুধু বেশী, তাহা নয়। বড় অদ্ভুত রকমের। সুতরাং জীবন-ধর্ম্মের নিয়মে যেখানে বৈচিত্র্য খুব বেশী, সেখানে ঐক্যও তেমনি গভীর ও সুদৃঢ় হইতে হইবে। এই ঐক্যই ত জাতীয়তা। ভারতবর্ষে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা-কল্পে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জাতীয় একতা অনেক গুণে বেশী হওয়া দরকার, কেন না, অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষের মত বৈচিত্র্য নাই। যেখানে বৈচিত্র্য অল্প—বা সহজ

বা সাধারণ রকমের, সেখানে অল্প একতাতেই জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। বিধাতার ইচ্ছায় যাহা কঠিন, ভারতবর্ষকে এ যুগে তাহাই সম্ভব করিতে হইবে এবং ইহা ভারতবর্ষকে সম্ভব করিতেই হইবে,—কেন না, বর্ত্তমান ভারতের জাতীয়তার প্রতিষ্ঠার উপর মানবজাতির বিভিন্ন শাখা-জাতিগুলির পরস্পর মিলন একান্ত নির্ভর করিতেছে। আমার মনে হয়—ভারতবর্ষে যদি একজাতীয়তা প্রতিষ্ঠা না হয়—তবে League of Nations প্রভৃতি যাহার পূর্ব্বাভাস বা সূচনা মাত্র, সেই মানবজাতির বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী খণ্ড জাতিগুলির ভবিষ্যৎ মিলন—নিতান্তই আকাশকুসুম।

আমি আবার বলি, ভারতবর্ষে একজাতীয়তা কঠিন হইলেও সম্ভবপর। বৈচিত্র্য বাধা নহে। বৈচিত্র্য যত বেশী, ঐক্যও তত দৃঢ় হইবে। আমরা ইহা করিব। বিধাতা দায়স্বরূপ এই গুরুভার আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এক-জাতীয়তাপ্রতিষ্ঠা প্রত্যেক ভারতবাসীর ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করা কর্ত্তব্য। ভারতের এই বিভিন্ন ধর্ম্ম,—ভাষা,—ব্যবহার; এই বৃহৎ ভৌগোলিক আয়তন—ইহার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান—সমন্বয়সংঘটন করা হইতে পারে, কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ, কিঞ্চিৎ কণ্টকাকীর্ণ পথে ক্লেশকর ভ্রমণ—তথাপি আমার নিশ্চয় মনে হয় যে, ইহা ব্যতীত স্বরাজলাভ সম্ভব হইবে না। এইখানেই এবং এই প্রসঙ্গে এ যুগে মহাত্মা গান্ধীর নাম ও তাঁহার বাণীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত অধিক বলিয়া তাঁহার অতুলনীয় মনীষা,—তাঁহার অনুপম দেব-চরিত্র, তাঁহার অমানুষিক কার্য্য করিবার ক্ষমতার নিকট আমরা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়াও একটা গৌরব ও গর্ব্ব অনুভব করি। তবে মহাত্মা গান্ধীর নামে কেবলমাত্র গৌরব ও গর্ব্ব করিয়া কালক্ষেপন সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। ভারতবর্ষে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠা-কল্পে তিনি যে সৃষ্টি বা গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি আমাদিগকে পালন করিতে বলিয়াছেন—তাহা না করিতে পারিলে আশঙ্কা হয়—আমাদের এবারকার আয়োজন-উদ্যোগে বুঝি বা ভারতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য্য-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ আমি আর আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি না। কেন না, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মহাত্মা স্বয়ং এখানে উপস্থিত এবং তাঁহার মুখ হইতেই তাঁহার বাণী—আমরা শুনিতে পাইব। তাঁহার গঠনমূলক পদ্ধতির সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত; এবং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সমস্ত দেশবাসীকে মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি। শুধু মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ যথেষ্ট নয়।

যাহা হউক, জাতীয় মুক্তির আদর্শ আলোচনার প্রসঙ্গে Independenceএর আদর্শের মধ্যে একটা শৃঙ্খলার (order) বড় অভাব বলিয়া বোধ হয়। যেন নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই বিবিধ উপকরণ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে—এক সুমহান্ ঐক্য-স্থাপনের জন্য শৃঙ্খলা রক্ষা করা বা শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা স্পষ্ট আমাদের বুঝা উচিত যে, যাহা আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি, তাহার সহিত যেন আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য, যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক আবেষ্টন, তাহার মিল থাকে। আমার মনে হয়, স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম বা সভ্যতার লোকেরা আছে, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্যসংস্থাপনের জন্য প্রথমতঃ—আমাদের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই জাতীয় একতাস্থাপনের জন্য আমাদের জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমি বলি না—যে, তাহার জন্য আমাদের দুই হাজার বৎসর অতীতে ফিরিয়া

যাইতে হইবে। যখনই এই রকম কথা আমি বলিয়াছি, তখনই অনেকে আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। তাহা নয়। আমাদিগকে সম্মুখে নবযুগের মহামিলনের ক্ষেত্রর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। তাহাকে রক্ষা করিয়া, উত্তরোত্তর তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া অগ্রসর হইব। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন- এই যে শৃঙ্খলার (ordor) কথা আমি বলিতেছি—ইহা ইউরোপে যে ভাবে দেখা দিয়াছে, যে আকারে ফুটিয়াছে, ভারতবর্ষে সেরূপ হইলে চলিবে না। ইউরোপের সমাজে ও রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের নানা বিভাগে যে শৃঙ্খলা দেখা যায়, তাহার মূলে একটা সামরিক (Military) ভাব বা অভিযান যেন লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমাজ ও শাসনযন্ত্রও এইরূপ একটা সামরিক শৃঙ্খলার দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে—এবং রক্ষা পাইতেছে। আপনারা কেহ যেন মনে না করেন—যে, এই প্রসঙ্গে আমি ইউরোপীয় সভ্যতাকে নিন্দা করিতেছি। ইউরোপের, তথা ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের যে বৈশিষ্ট্য আমার চক্ষে পড়ে, আমি তাহার কথাই বলিতেছি মাত্র। তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তাঁহারা রক্ষা করিবেন, চাই কি বৃদ্ধিও করিবেন এবং করিতেছেনও। সমস্ত মানবসমাজের মধ্যে একটা ঐক্য থাকিলেও তাহাদের পথ আমাদের নয় এবং আমাদের পথ তাহাদের নয়। তাহারা তাহাদের পথে চলিবে—আমরা আমাদের পথে চলিব। উদ্দেশ্য এক। তবে পথ কিছু ভিন্ন। তৃতীয়তঃ—আমাদের পথে অগ্রসর হইতে কোন বিদেশীয় রাজশক্তি আমাদের বাধা দিতে পারিবে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—Independence-এর আদর্শ হইতে স্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কি? স্বরাজের আদর্শে কি আছে—যাহা Independenceএর আদর্শে নাই? আমি বলি, আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ। Home-Rule এবং Self-Government এর যে আদর্শ, তাহার মধ্যে আমি যেন ত্রুটি দেখিতে পাই। এই সমস্ত আদর্শের মধ্যে যাহা আছে, স্বরাজের আদর্শেও তাহা আছে। কিন্তু আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি—তাহাতে Rule অর্থাৎ শাসন এই কথাটির মধ্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠে—তাহার বিরুদ্ধে আমার মন বিরূপ হইয়া উঠে—তা সে শাসন ঘরেরই (Home) হউক—অথবা পরেরই (Foreign) হউক। Self-Government এর বিরুদ্ধেও আমার ঐরূপ আপত্তি। কিন্তু কেবল নিজেদের দ্বারা এবং নিজেদের জন্যই যদি Self-Government হয়, তবে আমার আপত্তি বড় টিকে না—সত্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি বলিতে পারি যে, স্বরাজের আদর্শে ইহার সমস্তই বিদ্যমান আছে।

তার পরে প্রশ্ন এই—আমরা যে জাতীয় মুক্তি লাভ করিব, তাহা বৃটিশসাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া, না তাহার বাহিরে গিয়া? কংগ্রেস ইহার উত্তর স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যে সমস্ত অধিকার, তাহা যদি বৃটিশসাম্রাজ্য স্বীকার করে, তবে আমাদের এই সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। আর যদি স্বীকার না করে—তবে বাধ্য হইয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে আমাদের যাইতে হইবে। কেন না, জাতীয় মুক্তি আমাদের লাভ করিতে হইবে—ইহা নিশ্চিত। আমরা সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিব—কি সাম্রাজ্যের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িব—ইহার উত্তর আমাদের অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের যাঁরা নিয়ামক, তাঁহারাই বেশী করিয়া বলিতে পারেন। একটা জাতি হিসাবে আমাদের জীবনধারণ করিতেই হইবে। শুধু জাতীয়-জীবন ধারণ নয়—জীবনকে প্রসার করিতে হইবে, পরিপূর্ণ করিতে হইবে, জাতীয় জীবনের এই বিকাশে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি আমাদিগকে যথোপযুক্ত সুযোগ দেয়—তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই আমরা মুক্তিলাভ করিব। আর যদি সুযোগ না দেয়—সাম্রাজ্যের রথচক্র যদি আমাদের নবজাগ্রত জাতীয়-জীবনকে পিষিয়া ফেলে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়াই আমাদের স্বরাজলাভ করিতে হইবে। অন্যথা উপায় কি?

কিন্তু ইহা সত্য যে, আমরা যদি ওই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকি, তবে অনেক দিকে অনেক রকমের সুবিধা ও সুযোগ আমরা লাভ করিতে পারি। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত এখন আর প্রভু ও ক্রীতদাসের সম্বন্ধ নাই। খণ্ড দেশ বা রাজ্যগুলি এখন স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় সাম্রাজ্যের সহিত একসঙ্গে গ্রথিত থাকিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ। বাহ্যসম্পদ লাভের সুযোগ ও সুবিধার জন্য, স্বেচ্ছায় খণ্ডরাজ্যগুলি, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চায়। সুতরাং এই স্বাধীন চুক্তিমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইচ্ছামত খণ্ডরাজ্যগুলি অসুবিধা বুঝিলে, সাম্রাজ্যের গণ্ডীর বাহিরে যখন খুসি চলিয়া যাইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার একটা ভাব খুবই পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন কি সাম্রাজ্যবাদী, কি খণ্ড ও স্বতন্ত্র রাজ্যবাদিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, উভয়ের পক্ষেই স্বাধীনতা-মূলক চুক্তিসত্ত্বে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে একসঙ্গে থাকাই শ্রেয়স্কর। এখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর জাতিসকলের বর্ত্তমান অবস্থায়, কোন এক দেশ বা জাতিই অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া, পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না—বাঁচিতে পারে না এবং এই আদর্শের অনুপাতে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত খণ্ডরাজ্যগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে রক্ষা করিয়া—ও তাহার উন্নতি-কল্পে কোনরূপ বাধা না পাইয়া, যদি অগ্রসর হইতে পারে, তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি, তাহা অবশ্যই লাভ করিতে পারে।

আমি নিজে এই সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবার জন্য আর একটি বিশেষ কারণে উৎসাহ পাই। এই কারণটি রাজনৈতিক নহে—আধ্যাত্মিক। আমি জগতের পরিণামে একটা শান্তিতে বিশ্বাস করি। সমগ্র মানবজাতির একটা মহামিলনের যে স্বপ্ন,—তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি তাহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খণ্ড-রাজ্যগুলির বিশেষ বিশেষ স্বার্থ, স্বাতন্ত্র্য ও সভ্যতাকে রক্ষা করিয়া এক অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে—তবে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতির বিভিন্ন বিচিত্র শাখার মধ্যে এক অখণ্ড সুমহান্ ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। মানবজাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বড় কিছু কল্পনায় বা ধারণায় আসে না। যদি প্রত্যেক জাতির উদারহৃদয় ও অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে ব্রতী হন—তবে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলিকে, সাম্রাজ্যের ঐক্যের জন্য আপাততঃ কোন কোন দিকে কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদিগণ অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে দাসের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি লইয়া যে দেখা, তাহা চিরকালের মত পরিত্যাগ করিবেন। আমি মনে করি—ভারতের মঙ্গলের জন্য, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য, ভারতবর্ষ—ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা সফল হইলে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতি মানবজাতিকে যে ভাবে সাহায্য করিতে পারে—ভারতবাসীও তাহা করিবেই এবং সম্ভবতঃ তাহার অতিরিক্তও

কিছু করিবে। কেন না, মানবজাতি ভবিষ্যৎ মহামিলনের একটা আদর্শ—ভারতবাসীর নিকট হইতে পাইবে।

এক্ষণে জাতীয়-মুক্তির আদর্শ ছাড়িয়া তাহা লাভ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা আপনাদের সম্মুখে আমি উপস্থিত করিব। আমার নিজের এইরূপ ধারণা যে, উপায়কে আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করা যায় না। উপায় আদর্শেরই একটা অংশ। কেন না, যখনই আমরা উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমাদের মনের সম্মুখে উদ্দেশ্য বা আদর্শ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—যে, উপায় উদ্দেশ্য ছাড়া নহে। উদ্দেশ্য বা আদর্শের একটা অংশ।

এখন উপায় যদি আদর্শের একটা অংশ হয়—তবে হিংসা কোন যুগেই আমাদের জাতীয়-জীবনের আদর্শ ছিল না—বা এখনও নাই—সুতরাং হিংসামূলক কোন উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। কেন না, তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই। আমি বলি না যে, ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নাই, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। আমাদের ইতিহাস কোন বালকে পাঠ করিলেও আপনাদিগকে বলিয়া দিবে যে, ইহা মিথ্যা। কিন্তু অনেক জিনিস জোর করিয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। ইতিহাস-পাঠকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে যথার্থ স্বরূপ—তাহা হইতে তাহার উপর আরোপিত যে মিথ্যা আবরণ—তাহা অবশ্যই পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারিবেন। হিংসা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তেমন ভাবে নাই, যেমন ইউরোপে আছে। এই হিংসামূলক অবাধ্যতা দূর করিবার জন্য ইউরোপে যে আইনের সাহায্য লওয়া হয়—সে আইনের ভিত্তিও পাশবিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমরা ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যবহার পালন করিয়া আসিতেছি। প্রাচীনতার প্রতি আমাদের স্বভাবের মধ্যে একটা ঝোঁক আছে। কতকটা এই গতানুগতিক-ভাবের জন্যই হিংসার ভাব আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কম। আমাদের গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি অহিংসভাবে কাজ করিবার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানগুলিই—ফুল যে রকম আপনিই ফুটে—সেই রকম আপনা হইতেই বিকসিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্য লইয়া তর্ক করিয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন;—মুমুক্ষু আত্মা-সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য করুণ আর্ত্তনাদ করিয়াছে। কলহ ও বাদবিসংবাদ—সালিশগণের সুপরামর্শে নিষ্পত্তি হইয়াছে। এইরূপ জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া যে কোন উপায় এখন অবলম্বন করা যাইবে, তাহা যে শুধু নীতির বিরোধী হইবে, তাহা নয়,—তাহা ব্যর্থ হইবে। কোন ফল প্রসব করিবে না।

আমি বলিতে দ্বিধা বোধ করি না—যে, হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনই জাতীয়-মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। তার পর ভারতীয় প্রকৃতির অহিংসামূলক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও—ইহা কিরূপে সম্ভব যে, নিরস্ত্র একটা পরাধীন জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত, গভর্ণমেণ্টের আজিকার দিনের প্রচণ্ডহিংসামূলক—প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী হইবে? ফরাসী বা অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের কথা তুলিয়া কাজ নাই। সেই সমস্ত বিদ্রোহের যুগে মানুষেরা তীর, ধনুক ও বর্শা হাতে যুদ্ধ করিত। কখন বা জয়লাভও করিত। ইহা কি কল্পনায় সম্ভব যে, ঐ উপায়ে আমরা এই

বিজ্ঞানের যুগে সামরিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত একটা রাজশাসনকে বিধ্বস্ত করিতে পারি? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডেও এই শ্রেণীর বিদ্রোহ আর আজিকার দিনে সম্ভবপর নয়।

তার পর ভারতবর্ষে জাতীয় একতাস্থাপনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের কথা আমি বলিয়াছি—এবং যাহা ব্যতীত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া আমার ধারণা, হিংসামূলক কোন উপায় অবলম্বন করিতে গেলে তাহা একেবারে অসম্ভব হইবে। আমরা যদি হিংস্র হইয়া উঠি, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট আরও অধিক হিংস্র হইয়া উঠিবে এবং এমন এক প্রচণ্ড দমন-নীতি আমাদের উপর চালনা করিবে, যাহার ফলে স্বরাজ লাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে আছে, তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াও যাইতে পারে। হিংসামূলক বিদ্রোহের পক্ষপাতী যে সমস্ত যুবকগণ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আপামর সাধারণ দেশবাসী কি তাঁহাদের পক্ষ লইবে? যখন জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হইবে, তখন যাহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মিবে, তাহারা সকলেই এই বিদ্রোহের ছায়ার ত্রিসীমানার মধ্যেও থাকিবে না। সুতরাং এইরূপ বিদ্রোহ কার্য্যকারী হইবে না, কিন্তু আমার কথা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, এই সমস্ত যুবকদের উদ্দেশ্যের সততা এবং স্বদেশ-প্রেমের আতিশয্যকে আমি অবজ্ঞা বা তাচ্ছীল্য করিতেছি। তাহা নহে। আমি শুধু বলিতে চাই যে, এই উপায় আমাদের প্রকৃতির সহিত মিলিবে না, আমাদের ধাতে সহিবে না, সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা শুধু "সময় ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র।" বাঙ্গালায় বিদ্রোহমূলক উপায়ের প্রতি আশা স্থাপন করিয়া আছেন যে সকল যুবকগণ, তাঁহাদিগকে আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, ঐরূপ আশা যেন তাঁহারা অচিরাৎ পরিত্যাগ করেন। আর বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলনকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করুন যে, এই উপায়ে স্বরাজলাভ কোনমতেই করা যাইবে না।

কিন্তু আমি যেমন হিংসামূলক উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলাম, তেমনই আমি না বলিয়া পারি না যে, গভর্ণমেণ্টের হিংসা-মূলক শাসনপদ্ধতিই বাঙ্গালাদেশে প্রজাশক্তির মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। আমার স্মরণ হয় যে, অধ্যাপক Dicey এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইংরাজ-জাতি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপর যে একটা সম্ভ্রম, তাহা খুব বেশী রকম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সম্প্রতি ব্যবস্থা-প্রণয়ন-কার্য্যে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে, আদালতের যে ক্ষমতা পূর্ব্বে ছিল, এখন তাহা অনেকাংশে খর্ব্ব করা হইয়াছে। ইহাতে আইন-রক্ষার প্রতি পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধা নাই বলিয়াই প্রমাণ হয়। বস্তুত হিংসা দ্বারা হিংসারই সৃষ্টি হয়। গভর্ণমেণ্ট যদি প্রজাশক্তির ন্যায্য দাবী, ন্যায্য আন্দোলনে—অযথা বে-আইনী রকমে বাধা প্রদান করেন, তবে অধ্যাপক Diceyর কথায় প্রজাশক্তির মধ্যে বে-আইনী অর্থাৎ আইন ভঙ্গ করিবার একটা স্পৃহা আপনা হইতেই সৃষ্ট হয়। ভারতের ইতিহাস, বিশেষভাবে বাঙ্গালার ইতিহাস অধ্যাপক Diceyর কথার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

ইংরাজ-রাজত্বে ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির মধ্যে এই রাজদ্রোহিতা, এই বিদ্রোহের আব-হাওয়া এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই। যেমন অন্যদেশে, তেমনই এখানেও, এই আবহাওয়া স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রথম স্তরে একটা সাধারণ রকম অশান্তি বা চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। তাহার কারণ শতবৎসরব্যাপী ইংরাজ-শাসনের ফল।

কেন না, প্রায় দীর্ঘ একটি শতাব্দী ধরিয়া ইংরাজ-রাজ, ইংরাজ দ্বারা ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য এ দেশ শাসন করিয়াছেন মাত্র। এই অস্বস্তি বা চাঞ্চল্য ১৮৫৮ খৃঃ, সিপাহী-বিদ্রোহের পর আরও ঘনীভূত হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃঃ কোম্পানীর হাত হইতে ভারতবর্ষের শাসন ইংলণ্ডের রাজার অধীনে যাইয়া পড়ে। বিশেষভাবে এই সময় হইতে ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত—ভিক্টোরিয়া যুগের বেশীর ভাগ—ভারতবর্ষকে এক বিদেশীয় আমলাতন্ত্র দ্বারা শাসন করা হইয়াছে এবং এই সময়ে ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। এই যুগের ইংরাজ শাসনের বিশেষত্ব যে কেবল ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা, তাহা নহে—ইহার সব চেয়ে বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একেবারেই উপেক্ষা করা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া যুগের শেষাশেষি,—প্রজার হিতের জন্য কতকগুলি সংস্কার করা হইয়াছিল, তাহা আমি জানি—আপনারাও জানেন। যেমন Lord Ripon এর Repeal of the Vernacular Press Act, The Inauguration of the Local Self-Government, The Ilbert Bill, এবং Revision of the Indian Councils Act, 1891, ইহা Lord Lansdowne এর সময়ে হইয়াছিল। ইহাকে আমি কতকটা Benevolent Despotism বলিতে চাহি। কেন না, এই সমস্ত সংস্কারের ভিতরকার কথা ছিল—আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাইয়া আমলাতন্ত্রের শক্তিকে আরও অপ্রতিহত করিয়া তুলা। কেবল এক Local Self-Governmentই প্রজার হিতের জন্য বলিয়া ইতিহাসে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যদি তলাইয়া দেখা যায়—তবে নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে—ইহা মুখে যত বলে, কাজে তাহা কিছুই করে না।

প্রকৃতপক্ষে Local Self Government'এর ব্যাপারে আমলাতন্ত্র এমন কোন ক্ষমতাই প্রজার হাতে ছাড়িয়া দেয় নাই, যাহা দ্বারা প্রজা নিজের ইচ্ছামত নিজেদের কোন হিতসাধন করিতে পারে! অন্যদিকে Lord Lytton এর Vernacular Press Act এবং Lord Dufferin এর শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতের উপর ঘৃণাসূচক উক্তি ও তাচ্ছীল্য এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্য-কল্পে অতি নীচ মনের পরিচয়, এ সমস্তই পরবর্ত্তী কালের ঘনীভূত বিদ্রোহমূলক আবহাওয়া সৃষ্টির পক্ষে একের পর আর সাহায্য করিয়া আসিতেছিল।

তার পর আমরা দ্বিতীয় স্তরে আসিতেছি। ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির মধ্যে বিদ্রোহের আবহাওয়াকে এই দ্বিতীয় স্তরে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়া, ইহাকে উদ্বোধন করিবার ভার লইয়াছিলেন—লর্ড কার্জ্জন। লর্ড কার্জ্জনের অবিমৃষ্যকারিতা ও দাম্ভিকতাই এই দ্বিতীয় স্তরের রাজদ্রোহিতার প্রবর্ত্তক। তিনিই লাটদিগের মধ্যে প্রথম শাসন-কার্য্যের সুবিধাকে (administrative efficiency) প্রজার হিতের উপরে স্থান দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে তিনি এই শাসনকার্য্যের সুবিধারূপ ধুয়া ধরিলেন—অন্যদিকে শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতকে অতি যথেচ্ছ রকমে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রজাশক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জাতীয় আন্দোলনকে—সারকুলারের পর সারকুলার জারী করিয়া তাহাকে যেন গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ইহা এক দিকে প্রচণ্ড দমননীতির সূত্রপাত করিল—অন্য দিকে দেশের এক শ্রেণীর লোকের মনে প্রকৃতই রাজদ্রোহিতার এক বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিল। যাহা বীজাকারে ছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইল। ইহাই রাজ-দ্রোহিতার ভাব-ধারায় দ্বিতীয় স্তরের দ্যোতনা।

লর্ড কার্জ্জনের পর আমরা তৃতীয় স্তরে আসিয়া উপনীত হইতেছি। বীজে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে।

গর্ত্তে লুকাইয়াছিল যে সাপ—লর্ড কার্জ্জন বাঁশী বাজাইয়া তাহাকে গর্ত্ত হইতে সাধ করিয়া বাহিরে আনিয়াছেন। সাপিনী ফণা তুলিয়াছে। একটা দংশন না করিয়া সে যায় কোথায়? তৃতীয় স্তরের লক্ষণ যে, যাহা ভাবাকারে আব-হাওয়ার মধ্যে ঘনীভূত হইতেছিল তাহা একটা বিষাক্ত দংশনে অতি ক্ষুদ্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিল। লর্ড মিণ্টোর রাজত্বকালে আমলাতন্ত্র তাহার হিংস্রমূর্ত্তির যে কোমল মসৃণ মকমলের বহির্বাবরণ, তাহাও দূরে ফেলিয়া দিল—এক নগ্ন বীভৎসতা সংহারের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। বাঙ্গালার যুবকদের মধ্যে এক শ্রেণী ইহাতে ভীত হইল না, কিন্তু তাহারা অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা বোমা ও রিভলভার হস্তে ধাবমান হইল। কাহারও নিষেধ শুনিল না। ইহাই তৃতীয় স্তর।

ভারতে রাজবিদ্রোহের মূলে যে মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ ও বিকাশ আমি দেখাইলাম, রাজা ও প্রজার মধ্যে যে ঘাত-সংঘাতের দানবীয় লীলাভিনয় আপনারা দেখিলেন, ইহাকে আরও সম্পূর্ণ করিয়া দেখা হইবে, যদি আপনারা আরও দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন। ইহা সত্য যে, রাজ-শক্তির অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা, অযথা নির্বিচারে সমস্ত দেশের উপর প্রচণ্ড দমননীতির প্রয়োগ বা অপ-প্রয়োগ, শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতকে অসীম অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা হইতেই রাজদ্রোহের আব-হাওয়া জন্ম লাভ করিয়াছে। তথাপি—ভারতের বাহিরের কতকগুলি ঘটনাও এই সম্পর্কে আমাদের মনে না আসিয়া পারে না। যেমন ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান কর্তৃক রুসের পরাজয়, তাহার ফলে সমস্ত এসিয়া ভূখণ্ডে একটা নব-জাগরণের সূত্রপাত,—'মশরের স্বাধীনতা-প্রয়াসী বীরদিগের গরিলা যুদ্ধের সফলতা, আয়রলণ্ডের প্রজাতন্ত্রবাদীদের বিদ্রোহমূলক প্রচেষ্টা এবং সোভিয়েট রাসিয়ার পৃথিবী-কম্পনকারী বলসেভিক অভিযান, সর্ব্বশেষে এঙ্গোরা গভর্ণমেণ্টের সিংহাসনতলে ইংরাজ ও গ্রীক জাতির নতজানু হইয়া অবস্থান, ইহা সমস্তই একের পর আর আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া ভিড় করিয়া জমিয়া উঠিয়াছে - উঠিতেছে তাহার ফলে এক শ্রেণীর ভারতবাসী চিন্তা করিতেছেন যে, যে কোন উপায়েই হউক, আমরাও স্বাধীনতা লাভ করিব।

আপনাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা থা। ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ এই পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, একটা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ তালিকা আমি আমার অভিভ পরিশিষ্টভাগে দিলাম। ১৯০৯ খৃঃ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আমি ঐ তালিকাতে দেই নাই। আমার বিশ্বাস, এই সমস্ত ঘটনা ইহারই মধ্যে আপনারা ভুলিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৯১২ খৃঃ বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয় দিল্লী চাঁদনীচকে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। Defence of India Actএ বহু লোককে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয়, রাউলাট আইন পাশ করা হয়, জালিওয়ানাবাগের লোমহর্ষণ বর্ব্বর-সুলভ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হয়, কোমাগাটা মেরু, চরমাইনারের ঘটনা এ সমস্তই আপনাদের স্মরণ আছে।

সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজ-অত্যাচারের পরেই একটা রাজদ্রোহিতার সূত্রপাত হয়। আবার এই রাজ-দ্রোহিতার পরে পুনরায় একটা রাজ-অত্যাচার আত্ম-প্রকাশ করে। খালি তাই নয়,—যখনই গভর্ণমেণ্ট আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রজার হিতের জন্য কোন আইন পাশ করেন—আবার ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দমন নীতি সমর্থন করিয়া আর একটা আইনও পাশ হয়।

জালিওয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরেই মহাত্মা গান্ধী স্বরাজলাভের জন্য এ যুগে আবার

নূতন করিয়া এক অহিংসা-মূলক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করেন। আমরা সকলেই আশা করি যে, আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত মহাত্মা গান্ধীর এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। করিবে কি,—করিয়াছে। হিংসা-মূলক পদ্ধতি—কি গভর্ণমেণ্ট এবং কি হিংসা-মূলক বিদ্রোহিভাবাপন্ন ভারতবাসী, উভয়েই ইহা পরিত্যাগ করিবেন। কেন না, ইহা দ্বারা কেহই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে না।

এই যে নূতন Ordinance Act, ইহার দ্বারা ভারতবাসীর উপর অযথা অত্যাচার উৎপীড়ন বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। ইহার মূলে কোন বিচারবুদ্ধি নাই। সমগ্র ভারত একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে আমার নিজের মনের ভাব যথোপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিতে আমি ভরসা পাই না। কেন না, আমি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছি যে, খুব সংযত ভাষায় আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিব। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি ইহার উচ্ছেদ কামনা করি। Lord Birkenhead ভারত গভর্ণমেণ্টের এই দমন-নীতি-মূলক আইন সমর্থন করিয়া আমাকে এই গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিবার জন্য যে সাদর-আহ্বান করিয়াছেন—তাহার উত্তরে আমি যাহা বলিয়াছি—কোন ভারতবাসীই তাহার উত্তরে অন্যরূপ বলিতে পারে না।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে—Lord Birkenhead বলিয়াছেন যে—এই Ordinance আইন দ্বারা কেবল অপরাধী ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই অসুবিধা ভোগ করিবে না। আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিবার স্পর্দ্ধা করি যে, Lord Birkenhead এ ক্ষেত্রে অতি মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাহাদিগকে এই Ordinance আইনের বলে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়, আমরা স্বীকার করি না যে, তাহারা অপরাধী। তাহারা অপরাধী কি, না—ইহা বিচারের পূর্ব্বে কেহই স্থির করিতে পারে না। পুলিস বা সি, আই, ডি-র গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা বিচার নহে—অপরাধ সাব্যস্ত নহে। ইহা অবিচার। ইহা অত্যাচার। ইহা সভ্যতাভিমানী—ন্যায়-বিচারাভিমানী সমগ্র ইংরাজ জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য সাক্ষী প্রমাণ লইয়া প্রকাশ্য আদালতে বিচার হউক। ইহা অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সুবোধ বালকেও ইহা বুঝিতে পারে।

গভর্ণমেণ্টের তিনটি বিভাগের মধ্যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করিবার ক্ষমতা কেবল আদালতের হস্তেই ন্যস্ত। আদালত বিচার করিয়া যাহা স্থির করিবে—Executive বা শাসনবিভাগ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে মাত্র। কিন্তু যদি Executive বা শাসনবিভাগ নিজেই বিচার করিতে বসে—যিনি হুকুম পালন করিবেন, তিনিই যদি হঠাৎ হুকুম করিতে আরম্ভ করেন, তবে প্রজার স্বাধীনতাকে এমন যথেচ্ছ নিষ্ঠুরভাবে অপহরণ করা হয় যে, সে সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ইতিহাস-লেখকগণ খুব বিশদরূপে বিশ্লেষণ করিয়াই লিখিয়াছেন। Lord Birkenhead তাঁহার নিজের দেশের ইতিহাস পড়েন নাই, এমন কথা কোন্ অর্ব্বাচীন বলিতে সাহস করিবে?

যখনই নূতন করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটা দমন-নীতি প্রয়োগ করিয়াছে, তখনই তাহার সমর্থনের জন্য একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে। সেই সব ঘটনার প্রত্যেকটির কথা বলিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি আমি করিব না। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু Bengal Ordinance সম্বন্ধে Legislative Assembly-তে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী যে সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে এ বিষয়ে খুব বিস্তৃত

রকমে সব কথাই তিনি বলিয়াছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে সেই বক্তৃতাটি পড়িতে বলি। কেন না, তাহাতে পণ্ডিতজী গভর্ণমেণ্ট উল্লিখিত প্রত্যেকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐরূপ ঘটনা হইতে কোনমতেই কোন প্রকারে দমন-নীতি প্রয়োগের অজুহাত বা অছিলা পাওয়া যাইতে পারে না। দমন-নীতি প্রয়োগের সময় গভর্ণমেণ্ট যে কৈফিয়ৎ ও যে ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা বিশ্বাস করা খুব শক্ত। আমি শুধু একটি দৃষ্টান্তের কথা আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব। ১৯০৮ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর—স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ৯ জন বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। লর্ড মর্লি তখন ভারত-গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী। এই সম্পর্কে Lord Mintoকে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি ৯জন ব্যক্তিকে, এক বৎসর হইল কারারুদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, আপনি বিশ্বাস করেন যে, তাহারা রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত অবৈধরূপে সংশ্লিষ্ট আছে এবং আপনি আরও বিশ্বাস করেন যে, তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলে, উল্লিখিত ষড়যন্ত্রগুলির দমন হইবে।"

এখন আপনারা শুনুন, Sir Hugh Stephenson এই সম্পর্কে Bengal Councilএ মাত্র সে দিন কি সব কথা বলিয়াছেন।—

—"আমাদের দমন-নীতির অবলম্বিত উপায়ের অপ-প্রয়োগ-সম্বন্ধে আমি তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথম দুইটি অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পর্কে। সংবাদপত্রে ইহা বলা হইয়াছে যে, ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, এই দুই জন রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত কোন প্রকারে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে পুলিসের গোপন সংবাদ সম্পূর্ণই মিথ্যা এবং পুলিসের এই প্রকার গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া তখন যেরূপ গভর্ণমেণ্ট প্রতারিত হইয়াছিলেন—এখনও সেইরূপ হইতে পারেন। আমি বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তকে জানিতাম না। কিন্তু আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আমার এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই—ইহা আমি বলিতে পারি। কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাহাতে কৃষ্ণ বাবু, কি অশ্বিনীকুমার দত্ত কেহই রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রকে উৎসাহ দিবার—বিশেষতঃ উক্ত ষড়যন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে থাকিবার অভিযোগ কেহই করে নাই। অশ্বিনীকুমার দত্ত সম্বন্ধে Bengal Government যে Regulation IIIর প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, অশ্বিনী বাবু গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা স্থানে বক্তৃতায় এক তুমুল ঝড় তুলিয়াছিলেন।"

সুতরাং ইহা প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল যে, এ দেশে অবৈধ আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের আছে এবং সেই সঙ্গে ঐ অবৈধ আইনের অপ-প্রয়োগেও যথেষ্ট অবসর আছে। আমাদের যেরূপ অবস্থা—আর গভর্ণমেণ্টের যেরূপ ব্যবস্থা—তাহাতে এরূপ না হইয়া যায় না। জগতের ইতিহাস এই কথারই প্রমাণ দেয় যে, আমলাতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্রই আইন ও শৃঙ্খলার ("Law and Order") অজুহাতে তাহাদের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করে। আইন ও শৃঙ্খলা—কথাটি শুনিতে খুব ভাল। কিন্তু আমাদের মত দেশে—যেখানে (আইনের রাজত্ব) "Rule of Law" নাই—সেখানে আইন ও শৃঙ্খলার নামে—আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা-মদ-মত্ত ব্যক্তিগণ কেবল তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাকে অপব্যবহার ও অত্যাচারে পরিণত করে মাত্র। আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীন ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করিবার এক

উপায়—দমননীতির প্রয়োগ এবং গভর্ণমেণ্টের এই অযথা হিংসামূলক দমন-নীতির প্রয়োগকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। যেমন আমি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের পক্ষ হইতে হিংসামূলক রাজ-দ্রোহিতাকেও ঘৃণা করি। আমি গভর্ণমেণ্টকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সতর্ক করিয়া দিবার জন্য একটা দায়িত্ব অনুভব করিতেছি যে, অযথা দমন-নীতির প্রয়োগ রাজ্য-শাসনের পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। অতি অল্পসময়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট ইহার বলে—আপন ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু আমি আশা করি, Lord Birkenhead মনে মনে বুঝিতে পারেন-যে—এ উপায়ে রাজাশাসন চলিবে না।

যাহা হউক—জাতীয় মুক্তিলাভের জন্য আমাদের কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার আলোচনা আমি করিয়াছি। হিংসা-মূলক রাজদ্রোহিতার ভাব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন না, এই উপায় প্রথমতঃ নীতি-বিরোধী; দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না; ইহা নীতি-বিরোধী; কেন না, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় সভ্যতার সহিত ইহার মিল নাই। ইহা দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না, কারণ, ইহা ধারণাই করা যাইতে পারে না যে, আজিকার দিনে এমন একটা সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্টকে কয়েকটা বোমা ও রিভলভারের গুলীতে আমরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিব।

তার পর প্রশ্ন, সেই চিরন্তন প্রশ্ন "তবে মুক্তি কোন্ পথে?" কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা স্বরাজ লাভ করিব? খুব বিজ্ঞতার সহিত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, Reform Act অনুযায়ী গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিলেই স্বরাজ একেবারে আমাদের হাতের মুঠার মধ্যে! ইহার উত্তরে আমার যাহা বলিবার—তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া আবার আমি আপনাদিগকে বলিতেছি এবং আমি ইচ্ছা করি না যে, কেহ এই প্রসঙ্গে আমার অভিপ্রায়কে অস্পষ্টতা-দোষে দোষী করেন। আমি যদি বুঝিতাম, এই Reform Actএ সত্যিকার কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব কার্য্যই আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার বলে—আমরা জাতীয় অভাব সকল পূর্ণ করিয়া, জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি—তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া Council Chamberএর ভিতরে থাকিয়াই জাতির গঠন-মূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম ও আমার দেশবাসীদিগকে সেইরূপ করিতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া আমি আসল বস্তুটি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নই। Reform Act যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে কোন ক্ষমতা দেয় নাই, তাহা আবার আজ আপনাদিগের নিকট বুঝাইতে গিয়া অযথা সময়ের অপব্যবহার করিব না। আপনারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ ইহা আপনাদিগকে দেখাইয়াছে। দেখাইতে পারিয়াছে। আপনারা যদি এ সম্বন্ধে যুক্তি চান—বিচার করিতে চান—তবে আমি আমার আমেদাবাদ কংগ্রেসের বক্তৃতা আবার আপনাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে বলিব মাত্র, যদি আরও নিঃসংশয় হইতে চান, তাহা হইলে Muddiman Committeeর সমক্ষে যে সমস্ত সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে—তাহা আর একবার পাঠ করিবেন এবং এমন সমস্ত লোক ঐ সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, স্বয়ং গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের ধীরতা ও রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারেন না। বর্ত্তমান Reform Actএর আসল কথা হইতেছে এই যে, গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রীদিগকে বিশ্বাস করে না। অবিশ্বাস করে এবং যেখানে এইরূপ অবিশ্বাস মনের

মধ্যে থাকে, সেখানে সেই অবিশ্বাসের আব-হাওয়ার মধ্যে সহযোগিতা বা একত্রে কাজ করিবার কথা মুখেও আনা যায় না। তথাপি গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কাজ করা সম্বন্ধে আমার মত আমি সুস্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি। আমি আশা করি, বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন আমার সহিত একমত হইয়া এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতই প্রকাশ করিবে। আমার কথা এই যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কাজ করিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই—কেবল যদি গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিয়া সত্যিকার ক্ষমতা ও দায়িত্ব আমাদের উপর ছাড়িয়া দেন এবং কাজ করিতে কোন বাধা না দেন। তবে এই একত্রে কাজ করাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, আমাদের শাসনকর্ত্তাদের আমাদের প্রতি মনের ভাব যথার্থরূপে পরিবর্ত্তন হওয়া চাই, —দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ স্বরাজ নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে আপনা হইতেই বিনা বাধায় যাহাতে আমরা পাইতে পারি, এখনই তাহার সূত্রপাত করা দরকার। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদিগকে এমন ভাবে কথা দিবেন যে, তাহার যেন আর নড়চড় না হইতে পারে।

আমি বরাবর বলিয়াছি যে, গঠন-মূলক কার্য্য আরম্ভ করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা বুঝিতে পারেন যে, একটা জাতির ইতিহাসে, স্বাধীনতালাভ করিবার পথে, কয়েক বৎসর মাত্র ব্যবধান, খুব বেশী সময় নয়। অবশ্য সেই পথে অগ্রসর হইতে এখনই যদি আমরা সুযোগ পাই, প্রকৃত স্বরাজলাভের ভিত্তি যদি এখনই প্রতিষ্ঠিত হয়—এবং যথার্থ-রূপে যদি আমাদের ও গভর্ণমেণ্টের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়। আমি জানি, আপনারা বলিবেন—'মনপরিবর্ত্তন' একটা সুন্দর কথা মাত্র—উহার কোন অর্থ নাই, প্রকৃত কাজে উহার পরিচয় ও প্রমাণ আমরা চাই। ইহা খুব সত্য—এবং আমিও ইহা স্বীকার করি। কিন্তু মুখের কথা কাজে পরিচয় দিবার জন্য, রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা নূতন আব-হাওয়ার সৃষ্টি প্রয়োজন। এই আব-হাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে—যদি রাজা ও প্রজার মধ্যে মনোমালিন্য দূর করিয়া একটা মিট্-মাট বা আপোষের প্রস্তাব হয়। উভয় দলের মধ্যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস উভয় দলেই অতি সহজে অনুভব করিতে পারে। ধীর ও শান্তভাবে সত্য যদি কোন আপোষের প্রস্তাব হয়—তবে তাহার সার্থকতার জন্য, আমি মনে করি, সেই আপোষের সর্ত্ত (Terms) গুলি অপেক্ষা, ঐ সমস্ত সর্ত্তের (Terms) পশ্চাতে যে মন আছে, সেই মানসিক অবস্থার প্রতি অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে। উভয় পক্ষের মন যদি সরল হয়, সফলতা সহজেই করতলগত হইতে পারে। অন্যথা সফলতার কোন সম্ভাবনা আমি ত দেখি না। বর্ত্তমান অবস্থায়—এখনই—আপোষের জন্য নিশ্চিতরূপে কোন সর্ত্ত (Terms) উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি কর্ত্তৃপক্ষের মন যদি সরল হইয়া আসে, পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া—শান্ত-ভাবে আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে, তবে আপোষের সর্ত্তগুলি স্থিরনিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না।

বাঙ্গালা দেশের মনের ভাব আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি—তাহাতে আভাসে কতকগুলি সর্ত্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ দমন-নীতি প্রয়োগের যে কতকগুলি ক্ষমতা ধারণ করিয়া আছেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ রাজনৈতিক বন্দীদের সর্ব্বপ্রথমেই ছাড়িয়া দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে আমরা নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ

লাভ করিতে পারি—তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা দিবেন—যে কথার কোন নড়চড় হইতে পারিবে না।

তৃতীয়তঃ—পূর্ণ স্বরাজলাভের পূর্ব্বে—ইতোমধ্যে এখনই—আমাদের শাসনযন্ত্রকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিবেন, যাহাতে পূর্ণ স্বরাজলাভের একটা স্থায়ী পাকা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন পূর্ণ স্বরাজলাভের পথে কি ভাবে এই বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রকে, কোন্ দিকে কতটা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা মিট্-মাট-প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করে এবং এই কথাবার্ত্তা কেবল যে গভর্ণমেণ্ট ও সমগ্র প্রজাশক্তির প্রতিনিধিদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে। দেশের সকল বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে হইবে। দেশের ইউরোপীয় ও Anglo-Indian সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকেও আহ্বান করা হইবে। আমার গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে আমি এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি।

আমি এ'কথা আপনাদিগকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে বলিতেছি যে, আমরাও গভর্ণমেণ্টের সহিত এমন একটা সর্ত্তে আবদ্ধ হইব যে, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি হাবভাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিব না,—অবশ্য এখনও দেই না—এবং আমরা সর্ব্বতোভাবে এইরূপ আত্মঘাতী আন্দোলন দেশ হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিব। এইরূপ একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, তাহা নয়—কেন না, বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন,—কোন দিনই রাজদ্রোহমূলক কোন প্রকার আন্দোলনকে উৎসাহ দেয় নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, গভর্ণমেণ্টের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইলে—তাহার ফলে স্বতঃই রাজদ্রোহীদের মনেও একটা পরিবর্ত্তনের ভাব আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে এবং আমি যে ভাবের একটা আপোষের আভাস এইমাত্র দিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে,—রাজদ্রোহের আন্দোলন একটা অতীতের বস্তু হইবে মাত্র—বর্ত্তমানে তাহার কোন অস্তিত্বই থাকিবে না—এবং যে শক্তি ও সামর্থ্য ভ্রান্তপথে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এখন প্রয়োগ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইতেছে, তাহা দেশের প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সার্থকতা লাভ করিবে।

তার পরের কথা, যদি আমাদের আপোষের প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত না করেন, তখন আমরা কি করিব? ইহার উত্তর খুব সহজ। আমরা গত দুই বৎসরকাল যে ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছি—সেই পথে—সেই ভাবেই কার্য্য করিতে থাকিব এবং তাহাতে ফল এই হইবে যে—গভর্ণমেণ্ট তাহার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাপ্রযুক্ত অধিকারের প্রয়োগ ও অপব্যয় করা ভিন্ন—স্বাভাবিক নিয়মে—শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিতে পারিবেন না। যেমন এখন পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এরূপ করা কর্ত্তব্য নয়। তাঁহারা যুক্তিও দেন। বজেটের প্রস্তাবে বাধা দিবার নাকি আমাদের নৈতিক অধিকার নাই। কেন না, তৎপূর্ব্বে আমাদের নাকি প্রজাদের নিকট যাইয়া ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিবার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

এই কথার উত্তরে আমার আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, সমগ্র ভারতে প্রজাশক্তির মধ্যে একযোগে একটা বিরাট অহিংসামূলক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার আব-হাওয়া সৃষ্টি করা। স্বাধীনতাপ্রয়াসী পর্য্যুদস্ত আমরা—আমাদের হস্তে স্বাধীনতার যুদ্ধে ইহাই শেষ অস্ত্র। আমি বলি ব্রহ্মাস্ত্র। ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে মহাবীর গাণ্ডীবী যেমন সর্ব্বপ্রথমেই পাশুপত প্রয়োগ করেন নাই, মহাবীর কর্ণও যেমন সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার একাঘ্নী অস্ত্র

ব্যবহার করেন নাই—কোন বীরই তাহা করে না, —আমরাও সর্ব্বপ্রথমে আমাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করিব না। কিন্তু যখন সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে,—শেষ যখন আমাদের সম্মুখে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের রথী যিনি, তাঁহাকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া আমরা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিব না—ভীত হইব না, কেন না, আমরা জানি যে, এ যুদ্ধ পশুবলের বিরুদ্ধে মানবের যে আত্মার বল—তাহারি যুদ্ধ। ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ। আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই—কিছু আসে যায় না। এ বিশ্বাস আমাদের আছে যে, পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদের আজিকার যুদ্ধের মত—কোন একটা যুদ্ধও দেখাইতে পারে না। এক দিকে বর্ত্তমান যুগের নব-আবিষ্কৃত বিজ্ঞান-সহায়ে সুসজ্জিত দৃঢ়বদ্ধ কাতারে কাতারে সশস্ত্র সেনা-সমাবেশ—অন্যদিকে নিরস্ত্র দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ অগণন ৩০ কোটি নর-কঙ্কাল। কটিমাত্র বস্ত্র আবরণে দেশব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জীবন্ত বিগ্রহ—ভারতের প্রধান সেনাপতি, আজ মাত্র আত্মার বলকে হস্তামলকবৎ ধারণ করিয়া, আমাদিকে এই সমরাঙ্গনে আহ্বান করিয়াছেন।

হে আমার দেশবাসী ভ্রাতাগণ, ভগিনীগণ, সত্যি আমাদের বর্ত্তমান ঘাত-সংঘাতের কোন প্রতিধ্বনি কোন জাতির অতীত ইতিহাসে দেখা যায় না। বজেট প্রস্তাবে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহার যদি অনুরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই আপনাদের এত আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করিব। আপনারা কি জানেন না যে, ষ্টুয়ার্টদিগের রাজত্বকালে যখন প্রজারা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই পার্লেমেণ্টে প্রজাশক্তির প্রতিনিধিগণ বজেট প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন? অহিংসা-মূলক অবাধ্যতার আব-হাওয়া সৃষ্টি করিবার উপায়, গভর্ণমেণ্টকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে ট্যাক্স আদায় করিতে বাধ্য করা। আমরা বজেট প্রস্তাবে বাধা দিয়া সফল হইলেই গভর্ণমেণ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে ট্যাক্স আদায় করিতে উদ্যোগী হইবে এবং সেই সময় যদি নিতান্তই আসে, তবে আমরা আমাদের দেশবাসীকে ঐরূপ অবৈধ উপায়ে ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে বাধা দিবার জন্য পরামর্শ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিব না।

তবু আমি আশা করি—সেই সময় হয় ত আসিবে না। কেন না, চারি দিকেই মনের একটা পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু যদি আপোষের সকল প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়—সকল ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই ভারতবাসীকে অহিংসা-মূলক অবাধ্যতা (Civil Disobedience) গ্রহণ করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই ব্রহ্মাস্ত্র সুযোগ বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও আপনাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, Civil Disobedience শুধু মুখের কথা নয়। Civil Disobedience করিতে হইলে—

—দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে খুব বড় রকমের একটা শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজন হইবে।

—আত্মোৎসর্গের জন্য অসীম সহিষ্ণুতা ধারণ করিতে হইবে।

—ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থকে সমগ্র জাতির স্বার্থের নিকট বলি দিতে হইবে।

আমার আশঙ্কা হয়, মহাত্মা গান্ধীর গঠন-মূলক কার্য্য পূর্ণ রকমে সফল না হইলে Civil Disobedience সম্ভবপর হইবে না। তথাপি আমাদের আদর্শকে সর্ব্বদাই আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে। কেন না,

যে রকমেই হউক, স্বাধীনতাকে আমরা লাভ করিবই।

তবে আমি বলিতেছি যে—আপোষের সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি। সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি দেখিতেছি—বিচ্ছিন্ন মানব জাতির মধ্যে একটা গঠন, একটা শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের জন্য মানবের আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, জগতের এই মহা-মিলনে ভারতবর্ষ খুব বেশী সাহায্য করিবে। জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষের কিছু বলিবার আছে। ভারতবর্ষ তাহা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে ভর করিয়া ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়াছে—মানবের বিভিন্ন জাতির মিলন-মন্দিরের সিংহদ্বারে ভারতবর্ষ তাহার যুগ-যুগান্তের অমরবাণী লইয়া সমুপস্থিত। ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ কি পথের কণ্টক হইবেন? আমি আশা করি না। তাঁহাদিগকে আমি বলি যে, তোমরা শান্তিলাভ করিতে পার—যদি আপোষ কর। আপোষের সর্ত্তগুলি তোমাদের ও আমাদের উভয় পক্ষেরই সম্মানজনক হইবে। ভারতের ইংরাজ সম্প্রদায়কে আমি বলি যে, তোমরা স্বাধীনতার পতাকা বহন করিবার অধিকারী একটা মহিমজাতির বংশধর —আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে কি তোমরা সাহায্য করিবে না—? আমরা ত এ দেশে তোমাদের ন্যায্য অধিকারের স্বত্ব সর্ব্বদাই স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বাঙ্গালার উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে আমি বলি যে—তোমরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে—এ যুগে বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছ—বহু কষ্ট পাইয়াছ—তোমাদের উপরেই রাজরোষ সংহারের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখনও সময় আসে নাই,—যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পার। যুদ্ধক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কলকোলাহলে মুখরিত। যাও বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের একটা মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা—তাহা ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি হইয়া শান্তি আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে—তখন সংযত, শান্ত পদক্ষেপে সে শান্তিময় মিলন-মন্দিরে —সমুন্নতশিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে—এই স্বপ্ন সাশ্রুনেত্রে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি—। তোমরা তখন সর্ব্বপ্রকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিবে। জয়ী যে, সে দম্ভ করে না। বীর যে, সে জয়ের পর বিনয়ে অবনত হয়। মিলন-মন্দিরে যাত্রীরা যেন তোমাদের দেখিয়া বলিতে পারে—এরা সেই সমস্ত যোদ্ধা, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়কে পরাজিত করিয়াছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াছে, আবার যুদ্ধাবসানে জয়মাল্য গলে —ইহারা বিনয়ে ও সৌজন্যে শত্রুকে অধিকতর পরাজিত করিয়াছে।

জাতীয়তা একটা উপায়—যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতি-মুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিকাশ এই জন্য প্রয়োজন যে—ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারে। জাতীয়তাই শেষ কথা নয় এবং আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, যখন তোমরা মিলনের সর্ত্তগুলিকে বিবেচনা করিবার জন্য আহূত হইবে—তখন জাতীয়তার গৌরবে অন্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতির যে ঐক্যমূলক গভীর স্বার্থ, তাহা ভুলিও না। আমি নিজে কি চাই, তাহার সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। আমি চাই—

—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তাহার আপন সভ্যতার, আপন ধর্ম্মের—আপন আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নবযুগের উপযোগিভাবে রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত একজাতীয়তার মধ্যে মিলিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশেই সমগ্র ভারতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত, ভারতের একতাকে রক্ষা করিবে।

—ভারতের এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও মিলন, সাম্রাজ্যের এক মহামিলনের অঙ্গীভূত। সমগ্র ভারত-সম্রাজ্যের ভিতরে একটা বিরাট অঙ্গের মত অবস্থান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যের বল, সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

—প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির স্বাধীনতার সার্থকতা সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে সাহায্য করিবার উপর নির্ভর করিতেছে।

—জাতিতে জাতিতে মিলন—পৃথিবী-পৃষ্ঠে ব্যাকুল মানবাত্মার শান্তি আনয়ন করিবে।

বন্দে মাতরম্।

ভাঙ্গিতে চাই কেন ?

[গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ এই সংস্কার হইতে উদ্ভূত হইবে। কংগ্রেস সে কথা অস্বীকার করেন। কংগ্রেসের মতে এই নব প্রবর্ত্তিত শাসনসংস্কারের মধ্যে স্বরাজের বীজ নাই। এই মতবাদ হইতেই অসহযোগ আন্দোলনের উৎপত্তি। যদিও দেশের শাসনভার কতক পরিমাণে দেশের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিগণের নির্ব্বাচিত মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে, তথাপি কার্য্যতঃ এই মন্ত্রিগণের হাতে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। মন্ত্রিগণ যে কয়টি বিভাগের পরিচালনভার পাইয়াছেন, তাহাতে প্রজার কল্যাণসাধনের উপযুক্ত কোন ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের অধীনস্থ কোন বিভাগে কোন প্রজাহিতকর অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবার কোন উপায় নাই; কারণ, রাজকোষের উপর তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। শাসন-যন্ত্রটি গভর্ণমেণ্ট দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। এক অংশের কর্তৃত্বভার এই মন্ত্রিগণের হাতে ও অপরাংশের কর্তৃত্বভার গভর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্যগণের হাতে ন্যস্ত। বাহ্যতঃ কতকগুলি বিভাগের পরিচালনভার এই মন্ত্রিগণের হাতে থাকিলেও কার্য্যতঃ শাসন, সংরক্ষণ, উন্নতিবিষয়ক যাহা কিছু ক্ষমতা, সে সমস্তই গভর্ণমেণ্টের অপরার্দ্ধে, অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্যগণ-পরিচালিত বিভাগে সম্পূর্ণভাবে অবস্থিত। এই দ্বৈতশাসন-প্রণালী দ্বারা ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজলাভের যোগ্যতা দান করা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়, এ কথা কংগ্রেস স্বীকার করেন না। এই জন্য কংগ্রেসের অন্তর্গত স্বরাজ্য দল এই দ্বৈতশাসনপদ্ধতির উচ্ছেদকল্পে মহাত্মা গান্ধীর অনভিপ্রায় সত্ত্বেও কাউন্সিলে প্রবেশ করেন এবং অচিরে বাঙ্গালা ও মধ্যপ্রদেশে সাফল্য লাভ করেন। দেশে অনেক গণ্যমান্য লোক আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সহজ—স্বরাজ্য দল এই দ্বৈতশাসন বিনষ্ট করিয়া দেশের অমঙ্গলই করিতেছেন, এই শাসন-সংস্কারে ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের যে সামান্য অধিকার পাইয়াছে, তাহাও স্বরাজ্য দলের নির্বুদ্ধিতায় বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বহুবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার শেষ চেষ্টা ও এ সম্বন্ধে তাঁহার শেষ উক্তি বাঙ্গালার কাউন্সিলে মন্ত্রিগণের বেতন মঞ্জুর করার প্রস্তাব উপলক্ষে বিজয়গৌরবে ঘোষিত হয়। নিম্নে সেই সারগর্ভ, মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।]

আমার শরীর অসুস্থ; তথাপি কাউন্সিলের সমক্ষে আজ যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। আমার কয়েক জন বন্ধু শ্রীযুক্ত ফজলুল্ হক্ মহাশয়ের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি ও আমি বিষয়টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক হইতে দেখি। কিন্তু তাঁহার মতের ভিত্তি কি, তাহা অনেকে কেন দেখিতে পান না, তাহা আমি বুঝি না। আমি তাঁহার সহিত একমত নহি, তবুও তাঁহার মতবাদের ভিত্তি কি, তাহা আমি বুঝি। দ্বৈতশাসন-পদ্ধতির পক্ষে আজ যে সমুদায় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই—যে সকল বিভাগের কর্তৃত্ব মন্ত্রিগণের হাতে দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা আমরা কেন দেশের উন্নতিকল্পে কাজে লাগাইব না? কেন সাধারণ প্রজাগণের হিতসাধনের, কৃষি-শিল্পিগণের কল্যাণসাধনের সুযোগ নষ্ট করিব? শ্রীযুক্ত ফজলুল্ হক্ মহাশয় বলিতে চান যে, মন্ত্রিগণ যতক্ষণ কায়েমী

না হন, দেশের হিতসাধনের জন্য তাঁহাদের যে সামান্য ক্ষমতা আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করার উপযুক্ত অবসর তাঁহারা যতক্ষণ না পান, ততক্ষণ সে চেষ্টা করা বৃথা। এ মতের তাৎপর্য্য আমি বুঝি, এবং আমার মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও, ইহাকে আমি সম্মানের সহিত আলোচনা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মত আমার পক্ষে দুর্বোধ। তিনি কি বলিতে চান? হক্ সাহেব দ্বৈতশাসনের উপকারিতায় বিশ্বাস করেন। মিত্র মহাশয়ের সে বিশ্বাস নাই! সে কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, আজ এই কাউন্সিলেও সে কথা বলিয়াছেন। তিনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"আমার বিবেচনায় দ্বৈতশাসন এ দেশে একদম নিষ্ফল হইয়াছে। আমার আরও বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে দ্বৈতশাসনপদ্ধতি চালান ক্রমেই বেশী দুরূহ হইয়া উঠিবে।" মিত্র মহাশয় মৌখিক সাক্ষ্য দিবার সময়ও বলিয়াছেন—"দ্বৈতশাসনপ্রণালী আমি পূর্ব্বেও চিরদিন অহিতকর বিবেচনা করিয়াছি।" তথাপি এখন তিনি এক 'অনির্দ্দেশ্য নীতির দোহাই পাড়িতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ নীতির বলে মানুষ বলিতে পারে—"আমি চিরদিন দ্বৈতশাসন অকল্যাণকর বিবেচনা করি, এ শাসনপদ্ধতিতে আমার কোন আস্থা নাই, এ যন্ত্র চালান চলে না, তথাপি ইহাকে চালাইবার ভার আমি লইতে প্রস্তুত?" যদি আপনি দ্বৈতশাসন-যন্ত্র চালাইবার জন্য প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে ইহা হইতে আপনি যত সামান্যই হউক, কিছু কল্যাণের আশা আছে মনে করেন, মানিতে হইবে; এবং যদি বিন্দুমাত্র কল্যাণের আশা আছে মনে করেন, তাহা হইলে কেন বলেন, এ শাসন-পদ্ধতিতে আপনার আস্থা নাই—ইহা চালাইবার অযোগ্য? কোন্ যুক্তিবলে এরূপ অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, আমি বুঝি না। দ্বৈতশাসন যদি সত্যই অকল্যাণকর বলিয়া আপনার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুধু মুখের কথায় নয়, কার্য্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করুন। আজ এই সম্পর্কে আপনারা যে ভোট দিবেন, গভর্ণমেণ্ট তাহাই আপনাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিবেন। যদি বলেন, দ্বৈতশাসন অন্যায়, তথাপি 'যা পাওয়া যায়' এই হিসাবে ইহাতে বাঁধ লাগাইব—তাহা হইলে আমি বলিব, যদি কিছুমাত্র উপকারিতা থাকে—যাহা আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি—তাহা হইলে ইহাকে নিন্দা করার অধিকার আপনার নাই। কিন্তু যদি ইহার উপকারিতা স্বীকার না করেন, যদি দ্বৈতশাসন দেশের পক্ষে অকল্যাণকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মানুষের মত জোর করিয়া বলুন—'দ্বৈতশাসনে আমার আস্থা নাই, ইহার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই, কোন যোগ নাই, আমি কোন আনুকূল্য করিতে চাই না, কারণ, এ শাসনপদ্ধতি হইতে আমার দেশের কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।' মিত্র মহাশয় এ পন্থা অবলম্বন করিলে আমি তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

স্বরাজ্য দলের মতবাদ সম্বন্ধে শুধু আজ নয়, বহুবার এবং পুনঃ পুনঃ বহু সমালোচনার বাণ বর্ষিত হইয়াছে। আমার আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় যে, এই সমালোচকগণ ক্রমাগত নিষ্ফল সমালোচনা করিয়া ক্লান্তি বোধ করেন না। বার বার একই কথা বলায় মনে হয়, ইঁহারা স্বরাজ্য দলের মতবাদ ও সেই মতবাদের পোষকে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ইঁহারা বলেন, স্বরাজ্য দলের একমাত্র কথা—'ধ্বংস কর, ধ্বংস কর। ধ্বংস ছাড়া এই দলের আর কোন কাজ নাই।' কিন্তু কথা এই, সমালোচকের দল স্বরাজ্য দলের কথা এত কম বোঝেন যে, ইঁহাদের

সমালোচনার উত্তর দেওয়া আমি সহজ বিবেচনা করি না। আমরা ধ্বংস করিতে চাই কেন? কি ধ্বংস করিতে চাই? যে শাসনপদ্ধতি আমার এ দেশের কোনও মঙ্গল করে না, করিতে পারে না, আমরা তাহাকে ধ্বংস করিতে চাই। আমরা এই শাসন যন্ত্র ভাঙ্গিতে চাই, কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য, ইহার স্থলে আমরা এমন যন্ত্র প্রস্তুত করিব, যাহার দ্বারা আমরা দেশের আপামরসাধারণের কল্যাণ সাধিত করিতে পারি। আপনারা কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির দ্বারা আমাদের দরিদ্র দেশবাসিগণের কোনও উপকার করিতে পারেন? এই দ্বৈতশাসন-প্রণালী মানিয়া সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মত যোগ্য ব্যক্তির মন্ত্রিত্বাধীনে দীর্ঘ তিন বৎসর কাজ করিয়া আপনারা কি দেখিয়াছেন? কি করিতে সমর্থ হইয়াছেন? দরিদ্র জনমণ্ডলীর কোন উপকার-সাধন করিয়াছেন? তাহারা কি এতটুকুও বেশী শিক্ষালাভ করিয়াছে? এতটুকুও মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছে? তাহাদের আর্থিক অবস্থার কি কোনও উন্নতি হইয়াছে? না,—এ সকল কিছুই করিবার আপনাদের ক্ষমত নাই, তাহা আপনারাও জানেন; সুতরাং এই অবস্থায় আপনাদের দ্বারা দেশের কোনও উপকার হইবে না। মন্ত্রিগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি শুনা যায়; কিন্তু অর্থাভাবে সে ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিরর্থক। যে সকল বিভাগে জাতীয় উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে, জাতীয় জীবন-গঠনের সহায়তা করা যাইতে পারে, তাহা মন্ত্রীদের হাতে; কিন্তু রাজকোষের উপর তাঁহাদের কোনও অধিকার নাই। সে অধিকার দেওয়া হইয়াছে গভর্ণমেণ্টের অপরার্দ্ধে—সরকারী সদস্যগণের হাতে। এই সদস্যগণ টাকা না দিয়া মন্ত্রিগণের দেশহিতকর সমস্ত অনুষ্ঠান নিবারিত করিতে পারেন। এই অবস্থায় দেশের লোক যদি মন্ত্রিগণকে দোষ দেয়, গভর্ণমেণ্ট অনায়াসে বলিতে পারেন—'এই দেখ বাপু, তোমাদের মন্ত্রীদের কাজ' কি চমৎকার ব্যবস্থা! কেহ কেহ মনে করেন, এই অবস্থাতে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা না করিলে যে সকল বিভাগের কর্ত্তৃত্ব-ভার মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করিতে পারেন। যদি প্রত্যাহার করেন, তাহাতে দেশের কি ক্ষতি? গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে সেই সকল বিভাগের কাজ চালাইলে যদি দেশের কোনও উপকার না হয়, তখন সে জন্য দেশ আর মন্ত্রিগণকে দায়ী করিতে পারিবে না। মন্ত্রিগণও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে—"আমাদের হাতে টাকা ছিল না, কাজেই দেশের কোনও উপকার করিবার শক্তি আমাদের ছিল না।" যাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কেন ভাঙ্গিতে চাই, তাঁহাদের আমি বলিব, এই জীর্ণ অকর্ম্মণ্য ইষ্টকস্তূপ ভূমিসাৎ না করিলে তাহার স্থানে মনোরম সুদৃশ্য সৌধ নির্ম্মাণ করা অসম্ভব। নির্ম্মাণের আর অন্য কি উপায় থাকিতে পারে? ধ্বংস ধ্বংস বলিয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, আমার মনে হয়, তাঁহাদের কথার কোনও অর্থ নাই। কারণ, আমরা শুধু ধ্বংসের জন্য ধ্বংস করিতে চাহি না। স্বরাজ্য দলের সভ্যগণ শুধু ধ্বংস করিতে চান, এ কথা বলিলে তাঁহাদের উপর ঘোরতর অবমাননা প্রদর্শন করা হয়। তাঁহারা ভাঙ্গিতে চান সত্য, কিন্তু সে কেবল গড়িবার জন্যই। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের কাজে আমরা বাধা দিই, তাহার উদ্দেশ্য, আমরা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত করিয়া, নূতন করিয়া গড়িবার অবসর খুঁজি। আমার মনে হয়, এ নীতি অতি সহজ; ইহা আমার বন্ধুগণের নিকট এত দুর্ব্বোধ বলিয়া কেন ঠেকে, তাহা আমি জানি না। যে কোন দেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ুন, দেখিবেন, ঠিক এই একই নিয়মে

সেই সকল দেশে রাষ্ট্রীয় জীবন গঠিত হইয়াছে। অবাধ রাজশক্তিকে প্রতিহত না করিয়া কোনও দেশেরই প্রজাবর্গ রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হয় নাই। অমাদের দেশের শাসনপদ্ধতি অধর্ম-মূলক ও অকল্যাণকর। যে উপায়ে ইংলণ্ডের প্রকৃতিপুঞ্জ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, সে উপায় এই দেশে অবলম্বিত হইলে তাহা নিন্দিত হইবে। স্বরাজ্য দল তাহা অবলম্বন করিতেছে, ইহাই কি তাহার কারণ?

কেহ কেহ আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি আপনাদের আর অধিক সময় লইতে ইচ্ছা করি না, কারণ, আমি বিশেষ শ্রান্তি বোধ করিতেছি। প্রথমতঃ সার প্রভাস মিত্র ও আর কয়েক জন বক্তা সহযোগিতা-নীতির উচ্চ গুণগান করিয়াছেন। আমি সহস্রবার বলিয়াছি এবং এখনও পুনরায় বলিতেছি যে, আমি সহযোগিতার বিরোধী নহি; স্বরাজ্য দলের কোনও লোকই নহে। কিন্তু বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির অধীনে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা অসম্ভব। সহযোগিতার অর্থ কি দাসত্ব? গভর্ণমেণ্ট কি কিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত? না, গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিষয়ে নিজের জিদ বজায় রাখিবেন; কাজেই এই অবস্থায় সহযোগিতার অর্থ, ভারতবাসিগণ তাহাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও নীতি জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্ববিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট মস্তক অবনত করে। আমি কিন্তু সহ-যোগিতার এই অর্থ জীবনে কখনও শিক্ষা করি নাই। গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু আমি চাই, আপনারা আমাকে সত্য ও আন্তরিক সহযোগিতার পথ প্রদর্শন করুন। বর্ত্তমান অবস্থায় সে পথ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমরা তখনই সহ-যোগিতা করিতে পারি, যখন আমরা দেখিব, গভর্ণমেণ্টের সহিত আদান-প্রদান সম্ভব, যখন আমরা দেখিব, গভর্ণমেণ্টের অন্তঃকরণে প্রজাগণের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার জন্য সত্য ইচ্ছা জাগিয়াছে, যখন দেখিব, গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বর্ত্তমানে আপনারা কি তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতেছেন? আমি গভর্ণমেণ্টের সেরূপ কোন ইচ্ছার অস্তিত্ব অনুভব করি না—পক্ষান্তরে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ধ্বনিত প্রত্যেক কণ্ঠ রুদ্ধ, স্বাধীনতালাভের জন্য প্রত্যেক ক্ষুদ্র চেষ্টা নিন্দিত। আমাদের মুক্তির জন্য আমরা যাহা কিছু করিতে চাই, তাহা ঘৃণিত অপরাধ বলিয়া গণ্য। দেশের এই অবস্থা, আমাদের এই অবস্থা। এই অবস্থায় আপনারা আমাকে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে বলেন? যাহারা বলেন, আপনাদের সহিত সহযোগিতা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত, আমার মনে হয়, তাঁহারা সত্য গোপন করেন। বর্ত্তমান অবস্থায় আন্তরিক সহযোগিতায় কোনও পথ নাই। স্বরাজ্য দল সহযোগিতার বিরুদ্ধ এ কথা মুখে আনিবেন না। যে গভর্ণমেণ্ট সৎ, সম্মানার্হ এবং প্রজাহিতরত, সেরূপ গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বরাজ্য দল সহযোগিতা করিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

আমাকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"দ্বৈত-শাসন বিনষ্ট করিলে আমাদের কি লাভ হইবে?" ইহার উত্তরে পুরাকালে কৃষ্ণভক্ত জনৈক ঋষি তাঁহার শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, আজ আমার সেই কথা মনে পড়িতেছে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কৃষ্ণদর্শনে কি লাভ?" উত্তরে গুরু বলিয়াছিলেন—'কৃষ্ণদর্শনই কৃষ্ণদর্শনের লাভ।" আমরা এরূপ রাষ্ট্রবিধান প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, যাহা প্রাণহীন হইবে না, যাহা আমাদের স্বাধীনতার সোপান হইবে, যাহার অধীনে ভারত-বাসী ভিন্নদেশীয় হিতৈষিগণকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে, আমি জোর করিয়া বলিব,

আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় বিধানে সে সুযোগ নাই। আমাদের রাষ্ট্রীয়-জীবন আপদমস্তক অলীক অসত্যের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। দ্বৈতশাসন ধ্বংস করিতে পারিলে আমাদের এই লাভ হইবে যে, তাহার স্থলে আমরা সত্য সুন্দর রাষ্ট্র-বিধানের সৌধ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবে। এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা আপনাদের পক্ষে সহজ হইবে, যদি আপনারা আভিজাত্যের সঙ্কীর্ণ অভিমান বর্জ্জন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর মঙ্গল ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। যদি আপনারা এই সহজ সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন যে, রাষ্ট্র-বিধান বা গভর্ণমেণ্ট তখনই সার্থক, যখন তাহা জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং জাতীয় কল্যাণের প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। এ কথা স্বীকার করিলে দ্বৈতশাসন ধ্বংসের শুভ পরিণাম উপলব্ধি করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হইবে না।

আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে, দ্বৈতশাসন ধ্বংস করার পর আমরা কি করিতে চাই? উত্তর—তাহা অবস্থার পরিবর্ত্তন ও পরিণতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। আমরা কি করিতে চাই—বা কি করিতে চাই না, সে সম্বন্ধে আমরা কোনও কথা লুকাইতে চাই না। আজ যদি এই সভা প্রস্তাবিত বিষয় আমাদের বিপক্ষে মীমাংসা করেন, তাহা হইলেও আমাদের মতের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতি অন্যায় ও অধর্ম্মমূলক এবং কোন সৎলোক আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া এই গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। স্বরাজ্য দলের এই সিদ্ধান্ত। এই জন্যই আজ আমি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছি। যদি প্রস্তাব গৃহীত না হয়, গভর্ণমেণ্টের সম্মুখে দুইটি পথ আছে। যে সকল বিভাগ মন্ত্রিগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহাদিগের পরিচালন-ভার গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে লইতে পারেন। যদি করেন, তাহা আমাদের পক্ষে গৌরবজনক বিবেচনা করিব, কারণ, এরূপ গভর্ণমেণ্ট চালাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও সমুদায় দোষভার গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধে নিপতিত হইবে। এরূপ না করিয়া গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সদস্য-সভা (Council) ভাঙ্গিয়া দিতেও পারেন। তাহা করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব, কারণ, তাহার ফলে—এবং সে কথা গভর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জানেন—স্বরাজ্য দলের সভাগণ আরও অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইয়া এই কাউন্সিলে ফিরিয়া আসিবেন। তাহাতে স্বরাজ্য দলের সুবিধা ও সুযোগ আরও বর্দ্ধিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট যাহাই করুন, আমরা তাহাতে ভীত নহি;—আমাদের দেশবাসিগণ আমাদের সহায়। যাহাদের প্রশ্নের উত্তরে আমাকে এই সকল কথা বলিতে হইল, তাঁহারা মনে করেন, এই কাউন্সিলই আমাদের মুক্তির একমাত্র সোপান। তাহা নহে—আমি আজ জোর করিয়া বলিতেছি, তাহা নহে। আমাকে কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট ভয় পাইয়া কিছু করিবার পাত্র নহেন। আমাদের রক্ষণশীল ইংরাজ শাসনবিধাতৃগণ ভয় পাইবেন কি না, তাহা আমার আদৌ চিন্তার বিষয় নহে। ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট কিছু আদায় করার প্রবৃত্তিও আমার নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয়—এই রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্টও বিলক্ষণ জানেন যে,—জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বলিয়া যে অমরশক্তি জাতির হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, তাহার সাফল্য কোন রকমেই রোধ করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট রক্ষণশীলই হউক, বা উদারনীতিপরায়ণই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এ সকল নাম আমার নিকট অর্থশূন্য। ভারতবাসীর নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ফলবতী করাই আমার একমাত্র কাজ। আমি আজ সেই আকাঙ্ক্ষা আপনাদের নিকট ঘোষণা করিতেছি। আপনারা জানিবেন, গভর্ণমেণ্টের নীতি-পদ্ধতি যাহাই হউক, ভারতবর্ষের মত মহৎ ও গৌরবময়

দেশের মর্ম্মগত আকাঙ্ক্ষা রোধ করা পৃথিবীর কোনও গভর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নহে।*

স্বরাজ

[গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় স্বরাজ্যদলের যে সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ]

দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা আমার নাই, স্বরাজ্য দল কি কায করতে চান, শুধু সেই সম্বন্ধে দুই একটা কথা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা' কিছু জ্ঞাতব্য, তা'র বিস্তারিত আলোচনা আমি করব না, আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ও সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতির যেটা মূল-তত্ত্ব ও তা'র পরিচায়ক কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ, শুধু সেই সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। এ কথা বলার বোধ করি কোন প্রয়োজন নাই যে, আমাদের উদ্দেশ্য স্বরাজলাভ। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে—স্বরাজ বললেই আজকাল অনেকে নানা প্রশ্ন তোলেন। "স্বরাজ যে তোমরা চাও, সেটা কি রকমের জিনিস?" প্রথমেই এই প্রশ্ন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন। আবার আমার এমন বন্ধুও আছেন, যাঁরা স্বরাজের আগাগোড়া সব খুঁটিনাটি সাব্যস্ত করতে গিয়ে আসল কথাটাই ভুলে যান। তাঁ'রা ভুলে যান যে, স্বরাজের জন্যে আমরা যে প্রয়াস কচ্ছি, তা'র তাৎপর্য্য এ নয় যে, আমরা কোন শাসন-পদ্ধতিবিশেষের বিরোধী বা কোনটার পক্ষপাতী। কথাটা হচ্ছে, আমরা চাই সেই অধিকার—যার জোরে আমরা আমাদের উপযোগী আমাদের কল্যাণকর শাসন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এইটাই হ'ল স্বরাজের মূল ভিত্তি। এ কথা আমি পূর্ব্বে অন্যত্র বলেছি এবং আজও পুনরায় বলছি যে, স্বরাজ—স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার অধিকার আর কোন একটা বিশিষ্ট আকারের শাসন-যন্ত্র, এর মধ্যে যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, সেটা ভুললে চলবে না। কোন রকমের শাসন-পদ্ধতি বা রাষ্ট্র-যন্ত্রই নিত্য বা স্থায়ী নয়। আজ এক রকমের শাসন-যন্ত্র তৈয়ারী করা হ'ল, কা'ল তাকে ভেঙ্গেচুরে তার ভগ্নাবশেষের উপর পরশু আর একটা নূতন রকমের শাসন-যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হ'ল। এই হচ্ছে সব দেশের গতি, সব রাজ্যের গতি। আমি চাই আমার দেশের লোক জোর ক'রে বলেন যে, আমাদের শাসন-যন্ত্র, আমাদের রাষ্ট্রবিধান গ'ড়ে তোলবার হক্ আমাদের—আমাদের জাতীয় প্রয়োজন বোধ এবং আমাদের জাতীয় শক্তি ও প্রতিভা অনুসারে আমরা সে যন্ত্র গ'ড়ে তুলতে চাই। আর চাই আমাদের বিদেশী শাসনকর্ত্তারা আমাদের এই অধিকার স্বীকার করেন।

একটা কথা অনেকে জানতে চান—সেটা হচ্ছে, আমরা যে স্বরাজ চাই, সে ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কি না, অর্থাৎ ইংরাজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ রাখতে চাই, না সম্পূর্ণ স্বাধীন হ'তে চাই? অনেক বিলাতী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমার মনে হয়, তাঁদের মনে এই সন্দেহ জাগছে যে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত ক'রে তোলাই আমাদের মৎলব। কিন্তু তা নয়। আমি চাচ্ছি আমার স্বাধীনতার অধিকার, আমি চাচ্ছি আমার দেশের স্বাধীনতার অধিকার। আমি চাচ্ছি আমাদের স্বাভাবিক অধিকারের বলে আমাদের দেশের—আমাদের নিজের রাষ্ট্রবিধান নিয়ন্ত্রিত

*শ্রীপঞ্চানন মজুমদার অনুদিত।

করতে, গ'ড়ে তুলতে। ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থেকে যদি আমাদের সে অধিকার নষ্ট না হয়, সে সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকায় আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকায় যদি আমাদের সে অধিকার নষ্ট হয়, তবে আমি বলব, এ সাম্রাজ্যের উপর আমার যে প্রীতি, আমার স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অনুরাগ তা'র চেয়ে অনেক বেশী। সেই জন্যে আমি বলি, দূর-ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তা'র অনুসন্ধান করা এখন আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। আমাদের সম্মুখে যে যুদ্ধ প'ড়ে রয়েছে, তাতে আত্মনিয়োগ করেই যেন আমরা এখন সন্তুষ্ট থাকি, যেন এ যুদ্ধে সত্যই আমাদের অবলম্বন হয়, এবং আমরা যেন না ভুলি যে, সত্য হচ্ছে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনের যে অধিকার, সে ঈশ্বরদত্ত অধিকার, আমরা সে অধিকারে বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারিনে। আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট কি রকমের হ'লে দেশের পক্ষে কল্যাণকর হ'বে, কি রকমের শাসন-পদ্ধতি আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে উপযোগী হ'বে, সে মীমাংসা আমরা করব—আমাদের বিচারক সাজবার অধিকার বিদেশীর নেই।

এই ত হ'ল স্বরাজের কথা। তা'র পরে আমাদের ভাবতে হ'বে, কি ক'রে আমরা স্বরাজ পেতে পারি। ইতঃপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সভায় অসহযোগ সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করেছি। কেহ কেহ বলেন, আমার সে মত প্রাপ্ত। কথা নিয়ে মারামারি করতে আমি চাইনে। অসহযোগ অর্থে অন্যে যে যা বোঝেন, বুঝুন—আমি যা বুঝি, তাতে আমি জোর ক'রে বলছি, পূর্ব্বেও বহুবার বলেছি, যে, এই গভর্ণমেন্টের সঙ্গে লড়তে হ'লে এবং স্বরাজ লাভ ক'রতে হ'লে এই গভর্ণমেন্টের সর্ব্বাঙ্গে অসহযোগ প্রয়োগ করতে হ'বে। এই স্বরাজ-সংঘ যখন আমরা প্রথম গড়ি, তখনই অসহযোগ কি, তা আমরা বলেছিলাম। * * * * তখন আমরা প্রকাশ্যভাবে দেশের জনসাধারণকে বলেছিলাম যে, অসহযোগের তাৎপর্য্য, দেশে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করতে হ'বে যে, লোকে বিদ্বেষবুদ্ধি বর্জ্জন ক'রে অন্যায়ের রোধ করতে পারে এবং এই স্বেচ্ছাচারী আমলা-চালিত শাসনপদ্ধতি অচল ক'রে তুলতে পারে।

আমাদের এই কথায় কোন কোন সমালোচক বিরক্ত হয়ে বলেছেন—"এরা অরাজকের দল, এরা দেশের গভর্ণমেন্ট থাকে, তা চায় না।" বস্তুতঃ আমরা তেমন কিছুই বলিনি। আমরা বলেছি, স্বেচ্ছাচারী আমলা-শাসিত গভর্ণমেন্ট আমরা চাইনে। আমাদের এ কথার অর্থ এ নয়—এবং তেমন অর্থ হ'তেও পারে না যা এমন কথা আমরা কোথাও বলিনি যে, আমরা কোন রকম গভর্ণমেন্ট চাইনে। আরও অরাজকতা চাই, বা কোন প্রকার শাসন-পদ্ধতি আমরা চাইনে, এমন কথা আমরা বলিনি। যা আমরা বরাবর বলেছি, তা এখনও বলছি যে, কর্ম্মচারিতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার-নিয়ন্ত্রিত এই গভর্ণমেন্ট আমরা চালাতে দেব না এবং সেই উদ্দেশ্যেই দেশের লোকের মনের ভাব এমন ক'রে তুলতে চাই যে, তা'রা ক্রমে সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা বন্ধ ক'রে এই গভর্ণমেন্টকে অচল ক'রে তুলতে পারে ও আমাদের জাতীয় দাবী ও আমাদের জাতীয় গৌরব অক্ষুন্ন ও অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। এই হ'ল অসহযোগের দ্বিবিধ তাৎপর্য্য। * * * * আচ্ছা, এই যে আমলাতন্ত্র গভর্ণমেন্ট, এর শাসনে চলবে কেমন ক'রে? এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, দেশের লোকের সম্মতি ও সাহায্য ব্যতীত এরা কখনই দেশ শাসন করতে পারে না। সুতরাং এই আমলাতন্ত্র যদি আমরা উঠিয়ে দিতে চাই, তা হ'লে প্রথমে অন্যায়কে রোধ করবার জন্যে

উন্মুখ এমন একটা মানসিক শক্তি দেশে জাগিয়ে তুলতে হ'বে। সে রকম চেষ্টা করায় কোন দোষ নেই এবং কেউ বলতে পারে না, সে চেষ্টা অস্বাভাবিক। যখন কোন জাতির জীবন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হয়, তখন তা'র পক্ষে এরূপ চেষ্টা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই, এবং যদি দাঁড়াই, তা' হ'লে তা'র একমাত্র অর্থ হচ্ছে আমলাতন্ত্র শাসনের বিনাশ।

আপনারা যদি অন্যায়ের রোধ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন, এবং সমস্ত জাতির মধ্যে সে শক্তি জাগ্রত ক'রে তুলতে পারেন, তখন আপনারা কি করবেন? তখন গভর্ণমেণ্টকে আপনাদের এ কথা স্পষ্ট ক'রে বলতেই হ'বে, "আমাদের বাঁচবার জন্যে এ অধিকার আমাদের চাই, আমাদের এই দাবী যে, আমাদের শাসনভার আমরা নিজেদের হাতে নিব এবং আমাদের জাতীয় শক্তি ও প্রতিভা অনুসারে আমাদের গভর্ণমেণ্ট গ'ড়ে তুলব ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করব। আমাদের এ অধিকারের ন্যায্যতা আজ হোক, কা'ল হোক বা পাঁচ বছর পরেই হোক," তোমরা স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ, সে অধিকার প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির স্বাভাবিক অধিকার।"

আমি এই জন্যে বলছিলাম যে, কোন গভর্ণমেণ্ট আমাদের এ অধিকার দিতে পারে না, আমাদের আপন শক্তিতে এ অধিকার আমাদেরই অর্জ্জন করতে হবে, এবং গভর্ণমেণ্ট যদি তা' স্বীকার করতে না চায় ত তাদের বাধ্য ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে যে, সে অধিকার আমাদের জন্মগত এবং তা' আমাদের সাধনার দ্বারাই আমরা অর্জ্জন করেছি। সেই কথাই আজ আমরা গভর্ণমেণ্টকে বলতে চাই। কিন্তু যদি গভর্ণমেণ্ট তাতে কর্ণপাত না করেন, তা' হ'লে আমরা ক্রমে সর্ব্ববিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করব এবং বর্ত্তমান শাসন অচল ক'রে তুলব। আমি আবার বলি যে, আমরা কোন রকম গভর্ণমেণ্ট চাই না, তা নয়, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের শাসন-পদ্ধতি যার দ্বারা আমাদের দেশে জনসাধারণের কোন কল্যাণ হইতেছে না, বরং কেবল বিদেশীয়দেরই ইষ্টসাধন হচ্ছে, এই গভর্ণমেণ্ট আমরা চাই নে। * * *

এই জন্যে আমাদের শাসনকর্ত্তাদের আমরা বলছি যে, যদি তাঁরা আমাদের এ ন্যায্য দাবী স্বীকার না করেন, তা' হ'লে বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রটি না ভেঙে আমাদের অন্য কোন উপায়ই নেই। কারণ, আমারা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, এই গভর্ণমেণ্ট এমনি ক'রে চল্লে আমাদের জাতীয় জীবনের স্ফূরণ অসম্ভব এবং আমাদের জাতির উপযোগী রাষ্ট্রতন্ত্র নির্ম্মাণ করাও অসম্ভব; নতুবা বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতি বিনষ্ট করায় আমাদের যে একটা আনন্দ আছে, তা' নয়।

আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, ভারতসচিব কিংবা এখানকার শাসকগণের কাছে আমার কিছু বলবার নেই যে, আপনারা স্বরাজ্য দলের এই মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে সহায় হউন। শুধু সমালোচনা ক'রে এই সম্প্রদায়কে বিব্রত ক'রে তুলবেন না, এদের কায করবার অবসর দিন। আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, বিশ বছর ধ'রে আমি আমার দেশের মুক্তির কথা চিন্তা ক'রে আজ জীবনের অপরাহ্নে কাযে নেমেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আপনারাও এ বিশ্বাস রাখবেন যে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার জীবনান্তের পূর্ব্বে আমি আমার উদ্দেশ্য-সাধন করতে সমর্থ হ'ব।

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার অনূদিত।

অসহযোগ

অসহযোগের তাৎপর্য্য কি? আমি যদি অসহযোগ নীতির তাৎপর্য্য ঠিক বুঝে থাকি ত আমি বলব, যা' কিছু তোমার স্বভাবের সত্য সহায় নয়, যা' কিছু তোমার জাতীয় প্রকৃতি ও সংস্কারের প্রতিকূল, তোমার জাতীয় জীবনের অন্তরতম প্রাণ-শক্তির সাধনার যে স্বরাজের প্রতিকূল, তা' বর্জ্জন কর। আমি যদি অসহযোগের অর্থ বুঝে থাকি, তা' এই যে, যা' কিছু অসত্য, যা' কিছু মিথ্যা তোমার বর্ত্তমান জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, সে সমুদায়ই তোমাকে ত্যাগ করতে হ'বে। এই মিথ্যার মায়া পরিহার কর, দেখবে, তোমার জীবন সফল হয়েছে, নব জীবনের আনন্দে দেশের সমস্ত দৈন্য দূর হয়েছে, ভারত আবার গৌরবময় হয়ে উঠেছে। অসহযোগের তাৎপর্য্য যদি এ না হ'ত, তা' হ'লে আমি কখনই অসহযোগ অবলম্বনের পক্ষপাতী হ'তাম না। আমি অসহযোগের পক্ষপাতী, কারণ, আমার একান্ত বিশ্বাস যে, ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে যে মহাপ্রাণ নিহিত আছে, অসহযোগ তা'র বিকাশের সহায়। অসহযোগ আমার আত্মজ্ঞানের অনুকূল, আমার আত্মোপলব্ধির সহায়। অসহযোগ আমার অন্তরস্থ আত্মা, আমাদের জাতির অন্তরস্থ আত্মার সন্ধান দেয় এবং সেই আত্মাকে লাভ করাইবার পথে আমাদের সমস্ত জাতীয় জীবন জুড়ে যে সকল মিথ্যা আমাদের অবলম্বনস্বরূপ হয়ে আছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে যা' আমাদের পদে পদে বাধাই জন্মাচ্ছে, সেই সকল মিথ্যার স্তূপকে চূর্ণ ক'রে অপসারিত ক'রে আমাদের পথ মুক্ত ক'রে দেয়। এই জন্যই আমি অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করেছি।

অসহযোগের মর্ম্ম যদি এই হয়, তা' হ'লে এক দিকে যেমন আমাদের আত্মনির্ভরশীল হ'তে হ'বে, অপর দিকে তেমনই আত্মশক্তির স্ফুরণের জন্যে আমাদের সাধনপথের সমুদায় বাধা দূর করতে হ'বে, আমাদের নিজের ও আমাদের জাতির আত্মার যোগ যা'তে প্রতিহত কচ্ছে, এমন সমস্ত বিঘ্নই দূর করতে হ'বে।

এই যে সব কাউন্সিল দেখছেন—এ সব কি? শুধু মিথ্যার লীলাভূমি। আমরা কি এগুলি আঁকড়ে ধ'রে থাকব?—দূর ক'রে দেব না? আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ নেই, তা' কিছুতেই বলতে পারিনে। সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সে সম্বন্ধ মিথ্যার সঙ্গে। এই মিথ্যা আমাদের ভিতরে, আমাদের বাইরে, আমাদের আশেপাশে, আমাদের চতুর্দ্দিকে আচ্ছাদিত করেছে; এই মিথ্যার চাপে আমাদের জীবন পিষ্ট হচ্ছে। ইহার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। কাযেই এই মিথ্যা, এই কাউন্সিল ধ্বংস না ক'রে আমাদের উপায় কি? কাউন্সিল ধ্বংস করতে চাই—তা'র একমাত্র তাৎপর্য্য, এই মিথ্যার সঙ্গে আপোস করা চলে না, সহযোগিতা করা চলে না, এ আমাদের জীবনপথে একটা প্রকাণ্ড বাধা; এই বাধা আমি সরাতে চাই; বিনষ্ট করতে চাই। কাউন্সিলে প্রবেশ ক'রে সেখানে ব'সে যদি আমি অসহযোগ অবলম্বন করি, তা' হ'লে কি-কিছু অন্যায় করব?—অসহযোগ নীতির অবমাননা করব? না, তা' আমি স্বীকার করিনে। এই কাউন্সিলগুলি কি? শুধুই কি এক একটা বাড়ী? এগুলি এক একটা প্রতিষ্ঠান, এক একটা সংঘ, এক একটা যন্ত্র; এই যন্ত্রগুলি এদের সমগ্র শক্তি দিয়ে আমাদের গ্রাস ক'রে ফেলেছে, আমাদের জীবনের রস-রক্ত শোষণ করছে, আমাদের সমস্ত জীবন পেষণ করছে। কাযেই এই যন্ত্রের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি চাই-ই। তার একমাত্র উপায়,—এই যন্ত্রের, এই কাউন্সিলের সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট যে আমাদের শাসন করছেন,

তা' আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যর্থ ক'রে দেওয়া, আপনারা মনে করতে পারেন, এটা আমার ভুল। কাউন্সিলে ঢুকলে এ উদ্দেশ্যসাধন করা চল্‌বে না; কিন্তু আমি আপনাদের ব'লে রাখছি যে, কাউন্সিলের ভিতরে ব'সে আমি অসহযোগের গৌরব এক বিন্দুও হানি করব না। যারা গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহভিখারী, উচ্চপদ লাভের আশায় যা'রা কাউন্সিলে ঢুকতে চায়, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। গভর্ণমেণ্টের উচ্ছিষ্ট আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আমি কাউন্সিলে ঢুকতে চাই—এই শাসনসংস্কাররূপধারী অসুর, যে আমাদের জীবনের রক্ত শোষণ করছে, তা'কে ধ্বংস করবার জন্যে। যদি মনে করি, সে শক্তি আমার নেই, তা' হ'লে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি কাউন্সিল পরিহার করব।

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার অনূদিত।

স্বদেশপ্রেম কি অপরাধ?

[২৯শে অক্টোবর ১৯২৪]

গভর্ণমেণ্টের দমননীতি ও তাহার ফলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জীর্ণ ৩ নং রেগুলেসন অনুসারে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে মিউনিসিপাল আফিসে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে দেশবন্ধু ২৯শে অক্টোবর ১৯২৪ তেজোগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে বলিয়াছিলেন:—

* * * দেশের মধ্যে যদি কোথাও বোমা ফাটে কিংবা কেহ পিস্তল ছোড়ে, আমরা অমনই চীৎকার করিয়া উঠি—'কি নৃশংস অত্যাচার!' কিন্তু আমরা 'কি নৃশংস অত্যাচার' বলিয়া চীৎকার করি কেন? কারণ, বাস্তবিকই আমরা সেরূপ কাম অতি গর্হিত, অতি নৃশংস বলিয়াই বিবেচনা করি। কিন্তু আজ দেশে এমন দিন আসিয়াছে যে, আমাদের যে সকল দেশবাসী পশুবলে আস্থাসম্পন্ন, শুধু তাহাদের নৃশংসতার নিন্দা করিলে চলিবে না; পরন্তু গভর্ণমেণ্টের নৃশংসতারও প্রতিবাদ করিতে হইবে। সুভাষচন্দ্রকে আবদ্ধ করিয়া আমার মনে হয়, গভর্ণমেণ্ট এই নৃশংসতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে আইন পাশ করিয়াছেন এবং যাহার বলে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, উহা' আইন নামের অযোগ্য—উহা বে-আইনী আইন। যদি জিজ্ঞাসা করেন, বে-আইনী আইন কাহাকে বলে? তাহা হইলে গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতসংরক্ষণ বিধির (Defence of India Act) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিব—যে, সত্য ও ন্যায়ের উপর সমাজের স্থিতি, তাহার সেবা ও সংরক্ষণ যে আইনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য নয়, সে আইনকে বে-আইনী আইন ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

আইনের আবরণে ইহাকে আবৃত করিলেও এরূপ আইনে প্রকৃত আইনের মর্য্যাদা থাকিতে পারে না। কারণ, উহা ন্যায়ের সমস্ত নীতি, সত্যের সমস্ত নীতিকে অবমাননা করে এবং ন্যায় ও সত্যচ্যুত হইয়া আইনের তাৎপর্য্য অস্বীকার করে। আমরা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছি, কারণ, ইহা মানুষের স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত। যদি কোন লোককে আবদ্ধ করা হয় এবং সে কি অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ হইল বা তাহার অপরাধের কোন প্রমাণ আছে কি না, তাহাকে বলা না হয় এবং তাহার অপরাধের আইন অনুসারে বিচার না করিয়া তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট কাল বন্দিভাবে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারে পদাঘাত করা হয়। যে আইনের দোহাই

দিয়া মানুষের উপর এরূপ গর্হিত ব্যবহার করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই বে-আইনী আইন। অত্যাচারী ষ্টুয়ার্ট রাজগণের আমলে ইংলণ্ডে এইরূপ আইন প্রবর্ত্তিত ছিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট এরূপ আইনের সাহায্য ব্যতীত আজ এ দেশ শাসন করিতে পারেন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা।

গত ১৯২৪ খৃঃঅব্দে ২৪শে এপ্রিল এই মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনরগণ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহাদের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমান আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন ভিন্ন এরূপ নিয়োগ পাকা হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট এক মাসের ঊর্দ্ধকাল বিবেচনা করিয়া সুভাষচন্দ্রের নিয়োগে সম্মতি দান করিলেন। তাহার পর চারি মাস অতীত হইতে না হইতেই এক দিন প্রভাতে মিউনিসিপ্যালিটীর কায করিয়া সুভাষচন্দ্র বাড়ী আসিয়া দেখিলেন যে, বহু পুলিস তাঁহার গৃহে উপস্থিত। কোন অপরাধের কথা তাঁহার নিকট উল্লেখ করা হইল না, কোন অভিযোগ তাঁহাকে শুনান হইল না, তাঁহার কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল না, তৎক্ষণেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। সুভাষচন্দ্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহাকে আপনারা কি বলিতে চান? ইহা কি ন্যায়সঙ্গত? ইহা কি আইনসঙ্গত? ইহা কি নিছক পশুবল নহে?

যদি কোন বিদ্রোহী যুবক প্রাণের অদম্য আবেগে পিস্তল বা বোমা ছোড়ে, তাহা হইলে আমি মনে করি না যে, তাহার অপরাধ গভর্ণমেণ্ট যেরূপ নৃশংসভাবে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা গুরুতর। অত্যাচারেই অত্যাচারের জন্ম। ১৯০৭ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই প্রকার বহু অত্যাচারের ফলে—বিধিবদ্ধ অত্যাচারের ফলে—বিদ্রোহীদের অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

আমার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গভর্ণমেণ্ট নিজকৃত অপরাধের সাফাই করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আমার কথায় সেরূপ সাফাইয়ের কোন ভিত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, দেশে বিদ্রোহীর অভাব নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই কথা আমি প্রথম বলি। আমি যাহা বলিয়াছিলাম, নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ আইন পাশ করার যে উদ্দেশ্য কথিত হইয়া থাকে, তাহা যথার্থ নহে। প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? গভর্ণমেণ্ট বলেন যে, দেশে প্রকাণ্ড একটি বিদ্রোহীর দল আছে। আমি সে কথা অস্বীকার করি না। বাঙ্গালা দেশে যে বিদ্রোহীর দল আছে, তাহা অকাট্য সত্য। কিন্তু তাহাতে কি? কেহ কি মনে করিতে পারে—কেহ কি আশা করিতে পারে যে, এরূপ আইনের দ্বারা তাহাদের দমন করা যাইবে? ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দ্বারা কি কখনও বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছে? আইনের পীড়নে বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছে, এমন একটি উদাহরণ আপনার ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করুন। বিদ্রোহ অন্যায়, আমি স্বীকার করি। এ দেশে বিদ্রোহী দলের যে কর্ম্ম-চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে, তাহা অন্যায়, আমি স্বীকার করি এবং বিদ্রোহ উন্মূলিত করিতে হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি? বিদ্রোহ যাহাতে নিশ্চিত উন্মূলিত হয়, এমন পন্থা অবলম্বন করাই কি গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে? গভর্ণমেণ্টের কি এই বিদ্রোহী দল ইংরাজ রাজশক্তিকে উচ্ছেদ করিয়া অন্য বিদেশী রাজশক্তিকে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে? আমার নিশ্চিত মনে হয়, তাহা তাহারা চাহে না। তবে তাহারা কি চাহে? গভর্ণমেণ্ট কি কখনও এই বিদ্রোহভাবের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন? ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আমরা ক্রমাগত এই বিদ্রোহিতার কথা শুনিয়া

আসিতেছি এবং দেখিতেছি, গভর্ণমেণ্ট ইহার দমনের জন্য নিত্য নূতন আইন পাশ করিতেছেন। কিন্তু এই বিদ্রোহিতার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট কি কোন চেষ্টা করিয়াছেন? অনেক গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে আমি জানাইয়াছি এবং আজ আপনাদেরও জানাইতেছি যে, অনেকের অপেক্ষা এই বিদ্রোহিগণকে আমি বেশী জানি। ইহাদের বহু মোকর্দ্দমা আমি করিয়াছি। ইহাদের মনোভাব আমি বিলক্ষণ বুঝি। আমি জানি, তীব্র স্বাধীনতার তৃষ্ণাই ইহাদের বিদ্রোহিতার একমাত্র কারণ। বিগত দেড় শত বৎসরের শাসনকালের মধ্যে ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভের জন্য বা তাহাদের স্বাধীতার যোগ্য করিয়া তোলার জন্য গভর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন? আমরা স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য নহি, এই কথাই কি অহরহঃ আমাদের শুনান হয় না? আমরা অশিক্ষিত, নিরক্ষর,এই নিন্দাই কি সর্ব্বদা ঘোষিত হয় না? তাহার উত্তরে আমি কি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না—"তোমরা এ দেশে দেড়শত বৎসর আসিয়াছ, তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ। তোমরা বলিয়া থাক, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করিয়া তোলাই তোমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু এত দিনে সে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তোমরা কি করিয়াছ?"

এখন আপনারা বুঝিতে পারিবেন, বিদ্রোহী দলের মনস্তত্ত্ব কি? আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ দেখিতেছে, পৃথিবীর ছোট বড় সমস্ত জাতিই স্বাধীন। তাহারা অন্য জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করিয়া মনে মনে ভাবে,"আমরা কেন এরূপ পরাধীন থাকিব? আমরা এ দাসত্ব ঘুচাইব।" এ আকাঙ্ক্ষা কি দোষের? যুবকগণের এইরূপ মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করা কি এতই কঠিন? দাসত্ব-মোচনের এই তৃষ্ণার স্পন্দন কি আমরাও আপন হৃদয়ে অনুভব করি না? পরিপূর্ণ যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্যে যখন এই সকল যুবকগণ দেখে, তাহারা জাতীয় জীবন গঠনে ও দেশের গভর্ণমেণ্টের পরিচালনের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত, তখন তাহারা ক্ষোভে জ্বলিতে থাকে। উহাদিগকে সে অধিকার দান কর, দেখিবে, বিদ্রোহিতা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, বিদ্রোহী দলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার স্বীকারোক্তি পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত করিয়াও গভর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইতে চান না। আমিও এ কথা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছি এবং আজও স্বীকার করিতেছি। যাহা সত্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করি, তাহা স্বীকার করিতে আমি কোন দিনই পশ্চাৎপদ হইব না। কিন্তু আমি বিদ্রোহ-দমনের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কি কখনও চিন্তা করিয়াছেন? সে কথা কখনও আমলে আনিয়াছেন? সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের সাক্ষ্য তাঁহাদের এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে, তবুও কি দমন-নীতি ছাড়া আর অন্য কোন উপায় তাঁহারা দেখিতে পান না? শুধুই দমন দমন! আর কোন পন্থার কথা কি তাঁহাদের মনে উদয় হয় না? আমি আবার তাঁহাদের বলিতেছি যে, দমন-চেষ্টা যতই কেন হউক না, তাহাতে বিদ্রোহিতা কদাপি প্রশমিত হইবে না। একটা সমগ্র জাতিকে কেহ কখনও পৃথিবীর বক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। মুক্তি আশায় উদ্বেলিত সমগ্র জাতির প্রাণের বেগ কেহ কখনও জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে পারে না।

আমি রাজদ্রোহী নহি, রাজদ্রোহীর পন্থা আমার পন্থা নহে। তথাপি আমার হৃদয়ের মধ্যে রাজদ্রোহীর তীব্র মুক্তিকামনা স্পন্দিত হইতেছে। মুক্তির জন্য আমি জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, আজ আপনাদের সমক্ষে আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা

করিতেছি যে, যদি স্বাধীনতার জন্য জীবন দান প্রয়োজন হয়, আমি সে জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত।

যদি বিদ্রোহিতায় আমার আস্থা থাকিত, যদি এ বিশ্বাস আজ আমার জন্মে যে, বিদ্রোহিতা সাফল্য লাভ করিবে, তাহা হইলে কালই আমি বিদ্রোহিদলে যোগ দিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিদ্রোহচেষ্টা কখনও সফল হইবে না এবং এই কারণেই তাহাতে আমি যোগ দিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার কথা মনে হইলে, স্বাধীনতালাভের জন্য তাহাদের অদম্য উৎসাহের কথা মনে হইলে আমার বোধ হয়, বুঝি আমিও তাহাদের এক জন। এই স্বাধীনতার জন্য যদি অশেষ কষ্ট ও ঘোরতর প্রতিকূলতা আমাকে মাথা পাতিয়া লইতে হয়, অথবা আমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু ব্যয় করিতে হয়, তাহার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

সিমলায় থাকিতে আমি শুনিয়াছিলাম যে, আমি যে মুহূর্ত্তে হাওড়ায় পদার্পণ করিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। গ্রেপ্তারের ভয় আমি রাখি না। আমি কোন অন্যায় কর্ম্ম করি নাই। প্রত্যেক সৎ ভারতবাসীরই যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিয়াছি।

ভারতের প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ সন্তান অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, তিনি তাঁহার স্বদেশকে ভক্তি করেন ও তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীনতার অনুরাগ আছে। তিনি অবশ্যই বলিবেন—"আমার ঘরের ব্যবস্থা আমি নিজেই করিতে চাই—এ আমার স্বাভাবিক, জন্মগত অধিকার, এ অধিকার আমি চাই।"

স্বদেশ-প্রীতি যদি অপরাধ হয়, মুক্তির অনুরাগ যদি অপরাধ হয়, আমি স্বীকার করিতেছি, আমি অপরাধী; এবং সে অপরাধের জন্য যদি আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হয়, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই, তথাপি বর্ত্তমান ভারতবাসীর যাহা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি, তাহার সাধনে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের সীমা আমি একটু অতিক্রম করিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাহিতেছিলাম যে, সুভাষচন্দ্রকে যদি বিদ্রোহী বলিয়াই ধরা যায়, তবে তিনি আমার চেয়ে বড় বিদ্রোহী নন। অথচ আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি, আমি জানিতে ইচ্ছা করি। জন্মভূমিকে ভাল বাসিলে যদি অপরাধ করা হয়, তবে আমি অপরাধী। যদি সুভাষচন্দ্র বসু অপরাধী হন, আমিও অপরাধী। শুধু আপনাদের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ অপরাধী নন, আপনাদের মেয়রও তুল্যাংশে অপরাধী।

বিদ্রোহী দলের অত্যাচার নিবারণ করা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। দেশের ন্যায়সঙ্গত সঙ্ঘসমূহই এই সকল অনুশাসনের (ordinance) লক্ষ্য। আইনসঙ্গত উপায়ে দেশের উন্নতির জন্য যে সকল সঙ্ঘ বা দল গঠন করা হয়, তাহা নিবারণ করাই এই সকল অর্ডিন্যান্স বা অনুশাসনের উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত উইলসন সাহেব পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অভিমত উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের শুনাইয়াছেন। পণ্ডিতজীর বক্তৃতা হইতে আরও কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমি আপনাদের শুনাইবার প্রার্থনা করি। তাহাতে পণ্ডিতজী শুধু যে রোগ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা নয়, ব্যাধি-নিরাকরণের উপায়ও দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—

"দাশ মহাশয় বলিয়াছেন, রাজকর্ম্মচারিগণ যাহা জানেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর বিপ্লবভাব দেশে বর্ত্তমান। কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এ কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। তবে সে কথা আমি সম্পূর্ণ

মানিয়া লইতেছি। শুধু তাই নয়, আমি আরও বলি, যদি আপনারা সতর্ক না হন, কোন্ দিন হঠাৎ দেখিবেন যে, সমস্ত দেশ মৌমাছির চাকের মত গুপ্ত সমিতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং তাহা দমন করার শক্তি আপনাদের নাই।

* * * * *

আমি আপনাদের আরও বলিব, সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন জানে যে, দুই আর দুই চার হয়, আমি সেইরূপ জানি, আমার দেশের সব চেয়ে বড় ক্লেশ কি। আপনারাও না জানেন, এমন নয়। আপনাদের দমনকারী আইনের দ্বারা বিপ্লব বিনষ্ট হইবে, এই ধারণায় আপনারা বাহাদুরী করিতে পারেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় ভুল আর কিছু হইতে পারে না। একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই এই সকল বিপ্লবজ অপরাধ প্রশমনের প্রকৃষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন,—তাঁহার নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা। কিন্তু আপনারাই তাঁহাকে সে সাধু চেষ্টার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাহার ফলভোগ আপনাদের করিতেই হইবে। স্বভাবতই গুপ্ত মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র আবার চলিতে থাকিবে; তাহা ছাড়া আপনারা অন্য কিছু প্রত্যাশা করিতে পারেন না। আপনাদের এই সকল আইন বিপ্লববাদীদের কর্ম্মচেষ্টাকে স্পর্শও করিবে না। কারণ, তাহারা যাহা করে, সে লোকচক্ষুর অন্তরালেই করে। * * * যদি আপনারা তাহাদের দলগুলিকে বে-আইনী ঘোষণাও করেন, তথাপি কয়টি দলকে আপনারা ধরিতে ও বিনষ্ট করিতে পারিবেন? * * * কাজেই আপনাদের এই আইন প্রযুক্ত হইবে শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশ ও আমার মত লোকের উপরেই—যাহারা বোধ করি, বিপ্লববাদীদের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।"

এই সকল অনুশাসনের (ordinance) দ্বারা শুধু এই প্রকার কাজই সম্পন্ন হইতে পারে। যে সকল লোক সঙ্গত উপায়ে মুক্তির জন্য আগুয়ান, যাহারা দেশের মঙ্গলকর্ম্মের জন্য দলবদ্ধ, এরূপ আইন তাহাদেরই পিষ্ট করিবে; এবং তাহার পরিণাম দেশে বিদ্রোহজনিত অত্যাচারের বৃদ্ধি। আপনারা কি কখনও আশা করিতে পারেন যে, ন্যায্য ও নিরুপদ্রব উপায়ে যে সকল লোক দেশের মুক্তির জন্য সচেষ্ট বা যে যুবককে বিনা কারণে তাহাদের শান্ত স্নেহের আগার পিতামাতার আশ্রয়চ্যুত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল, তাহারা গভর্ণমেণ্টের প্রতি সহৃদয় ভাব পোষণ করিবে? বরং পক্ষান্তরে ইহাই কি আপনারা মনে করিবেন না যে, এরূপ একটি অত্যাচারের ফলে বিদ্রোহীদের অত্যাচার শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা? বাঙ্গালা দেশে বিপ্লববাদীদের একাধিক গুপ্ত দল আছে, আমি বলিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি গভর্ণমেণ্টকে আরও বলিতেছি—এবং যদি জগদীশ্বর আমাকে আর কয়েক বৎসর রক্ষা করেন, আমি যেখানেই থাকি, নিঃসন্দেহ প্রমাণের দ্বারা দেখাইয়া দিব যে, এই সকল দমনকারী আইনের দ্বারা, এই সকল বে-আইনী আইনের দ্বারা বিদ্রোকারীদের দুষ্কৃত দমন করা অসম্ভব। তাহা পূর্ব্বে কখন হয় নাই, ভবিষ্যতেও কখনও হইবে না।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের (রেগুলেশন) অপ্রচলিত বিধি অনুসারে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার এই মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষেও বিশেষ শঙ্কার বিষয়। ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের শুভাশুভের দিক হইতে অথবা গভর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের জাতীয় বিরোধের দিক হইতে না দেখিলেও এই গ্রেপ্তারে মিউনিসিপ্যালিটীর যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। গভর্ণমেণ্ট যদি আজ অনায়াসে আপনাদের প্রধান কর্ম্মচারীকে বন্ধন করিতে পারেন, তাহা হইলে বন্ধনের পর বন্ধনের দ্বারা গভর্ণমেণ্ট স্বরাজ্যদলভুক্ত সভ্যগণ-পরিচালিত এই মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ

একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। মনে করুন, গভর্ণমেণ্ট যদি ভাবেন—আর এ কথা মিথ্যা নয় যে, গভর্ণমেণ্ট তরপের কেহ কেহ ভাবেন যে, কংগ্রেসের দলভুক্ত লোকের হাতে এ মিউনিসিপ্যালিটীর পরিচালনভার রাখা ঠিক নয়, এবং সেই হিসাবে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে অন্যান্য কর্ম্মচারীদের গ্রেপ্তার করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটী অচল করিয়া তোলেন, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগতভাবে সুভাষচন্দ্রের দিক হইতে বা অন্যান্য দিক হইতে না দেখিলেও শুধু মিউনিসিপ্যালিটীর হিতাহিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও, আমার বোধ হয়, গভর্ণমেণ্টের এই গর্হিত আচরণের বিরুদ্ধে আপনাদের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা আবশ্যক এবং আপনাদের যে কর্ম্মচারীকে এইরূপ আপনাদের মধ্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে, তাঁহার প্রতি আপনাদের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসের পরিচয় প্রদর্শন করা আবশ্যক।

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার অনূদিত।

মায়ের ডাক

আমাদের জাতীয় জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যে, আমাদের শাসনকর্ত্তাদের রক্তচক্ষুর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমাদের আপন হৃদয়ের বল মাপতে হ'বে—আমাদের অন্তরের মধ্যে বুঝতে হ'বে, জননীর এই দুর্দ্দিনে আমরা তাঁর পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত কি না। আমি সে জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত; তাই আমি আপনাদের আহ্বানে আজ এখানে এসেছি। আমার উপর আপনারা যে বিশ্বাস দেখিয়েছেন, সে জন্য আপনাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদাই। কিন্তু প্রথমেই আমি আপনাদের সতর্ক ক'রে দিতে চাই যে, আমার এমন বিষয়বুদ্ধি বা বিজ্ঞতা নেই যে, তা দিয়ে আপনাদের সাহায্য করি। আমি যে নগর থেকে আসছি, সেখানকার লোক সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের প্রজ্বলিত ক্রোধানলে জর্জ্জরিত হয়েছে। তাঁদের উন্মেষিত রাষ্ট্রজীবন বিনষ্ট করবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ ব্যবস্থার দ্বারা গভর্ণমেণ্ট সত্য এই ফল আশা করছেন যে, কলিকাতাবাসীরা ভয়ে রাজকুমারকে সংবর্দ্ধনা করতে বাধ্য হ'বে। কিন্তু আগামী ২০শে ডিসেম্বর যদি রাজকুমার কলিকাতায় কোন সংবর্দ্ধনা পান, তা' হ'লে আপনারা জানবেন, সে সংবর্দ্ধনা কলিকাতার নগরবাসীদের প্রদত্ত নয়—সে তাঁদের কারারুদ্ধ আত্মার আর্ত্তস্বর। কলিকাতায় যে জীবন-যজ্ঞ প্রজ্বলিত হয়েছে, তা'র স্পর্শে আমি পূত, সংস্কৃত হয়ে এসেছি; এবং যদিও আমি বিষয়বুদ্ধিশূন্য দীন, তথাপি আমি একটা অর্ঘ্য নিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি—সেটা হচ্চে, আমাদের এই জীবন-যজ্ঞ সুসম্পন্ন করবার জন্যে আমার অটল প্রতিজ্ঞা ও অসীম প্রাণভরা উৎসাহ।

আমার মনে হয়, আমাদের প্রথমেই স্থির করা আবশ্যক, আমরা এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন কেন করচি। এ কথার উত্তরে সকলেই বলবেন—আমাদের উদ্দেশ্য বিদেশীর অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করা। কিন্তু মুক্তি কথাটার তাৎপর্য্য কি, তা' গোড়াতেই আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। এই মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্থে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা বা একান্ত সংযমের অভাব নয়, এটা স্বতঃসিদ্ধ। যখন কোন লোককে চুরী করতে বা অন্যের জায়গায় জোর ক'রে ঢুকতে নিষেধ করা যায়, তখন তা'র স্বাধীনতা ও এই নিষেধের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না; কারণ, সে নিষেধ বা বাধার পিছনে মানুষমাত্রেরই অনুজ্ঞা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা অর্থে অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখিয়া একান্তভাবে স্বকীয় শক্তির অনুশীলনও বুঝায় না। কারণ, যদি

আমরা সমাজ রক্ষা করতে চাই এবং আশা করি, সমাজ আমাদের রক্ষা করবে, তা' হ'লে আমরা সম্পূর্ণ অনন্যসাপেক্ষ, সম্পূর্ণ অনধীন হ'তে পারিনে। কিন্তু স্বাধীনতার এই যে খর্ব্বতা, এটা পরাধীনতা নয়, এটা মানবজীবনের সার্থকতার বিরোধী নয়; কারণ, এটা স্বেচ্ছাকৃত। এ কথা আমাদের মনে রাখতেই হ'বে যে, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়, স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজের কল্যাণের কোন বিরোধ নেই, কারণ, সেই কল্যাণের কাছে আমরা যখন মাথা নোয়াই,আমাদের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করি, সে কাহারও ভয়ে নয়, সে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায়।

তা' হ'লে স্বাধীনতা বলতে আমরা কি বুঝব? স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, স্বাধীনতা সেই অবস্থা, যে অবস্থায় কোন জাতি আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে আপন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে, সার্থক করতে পারে। জাতীয় জীবন পাছে কলুষিত হয়, জাতীয় বৈশিষ্ট্য পাছে নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে কত জাতি প্রাণপণ করেছে, মানবজাতির ইতিহাস তা'র লোম হর্ষণ বিবরণে পরিপূর্ণ। যদি শুধু আধুনিক উদাহরণ দেওয়া যায়, তা' হ'লে, ফিন্‌ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, আই রায়ল্যাণ্ড, মিশর ও ভারতের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা প্রত্যেকেই বিদেশী সভ্যতার আক্রমণ রোধ ক'রে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণ কচ্ছে। * * * *

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান যা' এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা'র আঘাতে আমাদের জাতীয় জীবনের মূল উৎপাটিত না হয়, আমরা আপন ভাবে জাতীয় জীবন গ'ড়ে তুলতে পারি, ভারতের সত্য পরিণাম অনুসন্ধান ক'রতে পারি—এই জন্যেই আমরা স্বাধীনতা চাই। আমার মনে হচ্ছে, আমার কানে একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। সে আওয়াজ যেন আমাকে বাধা দিয়ে বলছে—'পাশ্চাত্য জ্ঞান আমাদের দোরে দাঁড়িয়ে আতিথ্য প্রার্থনা কচ্ছে; আমরা কি নির্ম্মমভাবে তাকে দূর ক'রে দেব? আমরা কি ভুলে যা'ব যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলিত জ্ঞান-ভাণ্ডার পৃথিবীর মুক্তিবিধান করবে?' এ আওয়াজ ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের। আমি স্বীকার করি যে, ভারতীয় জ্ঞানের আভিজাত্যকে যদি সজীব রাখতে হয়, তা' হ'লে, অন্য জাতির সংস্পর্শ থেকে একে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা চ'লবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আপত্তির বিরুদ্ধে আমার দু'টি কথা বলবার আছে। প্রথম অতিথিসৎকারের কথা ভাববার আগে আমাদের ভাবতে হ'বে, আমাদের নিজস্ব একটা বাড়ী চাই, যেখানে আমরা অতিথিকে স্থান দিতে পারি। দ্বিতীয়, আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার, আমাদের সভ্যতা, যা' আমরা প্রায় হারিয়ে ফেলেছি, আগে তার পুনরুদ্ধার ক'রতে হ'বে, আমাদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে; তবে আমাদের পাশ্চাত্য জ্ঞান গ্রহণ করবার শক্তি আসবে। আমার বিশ্বাস, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্বাধীনভাবে সে জ্ঞান গ্রহণ করতে না পারব, ততক্ষণ সে জ্ঞান আমাদের মধ্যে দাসসুলভ অনুকরণবৃত্তিকেই প্রবল ক'রে তুলবে—যা' যথেষ্ট পরিমাণে ঘটেছে, আমাদের শক্তি বাড়াবে না, আমাদের জীবনের অন্ধকার দূর করবে না। ভারতের সভ্যতা, ভারতের জ্ঞানশক্তি আজ মুমূর্ষু—আমাদের পরাভূত রাষ্ট্রশক্তিই এই শোচনীয় পরিণামের কারণ। এ দুর্গতি আমাদের দূর করতেই হ'বে। ভারতের মৃতকল্প দেহে আবার জীবনের সঞ্চার করতে হ'বে। তার আগে জ্ঞানের মিলন, সভ্যতার মিলনের কথা উঠতেই পারে না।

আমাদের দেশে এক দল রাজনৈতিক আছেন, যাঁরা আপনাদের উদারপন্থী বলেন। আমাদের এই বন্ধুগণের একটা আপত্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার।

এঁরা বলেন—স্বাধীনতার উদ্দেশ্য যখন দেশের উন্নতি, তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্য থেকে সে উন্নতি-সাধনে আপত্তি কি? ইহার উত্তরে আমি বলিব, যত দিন ইংরাজ সাম্রাজ্যে ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী পোষ্যের মত থাকবে, তত দিন সে কাজে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। ভারতের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ যে পল্লীগ্রাম, সেখানে যাও এবং সাধারণ পল্লীবাসীর জীবনযাত্রার খবর নাও, দেখবে, তারা কত শ্রমশীল, কত নির্ভীক। সেরূপ লোক সকল দেশের গৌরবস্থল। কিন্তু দেখবে, পরাধীনতায় যে হীনতা এনে দেয়, সেই হীনতা তাদের মুখমণ্ডলে আঁকা—দলাদলি, ঝগড়া আর মামলা এই তাদের জীবনের অবলম্বন। যে জন্যে প্রত্যেক গ্রাম কোন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ছিল না, সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ সুখী ছিল, সে সব প্রতিষ্ঠান, সে সব ব্যবস্থা এখন কোথায়? যে দিন পল্লীবাসীরা অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম পালন করবার যথেষ্ট অবসর পেত, সে দিন কোথায় গেল? আমার বিশ্বাস, কোন জাতি যখন স্বাধীনতা হারায়, তখন ক্রমে হীনতার ছাপ তার জীবনের প্রতি অণু-পরমাণুর উপর অঙ্কিত না হয়ে পারে না। পরাধীন জাতির প্রত্যেক কর্ম্মচেষ্টা এই হীনতায় কলুষিত হয়, —পরাধীনতার এই অনিবার্য্য পরিণাম। আমাদের হয়েছেও তাই। ইংরাজ শাসনাধীনে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে। স্বর্গীয় রমেশ-চন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমাণ করেছেন যে, এ দেশের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা—সূতা ও কাপড়ের ব্যবসা, ইংরেজ শাসনকালে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অধর্ম্ম উপায়ের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর তার ফলে দেশ নিরন্ন হয়ে উঠবে, এ কথা ভাবলে কার প্রাণ না অশান্ত হয়ে ওঠে? অন্য দিকে দাসত্বের হীনতায় আমাদের জাতীয় জীবন ভেঙে উঠছে, আমাদের জাতীয় সদ্‌গুণ, আমাদের জাতীয় গৌরব আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমরা মাতৃভাষা ছেড়ে আমাদের ইংরাজ প্রভুর বুলি ধরেছি, ইংরাজী হাবভাব নকল করেছি। পল্লীর সমাজ ভেঙে বিলাতী ধরণে নগর বসাবার জন্যে চীৎকার করছি; ছুতার, কামার, তাঁতির অন্ন মেরে বড় বড় কারখানা খুলছি, মক্তব ও টোল উঠিয়ে দিয়ে ইংরাজী স্কুল খুলছি, পঞ্চায়েত অমান্য ক'রে আদালতে ছুটছি; মসজিদ্ ও মন্দির ভেঙ্গে লাটবেলাটের কীর্ত্তি অক্ষয় করবার জন্যে নগরে নগরে সৌধ নির্ম্মাণ করছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে অন্ধ হয়ে আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে উন্মত্ত আগ্রহে বরণ ক'রে নিয়েছি এবং আমাদের চির-গৌরবময় অতীত সাধনার প্রতি বিমুখ হয়ে তার সঙ্গে যোগ ছিন্ন ক'রে আমাদের জাতীয় হীনতার ও লাঞ্ছনার একশেষ করেছি। আমার উদারপন্থী বন্ধুগণ বলবেন—'বেশ ত, দেশের লোকের এই হীনতা আগে দূর কর, আগে তারা মানুষ হোক, তার পরে স্বাধীনতার দাবী কোরো।' আমি বলবো সে বাজে কথা। কারণ, এ কথা যদি ঠিক হয় যে, বিদেশীর শাসনের ফলে আজ দেশের এই অধোগতি—এই সর্ব্বাঙ্গীন দুরবস্থা, তা' হ'লে এ কথা মানতেই হবে যে, পরাধীনতা না ঘুচলে দেশের উদ্ধারের অন্য উপায় নেই। চেষ্টা করলে হয় ত এ অবস্থাতেও কিছু কিছু উপসর্গের নিবৃত্তি করা যেতে পারে, ছোটখাট দু'পাঁচটা দুঃখ দূর করা যেতে পারে, এমন কি, দেশের লোকের নিস্পন্দ প্রাণের মধ্যে এমন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ জাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, তা বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অনুকূল হ'বে। কিন্তু এ কথা আপনারা নিশ্চয় জানবেন যে, শুধু উপসর্গের কথা ভাবলে আপনাদের

চলবে না, রোগ প্রতীকারের উপায় করতেই হ'বে।

এই জন্যেই ইংরাজের প্রভুত্ব এ দেশে সুদৃঢ় ও স্থায়ী হওয়ার আমার এত আপত্তি। আমার বিশ্বাস, এই প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকলে, ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের কিংবা তাহার ব্যক্তিগত জীবনের আকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারে না। এ দেশে ইংরাজ শাসনপদ্ধতির দোষগুণের বিচারের কথা বাদ দিয়েই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সে শাসন ভালই হোক আর মন্দই হোক—এবং এ কথা স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই যে, এ শাসন যে কেবলই মন্দ, তা নয়, আমার সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি হচ্ছে এই যে, পরাধীনতা এমন জিনিস যে, তার আওতায় কোন জাতি তার নিজের জীবন অক্ষত রাখতে পারে না, পুষ্টি লাভ করতে পারে না, তার সাধনার চরম সিদ্ধি অর্জ্জন করতে পারে না। যুগ-যুগান্তব্যাপী ভারতের যে সাধনা আছে, তার বৈশিষ্ট্য সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে ভারতবাসীকে জাতীয় জীবনের গৌরবময় মহা পরিণাম অনুসন্ধান করতেই হবে! তাতে ইংরাজের সাহায্য বা বাধার অপেক্ষা রাখলে চলবে না। এই জন্যেই স্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজন —সে স্বাধীনতা ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থেকেই হোক আর বাইরে গিয়েই হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই।

এখন ভেবে দেখা যাক, আমাদের এই আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় এই যে, আমলাতন্ত্র শাসনের উচ্ছেদের জন্যে আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ?

আমি তিনটিমাত্র পথের কথা জানি—প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ; দ্বিতীয়, নূতন শাসনবিধি অনুসারে যে সকল কাউন্সিল বা প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হয়েছে, সেখানে গিয়ে শাসনকর্ত্তাদের সহযোগিতা করা; তৃতীয় শান্তভাবে অসহযোগ করা। প্রথম উপায়ের কথা একেবারেই বাদ দিতে হবে, কারণ, তা সম্পূর্ণ অসাধ্য। আর অসাধ্য না হইলেও আমি সে পথ বাদ দিতে বলতাম, কারণ, রক্তপাত আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কাজেই সহযোগ ও অসহযোগ এই দুটি পন্থার মধ্যে একটি আমাদের অবলম্বন করতেই হবে।

সহযোগের কথা আলোচনা করতে গেলেই আমরা যখন দেখি, ভারতে রাষ্ট্রজীবন গঠনে যাঁরা প্রথম থেকেই মেতেছেন, এমন কতকগুলি নেতা সহযোগিতার পক্ষপাতী, তখন আমরা বেশ একটু মুস্কিলেই পড়ি, বড় কম বিব্রত হয়ে পড়ি নে।

এই জন্যে আমার ইচ্ছা, যাঁরা এই নূতন শাসনবিধির (Governmeant of India Act) সমর্থন করেন, তাঁদের প্রদত্ত যুক্তিগুলি প্রথমে বিবেচনা ক'রে দেখি এবং তা করতে হ'লে আমাদের তিনটা জিনিস বিবেচনা করতে হ'বে; প্রথম—এই যে শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হয়েছে, এতে ভারতবাসীর স্বাধীনতার অধিকার অর্থাৎ ভারতবাসী নিজের জাতীয় জীবন আপন শক্তি ও প্রতিভা অনুসারে গ'ড়ে তুলতে ও নিয়মিত করতে পারে, এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে কি না; দ্বিতীয় ভারতবাসীর ইচ্ছার অনুরূপ ভারতবাসীর ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন শাসনপদ্ধতির সূচনা এই আইনের দ্বারা করা হইয়াছে কি না। যে প্রতিনিধি সভার (Councilo) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহার হাতে রাজকোষের উপর কোন প্রকৃত অধিকার দেওয়া হইয়াছে কি না।

এই নবপ্রবর্ত্তিত ভারতশাসনবিধির (Covernment of India Act) মুখবন্ধে সমস্ত আইনটির তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এই মুখবন্ধের গোড়াতেই লেখা আছে--যে হেতু পার্লামেন্টের বিজ্ঞাপিত নীতি ও অভিপ্রায় এই হইতেছে যে,—ভারতবাসীকে

তাহাদের স্বদেশ শাসনের ন্যায্য অধিকার প্রদান করা? না। যে সকল স্বাধীন রাজ্যের সম্মিলনে ইংরাজসাম্রাজ্য গঠিত, ভারতবর্ষকে তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে এই সাম্রাজ্যের সম্মানিত অংশীদারের অধিকার দেওয়া? না। তবে কি?—'প্রত্যেক শাসন বিভাগে ভারতবাসিগণকে ক্রমে ক্রমে প্রবেশাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং যাহাতে ভারতবর্ষে আস্তে আস্তে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা এবং যাহাতে ক্রমশঃ ভারতশাসনপদ্ধতি জনমতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজ সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা।' একটা জাতির ন্যায্য ও স্বাভাবিক অধিকার বোধ করি এর চেয়ে গৌণভাবে, এর চেয়ে অস্পষ্টভাবে স্বীকার করা যেতে পারে না। এর মধ্যে এমন প্রতিশ্রুতি কোথাও নেই, যার জোরে আমরা কোন কালে ইংরাজ পার্লামেণ্টকে বাধ্য করতে পারি। আমাদের এই ন্যায্য দাবী স্বীকার করত সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে সমানভাবে ভারতের মর্য্যাদা ও অধিকার স্বীকার করতে। মুখবন্ধ যত অগ্রসর হচ্ছে, আইনের তাৎপর্য্যও তত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটু অগ্রসর হয়েই দেখা যায়, লেখা আছে যে, ভারতবাসীকে কখন ও কতটুকু অধিকার দেওয়া হবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে পার্লামেণ্টের বিবেচনার উপর। শুধু তাই নয়, আর একটু অগ্রসর হয়ে দেখা যায় যে, এই আইন অনুসারে ভারতবাসীকে যে সুযোগ দেওয়া হ'বে, তারা যে পরিমাণে তার সদ্ব্যবহার করবে এবং যে পরিমাণে পার্লামেণ্টের চক্ষে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেবে, সেই পরিমাণে পার্লামেণ্ট তাদের আস্তে আস্তে অধিকারের গণ্ডী বিস্তৃত ক'রে দেবে অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের ইংরাজ ভাগ্যবিধাতাদের কাছে সুবুদ্ধি বালকের মত সপ্রমাণ করতে পারি যে, তাঁ'রা যা' বলবেন, আমরা ঠিক সেইমত চলছি এবং তাঁ'রা যা'কে দায়িত্ব' বোধ মনে করেন, আমাদের মধ্যে সেই দায়িত্ববোধ জন্মেছে, তা' হ'লে তাঁরা যখন যতটুকু অনুকম্পা দেখান উপযুক্ত বোধ করবেন, তাই দেখাবেন এবং আমাদের তাতেই সন্তুষ্ট হ'তে হ'বে। অর্থাৎ ত্রিশ কোটি ভারতবাসী চিরদিন শিশু থাকবে এবং ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা চিরদিন তা'দের অভিভাবকতা করবেন, এই হ'ল এই সংস্কৃত শাসনবিধির তাৎপর্য্য। এত বড় অপমান আমি সহ্য করতে কিছুতেই প্রস্তুত নই। আমাদের হিতাহিত আমরা বুঝি নে, কখনও বুঝব না, আমাদের বিদেশী শাসনকর্ত্তারা আমাদের হিতাহিত আমাদের চেয়ে বেশী বোঝেন এবং আমাদের কল্যাণভার চিরদিন বহন করতে পারেন, এ কথা আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। আমার বিশ্বাস, ভারতবাসীর উপর ইংরাজ অধিকার ও আধিপত্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখাই এই আইনের মূল উদ্দেশ্য।

আমাদের যে সকল উদারমতাবলম্বী বন্ধুগণ এই শাসনবিধির পক্ষপাতী, তাঁদের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তবু আমি এ শাসনবিধি মাথা পেতে নিতে পারিনে, কারণ, এ আইনের ভিত্তি ভারতের কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমার বিবেচনায় এ আইন স্বীকার ক'রে গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করলে আমাদের জাতীয় সম্মান কখনই বজায় থাকতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবনে যত ত্রুটিই থাক, আমি জোর ক'রে বলব, কংগ্রেস থেকে এ কথা আমাদের মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা কর্ত্তব্য যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির স্বাভাবিক অধিকার এবং ইংরাজ পার্লামেণ্ট যে সিদ্ধান্তই করুন, আমাদের জাতীয় সংস্কার, প্রকৃতি ও সাধ্যানুসারে আমাদের জাতীয় জীবন গ'ড়ে তোলা ও মুক্তির বিধান করার অধিকার ভারতবাসী ছাড়া আর কাহারও নাই। ভারতের এই মুক্তিসাধনার যিনি বিরোধী বা বিঘ্নকারী,

তঁাহাকে কখনই ভারতবাসীর বন্ধু বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইংরাজের সহিত আমি একমাত্র সর্ত্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত—সে হচ্ছে এই যে, ইংরাজ ভারতের এই স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করেন। এই নবশাসনবিধির মধ্যে কোথাও সে স্বীকারোক্তি নেই, যা আছে, তার একমাত্র সঙ্গত অর্থ ইংরাজের কর্ত্তৃত্ব ও আধিপত্য ভারতে কায়েমী করা। যা'তে আমার দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্তে পাথর চাপা থাকে, এমন ব্যবস্থার আমি কোন সাহায্য করতে পারিনে।

আমাদের উদারমতাবলম্বী বন্ধুগণ বলেন যে, যদিও ভারতশাসনবিধির মধ্যে আমাদের স্বাধীনতার অধিকার তেমন স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়নি, তবুও আমরা যদি এই আইন অনুসারে কাজ করি, তবে ভবিষ্যতে আমাদের এই ন্যায্য অধিকার পার্লামেণ্ট কখনই রোধ করতে পারবে না। আমাদের বন্ধুগণের বিজ্ঞতা, দেশহিতৈষিতায় আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে; কিন্তু তবুও আমি বলব, তাঁরা যা' বলছেন, সে কথা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর। ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আপোষ করতে আমার কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আপোষ কোন্ বিষয়ে করা চলে? জীবনের যেটা মূল ভিত্তি, সে বিষয়ে আপোষের কথা উঠতেই পারে না। অন্য বিষয়ে শুধু আপোষ কেন, আমি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজী আছি। স্বাধীনতার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার, প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার, সে অধিকারে কিস্তিবন্দী চলে না। আমি চাই, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের সে অধিকার প্রাণ খুলে স্বীকার করুন। নতুবা আমাদের এই বিরোধে শান্তি নেই। আমাদের পরিণাম সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নেই—আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি ধ'রে নিই, আমাদের পরাজয় হ'বে, তা' হ'লেও, আমাদের এই সান্ত্বনা থাকবে যে, আমরা আমাদের জাতীয় সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পেরেছি। আমাদের মন্ত্রিগণ এ কথাটা মনে রাখেন না। সেই জন্তেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহাদের এত বিরোধ। মন্ত্রিগণের চোখ শুধু পার্লামেণ্টের উপর আর তাঁদের চাকরীর উপর নিবদ্ধ। কংগ্রেসের কথা এঁরা বোঝেন না, কারণ, কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্পূর্ণ অন্য দিকে—কংগ্রেস চায় দেশের কল্যাণ এবং যা' সে কল্যাণের সত্য ভিত্তির বিরোধী, তা' কংগ্রেস সর্ব্বান্তঃকরণে বর্জ্জন করতে প্রস্তুত।

এখন দেখা যাক, এই নূতন শাসনসংস্কারে ভারতবাসিগণকে যেরূপ অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা'তে অন্ততঃ ভারতের স্বাধীনতার প্রথম সূচনাও করা হয়েছে কি না এবং কাউন্সিলে ভারতবাসীর প্রতিনিধিগণের হাতে রাজকোষের উপর কোন প্রকৃত অধিকার দেওয়া হয়েছে কি না। আমাদের উদারপন্থী নেতারা মনে করেন, দেশশাসনে কতকটা প্রকৃত অধিকার আমরা পেয়েছি; কারণ, যে সাত জন মন্ত্রী ও সদস্যের হাতে বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে পাঁচ জন ভারতবাসী। বাইরে থেকে এ কথা শুনলে মনে হয় বটে, দেশশাসনের দায়িত্ব ও অধিকার কতক পরিমাণে দেশের প্রতিনিধিগণের হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' কিছুই করা হয় নি। শাসনের ব্যবস্থাটা হয়েছে এই—গভর্ণমেণ্টের সমস্ত শাসনবিভাগগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—(১) খাস, (২) হস্তান্তরিত। খাসবিভাগের কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে চা'র জন গভর্ণরের মনোনীত সদস্যের হাতে; হস্তান্তরিত বিভাগের কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে কাউন্সিল বা প্রতিনিধিসভার নির্ব্বাচিত তিন জন মন্ত্রীর হাতে। এই দু'টি বিভাগই গভর্ণরের অধীন। খাস বিভাগের পরিচালন গভর্ণর সদস্যগণের সাহায্যে করিবেন এবং হস্তান্তরিত বিভাগের

পরিচালন গভর্ণর মন্ত্রিগণের সাহায্যে করিবেন। শাসনব্যাপারে গভর্ণর আইন অনুসারে সকল বিষয়ে মন্ত্রী ও সদস্যগণের সঙ্গে মিলিতভাবে পরামর্শ ক'রে কাজের ব্যবস্থা করতে বাধ্য ন'ন। নূতন টেক্স ধার্য্য করা, কর্জ্জ করা এবং খাস ও হস্তান্তরিত বিভাগের খরচের ব্যবস্থা করা—এই তিনটি বিষয়ে সদস্যদের সঙ্গে মন্ত্রীদের একত্র ক'রে পরামর্শ করার বিধি আছে বটে, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও মন্ত্রিগণের পরামর্শমত কাজ হ'বে এমন আশা ক'রবার উপায় নেই। কারণ, সদস্যগণের সঙ্গে মন্ত্রিগণের মতভেদ হ'লে, মন্ত্রীদের মত অগ্রাহ্য। এমন কি, যদি সদস্যগণের মধ্যে যে দু'জন ভারতবাসী, তাঁরাও মন্ত্রিগণের সঙ্গে যোগ দেন, তা' হলেও গভর্ণর বাকী দু'জন ইংরাজ সদস্যের মত সমর্থন ক'রে সেই মতে কাজ করতে পারেন। কাজেই সংখ্যা'য় বেশী হ'লেও শাসনব্যাপারে আমাদের মন্ত্রী ও সদস্যগণ সম্পূর্ণ শক্তিহীন। মন্ত্রিগণেরও রাজকোষের উপর কোন জোরই নেই; সদস্যগণ খাস বিভাগের ষোল আনা বরাদ্দ ক'রে নিয়ে যে সামান্য টাকা বাচবে, তাই মন্ত্রীদের হাতে দেবেন, মন্ত্রীরা সেই টাকায় যা' পারেন করুন। শাসনব্যাপারেও মন্ত্রীদের পুতুলের মত পঙ্গু করা হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন দমন করবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট যদি কোন নূতন আইন তৈরী করতে চা'ন কিংবা মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করতে চা'ন ত' মন্ত্রীদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই। মন্ত্রীরা নিরীহ শিশুর মত এ সব ব্যাপার ব'সে ব'সে দেখবেন, কোন কথা কইতে পারবেন না। এ সত্ত্বেও যদি আমাদের উদারনৈতিক নেতারা বলেন যে, সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন আমাদের লোক, সুতরাং গভর্ণমেণ্ট পরিচালনে আমরা ক্ষমতা পেয়েছি, তা' হলে আমি নাচার। এত বড় ভুল, এত কঠিন মোহ আর কি হ'তে পারে!

তা'র পরে, হস্তান্তরিত বিভাগের কথা ও সেখানে মন্ত্রীদের শোচনীয় অবস্থার একটু পরিচয় দিই। প্রথমতঃ কোন বিভাগ আদৌ হস্তান্তরিত হয়েছে, এটা সত্য নয়। ব্যাপারটা বেশ একটু রহস্যজনক। দেশের কোন প্রকৃত কল্যাণকর বিষয়ের জন্যে যখনই ভারতবাসীরা পীড়াপীড়ি করেছে, তখনই দেখা গিয়েছে, তা'র ফলে গভর্ণমেণ্ট আমাদের বড় বড় বাড়ী, বড় বড় আপিস ইত্যাদি তৈরী ক'রে দিয়ে বিরাট খরচের ব্যবস্থা করেছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। কোন বিষয়ে প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব যদি মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া হ'ত, কোন বিভাগে সত্য শাসনভার যদি ভারতবাসীর অনুকূলে হস্তান্তরিত হ'ত, তা' হ'লে আমরা কি দে'খতাম? আমরা দেখতাম, মন্ত্রীর এ ক্ষমতা আছে যে, তিনি বলতে পারেন, 'আমার অধীনস্থ বিভাগের ব্যবস্থা আমি আমূল পরিবর্ত্তন করতে চাই, যা'তে কম খরচে দেশীয় কর্ম্মচারী দ্বারা কাজ ভাল রকম চলে, আমি তার ব্যবস্থা করব।' এ কথা বলবার শক্তি থাকলে তবে বুঝতাম, কোন্ বিভাগের প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব মন্ত্রী পেয়েছেন। ভারত-শাসনবিধি এমন নিপুণ কৌশলে তৈরী যে, বাহ্যতঃ মন্ত্রীর হাতে কর্ত্তৃত্ব থাকলেও তাঁর কিছুই ক্ষমতা নেই। কোন প্রদেশের স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী এক সময় প্রতিনিধি সভার সমক্ষে বড় ক্ষোভে স্বীয় দুর্দ্দশার কথা অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, কোন বিশেষ জরুরী কাজের জন্যে যদি তিনি তাঁর অধীনস্থ বিভাগ থেকে ডাক্তার চেয়ে পাঠান, তখনই উত্তর আসে—আমাদের হাতে ডাক্তার নেই এবং যদি কখন তিনি কোন পীড়িত জায়গায় ডাক্তার পাঠান, অমনি চিকিৎসাবিভাগ তাঁর মুখের উপর ব'লে ব'সে—আপনার এ ডাক্তাররা আনাড়ী, আমরা এদের খরচ বহন করতে প্রস্তুত নই। ডাক্তারী বিভাগ ও স্বাস্থ্যবিভাগ একই মন্ত্রীর

অধীনে। কাজেই আপনারা বোধ করি আশ্চর্য্য হয়ে মনে কচ্ছেন যে, মন্ত্রীর অধীনস্থ বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের উপর তাঁর এত কম অধিকার কি কখন সম্ভব? কিন্তু বাস্তবিকই তাই। আমি আর এক জন মন্ত্রীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত ক'রে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করব। আয় ব্যয়ের আলোচনা উপলক্ষে এই মন্ত্রীটি প্রতিনিধি-সভায় বড় দুঃখে বলেছিলেন—'আপনারা মনে করেন, বিলাতে পার্লামেন্টের যে সকল মন্ত্রী আছেন, তাঁদের হাতে যে ক্ষমতা আছে, আপনাদের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত এই বেচারী দু'টিরও বুঝি সেই ক্ষমতা আছে এবং তাই ভেবে আপনারা আমাদের কৃত সকল কাজের কৈফিয়ৎ চান। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনারা এ কথাটা ভুলে যা'ন যে, প্রকৃতপক্ষে শাসনভার যাঁ'দের হাতে, আমরা সম্পূর্ণভাবে তাঁ'দের হাততোলার উপর—তাঁরা দয়া ক'রে যা' আমাদের হাতে তুলে দেন, আমরা তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করি মাত্র।'

এই ত মন্ত্রীদের অবস্থা। কাউন্সিল বা প্রতিনিধি-সভার অবস্থাও মন্ত্রীদের চেয়ে বিশেষ ভাল নয়। আইনে অবশ্য লেখা আছে, প্রতিনিধি-সভা অধিকাংশের মতানুসারে খাস বা হস্তান্তরিত যে কোন বিভাগেই হোক, খরচের ফর্দ্দ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নামঞ্জুর করিতে পারে। কিন্তু এ ক্ষমতারও মূল্য খুবই কম। কারণ, প্রথমতঃ কোন্ বিভাগে কত খরচ করা হ'বে, তা'র বরাদ্দ করায় কাউন্সিল বা প্রতিনিধি-সভার কোন হাত নেই; দ্বিতীয়তঃ খাস বিভাগের কোন খরচ যদি কাউন্সিল না-মঞ্জুর করে, তবে গভর্ণর আপন এক্তারে সে খরচ করিতে পারেন। সে খরচ যত বড় অপব্যয়ই হোক, প্রতিনিধিসভা তা' ঠেকাতে পারে না। কেবলমাত্র হস্তান্তরিত বিভাগে যে টাকা মন্ত্রিগণ পাবেন, প্রতিনিধিসভা তার উপর কিছু কমতা চালাতে পারে।

রাজকোষের উপর মন্ত্রীদের ও প্রতিনিধি-সভার এই অধিকার। অথচ আমাদের উদারনীতির উপাসক বন্ধুগণ বলছেন, ভারতবাসিগণ রাজকোষের উপর যথেষ্ট অধিকার পেয়েছেন।

এই নূতন ভারতশাসনপদ্ধতিতে এমন কিছু নেই, যা'তে ভারতবাসীরা মনে করতে পারে যে, এর দ্বারা তা'দের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার সূচনা করা হয়েছে। এই শাসনপদ্ধতি হবার আগে ভারতবাসী যে তিমিরে ছিল, এখনও সেই তিমিরে। এ শাসনপদ্ধতিতে আমরা এমন এতটুকু ক্ষমতা বা অধিকার পাই নি, যা'র জোরে আমরা বলতে পারি যে, ভবিষ্যতে দেশের কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্যে আমরা যে আইন বা যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করতে চাইব, তা' হ'বে, বা যে সকল আইন বা ব্যবস্থা প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হয়েছে, যে সকল আইন বা ব্যবস্থা প্রজার অমঙ্গল কচ্ছে বা তা'দের পীড়াদায়ক হয়েছে, তা' আমরা উঠিয়ে দিতে পারব। সে দিন পঞ্জাবে যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল, ভবিষ্যতে সেরূপ অত্যাচার নিবারিত হ'তে পারে, এমন কোন বিধি এ আইনে নাই—এমন কোন ক্ষমতা আমরা পাই নি। তবুও আমাদের প্রবীণ নেতারা এ আইনের প্রদত্ত অধিকারের মরীচিকায় ভুলে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রতে চান! আমি গভর্ণমেন্টের সঙ্গে অযথা বিরোধ করতে চাইনে। কিন্তু আত্মসম্মান হারিয়ে, দেশের মর্য্যাদার হানি ক'রে আমি শান্তি চাহিনে; এবং সেই জন্যেই আমি বলছি, যত দিন ভারতশাসনবিধির অভিপ্রায় ও তাৎপর্য্য পরিবর্ত্তিত না হচ্ছে, যত দিন আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, আমাদের জাতীয় জীবন আমাদের ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে গ'ড়ে তোলবার অবাধ অধিকার গভর্ণমেন্ট অকপটে স্বীকার না করছেন, তত দিন গভর্ণমেন্টের সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

কাজেই আমাদের স্বাধীনতার সমরে একটিমাত্র অস্ত্র আছে, যা ব্যবহার ক'রে আমাদের মুক্তির পথ

উন্মোচিত করতে পারি। উপর্য্যুপরি দু'বছর কংগ্রেসেও এই নীতিই অবলম্বিত হয়েছে। সুতরাং, অসহযোগ সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

তবে একটা আপত্তি কেউ কেউ করেন, সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। এঁরা বলেন, অসহযোগের মূল কথাটা হচ্ছে 'নেতি নেতি।' 'নেতি নেতি' ক'রে যদি সবই ছাড়া যায়, তা হ'লে ক্রমে আমরা এমন কোণঠাসা হয়ে পড়বো যে, আমাদের জাতীয় জীবন রক্ষা করাই কঠিন হবে। এঁরা মনে করেন, অসহযোগ আশার বাণী নয়, নিরাশার অবসাদ।

এটা মস্ত ভুল। অসহযোগ মোটেই নিরাশার বাণী নয়। অথবা আমাদের ক্লৈব্যবশতঃ আমরা যে পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও সমস্ত জিনিস থেকে স'রে থাকতে চাই, তাও নয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়, তা' কখনই নিরর্থক নয়—আমার বিশ্বাস, সে বিশ্ববিধাতার লীলা। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে যেমন তাঁর অচিন্ত্য লীলা প্রকাশ পায়, তেমনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই তাঁর ঐক্য সংসাধিত হয়। বাগানে যেমন নানা জাতীয় ফুল বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন বর্ণে ও গন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে সেই একই বিশ্বশিল্পীর অনন্ত মহিমার পরিচয় দেয়, সেই রকম মানুষও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ধ'রে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার দ্বারা বিভিন্ন ও বিচিত্র জাতীয় সংস্কারের ভিতর দিয়ে বিশ্বমানবের বিরাট ঐক্য ও কল্যাণ অনুসন্ধান করে। আপন আপন সাধনার অনুরূপ এই যে বিশিষ্ট পথ ধ'রে চলা, এই হ'ল প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য—তার জাতীয়তা, তার স্বাভাবিক অধিকার। এর সঙ্গে অন্য কোন জাতির বিরোধ নেই। অন্যের হিংসা জাতীয়তার লক্ষ্য নয়। নিজের বিশিষ্ট সাধনার দ্বারা অন্যের সঙ্গে ঐক্য নির্ণয় করা, যোগ স্থাপন করা, এবং পরিণামে সকলের সমবেত সাধনার দ্বারা মানব-জাতির চরম কল্যাণসাধন করা—এই হ'ল জাতীয়তার উদ্দেশ্য। ইংরাজের সঙ্গে আমরা যে সহযোগিতা করতে অস্বীকার কচ্ছি, তার এমন অর্থ নয় যে, আমরা ইংরাজের হিংসা করি বা ইংরাজকে ঘৃণা করি। আমরা অসহযোগ অবলম্বন কচ্ছি, তার উদ্দেশ্য যা' আমাদের বিশিষ্ট জাতীয় সাধনার বিরোধী, তা' বর্জ্জন না ক'রলে, আমাদের জাতীয় জীবন কখনও রক্ষা পাবে না, আমাদের দ্বারা মানবজাতির কোন কল্যাণ সাধিত হ'বে না। এই যে আমাদের ছেলে-দের শিক্ষা-দীক্ষার ভার আমরা আমাদের নিজের হাতে নিতে চাচ্ছি এর উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য বিদ্যা, পাশ্চাত্য জ্ঞান বর্জ্জন করা নয়। আমাদের দেশে যুগযুগান্তর ধ'রে যে জ্ঞান পুঞ্জীকৃত হয়ে আছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যার দিক থেকে আমাদের নজর ফিরিয়ে এনে আমাদের মনোভাব বিকৃত ক'রে তোলা হয়েছে এবং যা'র দিকে মুখ ফিরিয়ে আমরা আমাদের হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের ছেলেদের শ্রদ্ধা আমাদের সেই লুপ্তপ্রায় অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের উপর ফিরিয়ে আনাই আমাদের এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মর্ম্ম। আমাদের অতীত শিক্ষা ও সাধনার ভিত্তির উপর পাকা হয়ে দাঁড়াতে পারলে, তবে আমরা বিদেশের প্রদত্ত বিদ্যার সম্যক্ আদর করতে পারব, তবে সে বিদ্যা সত্য জ্ঞানের আলোক দান করবে! সেই জন্যে আমি বলি, জ্ঞানের যে মণিময় দীপ তোমার নিজের গৃহকোণে প'ড়ে রয়েছে, আগে সেই দীপ জ্বালিয়ে ঘরের অন্ধকার দূর কর, দেখ, তোমাদের অবস্থা কি, তার পরে বাইরে যে ঝাড়-লণ্ঠন পাও, নিয়ে এসে ঘর সাজিও।

এই হ'ল অসহযোগের প্রকৃত মর্ম্ম। সাধুচরিত্র, মহামনা ষ্টোক্‌স্ (Stokes) সাহেব অসহযোগের বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁর কথা উদ্ধৃত করার লোভ আমি সংবরণ করতে পাচ্ছি নে। তিনি বলেছেন,—'যে অন্যায় নিবারণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত, তার সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখার নামই অসহযোগ; যে অন্যায়ের প্রতীকার আছে বা যা স্পষ্টতঃ ধর্ম্ম বা বিবেকবিরুদ্ধ, তা মানতে অস্বীকার করার নামই অসহযোগ এবং সেই জন্যেই যারা স্বার্থ বা কূট-নীতির অনুরোধে অন্যায় আচরণ করে বা তার প্রতীকারের প্রতিকূলতা করে, অধর্ম্মের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়, তাদের সঙ্গে সংস্রব রাখতে অস্বীকার করার নামও অসহযোগ।'

আমাদের কোন কোন বন্ধু বলেন, অসহযোগ নৈরাশ্যের বাণী, অসহযোগ ভীরু দুর্ব্বলের সংকীর্ণতা-প্রসূত অস্বীকার, এবং এই যুক্তির দোহাই দিয়ে তাঁরা অসহযোগ-তত্ত্বের নিন্দা করেন। কিন্তু সেটা মস্ত ভুল। আমরা আজ দুর্ব্বল ব'লে এ কথাটা যুক্তিচ্ছলে অবতারণা করার কতকটা সুযোগ এসেছে বটে, নতুবা পৃথিবীর কোন্ বড় সাধনা কবে অসহযোগ নীতিকে উপেক্ষা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছে? যা অন্যায়, যা অসত্য, যা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, চিরদিনই পৃথিবীর মহাপুরুষগণ বর্জ্জন ক'রে সাধনার পথ নিষ্কণ্টক করতে শিখিয়েছেন। মানব-সমাজের সমস্ত গৌরবময় সিদ্ধির এই একমাত্র সনাতন পথ। আমরা যে বর্জ্জন করতে চাচ্ছি সে শুধু প্রকৃতভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। আমরা যে ভাঙ্গিতে চাচ্ছি, সে কেবল নূতন ক'রে ভাল ক'রে গ'ড়ে তুলবার জন্যে। এ বর্জ্জনে দুর্ব্বলতা নেই, সংকীর্ণতা নেই, নিরাশার কোন চিহ্নমাত্র নেই। যে সহস্র সহস্র যুবকগণ ও শত শত নেতাগণ দৈনিক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন, তাঁদের নির্ভীক, সহাস্য, বীরোচিত মুখ-মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা সহজ হবে। উদার বীরহৃদয়, জ্ঞানী, কর্ম্মবীর মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি কি নিরর্থক আপনাদের সুখের জীবন কণ্টকময় ক'রে তুলেছেন? পঞ্জাব-কেশরী, মহাতেজা লজপৎ রায় কি বাতুলের মত আমলাতন্ত্রের অনুশাসন ফুৎকারে অগ্রাহ্য ক'রে কারাগার বরণ করেছেন? মহামনা পণ্ডিত মতিলাল রাজোচিত ঐশ্বর্য্য ও সম্মানে পদাঘাত ক'রে যে অশেষ দুঃখ মাথা পেতে নিয়েছেন, তার কারণ কি এই নয় যে, শাসনতন্ত্রের অন্যায়ের কাছে মাথা নত ক'রে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়ার চেয়ে ব্যক্তিগত দুঃখ ও বন্ধনের দ্বারা দেশের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করা শ্রেয়ঃ? মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে যে সকল সাধক দুঃখকে গৌরবান্বিত করেছেন, তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করার সময় এখন নেই। তবে তাঁরা সবাই এবং যে অযুত দেশপ্রাণ ছাত্রগণ বিস্ময়কর সাহস, বীর্য্য ও ত্যাগের দ্বারা মাতৃভূমির সেবায় রত হয়েছেন, আমার একান্ত বিশ্বাস, তাঁদের নিষ্ঠাই জননীর চরণের শৃঙ্খল মোচন করবে।

আমাদের অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যে শাসনতন্ত্র যে কতটা বিচলিত হয়েছে, তা' তার নব-প্রবর্ত্তিত প্রচণ্ড দলননীতির দ্বারাই সপ্রমাণ হচ্ছে। বড়লাট রেডিং বাহাদুর শাসনতন্ত্রের এই গর্হিত দমননীতিকে অবৈধ বিবেচনা করেন না,—তিনি একে দলননীতি বলতেই অনিচ্ছুক। কিন্তু Seditions Meetings Act ও Criminal low Amendment Act যে দেশের সাধারণ দণ্ডবিধির অন্তর্গত, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারিনে; এবং এ যে শুধু আমার একার মত, তাও নয়। সম্প্রতি আইন-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গভর্ণমেণ্ট এক মন্ত্রণাসমিতির (Committee) গঠন করেছিলেন, সেই সমিতির অনুসন্ধান ও বিবেচনার জন্যে দলননীতিমূলক যে সকল বিধি প্রস্তাবিত হয়েছিল, এই আইন দুটিও তার

মধ্যে ছিল। তা ছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সংঘবদ্ধ হয়ে কোন মত প্রচার করা, দেশে রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তার করা বা শাসনকর্তাদের মতের বা কাজের প্রতিবাদ করা—এ হ'ল প্রজামাত্রেরই স্বাভাবিক আইন-সঙ্গত অধিকার। প্রজার এই অধিকারের উপরেই রাজা বা যে কোন প্রকারের শাসনতন্ত্রের প্রজাশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। প্রজাকে এ অধিকারে বঞ্চিত করলে শাসনতন্ত্রের আর কোন নৈতিক ভিত্তি থাকে না—তখন তা স্বেচ্ছাচারী প্রবলের অত্যাচারমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বড়লাট বাহাদুর বলেন, আমাদের সভা-সমিতি, আমাদের স্বেচ্ছা-সেবকদল, এ সব দেশের আইন ও শান্তিরক্ষার বিঘ্নকারী, তারা লোকের উপর জুলুম ক'রে শাসন-কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে। এ সম্পূর্ণ অসত্য। যদি তা না হ'ত, দেশে যে দণ্ডবিধি প্রচলিত আছে, গভর্ণমেণ্ট অনায়াসে সেই আইনের সাহায্যে সেই দুষ্কৃতের শাসন করতে পারতেন—এ সব অবৈধ আইন আবিষ্কারের প্রয়োজন হ'ত না। সভাসমিতিতে যদি কেহ বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেয় বা স্বেচ্ছাসেবকগণ কোন ব্যক্তির উপর জুলুম ক'রে কি ভয় দেখিয়ে শাসনকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়, সাধারণ আইনে ত পুলিসের যথেষ্ট শক্তি আছে, পুলিস সেই আইনের বলে তা'দের গ্রেপ্তার ক'রে কেন বিচার প্রার্থনা করে না? আদালতে অপরাধ প্রমাণ ক'রে কেন শাস্তির বিধান করে না? না, তা পারে না, কারণ, অপরাধের অভিযোগ কাল্পনিক, অসত্য। এই সকল সভা, এই সকল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের জাতীয় মহাসমিতি দ্বারা পরিচালিত অথচ জাতীয় মহাসমিতিকে বে-আইনী সংঘ বলা চলে না, কাজেই এদের বে-আইনী ব'লে ঘোষণা ক'রে প্রকারান্তরে জাতীয় মহাসমিতিকে পঙ্গু ক'রে তোলা, এই হ'ল এই সব গর্হিত বে-আইনী আইনের তাৎপর্য্য। একে দলননীতি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? লর্ড রেডিংকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—জাপান যদি আজ ইংরাজাধিকৃত অষ্ট্রেলিয়া দখল ক'রে বসে এবং অষ্ট্রেলিয়াবাসী ইংরাজকে ঠিক আমাদের অনুরূপ শাসনপদ্ধতি দ্বারা শাসন করতে থাকে, সেখানে ইংরাজদের সমস্ত সভাসমিতি বে-আইনী ঘোষণা করে এবং অষ্ট্রেলিয়ার ইংরাজরা যদি লুপ্ত স্বাধীনতা লাভের জন্যে কৃতসংকল্প হয়, তা হ'লে লর্ড রেডিং অষ্ট্রেলিয়ার ইংরাজদের কি উপদেশ দেবেন?—জাপানের ঘোষিত ব্যক্তিগত ও সংঘগত স্বাধীনতা-হরণকারী আইন অমান্য করতে উপদেশ দেবেন না কি? লর্ড রেডিং এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ বুঝতে পাচ্ছেন না; নতুবা তিনি আমাদের স্বদেশপ্রেমকে এরূপ অবজ্ঞা করতে পারতেন না।

যা হোক, আমাদের জাতীয় মহাসমিতি অসহযোগনীতি অবলম্বন করেছেন। আমাদের দেশের মুক্তির জন্য আমাদের হাতে এ ছাড়া অন্য উপযুক্ত অস্ত্র নেই। এ অস্ত্র ব্যবহার করা কোনক্রমেই অন্যায় বা বে-আইনী নয়। এই অস্ত্রের সাহায্যে আমরা বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন ক'রে দেশের লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার করব, স্বদেশজাত মোটা কাপড়ে লজ্জা নিবারণ ক'রে পরের দানে অঙ্গ সজ্জিত করার কলঙ্ক মোচন করব। এই অস্ত্রের সাহায্যে রাজকুমারের অভিনন্দন উপলক্ষে পদানত ভারতবাসীর শোচনীয় দৈন্যকে ঢেকে বীভৎস মিথ্যাচারের অভিনয়কে রোধ করব। এই অস্ত্রের সাহায্যে জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতের ঐকান্তিক মুক্তিকামনাকে গৌরবান্বিত ক'রে তুলব, সফল ক'রে তুলব। এই আমাদের সংকল্প, এই অসহযোগ মন্ত্রের দীক্ষা। বন্দে মাতরম্।

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার অনূদিত।

স্বরাজ কোন্ পথে ?

[১৯২২ খৃষ্টাব্দে গয়া জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ]

মহাত্মা গান্ধী

আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ আমার মনে যে বেদনা তীব্রভাবে আঘাত দিচ্ছে, তা' প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই, বোধ করি, প্রয়োজনও নেই ; কারণ, সে বেদনা আপনাদের সকলের মনকেই সমভাবে ব্যথিত করছে। দেশের অমঙ্গলের নিদান, অসত্যমূলক শাসন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভাবনীয় শক্তি ও সাহসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করতে করতে মহাত্মা বন্দী ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমরা আজ তাঁর উপদেশ ও নেতৃত্বে বঞ্চিত। কিন্তু তাঁর শক্তি, তাঁর প্রতিভা অশরীরিরূপে আমাদের কর্ত্তব্যপথে চালিত করবে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিচারের ভাণ ক'রে পৃথিবীর এক মহাপুরুষকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি রাজ্যের প্রজাগণকে কুবুদ্ধি দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা'র অন্তর্নিহিত নিতান্ত করুণ-রসটি প্রেমের অবতার যীশুর বিচার-ব্যাপারের সঙ্গেই তুলনীয়। প্রভেদ এই যে, যীশু অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেননি, গান্ধীজী অভিযোগ শুধু সম্পূর্ণ স্বীকার করেছিলেন, এমন নয়, তিনি বলেছিলেন, আইনের চোখে তিনি যে অপরাধ করেছেন, অভিযোগে তার চেয়ে তাঁকে লঘু অপরাধীই বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন, পরমেশ্বরের আইন মান্য করার জন্যেই তিনি শাসন-পদ্ধতির আইন অমান্য করেছেন। দু'হাজার বছর আগে ঈশ্বরের ৩।
পুত্র যীশুর বজ্রনির্ঘোষ নীরব উত্তরে তাঁর বিচারক যেরূপ স্তম্ভিত হয়েছিল, সে দিন মহাত্মার সত্য-সমুজ্জল বাণীও তাঁর বিচারককে সেইরূপ স্তম্ভিত করেছিল। মানবসমাজের কল্যাণের জন্যে গান্ধীর ন্যায় মহাপুরুষের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গর্ব্বান্ধ ব্যক্তিগণ আজ যদি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে, যদি বা উপহাসও করে, কৃতজ্ঞ মনুষ্য-সমাজের কাছে তিনি চিরদিন অন্তরের শ্রদ্ধা ও পূজা পাবেন।

আইন ও শৃংখলা

আজ ভারতে এক মহা সমস্যার দিন এসেছে ; এবং এর ফলে আমাদের শাসক-সম্প্রদায় ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকগণের সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের একটা পরিষ্কার বিচ্ছেদ ঘটেছে। দেশে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে জেগেছে, তা' দমনের জন্যে আমাদের শাসক সম্প্রদায় বিশেষভাবে গত বছর থেকে যে তাণ্ডবনীতি অবলম্বন করেছেন, আমাদের স্বদেশীয় উদার-নৈতিক নেতারা তা'র সমর্থন ক'রে এসেছেন। তা'র একটা বড় কারণ, তাঁ'রা শাসকসম্প্রদায়ের উচ্চারিত "আইন ও শান্তি'র ধুয়ো তুলেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, সর্ব্বত্র এই একই ধুয়ো তুলে, শাসকসম্প্রদায় মনুষ্য-সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবার অন্তিম চেষ্টা করেছে।

এ দেশে আমরা আজ সেই পুরাতন অভিনয়েরই পুনরাবৃত্তি দেখছি। আমাদের শাসনকর্ত্তারা ও তাঁ'দের পৃষ্ঠপোষকগণ বলছেন, সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট দেশের মঙ্গলের জন্য একান্ত দরকার এবং সেই জন্যেই প্রজাগণের সহস্র অসুখ, সহস্র অভিযোগ থাকলেও, গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব-

হানিকর কোন কাজ করার অধিকার প্রজার নেই—গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে অভিযোগের আন্দোলন করা ভিন্ন দুঃখ নিবারণের উপায়ান্তর অবলম্বন করার অধিকার প্রজার নেই। গভর্ণমেণ্টের উপর তুমি সন্তুষ্ট না হও, চুপ ক'রে থাক, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করো না—বড় জোর এই পর্য্যন্ত পার; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ বিরুদ্ধতা, কিংবা গভর্ণমেণ্টের কোন নীতি বা কোন কার্য্যপদ্ধতির রোধ করা—এ তোমার অধিকারের বাইরে। এই হ'ল শাসকতন্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে সমস্ত অত্যাচারী রাজা ও শাসকগণ এই সিদ্ধান্তকে আবহমানকাল থেকে অভ্রান্ত মনে ক'রে এসেছেন। কিন্তু যখনই প্রজারা স্বাধীনতা চেয়েছে, এ নীতিকে তা'রা পদদলিত করেছে এবং যখনই তা'রা অত্যাচারী শাসকের বজ্রমুষ্টি থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে, তখনই তা'রা এই নীতিমূলক সমস্ত বিধি ও অনুশাসন অমান্য করেছে।

ইংলণ্ড থেকেই এ দেশে এই আইন ও শৃঙ্খলার ধুয়ো এসেছে। কিন্তু ইংরাজ প্রজারা কি এ ধুয়োয় ভুলে তা'দের রাজা বা শাসনকর্ত্তাদের হাতে অবাধ, অসংযত ক্ষমতা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছে বা প্রজার সুখ-স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছে? ইংরাজ প্রজাপুঞ্জ স্বাধীনতার জন্যে শুধু 'আইন ও শান্তির' ধুয়ো অমান্য ক'রে অন্যায় আইন ভঙ্গ করেছে, তা নয়, তা'রা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, এমন কি, রাজার শিরশ্ছেদ পর্য্যন্ত করেছে। বহু বিদ্রোহের পরে যখন রাজশক্তি খর্ব্ব হ'ল, ইংলণ্ডের প্রজারা দেশের শাসনভার বহু পরিমাণে তা'দের প্রতিনিধি-সভার হাতে অর্পণ করলে, তখনও ইংলণ্ডের নরপতি দেশের শান্তির দোহাই পাড়তে ছাড়েননি এবং সেই অছিলায় প্রকারান্তরে অবাধ ক্ষমতার দাবী করেছেন। তখনও ইংলণ্ডের বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে প্রজার উপর অত্যাচার নিবারিত হয়নি, তখনও প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক আদমের মতে আইনের নামে নরহত্যা নিবারিত হয়নি। কিন্তু ইংরাজ প্রজারা যখন দেখলে, পার্লামেণ্টের হাতে দেশশাসনের ভার থাকলেও, আইন অনুসারে রাজার অবাধ ক্ষমতা রোধ করার উপায় নেই, তখন তা'রা কি করলে? তা'রা পার্লামেণ্টের ভিতরে ব'সে এবং বাইরে রাজ্যের সর্ব্বত্র অসহযোগ অবলম্বন করলে। তা'রা তা'দের রাজার টাকার দাবী না-মঞ্জুর করতে আরম্ভ করলে এবং আবশ্যকমতে টেক্স দেওয়া বন্ধ করলে। এই অসহযোগের জয় হ'ল, ইংরাজ প্রজা তা'দের রাজার হাত থেকে প্রজার স্বত্বাধিকারের সনন্দ আদায় করলে। কিছু দিন দেশে শান্তির ছায়াপাত হ'ল, কিন্তু ক্ষুব্ধ রাজশক্তি অবসরের প্রতীক্ষায় রইল এবং কিছু দিন পরে যখনই সুযোগ উপস্থিত হ'ল, 'দেশের মঙ্গল' 'দেশ-রক্ষা', 'দেশের বিপদ' ইত্যাদি অছিলায় প্রজার ধন-প্রাণের উপর অবাধ দাবী ক'রে বসল। শেষে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ প্রকৃতিপুঞ্জ যখন আইন ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে জয়লাভ করলে, তখন সভ্যজগৎ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে যে, রক্তপাত না ক'রে প্রজা কি ক'রে দুর্জ্জয় রাজশক্তিকে পরাভূত করতে পারে, প্রজার স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারে।

সংক্ষেপে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এই। সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত স্বাধীন ইংরাজ মুক্তকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা ক'রে এসেছে যে, দেশ আইন অনুসারে শাসন ক'রে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হ'লে গোড়ার কথাটা হচ্ছে, দেশের লোকের মতানুসারে আইন তৈরী হওয়া একান্ত আবশ্যক, প্রজার অমতে বা মতের বিরুদ্ধে আইন প্রস্তুত করা হ'লে, সে আইন

প্রজারা মান্‌তে বাধ্য নয়, সে আইন বে-আইনী—আইন নামের অযোগ্য এবং যদি সেরূপ আইন প্রজার ন্যায্য অধিকারের বিরোধী হয়, তা' হ'লে তাহার প্রত্যাহারের জন্যে আবশ্যক হ'লে বিদ্রোহ পর্য্যন্ত করা প্রজার অধিকারের অন্তর্গত।

এ দেশের উদারপন্থী নেতাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, গভর্ণমেণ্ট যে কোন আইন প্রবর্ত্তিত করুন, প্রজাদের তা মানা একান্ত কর্ত্তব্য। এ বিশ্বাসটা যে সর্ব্বৈব ভ্রমাত্মক, এই কথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই আমি ইংলণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটু বিস্তারিত আলোচনা করলাম। বর্ত্তমানে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শাসনকর্ত্তাদের অসংযত, অসীম ক্ষমতার দ্বারা নিতান্ত খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং আইন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহসভা-নিবারক আইন, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত দণ্ডবিধি আইন এ সকল আইনের কি প্রয়োজন? দেশের শান্তিরক্ষা? আইনের মর্য্যাদারক্ষা? এই অজুহতে এই সব বে-আইনী আইন প্রচলিত রয়েছে বটে, কিন্তু আইনকর্ত্তা ও তাঁদের সমর্থনকারীদের জানা উচিত যে, এ সকল আইনের পীড়ন ব্যর্থ করার অধিকার প্রজার হাতেই আছে—এ জাতীয় আইন অমান্য ক'রে, অগ্রাহ্য ক'রে।

বিগত কয়েক বৎসর ধ'রে এ দেশে আমরা ক্রমাগত এই আইন ও শান্তির ধুয়ো শুনে আসছি। আমাদের উদারনৈতিক বন্ধুগণও সেই ধুয়োয় সায় দিয়ে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের দলে দলে জেলে পাঠাবার রাস্তা খোলসা ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডের অত্যাচারী ষ্টুয়ার্ট রাজারা বা তাঁদের অধীনস্থ আদালতসমূহ যখন ইংরাজ প্রজাদের বিনা অপরাধে ছল খুঁজে জেলে পুরতেন, তখন তাঁরাও কি এই একই আইনের বা শৃঙ্খলার দোহাই পাড়তেন না? তফাৎ কোথায়? কেন ষ্টুয়ার্ট রাজাদের নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে কলঙ্কে লিপ্ত, আর কেনই বা ভারতের শাসনকর্ত্তারা সমর্থন-যোগ্য? ষ্টুয়ার্ট রাজারা রাজ্যের মঙ্গলের দোহাই দিয়ে যথেচ্ছ প্রজা শোষণ করতেন—সে অর্থে রাজ্যের কোনই মঙ্গল হ'ত না, এমন নয়; কিন্তু ইংরাজ প্রজাশক্তি রাজার সে ক্ষমতা রোধ করেছিল, কারণ, বুঝেছিল, দেশের কাজের জন্যে কর আদায় করা বা নূতন কর ধার্য্য করার যে ক্ষমতা তাদের প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত আছে, তা'র সঙ্গে রাজার এই স্বেচ্ছাচার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের বড় লাট বা প্রাদেশিক লাটগণের হাতে সার্টিফিকেটের জোরে যে কোন আইন পাশ করার খরচ মঞ্জুর করার বা টেক্স বসানর যে অবাধ ক্ষমতা আছে এবং যা তাঁরা রাজ্যের মঙ্গলের দোহাই দিয়ে করতে পারেন—এও কি সেই পুরাতন ষ্টুয়ার্ট রাজাদের ক্ষমতার মতই অবাধ ও বেপরোয়া নয়? ইংলণ্ডের ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে যে, যেখানে শাসন-কর্ত্তাদের হাতে এরূপ বিরাট, অপরিসীম ক্ষমতা থাকে, সেখানে দেশে আইন নেই মনে করতে হ'বে। ইংলণ্ডের প্রজারা আপন মনুষ্যত্বের জোরে কল্পিত আইনের ও শৃঙ্খলার দাবীকে পরাভূত করেছে। ভারতবাসীর মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তবে তাহারাও এই দাবীর অসারত্ব সগৌরবে প্রতিপন্ন করবে।

ইংরাজের ইতিহাসের নজির ছাড়া কোন কথাই অনেকের কাছে প্রামাণ্য নয়। তাই সে ইতিহাসের নজির আওড়াতে হ'ল। নতুবা আমি কোন ঐতিহাসিক নজিরের বলে 'আইন ও শান্তির' দাবী অস্বীকার করতে চাইনে; আমার যুক্তি হচ্ছে—প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতির এটা হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত অধিকার যে, সত্যের উপর দাঁড়িয়ে সে অসত্য বা অধর্ম্মমূলক আইন অমান্য করে। আসল কথাটা এই যে, আইন বা শৃঙ্খলা মানুষের মঙ্গলের জন্যে সৃষ্ট, মানুষ আইন ও শৃঙ্খলা মানবার জন্যে সৃষ্ট নয়। জাতীয় জীবনগঠন

মানুষের মহা ধর্ম্ম, বিরাট কর্ত্তব্য। যা এই কর্ত্তব্যের বিরোধী, তা প্রাণপণ শক্তিতে রোধ করা জাতির অন্যতম কর্ত্তব্য। যে আইন জাতীয় জীবনের বিকাশপথের বাধা, তা অমান্য না করা আমি মনুষ্যত্বের অবমাননা ও ঈশ্বরের ন্যায়-বিধানের বিরোধী মনে করি।

আমাদের শাসন-কর্ত্তারা যে এই অলীক আইন ও শান্তির দাবীর আড়ালে নিজেদের ক্ষমতার দাবীকে আচ্ছাদিত কচ্ছেন, এটা আমি মনে করি, দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ, মানুষ মিথ্যা দাবী তখনই করে, যখন তা'র সত্য দাবীর কিছু থাকে না। শাসনযন্ত্র যে ভেঙ্গে পড়বার মত হয়েছে, এই মিথ্যা দাবীই তা'র প্রমাণ। এখন আমাদের সত্যের আদর্শকে আমাদের সাম্‌নে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবা ক'রে যেতে পারলেই অচিরে স্বাধীনতা আমাদের করতলগত।

আদর্শ—জাতীয়তা

আমাদের আদর্শ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বপ্রথমেই আমার বলতে ইচ্ছে হয়—জাতীয়তা। জাতীয়তা বলতে আমি কোন বিশেষ গুণ বা তত্ত্ব বুঝি নে। জাতীয়তা একটা ভাবের ক্রম বা বিকাশের পদ্ধতি, যার ভিতর দিয়ে গিয়ে প্রত্যেক জাতি আত্মোপলব্ধি করে ও পরিণতি লাভ করে। এই যে জাতীয় আত্মোপলব্ধি, এ যেমন পর-নিরপেক্ষ নয়, তেমনই পরদ্বেষপূর্ণও নয়। পক্ষান্তরে, কোন জাতির প্রকৃত আত্মোপলব্ধি হ'লে, সে এমন একটা অদ্ভুত শক্তি লাভ করবে, যা অন্য জাতির পক্ষেও কল্যাণকর না হয়ে পারবে না। জগতে বৈচিত্র্য ও ঐক্য সমান সত্য, সমান সনাতন। যখন প্রত্যেক জাতি খণ্ডভাবে আপন বিশিষ্ট পথে তা'র অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে লাভ করবে, তখন তা'দের খণ্ড খণ্ড বিচিত্র পূর্ণতা মানবজাতির বিরাট সভাঙ্গনে এমন অপরূপ সখ্যে মিলিত হ'বে যে, সেই মহামিলনের পূর্ণতর ঐক্যে তা'দের ভেদ ও খণ্ডতা সার্থক হয়ে উঠবে। ইউরোপে জাতীয়তা কথা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এর সঙ্গে তা'র মিল নেই—সে জাতীয়তার কথা আমি বলছি নে। ইউরোপের জাতীয়তা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, পরস্পরবিদ্বেষী। ফরাসীর জাতীয়তা জার্ম্মাণের হানিকর, জার্ম্মাণের জাতীয়তা ফরাসীর পক্ষে অহিতকর। কিন্তু মজা এই যে, ফরাসী বা জার্ম্মাণ কেহই বোঝে না যে, যা আজ ফরাসীর পক্ষে অকল্যাণ-কর, তা কা'ল জার্ম্মাণের পক্ষেও অশুভপ্রদ হ'বে। ইউরোপ এ সত্য আজও বোঝেনি, মানবসমাজের কল্যাণ এই সত্য উপলব্ধি করার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করছে। আমরা যদি বুঝি, আমাদের জাতীয়তা সমগ্র মানবজাতির অনন্ত পরিণাম-সমুদ্রে একটা জলধারা, যা'র সঙ্গে মিলিত হওয়াই আমাদের জাতীয় জীবনের চরম সার্থকতা এবং আমরা যদি না ভুলি যে, আমাদের এই জীবনের ধারা যুগযুগান্তর ধ'রে কত ভাব, কত সাধনার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে এসেছে, তা হ'লে আমরা আমাদের বিগত ও ভবিষ্যৎ জীবনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব জাতীয়-তার সৃজন ক'রে তুলতে পারব—যা'র সত্যের আভায় সমস্ত মনুষ্যসমাজ গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে।

এই জন্যেই আমাদের একান্তমনে জাতীয়তার সাধনা ক'রতে হ'বে। এই জাতীয়তার সাধনাই স্বরাজসাধনা, কারণ, যে পরিমাণে আমরা আমা-দের জাতীয় জীবনকে সত্য ক'রে তুলতে পা'রব, সেই পরিমাণে আমরা স্বরাজের পথে অগ্রসর হ'ব। স্বরাজ কি, এ ধাঁধা অনেকের মনে আছে। স্বরাজের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কারণ, স্বরাজ

জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। জাতীয় জীবন কি আকারে আত্মপ্রকাশ করবে, কি পরিণতি লাভ করবে, কেহই জানে না। কাজেই স্বরাজ কি রূপ ধারণ করবে, নিশ্চয় ক'রে বলা অসম্ভব। তবে এ কথা ঠিক যে, স্বরাজ কোন বিশেষ আকারের শাসনপদ্ধতি বা গভর্ণমেণ্ট নয়। জাতীয় জীবনের প্রকৃত অভিব্যক্তির সঙ্গে স্বরাজ একসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা, বড় সাধনা হচ্ছে স্বরাজ।

নিরুপদ্রব অসহযোগ

আমি পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বলছি, একমাত্র নিরুপদ্রব অসহযোগের দ্বারাই আমরা স্বরাজসাধনা করতে পারি—অসহযোগের দ্বারাই আমাদের শাসনপদ্ধতিকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করতে পারি যে, কালে তার ভিত্তির উপরে স্বরাজমন্দির নির্ম্মিত হ'তে পারে। অসহযোগ তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। শুধু এই কথা বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, জাতীয় জীবন গঠনের দিক থেকে দেখলে, অসহযোগ জাতীয় শক্তি সমাহিত করবার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। নৈতিক দিক থেকে দেখলে এ কথা বোঝা কঠিন হ'বে না যে, জাতীয় জীবনের পক্ষে যা' কিছু অহিতকর, তা' থেকে জাতির চিত্তকে স্বেচ্ছায় সংহৃত ক'রে জাতীয় চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করতে অসহযোগ প্রকৃষ্ট উপায়।

এ দেশে এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁ'রা মনে করেন, অহিংসা দ্বারা দেশের অধীনতা দূর করা যায় না—অহিংসা আদর্শমাত্র, মানুষের জীবনে সে আদর্শ বাস্তব হয়ে উঠতে পারে না, বিনা রক্তপাতে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায় না। যাঁরা এই মতের পক্ষপাতী, তাঁদের স্বদেশপ্রেম ও সাহস প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের মত ভ্রান্ত, এ কথা আমি জোর করেই বলব। হিংসায় আমার আস্থা নেই—সে আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। তা' ছাড়া ইতিহাসের সাক্ষ্য মানতে হ'লে এ কথা স্বীকার করতেই হ'বে যে, বিদ্রোহ যেখানে রক্তস্রোতের উপর দিয়ে স্বাধীনতার তরণী ব'হে এনেছে, সেখানে রক্তস্রোতের উপর দিয়েই সে তরণী অচিরে ভেসে চ'লে গিয়েছে। দু'একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হ'বে।

ফরাসী বিপ্লব

ফরাসী বিদ্রোহ ইউরোপীয় স্বাধীনতা-সমরের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিগৃহীত ফরাসী প্রজাগণ তা'দের পীড়নকারী রাজা ও পরাক্রান্ত ধনিকুলের উচ্ছেদ ক'রে তা'দের রক্তপ্রবাহের উপর ফরাসী জনগণের স্বাধীনতার সিংহাসন পেতেছিল। কিন্তু সে ক'দিনের জন্যে? হিংসা দু'দিনেই এই দুর্জ্জন জনগণকে বিচ্ছিন্ন, হীনবল ও পরাধীন ক'রে তুললে এবং নেপোলিয়ন যখন ফরাসী দেশের সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন ফরাসী জনগণের পায়ের শৃঙ্খল আবার দুর্ব্বহ হয়ে উঠল। তাই, বিজ্ঞ ইংরাজ মনীষী বড় ক্ষোভেই বলেছেন—"হে শ্রমসম্বল মনুষ্যগণ! দীর্ঘ ছয় বৎসর কত দুঃখ, কত শ্রম, কত প্রাণপণ প্রয়াস করিয়া তোমরা যে বিরাট রক্তোৎসব করিলে, তাহার ফলে তোমরা ত কিছুই লাভ করিলে না। তবে কেন সে কাজ করিলে?"

অন্যান্য দেশের বিদ্রোহ

ইংলণ্ড, ইটালী, রুসিয়া প্রভৃতি দেশের রক্তাক্ত বিদ্রোহ সমূহও এই একই সত্যের প্রমাণস্থল। পরাধীনতা যখনই হিংসাকে আশ্রয় ক'রে মুক্তির প্রয়াস করেছে, তখন হিংসা প্রবল হয়ে উঠেছে, ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতার গৌরবকে ম্লান ক'রে পশুবলে স্বাধীনতার উপাসকদের বিধ্বস্ত করেছে, পীড়িত করেছে। হিংসা হিংসককেই দংশন করেছে।

ইউরোপ যতই বড়াই করুক, স্বাধীনতা ইউরোপে আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি—দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার নিত্য নূতন আকারে সমগ্র ইউরোপে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে ইউরোপবাসীর স্বাধীনতার আস্ফালনকে উপহাস করছে।

অহিংসা ও অসহযোগ—একমাত্র পন্থা

আমি জানি, জীবনে বিদ্রোহ নিরর্থক নয়, অন্যায়ের ও অধর্ম্মের গতিরোধের জন্যে বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ কথা পাকা ক'রে বুঝতে হবে যে, হিংসা বিদ্রোহের অস্ত্র নয়—হিংসা আপন উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। অহিংসা ক্ষিপ্রপদ নয়, তা'র গতি মন্দ; কিন্তু অহিংসা ধীরে ধীরে যখন মানুষের মনে স্থান লাভ করে, তখন মানুষ পাকা ক'রেই স্বরাজের পথ ধরে। ভারতবাসী আজ এই পথের সন্ধান পেয়েছে। যাঁরা এখনও এ পথ সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁদের আকালী আন্দোলনের ইতিহাস মনোযোগের সহিত আলোচনা করতে অনুরোধ করি। অমৃতসহরে গিয়ে আহত আকালীদের যখন দেখলাম ও যখন জানলাম যে, বীর আকালীগণের মধ্যে এক জনও ভীষণ প্ররোচনা সত্ত্বেও হিংসা মাত্র করেন নি, তখন অহিংসার অনিবার্য্য জয় সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন সন্দেহ থাকল না। এই অদ্বেষ অসহযোগের দ্বারা ভারতবাসীকে স্বরাজ লাভ করতে হ'বে। আর দ্বিতীয় পথ নেই।

অসহযোগের প্রয়োগ

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কি ক'রে, কোন্ কোন বিষয়ে অসহযোগ প্রয়োগ করলে সিদ্ধিলাভ হবে, এখন তাই আমাদের বিচার্য্য। অনেকে মনে করেন, এই কয় বৎসর গভর্ণমেণ্টের তাড়নে দেশের লোকের মনে এমন একটা দুর্ব্বলতা এমন একটা ক্লৈব্য এসেছে যে, আবার উৎসাহের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন চালানর ক্ষমতা তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি এ কথা মানিনে। দেশে একটা বাহ্যিক শ্রান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অসহযোগ ও অহিংসা দেশে যে প্রাণ জাগিয়ে তুলেছে, তার মধ্যে স্বরাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অমর শক্তিতে বিরাজ করছে। এই শক্তিকে জাগ্রত ক'রে, সংহত ক'রে তাতে কর্ম্মপ্রেরণা দেওয়াই আমার বিবেচনায় এখন কংগ্রেসের একমাত্র কাজ। কি উপায়ে এ কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে, নিয়ে তার আলোচনা ক'রলাম।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্বাধিকার

জাতীয় মহাসমিতির প্রথম কাজ ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে সদ্ভাব ও ঐক্য সম্পাদন। এ জন্যে আমার মনে হয়, স্বরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে ছোট বড় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কি কি স্বত্বাধিকার থাকবে, কংগ্রেস থেকে তার মীমাংসা ক'রে একটা নির্দ্দিষ্ট ঘোষণা-পত্র প্রচার করা আবশ্যক। লক্ষ্ণৌ সহরে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মিলনপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তা' বহাল রেখে উভয় সম্প্রদায়ের স্বত্বাধিকার নির্দ্ধারিত করা নিতান্ত দরকার। আপন আপন ধর্ম্ম বজায় রেখে প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই অন্য সম্প্রদায়ের হিতের জন্যে কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হ'বে। গোহত্যা ও মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজান উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য আছে। কিন্তু গোহত্যা বন্ধ করা কি মুসলমানের পক্ষে এতই দুঃসাধ্য? এবং মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করা কি হিন্দুর পক্ষে এতই কষ্টকর? উভয় সম্প্রদায় একত্র হয়ে এর মধ্যবস্থা অনায়াসেই করতে পারে। এইরূপে শিখ, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতি যে সকল অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সম্প্রদায় আছে, তাদের

প্রত্যেকের স্বত্বাধিকার নির্দ্ধারিত করা যায়। এই সকল ছোট ছোট সম্প্রদায়ের স্বত্বাধিকার মীমাংসা করার সময় আমাদের মনে রাখ্‌তে হ'বে যে, লোকসংখ্যা হিসাবে এদের যা প্রাপ্য, তার চেয়ে বেশী না দিলে চলবে না। বস্তুতঃ ছোট ছোট সম্প্রদায়গণের মনে যদি আমরা এ বিশ্বাস জন্মাতে না পারি যে, স্বরাজাধিকারে ছোট বড়র হাতে, দুর্ব্বল সবলের হাতে পীড়িত হবে না, তা হ'লে ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন কখনই পাকা হ'বে না।

ভারতের বাহিরে আন্দোলন

পৃথিবীর সব দেশেই স্বাধীনতার সত্য উপাসক আছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা, তাঁদের উপদেশ ও সহানুভূতি লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এ জন্য আমার ইচ্ছা, আমেরিকা ও ইউরোপের সমস্ত প্রধান দেশে আমাদের জাতীয় মহাসমিতির শাখা-বিভাগ স্থাপন করা হয়। তা' হ'লে সভ্য জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হ'বে, জগতের কর্ম্মচক্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ও সত্য পরিচয় হয়ে উঠবে।

এসিয়াবাসীর মহাসম্মিলনী

পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের একটা সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হ'বে। যে সকল জাতি পর-পীড়িত, তা'রাই এই বিরাট মিলন-ব্যবস্থার অগ্রণী। এসিয়ার এই মিলন-ব্যাপারে শুধু ভারতবাসীই কি পরাঙ্মুখ হয়ে থাকবে? আমার মনে হয়, বিদেশে কংগ্রেসের শাখা-স্থাপন অপেক্ষাও এ ব্যাপারটা বেশী প্রয়োজনীয়। অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা ভারতবাসীর স্বীয় চেষ্টা দ্বারাই অর্জ্জন করতে হবে। তবুও সমগ্র এসিয়াবাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধা, সমবেদনা ও হৃদ্যতার সুযোগ আমরা অবহেলা করতে পারিনে। কারণ, নিখিল মানব সমাজের কল্যাণ ও শান্তির জন্যে এ মিলন একান্ত আবশ্যক। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীতে যতক্ষণ একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জাতিও শৃঙ্খলিত থাকবে, ততক্ষণ মানবসমাজের শান্তির আশা নেই, ততক্ষণ অন্য পরাক্রান্ত জাতিরাও যে নিরাপদ ও স্বাধীন, এ কথা মিথ্যা।

পঞ্জাব অত্যাচার,—খিলাফৎ

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই অঘটন ঘটছে। সেই সব অদ্ভুত ঘটনা যে সকল সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ, সেই শক্তিসমূহে পৃথিবীর সকল মানুষকেই কিছু-না-কিছু প্রেরণা দিচ্ছে। সম্প্রতি মুস্তাফা কামাল পাশার বিস্ময়কর জয়ভেরী যেন সমগ্র এসিয়া ভূভাগে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্তিমতী ক'রে তুলেছে, পীড়িত এসিয়ার বন্ধন ছেদন করেছে। ইউরোপে প্রত্যেক ক্ষুদ্র পদদলিত জাতির স্বাধীনতার জন্যে নবোন্মেষিত উন্মাদনাও এসিয়ার জাগরণের আনুকূল্য করেছে। স্বপ্নাবিষ্ট ভারতেও এ জাগরণের কম্পন অনুভূত হয়নি, কে বলবে? তাই বলছিলাম, এই ত উপযুক্ত সময়, যখন আমরা পঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচার ও খিলাফতের উপর নির্লজ্জ অবিচারের প্রতীকারের কথা আলোচনা করতে পারি। এই উভয় বিষয়েই আমাদের আন্দোলন আংশিকভাবে সফল হয়েছে। কিন্তু উপযুক্তভাবে আন্দোলন করলে আমাদের আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হ'তে না পারে, এমন নয়।

স্বরাজ—রূপের ইঙ্গিত

আমি পূর্ব্বে বহুবার বলেছি, স্বরাজ জিনিসটা কি রকমের হ'বে, তা' বোঝান যায় না, কেন না, স্বরাজ হচ্ছে জাতীয় অভিব্যক্তির প্রকট রূপ— জাতি যে ভাবে আত্মবিকাশ করবে, স্বরাজ তদনুসারে গ'ড়ে উঠবে। কিন্তু আমি জানি, দেশের মধ্যে স্বরাজের রূপ-কল্পনা নিয়ে একটা উৎকণ্ঠা, একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। এ দিকে

বাস্তব আকারে না হোক, মানসক্ষেত্রে অনেকেই স্বরাজের একটা রূপ বর্ত্তমান অবস্থানুসারে গ'ড়ে তুলছেন। কাজেই আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় মহাসমিতির মানস-পটে স্বরাজের যে রূপটা ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে, তার একটা আভাস সমগ্র দেশবাসীকে দিয়ে তাঁদের উৎকণ্ঠা প্রশমিত করা উচিত। আমার নিজের মনে যে রূপ ফুটে উঠছে, তার সামান্য ইঙ্গিত করা ভিন্ন এ অভিভাষণে আর বেশী কিছু সম্ভব নয়।

অনেকে মনে করেন, স্বরাজের জন্যে যা-কিছু চেষ্টা, যা-কিছু ত্যাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেই করছে, সুতরাং স্বরাজলাভ হ'লে স্বরাজের যা-কিছু সুখ-সৌভাগ্য মধ্যবিত্ত লোকদেরই করতলগত হবে—অন্য সকলের যে দুঃখ, সেই দুঃখ। এ আশঙ্কা অমূলক, কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা বলতেও পারি নে। অমূলক, কারণ, এ দেশে স্বরাজ-লাভের জন্যে আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আছে। কিন্তু যদি সাধারণ লোক এ আন্দোলনে, এ সাধনায় যোগ না দিত, কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেষ্টাতেই স্বরাজ লাভ হ'ত এবং তা তারা স্ব-শ্রেণীর ভোগের জিনিস ক'রে তুলত, তা' হ'লে আমি কখনই তাকে স্বরাজ ব'লে স্বীকার করতাম না। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত প্রজারা পার্লামেণ্ট স্থাপিত ক'রে তাদের দেশে স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড়িয়েছে। কিন্তু সাধারণ ইংরাজ দুঃখী প্রজা এখনও এই মধ্যবিত্তগণের পদদলিত। ইংরাজ স্বরাজ পেয়েছে, আমি স্বীকার করিনে। ইংরাজের মত আমাদের মধ্যবিত্তগণ মোহ কাটাতে পারবে না। ইংরাজ প্রভুর স্থলে দেশী প্রভু পেয়ে ভারতবাসী কখনই স্বরাজের গৌরব অনুভব করবে না। কাজেই আজ যদি ইংরাজ বলে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণের হাতে ছেড়ে দিতে তারা রাজী, আমি সে অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করব।

আমার কাছে সুগঠিত পল্লীসমাজ ও সংঘবদ্ধ পল্লীর স্থানীয় স্বাধীনতার মূল্য প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের চেয়ে বেশী। আমি বলছিনে যে, এই সঙ্ঘবদ্ধ পল্লীসমাজ সমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও যোগ-শূন্য হবে। তাদের মধ্যে যোগ থাকবে, তবে সে যোগটা স্বপ্রবর্ত্তিত, পরস্পরের উপর প্রীতি ও আনুকূল্যমূলক হবে। উপস্থিত পল্লীসমাজের জীবনগঠনের সহায়তার জন্যে প্রাদেশিক ও ভারত গভর্ণমেণ্টের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু ক্রমে সেই সমাজে জীবন যেমন উন্নত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে, উপরিস্থ প্রাদেশিক ও ভারত গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতাও তেমনই পল্লী-সমাজের হাতে বিন্যস্ত হ'তে থাকবে এবং যথাকালে এই পল্লীসমাজসমূহ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা লাভ করলে প্রাদেশিক ও ভারত গভর্ণমেণ্ট সাধারণ তত্ত্বাবধান ও উপদেশ দান করার অধিকার মাত্র স্বহস্তে রেখে সমস্ত শাসনভার এই সংঘবদ্ধ পল্লীসমাজের হাতে ছেড়ে দেবে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত শাসনভার পল্লীর হাতে ন্যস্ত না হ'লে দেশ কখনও স্বরাজ লাভ করবে না। এ জন্যে আমার নিবেদন, জাতীয় মহাসমিতি কালবিলম্ব না ক'রে একটি কমিটী গঠন করেন এবং সেই কমিটীর হাতে স্বরাজ গভর্ণমেণ্টের একটা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার ভার দেন।

ভোট দেওয়ার অধিকার স্বাধীনতার চরম উৎকর্ষ নয়, স্বরাজের নিদর্শন নয়, এ জ্ঞান ইউ-রোপে আজকাল ক্রমে উদিত হচ্ছে। সেখানে এখন মনীষিগণের মধ্যে কয়েক জন প্রাচীন ভারতের লুপ্ত পল্লীজীবনের দিকে লুব্ধ-দৃষ্টিতে চাইতে আরম্ভ করেছেন এবং সেই জীবনের তত্ত্ব আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁরা মনে করছেন, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সংখ্যার সমষ্টি দ্বারা শাসনযন্ত্রের গতি-পদ্ধতি নিয়মিত করা সমাজ ব্যবস্থার

রাজনীতির শেষ কথা নয়। জীবনের স্বাভাবিক স্ফুরণ, ব্যক্তিগত ও সংঘগত প্রীতি ও সহজ মিলনের আদর্শ এখন চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চিত্ত আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছে।

আমাদের স্বরাজের আদর্শও অনেকটা এই ছাঁচের। ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও জাতি আপন আপন স্বাধীনতা, বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য বজায় রেখে পরস্পরের সাহায্যে যাহাতে পূর্ণতা লাভ করতে পারে এবং পরিণামে নিখিল বিশ্ব-মানবের সঙ্গে সখ্য ও ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে, এমন যে বিধান, সেই হ'ল প্রকৃত স্বরাজ।

এই আদর্শে কংগ্রেস এই মুহূর্ত্তেই কাজ আরম্ভ করেন, এই আমার প্রার্থনা। বর্ত্তমান মহকুমাগুলিকে কেন্দ্র ক'রে পল্লীসংস্কার আরম্ভ করা আমার মত।

কাউন্সিল বর্জ্জন

কাউন্সিল বর্জ্জন কংগ্রেসনির্দ্দিষ্ট অসহযোগের একটি উপায়। সম্প্রতি এই ব্যাপার নিয়ে কিছু কংগ্রেসকর্ম্মিগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এক দল বলছেন, কাউন্সিল সর্ব্বতোভাবে পরিহার করাই কংগ্রেসের অভিপ্রায়। আর এক দলের মতে কাউন্সিলে প্রবেশ ক'রে কাউন্সিল ধ্বংস করার চেষ্টাও কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অসঙ্গত নয়। আমার মনে হয়, এই প্রস্তাবিত কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তনে যাঁরা আপত্তি করছেন, তাঁরা দেশের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার সম্যক বিচার করছেন না। অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে বলেই কংগ্রেস বারদোলী সিদ্ধান্তের দ্বারা কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন। তদ্দ্বারা কংগ্রেস 'বয়কট' বা বর্জ্জননীতি ত্যাগ করেন নি, শুধু আমাদের ধর্ম্মের গতি পরিবর্ত্তনই ইঙ্গিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা ছাত্রগণের স্কুল-কলেজ বর্জ্জনের কথা বিবেচনা করতে পারি। প্রথমে যখন ছাত্রগণকে সরকারী স্কুল-কলেজ ছাড়তে বলা হয়েছিল, তখন উদ্দেশ্য ছিল, রাষ্ট্রিক অর্থাৎ ছাত্র সম্প্রদায়ের শক্তি স্বরাজ-সাধনের কাযে নিয়োগ করা। বারদোলীতে স্থির হ'ল, জাতীয় স্কুল-কলেজ খুলে এই ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ এদের মধ্যে যাদের শক্তি প্রত্যক্ষভাবে ও ষোল আনা দেশের কাজে লাগান যাবে না, তাদের জাতীয় ভাবে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ক'রে সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জ্জনের সুবিধা ক'রে দেওয়া। টেক্স দেওয়া বন্ধ ক'রে যে দেশব্যাপী অবাধ্যতার সঙ্কল্প কংগ্রেস করেছিলেন, তা'ও ত পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কাজের সিদ্ধির জন্য দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে এরূপ অবশ্যম্ভাবী। শুধু মনে রাখতে হবে—সংকল্প আর সত্য। তা মনে রাখলে এই যে কাউন্সিলে ঢুকে কাউন্সিল সংস্কৃত করা বা ভাঙ্গার প্রস্তাব, এটা কখনই অন্যায় বা কংগ্রেসের অনভিপ্রেত ব'লে মনে হ'বে না।

কাউন্সিল বর্জ্জনের সংকল্প কংগ্রেস করেছেন কেন? এ রকম কাউন্সিলের দ্বারা দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কোন আশা নেই। এ কাউন্সিলের নীতি-পদ্ধতি ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের সংস্কারবিরোধী, ভারতবাসীর জাতীয় জীবন-স্ফুরণের প্রতিকূল—এই জন্যেই। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ কেহই কাউন্সিলে প্রবেশ করলেন না। কিন্তু কাউন্সিল-বর্জ্জন সংকল্প সিদ্ধ হ'ল না, কাউন্সিল বেশ নির্ব্বিবাদে চলতে লাগল এবং এমন লোক সব কাউন্সিলের সভ্য হ'ল, যারা দেশের লোকের প্রতিনিধি নয়। এ অবস্থায় কংগ্রেসের কর্ত্তব্য কি? যাতে কাউন্সিল সত্য সত্য বর্জ্জিত হয়, কাউন্সিল একেবারে ভেঙ্গে যায় কিংবা দেশের উপযুক্ত ও কল্যাণকর হয়ে ওঠে, সেরূপ ব্যবস্থা করাই কি কর্ত্তব্য নয়?

বর্জ্জনের তাৎপর্য্য শুধু ভাঙ্গা নয়—গড়বার জন্যে

ভাঙ্গা, এ কথা যেন আমরা না ভুলি। কাউন্সিল বর্জ্জন করতে চাই, সে কাউন্সিলের উপর স্বরাজের ভিত্তি পত্তন করা সম্ভব নয় বলেই। কাজেই যদি শুধু আমরা কাউন্সিল থেকে সরে দাঁড়ালে কাউন্সিল বন্ধ হয়ে না যায় এবং তার ধারা এমন বদল না হয় যে, তার উপর স্বরাজ গড়ে তোলা যায়, তা হলে শুধু আমরা জনকতক সরে দাঁড়িয়ে কি লাভ? তার চেয়ে সেই কাউন্সিলে ঢুকে তার বনেদ পর্য্যন্ত খুঁড়ে ফেলে সেই জায়গায় স্বরাজের ভিত গাঁথবার চেষ্টা কি অনেক ভাল নয়? আমি এই পথ ধরে কাউন্সিল বর্জ্জন করতে পরামর্শ দিই।

*   *   *   *

তা ছাড়া, গত দু'বছর কাউন্সিলের কাজ যে ভাবে চলেছে, তাতে আমার মনে হয়, অসহযোগীদের কাউন্সিলে প্রবেশ করা নিতান্ত দরকার হয়েছে। যে সব [illegible] কাউন্সিলে ঢুকেছেন, তাঁরা শাসনকর্ত্তাদের [illegible] ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছেন। [illegible] দেশের অর্থ এঁরা অন্যায় [illegible] জলের মত খরচ করছেন। ১৯১[illegible] খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্টের মোট খরচ হয়েছিল ৭২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই খরচ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ১ শত ৩৮ কোটি হয়েছিল এবং এই নূতন কাউন্সিলের প্রথম বছরেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট ১ শত ৪৯ কোটি টাকা খরচ করেছেন। [illegible] সঞ্চিত ধন খরচ করলে [illegible] না। কিন্তু তা নয়, খরচ [illegible] নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করে। [illegible] শত ও ঋণভারে জর্জ্জরিত। কিন্তু এই যে বিপুল ধনরাশি বছর বছর জলের মত খরচ হচ্ছে, তার কত অংশ দেশের প্রকৃত মঙ্গলকার্য্যে লাগান হচ্ছে? সামান্য, বাকী টাকার অধিকাংশ যুদ্ধবিভাগে, বড় বড় ইংরাজ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীদের বেতনে, পুলিসবিভাগে, বড় বড় ইমারত নির্ম্মাণে ও এমন সব কাজে ব্যয়িত হচ্ছে যে, দেশের লোক তাদের পক্ষে বিশেষ হিতকর মনে করে না।

এই অন্যায় খরচ বন্ধ করতে না পারলে, দেশের পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠবে, দেশের যে সকল লোক কংগ্রেসের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে, তারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়বে, হয় ত বা নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে সরকারের পক্ষ অবলম্বন করবে। অতএব গভর্ণমেন্টের এই উচ্ছৃঙ্খল অর্থনীতি রোধ করতেই হবে। অসহযোগী কংগ্রেসকর্ম্মিগণ কাউন্সিলে গেলে তাঁরা এই উদ্দেশ্য সফল করতে পারবেন। তাঁরা গভর্ণমেন্টের খরচের দাবী না-মঞ্জুর করতে পারবেন। তার পরেও যদি গভর্ণমেন্ট জোর করে ইচ্ছামত খরচ করেন বা নূতন ট্যাক্স বসান ত সে অন্যায়ের দায়িত্ব দেশের লোকে নিশ্চয়ই গভর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপাবে এবং তার প্রতীকার করা কঠিন হবে না। দেশশুদ্ধ লোক তখন কংগ্রেসের ইঙ্গিতমাত্রে চলবে, এবং সমগ্র দেশের সমবেত শক্তি শাসনযন্ত্রকে ভেঙ্গেচুরে নূতন করে দেশের প্রয়োজনের অনুরূপ করে তৈরী করে নেবে।

শ্রমিক সমবায় গঠন

আর একটা কাজে জাতীয় মহাসমিতির মনোযোগ এখনই আকৃষ্ট হওয়া উচিত। শ্রমিক ও কৃষি সমবায়-গঠন কার্য্যে কালবিলম্ব না করে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক। এই নিরন্ন শ্রমজীবী ও কৃষকের শক্তিই দেশের প্রধান শক্তি। এখন এই শক্তি বিচ্ছিন্ন, দুর্ব্বল। একে সমাহিত করা নিতান্ত দরকার। এরা জাতীয় মহাসমিতির মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। স্বরাজের আকাঙ্ক্ষাও এদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপেক্ষা কম নয়। ধনীর পীড়ন এদের উপর দিন দিন যেরূপ বেড়ে যাচ্ছে, তাতে এদের যদি

কংগ্রেস আশ্রয় না দেন, তবে প্রাণের দায়ে এরা স্বতন্ত্রভাবে দলবদ্ধ হ'বে ও আপন আপন শক্তি কেন্দ্রীভূত করবার জন্যে সংঘ গঠন ক'রে তুলবে। তখন কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের যোগ ছিন্ন হয়ে যাবে এবং অন্য দেশের ন্যায় এ দেশেও দলে দলে বিরোধ বেধে উঠবে। সে বিরোধের সমন্বয় করা তখন সহজ হবে না। তাই বলি, আর কালক্ষয় না ক'রে কংগ্রেস তৎপর এ কাজে হস্তক্ষেপ করেন।

আরব্ধ কর্ম্ম

আমাদের কর্ম্মপদ্ধতির গতিপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমি যা বললাম, তা'তে এ কথা কেহ যেন মনে না করেন যে, কংগ্রেস যে সকল কাজে হাত দিয়েছেন ও এত দিন ধ'রে ক'রে আসছেন, সে সব কাজ আমি স্থগিদ রাখতে পরামর্শ দিচ্ছি। স্কুল, কলেজ, আদালত, বিদেশী দ্রব্য প্রভৃতি বর্জ্জনের জন্যে যে সব কাজ আমরা আরম্ভ করেছি, তা সমভাবেই করতে হ'বে। জাতীয় স্কুল-কলেজ যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা বজায় রাখতে হ'বে, যেখানে সম্ভব, নূতন খুলতে হ'বে, সরকারী আদালত ছেড়ে নিজেদের পঞ্চায়েৎ স্থাপিত করতে হ'বে এবং যা'তে দেশের লোক পরমুখাপেক্ষী না থাকে, সে জন্য ঘরে ঘরে চরকা চালাতে ও খদ্দর তৈয়ারীর বন্দোবস্ত করতে হ'বে, এবং সর্ব্বোপরি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও ঐক্য স্থায়িভাবে স্থাপনের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হ'বে।

শেষ নিবেদন

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে; শুধু একটা কথা বলতে বাকী আছে। সে কথাটা হচ্ছে, স্বরাজের পথ বড় দুর্গম, কিন্তু আপনারা রক্তাক্ত-চরণে অন্ধকার ভেদ ক'রে সে পথে এত দূর অগ্রসর হয়েছেন যে, স্বরাজ প্রায় দৃষ্টির গোচর হয়ে এসেছে। অনেক আঘাত সহ্য করেছেন, অনেক নৈরাশ্য ভোগ করেছেন—এখনও হয় ত অনেক প্রহার আপনাদের মাথার উপরে সমুদ্যত হয়ে রয়েছে, কিন্তু এ কথা ভুলবেন না যে, নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় আপনাদিগকে বিজয়লক্ষ্মীর রত্নসিংহাসনের নিকটবর্ত্তী করেছে, সেই সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অক্ষুন্ন থাকলে অচিরেই স্বরাজ আপনাদের করতলগত হবে। আপনারা মনে রাখবেন, আপনারা যে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছেন, সে ধর্ম্মযুদ্ধ, সত্য ও ধর্ম্মই এ যুদ্ধের মন্ত্র। যদি সত্যভ্রষ্ট না হয়ে যুদ্ধজয় করতে পারেন, তবেই জয়লক্ষ্মী করতলগত হ'লেও আপনাদের হাত কখনও প্রভুত্বের কালিমায় কলঙ্কিত হবে না, তবেই ভারতের প্রাসাদে ও কুটীরে সমানভাবে স্বরাজের রত্নমন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে। **বন্দে মাতরম্।**

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার অনূদিত।

সম্পূর্ণ

বাঙ্গালীর গৌরব মুকুট

বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি—বাঙ্গালীজাতির গর্ব্ব, স্পর্দ্ধা, সম্পদ, অলঙ্কার-ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান অমর মনীষীগণের

মহাজীবনী ও প্রতিভা-বিশ্লেষণী

ভারত-প্রতিভা

যাঁহাদের নাম শ্রবণে—

মননে—স্মরণে—ধ্যানে বাঙ্গালী জাতীয়গৌরবে উদ্দীপিত—অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে—যাঁহাদের প্রতিভা ও মনীষাপ্রভাবে বাঙ্গালী আজ জগতবাসীর নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছে সেই মাতৃপূজার পুরোহিত—স্বনামধন্য অমরকীর্ত্তি প্রতিভার অবতারগণের জীবনী পাঠে দেশসেবায় তন্ময় হইয়া মাতৃপূজায় আত্মনিবেদন করুন!

কোন্ কোন্ মহাপুরুষগণের জীবনী প্রতিভা-বিশ্লেষণী

ভারত প্রতিভায় পাইবেন :—

১। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ২ রাজা রামমোহন রায় ৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ৫ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৬। স্বামী বিবেকানন্দ ৭। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৯। [illegible] ১০। রামতনু লাহিড়ী ১১। রাজা রাধাকান্ত দেব ১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৪। প্যারীচাঁদ মিত্র ১৫। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৬। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭। রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৯। দ্বারকানাথ ঠাকুর ২০। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২১। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২২। গঙ্গাধর কবিরাজ ২৩ রামগোপাল ঘোষ ২৪। দীনবন্ধু মিত্র ২৫। কালীপ্রসন্ন সিংহ ২৬। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২৭ আবদুল লতিফ।

প্রত্যেক জীবনী হাফটোন চিত্রে সুশোভিত।

চরিত্রচিত্র পাঠ ও স্বরূপ চিত্র দর্শন একত্র হইবে।

এ্যান্টিকে ছাপা চিত্রে চিত্রে চিত্রময়—সুদৃশ্য সিল্কের

সুকোমল পাড় বাঁধাই মাত্র ২৲ দুই টাকায়।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।